নজরুল-সাহিত্য বিচার

শাহাবুদ্দীন আহমদ

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারী ১৯৬৭

প্রকাশ করেছেন :
চিত্তরঞ্জন সাহা
মুক্তধারা
[স্বাধীন বাংলা সাহিত্য পরিষদ]
৭৪ ফরাশগঞ্জ
ঢাকা—১
বাংলাদেশ

প্রচ্ছদ এঁকেছেন :
কালাম মাহমুদ

ছেপেছেন :
প্রভাংশুরঞ্জন সাহা
ঢাকা প্রেস
৭৪ ফরাশগঞ্জ
ঢাকা—১
বাংলাদেশ

যাঁরা নজরুল-চর্চায় নিবেদিত

প্রকাশনা ও মুদ্রণ সম্পর্কিত দু'চার কথা

প্রকাশনা ও মুদ্রণ সম্পর্কে দু'চার কথা বলতে হয়। সতর্কতা সত্ত্বেও কিছু মুদ্রণ প্রমাদ রয়ে গেল। আমার নিজের দোষেই এ ভুল হ'য়েছে। পাণ্ডুলিপি যথেষ্ট যত্ন ক'রে তৈরী করা হয়নি। অগোছালো এবং বিশৃঙ্খল পাণ্ডুলিপি দেখে কম্পোজ কবলে ভ্রম সংশোধন করলেও তাতে ভুল থেকে যায। সেই সব ভুল এই সংস্করণে সংশোধন করা সম্ভব নয। আকাব ওকাব, উকার, ঊকার, ইকার, ঈকার-এর ভুল অথবা রেফ-এর অন্তর্ধান-এব ভুল পাঠক নিজেই শুধ্বে নিতে পারবেন পাংচুয়েশনের ত্রুটিও পণ্ডিত ব্যক্তিব বুঝে নিতে অসুবিধা হবে না। তবে যেখানে বিভ্রান্ত হওযার সম্ভাবনা আছে সেখানে শুদ্ধ মুদ্রণ কি হওযা উচিত পাঠককে তা জানান দরকার বলে গুটি-কযেক ত্রুটিব কথা এখানে উল্লেখ কবলাম। আমি কোনদিন 'লিখা' লিখি না সুতরাং "লিখা", দেখলে "লেখা" পড়ে নিতে হবে। "ইব্রাহিম খাঁ" নামের বানান সব সময় "ইবরাহিম খাঁ" হবে। কোথাও "জীবনানন্দ দাস" লেখা থাকলে 'দাস' এর 'স'-এর স্থানে "শ" হবে। ১২৮ পৃষ্ঠায় নজরুলের একটি কবিতা পংক্তি "ক্ষুদ্র প্রেমের শূদ্রানী" হয়েছে হবে "ক্ষুদ্র প্রেমের শূদ্রাণী"; ঐ একই পৃষ্ঠায় ইংরেজ কবি উইলফ্রেড ওয়েন-এর নাম ছাপা হযেছে "ওইলফ্রেড ওযেন"। কবিতার লাইন ১৪৪ পৃষ্ঠায় "আমি বঞ্চিত ব্যথা পান্থবাসী", ২৫০ পৃষ্ঠায় "শারাব সভায়", ২৮৫ পৃষ্ঠায় "আগ্নিক জমদগ্নি", ২৫১ পৃষ্ঠায় "অধরে দর কষা কষি", "দিবা ভোগ কর" ২৮৪ পৃষ্ঠায় "উড়ে সুখ নীড় পরে ছায়া তরু" ছাপা হয়েছে। ঐগুলি যথাক্রমে "আমি বঞ্চিত ব্যথা পথবাসী," "শাবাব সভার", "সাগ্নিক জমদগ্নি", "অধরে

অধরে দর কষাকষি'', ''দিয়া ভোগ কর'' এবং'' ''উড়ে সুখনীড় পড়ে ছায়া তরু'' হবে। এ-ছাড়া ৯৫ পৃষ্ঠায় ''অভয়ের কথা'' হবে ''অভয়ার কথা'', ১৭৫ পৃষ্ঠায় Zyric এর স্থানে হবে Lyric, ২৭১ এর পৃষ্ঠায় hili and dale এর স্থানে ''hill and dale'' হবে। প্রসংগতঃ এই গ্রন্থে কোথাও রেনেসাঁ লেখা থাকলে সেটাকে ''রেনেসাঁস'' ধ'রে নিতে হবে। ভিন্ন ভিন্ন সময়ে লেখা বলে কোথাও ''বিথোভেন'' লেখা হয়েছে কোথাও হয়েছে ''বেটোফেন'' কোথাও ''ডস্টয়েভস্কি'' আবার কোথাও 'দস্তয়েভস্কি' কোথাও ''হাফিজ,'' কোথাও ''হাফেজ'' কোথাও ''উমর'' আবার কোথায়ও ''ওমর''। বলাবাহুল্য ''বিথোভেন'' ও ''বেটোফেন'' যেমন এক ব্যক্তি তেমনি ''ডষ্টয়েভস্কি'' ও ''দস্তয়েভস্কি'', ''হাফেজ'' ও 'হাফিজ'' এবং ''উমর'' ''ওমরও'' একই ব্যক্তি।

''রুবাইয়াত-ই-ওমর খৈয়ামে'র অনুবাদক নজরুল'' প্রবন্ধটি ''নজরুল একাডেমী পত্রিকায়'' ''নজরুল ইসলাম ও ওমর খৈয়াম'' নামে ছাপা হয়েছিল। বস্তুতঃ ঐ প্রবন্ধটি মৎরচিত এবং এখনও অপ্রকাশিত ''দু'জন পারসী কবি ও নজরুল ইসলাম''-এর একটি অসম্পূর্ণ অংশ। প্রবন্ধটি ''নজরুল-সাহিত্য বিচারে''র অন্যর্ভুক্তির সময় কিছুটা সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে এবং যেহেতু অনুবাদ সম্পর্কিত আলোচনা তাই নামও পরিবর্তন করা হয়েছে। নজরুলের গ্রন্থে ''রুবাইয়াত''-এর বানান ''রুবাইয়াৎ'' আছে। ''ৎ''-এর স্থানে ''ত'' হওয়ার কারণ আমার অসতকর্তা। এই দারুণ অমনোযোগিতার জন্য আমি লজ্জিত। এই প্রবন্ধে R. O. K. অর্থ Rubaiyet of Omar Khayyam, Fitz অর্থ Fitzgerald, R.G. অর্থ Robert Graves এবং O.A.S. অর্থ Omar Ali Shah, R.O.R. অর্থ The Romance of the Rubaiyat.

''নজরুল ইসলাম ও হাফিজ'' প্রবন্ধটিও ''দু'জন পারসী কবি ও নজরুল ইসলাম'' গ্রন্থের আর একটি পরিচ্ছেদের অংশ বিশেষ। ''পূর্বাচলে'' প্রবন্ধটি ''মহাকবি হাফিজ ও নজরুল ইসলাম'' নামে ছাপা হয়েছিল। নাম পরিবর্তন ক'রে সেটাকেই এখানে ছাপা হ'ল। প্রবন্ধটিতে ভাবগত দিক থেকে হাফিজের সংগে নজরুলের ভিন্নতা ও অভিন্নতার তেমন বিশদ আলোচনা এখানে নেই।

আমার অসতর্কতার জন্য ৩১৬ পৃষ্ঠায় একটি দারুণ ভুল থেকে গেছে। "যেদিন লব বিদায়" স্তবকটির ইংরেজী অনুবাদ ঐ স্তবকের নীচে ছিল। কম্পোজিটারদের সঙ্গে সঙ্গে আমার চোখও ঐ স্তবকটির কথা স্মরণ করেনি। তাই স্তবকটিকে এখানে উদ্ধৃত করলাম :

Should I fall dead, wash my poor corpse in wine ;
Read it into the grave with drinking songs.
On Judgement Day, if you have need of me,
Delve in the soil beneath our tavern door.

[98 in **R** O.K, of **R**.G. and O.A.S.]

৭২ পৃষ্ঠায় দ্বিতীয় ইংরেজী উদ্ধৃতির শেষ বাক্যটির "If fellow" স্থানে "A fellow" হবে এবং "inventive head"-এর পরে, " , " কমা বসবে না।

—শাহাবুদ্দীন আহ্‌মদ

সূচীপত্র

লেখকের অন্যান্য বই :

১. শব্দ-ধানুকী নজরুল ইসলাম

২. সাহিত্য-চিন্তা

নজরুল-চর্চা : দেশে-বিদেশে

নজরুলের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে নজরুল-চর্চা শুরু হয়ে যায়। তখনকার দিনে, ১৯২০-২১ সালের বাঙালী পাঠকের কাছে তাঁর আবির্ভাব কিছুটা অচিন্তনীয় বলে মনে হয়েছিল। 'রবীন্দ্র-অনুকরণে যে সাহিত্যের ধারা তখন বাংলা সাহিত্যে প্রবাহিত ছিল নজরুল ইসলাম একটি কঠিন আঘাতে সেই ধারাপথটিকে বদলে দিলেন। তাঁর পূর্বে বাংলা কাব্যে সত্যেন দত্ত, মোহিতলাল, যতীন সেনগুপ্ত কিছু কিছু নব-জীবন দর্শনের নতুন আমেজ বয়ে নিয়ে এলেও বাংলার সমাজমানসের গভীরে প্রোথিত মৌল সমস্যাটির সমাধানের দিক নির্দেশে পথিকৃতের ভূমিকা গ্রহণ করতে পারেননি। সত্যেন দত্ত মেতেছিলেন নতুন নতুন ছন্দ-নির্মাণের আনন্দে; তাঁর কবিতায় শান্ত ইঙ্গিত ছিল সমাজ-সমস্যা নিরসনের, সেখানে ছন্দে-শব্দে মুদ্রিত ছিল স্বাজাত্যবোধ ও দেশাত্মবোধের নিরুদ্বেল আবেগ এবং তাঁর অনুভবে জড়িয়ে ছিল উদার মানুষের পুষ্প-হৃদয়। মোহিতলাল নিয়ে এলেন দেহ-বাদীর বস্তুমুখী বলিষ্ঠ কণ্ঠ, আর যতীন সেনগুপ্ত নিয়ে এলেন এক ধর্ম-পাগল দেশে পার্থিব চৈতন্যের নিরাধ্যাত্মিক দৃষ্টি। ভুললে চলবে না, যে ছন্দ আবিষ্কারের জন্য সত্যেন দত্তকে ছন্দের রাজা বলা হয়, তার অনেকাংশের স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং এবং মানবপ্রেম তথা বিশ্বপ্রেমের গভীর আবেদন তাঁরই কাব্যে সংগীতে ছিল প্রথম প্রস্ফুটিত পদ্ম। মোহিতলাল ও যতীন্দ্রনাথে বুদ্ধি ও মনীষার নব-দিগন্ত উন্মোচিত হলেও ভাষা ও ছন্দে উভয়েই রবীন্দ্র-সত্যেন থেকে অনেক বেশী পৃথক হতে পারেননি। সুতরাং বাংলা ভাষার সাহিত্য ও কাব্য প্রায় একঘেঁয়ে বীণার বাদ্যে পরিণত হল। এমনি একটি নিরুত্তাপ পরিবেশে একটি জীর্ণ-ভগ্ন ও তন্দ্রামগ্ন সমাজের প্রার্থনার ভাষা নজরুলের কণ্ঠে দীপ্ত বাণীতে উত্থিত হয়।'

বিদেশী রাজার শাসন ও শোষণে, দরিদ্র, ক্লিষ্ট, লাঞ্ছিত ভারত-বাসীর অন্তরে যে ক্রোধের পাহাড় সৃষ্টি হয়েছিল আগ্নেয়গিরির লোল জিহ্বা মেলে নজরুলের কাব্যে তার প্রকাশ হল। যে ক্রোধ অন্য কবির দ্বারা প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি, নিঃশঙ্কচিত্ত নজরুল সেই ক্রোধের ধনুকে শর যোজনা করে শত্রুপক্ষের শিবিরে প্রথম আঘাত হানলেন, তাদের তাঁবুর চূড়ায় পৌছে দিলেন দুর্নিবার মারণাস্ত্র। এই অকল্পণীয় এবং অভাবনীয় ক্ষমতা ও বীরত্বের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে সমস্ত বাঙালী পাঠক জাতিধর্ম নির্বিশেষে নিমেষে তাঁর ভক্তে পরিণত হয়।

কেবল কবিতা নয় একই সঙ্গে গান, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ লিখে সাহিত্যের নানা দিকে তিনি তাঁর শিকড় ছড়িয়ে দিলেন এবং কবিতা ও গানের মত সাহিত্যের অন্যান্য দিকে উন্নতমানের শিল্প-কুশলতার তেমন পরিচয়ের স্বাক্ষর আঁকাব সময় না পেলেও এক নতুন স্বাদের সঙ্গে বাঙালী পাঠকের পরিচয় করালেন। প্রকৃতপক্ষে ১৯২০ থেকে ১৯২৫-২৬ সাল পর্যন্ত নজরুল একাধারে বিপ্লবাত্মক কবিতা ও প্রেমের কবিতা লিখে বাঙালী পাঠকের সকল শ্রদ্ধা ও প্রীতি অর্জন-করেন। এরপরে তাঁর আর একটি নতুন মূর্তি দেখে পাঠক নতুন করে বিস্মিত ও মুগ্ধ হন। ফারসী গীতি-কবিতার সৌন্দর্য-অলঙ্কৃত এবং সৌরভ-বিজড়িত গজলের কাব্য-সুষমা ও উর্দু গজলের সুরৈশ্বর্যে সমৃদ্ধ অসংখ্য গানের মাদকতায় তিনি বাংলার আপামর জন-সাধারণের চিত্তকে উদ্বেল করে তুললেন। এরপরে বিদ্রূপ-গর্ভ রাজনৈতিক ও সমাজসচেতন তাঁর হাসির কাব্যগ্রন্থ চন্দ্রবিন্দু; রুবাইয়াত-ই-হাফিজ ও রুবাইয়াত-ই-ওমর খৈয়ামের বিস্ময়কর অনুবাদ তাঁর অন্য আর এক অনন্য রূপকে উদ্‌ঘাটন করল। কিন্তু ঐ পর্যন্ত তাঁর প্রতিভা সীমাবদ্ধ থাকল না। তিনি কেবল অজস্র গান লিখলেন না, নতুন নতুন সুর উদ্ভাবন করে বাংলার সংগীত জগতের শ্রেষ্ঠতম সুরস্রষ্টা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করলেন। নাটক লিখলেন, মঞ্চে ও সিনেমায় অভিনয় করলেন; এমনকি ছায়াছবির সংগীত পর্যন্ত পরিচালনা করে নিজের মহিমময় প্রতিভার অকল্পনীয় বৈচিত্র্যকে উদ্‌ঘাটন করলেন। মাত্র ২৩।২৪ বছরের মধ্যে বাংলার সাহিত্য, সংগীত, অভিনয়, সাংবাদিকতা এবং রাজনীতির জগতে তিনি যে অতুলনীয় কীর্তি স্থাপন করলেন তা' বাংলার মুসলমান

সমাজের তখনকার দিনের মান অনুযায়ী সীমাহীনভাবে বিস্ময়কর। এখানে বলা অনুচিত হবে না যে তাঁর আবির্ভাবে বাংলার গোটা মুসলমান সমাজ গুহার অন্ধকার থেকে আলোর সমুদ্রে উঠে এল।

সুতরাং নজরুলের এই চোখ-ঝলসানো উপস্থিতি তাঁর দিকে সকল শ্রেণীর মানুষের কৌতূহল-দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আবির্ভাবের প্রথম থেকেই তাঁকে নিয়ে হিন্দু-মুসলমান উভয় সমাজের সুধী, বুদ্ধিজীবী ও সাহিত্য মহলে আলোচনা-সমালোচনার ঝড় ওঠে। ভক্ত যেমন জোটে, তেমনি জোটে শত্রু।

নজরুল-চর্চা সম্বন্ধে বিস্তৃত কিছু বলার পূর্বে এই কথাটা বলে নিতে চাই যে, নজরুলের ভক্তদলের সংখ্যা অগণিত থাকলেও তাঁকে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে সাহিত্যে গভীরভাবে প্রতিষ্ঠিত করার সুসম্বদ্ধ সুনিয়মিত প্রয়াস প্রাথমিক পর্যায়ে হয়নি ; কিন্তু তাঁকে নিরুদ্যম এবং ধ্বংস করার সুপরিকল্পিত প্রয়াস চলেছিল। যদিও পৃথিবীর অন্যান্য দেশের অনেক শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের ভাগ্যে অনেক সময় উপেক্ষা অবহেলা এমন কি আক্রমণের আঘাত জুটেছে কিন্তু নজরুলের বেলায় তার রূপ সম্পূর্ণ অন্য রকম ছিল। এর কারণও হয়ত এই হতে পারে যে তিনি শুধু সাহিত্যের জন্যে সাহিত্য করেননি এক লক্ষ্যভেদী উদ্দেশ্যমূলক মহৎ ভাবনা প্রণোদিত সাহিত্য সৃষ্টি করেছিলেন—যা ভিতরে ভিতরে ছিল সমাজ, দেশ ও কালের সমস্ত কপটতা, ভণ্ডামী, অন্যায়, অসাম্য এবং দুরপনেয় অত্যাচার অবিচারের দুর্ভেদ্য দেয়াল চূর্ণ করার গ্রানাইট।

২

ধন্যবাদ 'সওগাত'-সম্পাদক মোঃ নাসিরউদ্দীনকে, তিনি নজরুলের প্রথম গল্প "বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী" 'সওগাতে' প্রকাশ করেছিলেন, ধন্যবাদ কমরেড মুজফ্‌ফর আহমদকে, তিনি 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা'য় নজরুলের প্রথম কবিতা 'মুক্তি' ছেপেছিলেন, ধন্যবাদ পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়কে, তিনি 'সবুজ পত্রে'র সম্পাদক প্রমথ চৌধুরী কর্তৃক অননুমোদিত, করাচী থেকে নজরুল প্রেরিত, হাফিজের কবিতার অনুবাদটি 'প্রবাসী'তে ছাপার ব্যবস্থা করেছিলেন, ধন্যবাদ আফজালুল হক সাহেবকে, তিনি 'মোসলেম ভারত' প্রকাশ করেছিলেন—যে 'মোসলেম ভারত' নজরুল-প্রতিভা বিকাশের শ্রেষ্ঠতম অবলম্বন হয়েছিল, ধন্যবাদ কবি সমালোচক

মোহিতলাল মজুমদারকে যিনি 'মোসলেম ভারতে' নজরুলের "খেয়াপারের তরণী" ও "বাদল প্রাতের শরাব" পাঠ করে 'মোসলেম ভারত' সম্পাদককে প্রেরণামূলক পত্রে বলেছিলেন :

আপনার পত্রিকার দুই সংখ্যা সম্প্রতি পাঠ করিয়া আনন্দ আশা ও বিস্ময়ে উৎফুল্ল হইয়াছি...মুসলমান সমাজের নবজাগরণের অনেক লক্ষণ সর্বত্র দেখা যাইতেছে...কিন্তু যাহা আমাকে সর্বাপেক্ষা বিস্মিত ও আশান্বিত করিয়াছে তাহা আপনার পত্রিকার সর্বশ্রেষ্ঠ কবি-লেখক হাবিলদার কাজী নজরুল ইসলামের কবিতা। বহুদিন কবিতা পড়িয়া এত আনন্দ পাই নাই, এমন প্রশংসার আবেগ অনুভব করি নাই।

ধন্যবাদ কবিকুল শিরোমণি রবীন্দ্রনাথকে—যিনি নজরুলকে তাঁর 'বসন্ত' নাটিকা উৎসর্গ করেছিলেন, খ্যাতির শীর্ষে সমাসীন থেকে অখ্যাত একজন তরুণ কবির কাব্যপাঠে মুগ্ধ হয়েছিলেন এবং তাঁরই পরিষদ-পণ্ডিতদের তর্কের উত্তরে নজরুলের কবিতা সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছিলেন : "যুগের মনকে যা প্রতিফলিত করে, তা শুধু কাব্য নয় মহাকাব্য।"

বাংলাদেশে এইভাবে "নজরুল-চর্চা" শুরু হয়। তাঁর কাব্য-প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে শান্তিনিকেতনের কবি সুধাকান্ত রায় চৌধুরী "মোসলেম ভারতে" লেখেন :

ছন্দে গানে বাজাও কবি বাজাও প্রাণের গান,
মুগ্ধ কর বিশ্বজনে দাও গো নূতন প্রাণ।

এর পর 'মোসলেম ভারতে' "কামাল পাশা", "আনোয়ার পাশা" এবং বিস্ময়-কর "বিদ্রোহী" প্রকাশিত হ'ল। উদ্বেলিত বাংলার প্রশংসামুখর হৃদয়ের অভিব্যক্তি ঘটল শ্রী শৈলেন্দ্রকুমার মল্লিকের "বিদ্রোহী বীর" কবিতায় :

ওগো বিদ্রোহী রণ-বীর
ওগো চঞ্চল অস্থির।
ওগো বঙ্গ-বাণীর বীণা-বৈঠকে ভেরীনাদ গম্ভীর।
ওগো বীর তলোয়ার ভক্ত।

তুমি মহরম খেল জয়গান গাহি মাখি শহীদের রক্ত।
ওগো বিস্ময় বাঙালীর!
ওগো মহামিলনের দীপ্ত মূর্তি হিন্দু-ইস্‌লামীর!

"বিদ্রোহী"র বিস্ময় কাটতে না কাটতে নজরুল প্রকাশ করলেন "ধূমকেতু" পত্রিকা। অভূতপূর্ব সাংবাদিকতায় এবং জ্বালাময়ী কবিতা ও প্রবন্ধের গদ্যভাষায় অভিভূত ফজলুল হক সেলবর্ষী এক পত্রে মারফৎ জানালেন :

ভাই কাজী সাহেব,
স্বয়ং বিশ্বকবি যাঁর প্রতিভায় মুগ্ধ, তাঁকে আমার মত লোকের ভক্তি নিবেদন করতে যাওয়াও ধৃষ্টতা। সেই পরমপুরুষকে ধন্যবাদ —আজ মুসলমান বাংলার একটি দৈন্য দূর হইয়াছে। আজ সাহিত্যের পুণ্য আঙ্গিনায় আপনার সমাজ দাঁড়াইবার মত যে স্থানটি পাইয়াছে, তাহা আপনারই দয়ায়।

আর কবি কালিদাস রায় লিখলেন :

ভাই নজরুল,
তোমার ধূমকেতুকে সাদর আহ্বান করি। তোমার লেখা পড়ছি আর অবাক হচ্ছি ; তুমি নিজেই ধূমকেতু। তোমার লেখনীতে পাশুপতের শক্তি।

'পরিদর্শক' 'ধূমকেতু'র স্বরূপ বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেন :

বাংলার সাহিত্য ও রাজনৈতিক গগনে ধূমকেতুর আবির্ভাব হইয়াছে। উহার সারথী হইতেছেন বাংলার উদীয়মান তরুণ কবি কাজী নজরুল ইসলাম। তাঁহার কলমে জোর আছে—তাঁহার কবিতায় তুবড়ি ছোটে—কথায় আগুন জ্বলে—ভাবে বান ডাকে, ভাষায় ঝলক দেয়। তাঁহার লেখনী যেন কষাঘাত খাইয়া বল্গাহীন উন্মত্ত অশ্বের মত ছুটিয়া চলে। 'ধূমকেতু'র পুচ্ছাঘাতে অনেকেরই চমক ভাঙিবে, নেশা অনেকেরই টুটিবে। কাজেই অত্যাচারী সাবধান হউন, তোষামোদী সম্বৃত হউন, পদলেহন পরিত্যাগ করুন।

'ধূমকেতু'র একটি সংখ্যায় 'বিদ্রোহী কবি'র প্রতি কয়েকটি অভিনন্দন ছাপা হয়। তার একটি এখানে উদ্ধৃত হল :

মাত করেছ, মাত করেছ
মাত করেছ বাঙলাকে
তাই জুটেছে চার পাশে আজ
শিষ্য তোমার লাখলাখে
তুমি মাত করেছ মাত করেছ
মাত করেছ বাঙলাকে
বসরা হতে পসরা নিয়ে
গুল্-বদনের গুল্ থেকে।

একটি কথাই ঘুরে ফিরে প্রকাশ হতে লাগল, একটি শব্দই পোশাক বদলে উচচাবিত হতে লাগল—আর তা'হল 'অবাক'—আর তা'হল—'বিস্ময়'।

সুতরাং অচিরেই ভিন্নদলের কণ্ঠ সোচচার হয়ে উঠল। ১৩২৯ সালের 'আশ্বিন' সংখ্যার "ইসলাম দর্শন" পত্রিকার "ধর্মনীতি-বিবর্জিত" শীর্ষক ভূমিকায় কবিকে 'যবন-হরিদাস' বলে আখ্যায়িত করা হয় এবং ঐ ভূমিকা-সংযুক্ত লেখা 'লোকটা মুসলমান না শয়তান' শীর্ষক প্রবন্ধে মোহাম্মদ রেয়াজউদ্দীন আহমদ লেখেন :

> ···হিন্দুয়ানী মাদ্দায় উহার মস্তিক পরিপূর্ণ···মুসলমানের ঔরসেও অনেক নাস্তিক শয়তান জন্মগ্রহণ করিয়াছে, মুসলমান সমাজ তাহাদিগকে আস্তাকুঁড়ের আবর্জনার ন্যায় বর্জন করিয়াছে, সুতরাং এ-যুবক কোন ছার।···নরাধম ইসলাম ধর্মের মানে জানে কি। খোদা-দ্রোহী নরাধম শয়তানের পূর্ণ অবতার।

এ-গেল বাঙালী মুসলমান-সমাজের দিক থেকে আক্রমণ। এবার বাঙালী হিন্দু-সমাজের দিক থেকে শুরু হল আর এক রীতির আক্রমণ। তাঁরা দু'একটা প্রবন্ধ কবিতায় কবিকে আক্রমণ না করে 'শনিবারের চিঠি' নামক একটি পার্মানেন্ট আক্রমণের আখড়া খুললেন। যাতে প্রতি সপ্তাহে কবির মস্তকে রাশি রাশি কুৎসা আর নিন্দার আবর্জনা ঢালা যায় তার পাকা-পোক্ত ব্যবস্থা হল। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে জুলাই প্রচ্ছদের উপর এক বাঙ্ময় কুক্কুটের চিত্র নিয়ে রণাঙ্গণে অবতীর্ণ হ'ল সর্বকালের সাহিত্য-ইতিহাসের কলঙ্ক স্থূল রসিকতার আধার সাপ্তাহিক 'শনিবারের চিঠি'। আর এর সৈনিকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন : 'প্রবাসী'-সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ পুত্র অশোক চট্টোপাধ্যায় এবং ভ্রাতুষ্পুত্র হেমন্ত

চট্টোপাধ্যায়, যোগানন্দ দাস এবং পরে পরে সজনীকান্ত দাস এবং নজরুলের এক কালেব অসামান্য গুণগ্রাহী কাব্য-সাহিত্যের অদ্বিতীয় পাঠক ও রসবেত্তা কবি মোহিতলাল মজুমদার। প্রধানত এঁরা সব ছদ্মনামে নজরুলেব ছন্দ অনুকরণ করে ব্যঙ্গ কবিতা এবং কখনো-বা নজরুলের কবিতাব হৃদয়হীন অশ্রাব্য প্যারোডি রচনা করতে লাগলেন। দু'একটি নমুনা : প্রথমে বিদ্রোহীর অনুকরণে সজনীকান্তের প্যারোডি :

আমি ব্যাঙ
লম্বা আমার ঠ্যাং
ভৈরব রভসে বরষা আসিলে
ডাকি যে গ্যাঙোর গ্যাঙ্।

* * *

আমি সাপ, আমি ব্যাঙেরে গিলিয়া খাই—,
আমি বুক দিয়া হাঁটি ইঁদুর ছুঁচোর গর্তে ঢুকিয়া যাই।

"কাণ্ডারী হুঁশিয়ারের" অনুকরণে সজনীকান্ত দাসের প্যারোডি :

চোর ও ছ্যাঁচোড় ছিঁচকে সিঁধেলে দুনিয়া চমৎকার
তল্পি-তল্লা, তহবিল নিয়ে ভাণ্ডারী হুঁশিয়ার।

আর এই সংগে নজরুলের কাজী উপাধিকে ব্যঙ্গ করে নাম দেওয়া হল গাজী বিটকেল।

নজরুল মৌন হয়ে যাওয়ার পূর্বে এমনি কোন্দল-কন্টকিত নজরুল-চর্চা বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে চিরমুদ্রিত হয়ে থাকে মাত্র দু'একটি উজ্জ্বল ব্যতিক্রম ছাড়া। সেই শুভচিন্তাযুক্ত আলোচনার কথা এবার বলব।

৩

সব দেশেই বড় প্রতিভাব ভাগ্যে প্রথম পর্যায়ে খুব বেশী আশীর্বাদ জোটে না। রবীন্দ্রনাথও তাঁর দেশ ও সমাজের কাছ থেকে অন্যায় আঘাত পেয়েছিলেন। এ সব ক্ষেত্রে প্রায়ই দেখা যায় সমালোচনার নামে অন্যায় সমালোচনা হচ্ছে। এবং এ-কথা স্বীকার্য যে একই সঙ্গে কবির পক্ষ নিয়ে লড়বার মত লোকেরও অভাব নেই। ব্লাকউডস্ ম্যাগাজিনে গীবসন ও তাঁর বন্ধুরা এবং কোয়ার্টার্লী রিভিউয়ে জন উইলসন ক্রোকার যখন কীট্‌স্‌কে ইতর ভাষায় আক্রমণ করেন তখন কবির বন্ধু ধর্মযাজক

বেঞ্জামিন বেইলী, কবির এক ভক্ত অনুরাগী জন স্কট, কবির হিতাকাঙ্ক্ষী রিচার্ড উড্হাউস এবং জন হ্যামিলটন রেনল্ড্স প্রমুখ ব্যক্তি কবির পক্ষ নিয়ে বিদ্বেষ-প্রণোদিত সমালোচকদের লেখার জবাব দেন। অনুরূপভাবে 'ইসলাম দর্শন' পত্রিকায় মোহাম্মদ রেয়াজউদ্দীন, শেখ হবিবর রহমান এবং মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ সম্পাদিত 'মোহাম্মদী' পত্রিকায় নজির আহমদ চৌধুরী যখন অশিক্ষিত কাব্যবোধসম্পন্ন মানসিকতার পরিচয় দিয়ে কবিকে 'কাফের' 'শয়তান' 'খোদাদ্রোহী' এবং 'পাপ' বলে মুসলমান সমাজকে পরামর্শ দেন তখন বাঙলার আর এক বিদ্রোহী সন্তান ইসমাইল হোসেন শিরাজী ১৩৩৫-এর ৩০শে কার্তিক 'সওগাত' সংখ্যায় এই পত্র লেখেন :

> মিলাদ মহফিলে যে গান লইয়া কবি নজরুল ইসলামকে অতীব জঘন্য ভাষায় জঘন্য ভাবে গালাগালি দিয়া সাপ্তাহিক মোহাম্মদীতে ইসলামি ভদ্রতার (আদবের) মাথায় পাদুকাঘাত করা হইতেছে, আবার মাসিক মোহাম্মদীতে জোরে সোরে সেই গান বাজনা জায়েজ বলিয়া ফতোয়া দেওয়া হইতেছে। এ-সমস্তই চমৎকার কাণ্ড। আমার মনে হয়, বন্ধুবর মওলানা আকরম খাঁ সাহেবের তওবা করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করা কর্তব্য। হয় তিনি ভদ্রলোকের মত মোহাম্মদী পরিচালিত করুন, না হয় তিনি বন্ধ করিয়া দিন। এইরূপ ব্যবহারের দ্বারা তিনি সর্বত্রই প্রায় সর্বজন কর্তৃক তিরস্কৃত ও নিন্দিত হইতেছেন। লজ্জায় আমাদের মাথা অবনত হইয়া যাইতেছে। পয়সার জন্য যদি এরূপ করিতে হয় তবে চুরি-ডাকাতি বা জাল জুয়াচুরি করিলে ইহা অপেক্ষা বেশী রোজগার হইতে পারে।

কবিকে জাতির তরফ থেকে সম্বর্ধনা দেওয়ার জন্যও একদল তরুণ যুবক ঢাকার 'জাগরণ' গোষ্ঠী ও কলকাতার সওগাত-গোষ্ঠী—যাদের মধ্যে 'সওগাত'-সম্পাদক মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন, সুসাহিত্যিক আবুল কালাম শামসুদ্দিন থেকে শুরু করে আবুল ফজল, আনোয়ার হুসেন এবং আবদুল কাদির ছিলেন—উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এই সম্বর্ধনা জ্ঞাপনের প্রস্তাব শুনে উল্লসিত ইসমাইল হোসেন শিরাজী বলেন :

> স্নেহাস্পদ নজরুলের সম্বর্ধনার প্রস্তাবে সুখী হইলাম। যদি টাকা থাকিত, তাহা হইলে কবিকে স্বর্ণ মুকুটে সাজাইয়া আনন্দ লাভ করিতাম।

নজরুল-বিদ্বেষীদের জঘন্য সমালোচনার জবাবে 'সওগাতে' মোহাম্মদ মোয়াজ্জেম হোসেন খান লিখলেন :

> নজরুল ইসলাম বাংলার জাতীয় কবি। তাই তাঁহার রচনায় ইসলাম ও হিন্দুয়ানী উভয় জাতীয় ভঙ্গীর ছাপই দিতে হইবে, নতুবা রচনা সুন্দর হইবে না। জাতীয় কবির লেখার ভিতর উভয় রূপ ছাপ পড়া খুবই স্বাভাবিক। ইহাতে হতাশ হইয়া পড়িবার কিছুই নাই। খোদার এ দুনিয়ায় আর কোথাও কাব্যের ও কবির ওজন ধর্মের ও সমাজের নিক্তিতে হয় না—বড়ই পরিতাপের বিষয় আমরা মোটেই কবিকে সম্মান করিতেছি না, তাঁর কবিত্ব প্রতিভার কদর বুঝিতেছি না।

বলা বাহুল্য হবে না মুসলিম তরুণদের মধ্যে কবি-পক্ষেব প্রতিবাদী সমালোচকদের একক শ্রেষ্ঠ ভূমিকা ছিল আবুল কালাম শামসুদ্দিনের। তিনিই প্রথম 'অগ্নি-বীণা' কাব্যের সমালোচনা করে নজরুল ইসলামকে "যুগ-প্রবর্তক" কবি হিসেবে চিহ্নিত করেন ; এবং "কাব্য-সাহিত্যে বাঙালী মুসলমান" শীর্ষক প্রবন্ধে বলেন :

> এই বাংলাদেশ ব্যতীত জগতের কোথাও বোধহয় কাব্যকে ধর্ম সমাজ, সভ্যতা ইত্যাদির মাপকাঠিতে যাচাই করিবার উদ্ভট প্রয়াস হয় নাই। কাজেই নজরুল ইসলামের কাব্য-সৃষ্টি সম্বন্ধে যে অনৈসলামিকতার ধোঁয়া উঠিয়াছে, ইহাকে আমরা প্রবুদ্ধ কাব্য উপভোগের ফল মনে করি না বরং কাব্য সম্বন্ধে উন্নত ধারণার অভাবের নিদর্শন বলিয়া ধরিয়া লইতে বাধ্য হই।

প্রসংগত ইতিমধ্যে নজরুল তাঁর সমালোচনার জবাব দিতে শুরু করেছিলেন। তার বিখ্যাত কবিতা "আমার কৈফিয়ৎ" সব সম্প্রদায়ের লেখক, বুদ্ধিজীবী, কাব্যরসবেত্তা, রাজনীতিক, ধার্মিক, সমাজসেবী ইত্যাদি নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল সমালোচকের—একটি সুপরি-কল্পিত কটাক্ষ-তীক্ষ্ণ ইঙ্গিতবাহী বেদনাদায়ক উত্তর। এছাড়াও তিনি ইবরাহিম খাঁর কাছে লেখা এক দীর্ঘ পত্রোত্তরে লেখেন (সমস্তটা এখানে দেওয়া অসম্ভব। কৌতূহলী পাঠক 'নজরুল রচনা সম্ভার' দেখে নেবেন।

গভীর ধর্মবোধ, ইতিহাস-বোধ, সমাজবোধ ও কাব্যবোধের এমন উৎকৃষ্ট উদাহরণ বাংলা সাহিত্যে খুব কম কবিই দেখাতে পেরেছেন।) :

> যাঁরা মনে করেন—আমি ইসলামের বিরুদ্ধবাদী বা তার সত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করছি, তাঁরা অনর্থক এ ভুল করেন। ইসলামের নামে যে কুসংস্কার মিথ্যা আবর্জনা স্তূপীকৃত হয়ে উঠেছে—তাকে ইসলাম বলে না মানা কি ইসলামের বিরুদ্ধে অভিযান? এ ভুল যাঁরা করেন তাঁরা যেন আমার লেখাগুলো মন দিয়ে পড়েন দয়া করে। আমার 'বিদ্রোহী' পড়ে যাঁরা আমার উপর বিদ্রোহী হয়ে ওঠেন, তাঁরা যে হাফেজ, রুমীকে শ্রদ্ধা করেন—এত আমার মনে হয় না। আমি তো আমার চেয়েও বিদ্রোহী মনে করি তাঁদের। এঁরা কি মনে করেন হিন্দু দেব-দেবীর নাম নিলেই সে কাফের হয়ে যাবে? তাহ'লে মুসলমান কবি দিয়ে বাংলা-সাহিত্য সৃষ্টি কোন কালেই সম্ভব হবে না।

নজরুলের ঐ চিঠি পড়লেই অনুমান করা যায় কী গভীর জাতি-প্রেম, ঔদার্য, মানবতাবোধ, দূরদর্শিতা এবং দায়িত্ব নিয়ে তিনি বাংলা সাহিত্যে আবির্ভূত হন। পরশ্রীকাতর অভিজাত আত্মাভিমানী বাব সাহিত্যিকেরা নজরুল-প্রতিভার প্রকৃত মূল্য নির্ধারণ না করলেও মূর্খ বলে পরিচিত জনসাধারণের অবিদ্বেষ-শুভ্র হৃদয়ানুভূতি গভীরভাবে এই মহাকবির কবিতা ও সংগীতের মহিমা উপলব্ধি করতে সমর্থ হয়েছিল—(পৃথিবীতে লক্ষ বছরের ইতিহাসে একথাই সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে সকল মহাকবিকে বাঁচিয়ে রেখেছে তথাকথিত মূর্খ জনগণের অহিংসাপ্লুত করুণাময় হৃদয়ের জ্যোতির্দীপ্ত স্মৃতিশক্তি ও গুণগ্রাহিতা।) এর প্রমাণ নজরুল-বিদ্বেষীদের মহা-আন্দোলনের জবাবে বাঙালী চট্টগ্রামবাসী কর্তৃক গৃহীত একটি প্রস্তাব :

> এই সভা ঘোষণা করিতেছে যে কবি কাজী নজরুল ইসলাম বাংলার মুসলমান সমাজের রত্নস্বরূপ। বাংলা-দেশের যে কয়েকজন গোঁড়া স্বার্থসর্বস্ব তথাকথিত আলেম তাঁহার বিরুদ্ধে প্রচারণা চালাইয়া ইসলামের উন্নতির মূলে কুঠারাঘাত করিতেছে এই সভা তাহাদের কাজের তীব্র নিন্দা করিতেছে।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই ডিসেম্বর কলকাতা এলবার্ট হলে বাঙালী জাতির পক্ষ থেকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। এই সভার পৌরহিত্য করেন শ্রী প্রফুল্লচন্দ্র রায়। এই সভায় সুভাষচন্দ্র বসু বলেছিলেন : "আমরা যখন যুদ্ধে যাব তখন সেখানে নজরুলের যুদ্ধের গান গাওয়া হবে।"

[নজরুলের মিত্রপক্ষ ও শত্রুপক্ষের যুদ্ধের সম্পূর্ণ ধারা-বিবরণী পাঠের জন্য পাঠকদের নজরুল-সংক্রান্ত বিশেষ তথ্য-সমৃদ্ধ তিনটি বই পড়তে অনুরোধ জানাব। প্রথমটি কমরেড মুজফ্‌ফর আহমদের "কাজী নজরুল ইসলাম : স্মৃতিকথা", দ্বিতীয়টি আবদুল আজীজ আল-আমানের "নজরুল-পরিক্রমা"। এবং তৃতীয়টি রফিকুল ইসলামের "নজরুল-জীবনী"। বলা বাহুল্য কোন একটিতেই সম্পূর্ণ ইতিহাস না থাকাতে প্রতিটি গ্রন্থ পঠিতব্য।]

৪

এ-পর্যন্ত যা হচ্ছিল তা ছিল প্রধানত আত্মরক্ষামূলক আলোচনা। কবিকে সাহিত্য-প্রতিষ্ঠা দেওয়ার মত তেমন (গঠনমূলক সাহিত্যালোচনা) এখন পর্যন্ত হয়নি। এ-পথে যাঁরা প্রথম এগিয়ে এলেন তাঁদের মধ্যে সর্বাগ্রে কবি আবদুল কাদিরের নাম উল্লেখযোগ্য। ১৯৩৩ সালে তিনি 'নজরুলের গানে কথা ও সুর'; ১৯৩৮ সালে 'বাংলা সাহিত্যে নজরুল' এবং ১৯৪১ সালে 'নজরুলের গীতি-কবিতা' নামে কয়েকটি প্রবন্ধে নজরুল-প্রতিভার কিছু বিশ্লেষণ-ধর্মী পরিচয় দেন। এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ 'নজরুলের গানে কথা ও সুর'। এই প্রবন্ধটির ভূমিকায় তিনি জার্মান সঙ্গীত জগতের দুই অবিস্মরণীয় প্রতিভা মোজার্ট ও বেটোফেনের কথা উল্লেখ করেন এবং বলেন :

> একালের বাংলা গানের ক্ষেত্রে এমনি দুই অনন্যসাধারণ প্রতিভা রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল ইসলাম। রবীন্দ্রনাথের গান নিঃসঙ্গ জগতের গান, এক প্রশান্ত আত্মবিরহের রসে ইহা উদাস হইয়া আছে। কিন্তু নজরুলের গান রক্তাক্ত আত্মার গান। কবি মাটির উপর দাঁড়াইয়া আছেন, কিন্তু সে-দাঁড়ানো গ্রীক-দেবতা মার্কারির মতো—

> গুল্‌ফ মূলে তাঁর পাখা, উর্ধ্ব আকাশের কিরণামৃতের জন্য তাঁর দু'নয়ন তৃষ্ণার্ত। মর্ত্যের দুলালীর জন্য তাঁর হৃদয়ের যে পরিবেদনা, তাহাই তাঁহার আত্মার রক্তপাতে গানে গানে অপূর্ব দাহের সৃষ্টি করিয়াছে। স্বপ্ন-নীল আকাশের কল্প মায়াপাশ কাটাইয়া অশ্রু-শ্যামল পৃথিবীর আকর্ষণে তিনি ধূলার আসনে অবতরণ করিয়াছেন; এই ধরণীর ধূলি-লাঞ্ছিতার জন্য যে গভীর প্রেম তাহা তাঁর গানে কী তীব্র জ্বালাই না সঞ্চার করিয়াছে।

নজরুল-গীতির সম্ভবত এটাই প্রথম পরিচয়মূলক, তুলনামূলক এবং গঠনমূলক সমালোচনা। এ-প্রসঙ্গে নজরুলের গানে তাঁর আবেগমুগ্ধতার প্রকাশ ঘটলেও একটি নিরাসক্ত সমালোচনামুখর ভঙ্গিও ছিল। যেমন:

> সম্প্রতি মনে হয় নজরুল ইসলাম হয়ত কবি ততখানি নহেন, যতখানি তিনি সুর-সাধক। অধুনা তিনি এক অশ্রুতপূর্ব গীতিলোকে অবস্থান করিতেছেন, সেখানে শুধু সুরের আলাপ।... সুরের বৈচিত্র্যের জন্যই এখন তাঁর দরদ কথার জন্য খুব নয়।...নজরুলের সদ্য প্রকাশিত 'জুল্‌ফিকার' ও 'বন-গীতি'তে সেই musical thought, সেই passionate language—যেখানে mere accent অপেক্ষা finer chant অধিক—আশানুরূপ কিনা, সন্দেহ হয়।

এখানে বলা আবশ্যক ১৯৩৩-এ এ প্রবন্ধ যখন লিখিত হয় তখন নজরুল ইসলামের সংগীত প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ হয়নি। তারও পরে আরও ৮ থেকে ৯ বছর নজরুল কবিতা ও সংগীতের চর্চা করেছেন। সুতরাং বলা বাহুল্য, আবদুল কাদিরের সমালোচনা নজরুলের সংগীত সম্পর্কীয় শেষ রায় নয়। কিন্তু যে-গ্রন্থ দুটি সম্পর্কে তিনি ঐ কথা বলেছেন সর্বাংশে সত্য না হলেও আংশিকভাবে তা সত্য। কেননা ইতিপূর্বে প্রকাশিত নজরুলের 'বুলবুল' কিংবা 'চোখের চাতক'-এর কাব্যসৌন্দর্য এই দুটি গ্রন্থে খুব বেশী লক্ষ্য করা যায় না। যদিও এদের সামাজিক কিংবা রাজনৈতিক মূল্য সেদিনকার পটভূমিকায় সীমাহীন।

প্রায় একই সময়ে 'বুলবুল'-এর ২য় সংস্করণের ভূমিকায় নজরুলের রাজনৈতিক জীবনের এবং পরে আধ্যাত্মিক জীবনের বন্ধু অমলেন্দু দাশগুপ্তের একটি উজ্জ্বল প্রবন্ধ মুদ্রিত হয়। এ-প্রবন্ধটি নজরুল সংগীতের

সুর নয়, কথার একটি গভীর ব্যাখ্যামূলক এবং গঠনধর্মী তাৎপর্য-পূর্ণ, সেই সঙ্গে কাব্যালোচনার দৃষ্টান্তমূলক সমালোচনা। ' 'অপূর্ব' 'অদ্ভুত' কিংবা 'বাজে' 'বিশ্রী' এই ধরনের বিশেষণযুক্ত কোন সমালোচনাই দায়িত্বজ্ঞানের পরিচায়ক নয়। বিশ্লেষণের মাধ্যমে সঠিক মূল্যায়নই প্রকৃত সমালোচনা। কেননা এর থেকে জানা যায় যে কাব্য অথবা সাহিত্যের যিনি সমালোচনা করেছেন সমালোচনা করার যোগ্যতা কিংবা ক্ষমতার তিনি প্রকৃত অধিকারী কিনা। এই ধরনের দায়িত্ববোধ যেমন আবদুল কাদিরের প্রবন্ধে দেখা যায় সেই একই দায়িত্ববোধ দেখা যায় অমলেন্দু দাশগুপ্তের প্রবন্ধে। অমলেন্দু দাশগুপ্ত লিখিত 'বুলবুলের পরিচয়পর্বের ভূমিকাটি অত্যন্ত আকর্ষণীয়। এও আবদুল কাদিরের ভূমিকার মত তুলনামূলক সাহিত্য পরিচয়ের নিদর্শন স্বরূপ। বিসমার্ক সম্বন্ধে আনাতোল ফ্রাঁসের একটি লেখার কথা উল্লেখ করে অমলেন্দু দাশগুপ্ত দেখিয়েছেন যে সৈনিক বিসমার্ক পরিশ্রান্ত অনুতপ্ত বিসমার্কের অশ্রুবিন্দুর কাছে যেমন পরাজয় মেনেছে তেমনি প্রেমিক বিরহী নজরুলের বেদনাদীর্ণ হৃদয়স্ফূরিত সংগীতের কাছে তাঁর বিদ্রোহ-ধর্মী কাব্যের পরাজয় হবে—নজরুলের গান এই অমর অশ্রুর সৌন্দর্য লাভ করেছে কিনা প্রবন্ধে সে কথাই লেখক ব্যাখ্যা করেছেন। উদ্ধৃতি সহযোগে তিনি দেখিয়েছেন যে আশাতীতভাবে নজরুলের গান সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে।

উপরোক্ত দু'জন কাব্যরসিকের পরে যিনি নজরুল প্রতিভা ও সাহিত্যের পর্যালোচনা করেছেন তিনি কাজী আবদুল ওদুদ। ১৯৪১ সালে কবির ৪৩তম জন্ম বার্ষিকীতে এই দীর্ঘ আলোচনাটি পঠিত হয়। কবির সাহিত্য-জীবনকে চারটি স্তরে ভাগ করে সুপরিকল্পিতভাবে শৃংখলার সংগে আবদুল ওদুদ নজরুল-প্রতিভার মূল্যায়নের চেষ্টা করেছেন। তাঁর এই প্রবন্ধটি মোস্তফা নূরুল ইসলাম সম্পাদিত 'নজরুল ইসলাম' ও হায়াৎ মামুদ-জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত সম্পাদিত 'তোমার সাম্রাজ্যে যুবরাজ' নামক সংকলন গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে। উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ-হিসেবে এটি পাঠকদের পড়তে অনুরোধ করব।

যুক্তি-সমৃদ্ধ বিস্তৃত আলোচনায় নজরুলের 'ইসলামী সঙ্গীত' রচনাকে আবদুল ওদুদ তেমন প্রশংসা করতে পারেননি কিন্তু 'শ্যামা সঙ্গীত' রচনাকে সার্থক বলে চিহ্নিত করেছেন এবং 'বৈষ্ণব সংগীত' সম্বন্ধে বলেছেন :

এখনকার 'বৈষ্ণব সংগীত' অপরিসীম মাধুর্যমণ্ডিত হয়ে দেখা দিয়েছে।

বস্তুত প্রবন্ধটিতে আবদুল ওদুদ তেমন কাব্যরসবেত্তার প্রজ্ঞাপ্রসূত নিরপেক্ষ বক্তব্য রাখতে পারেননি। তিনি নজরুলকে একজন 'মর্যাদাবান' কবি বলেছেন। আমি ব্যক্তিগতভাবে 'মর্যাদাবান' শব্দের তাৎপর্য বুঝিনি। তবে সমস্ত প্রবন্ধ পাঠে আমার ধারণা হয়েছে আবদুল ওদুদ নজরুল ইসলামকে "মোটের উপর একজন কবি" এই ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেছেন—এবং তাঁর নিজস্ব নিয়মে আদ্যোপান্ত বিশ্লেষণ করে।

১৯৪৪-এর আগে পর্যন্ত তারপর নজরুল ইসলামকে নিয়ে আলোচনার সাহিত্য-প্রচেষ্টা কোথাও দেখা যায় না। ১৯৪৪-এ নজরুলের এককালের সাহিত্য-বন্ধু কবি বুদ্ধদেব বসু নজরুলকে স্মরণ করলেন তাঁর স্মৃতির প্রতি মর্যাদা দেখিয়ে, তাঁর "কবিতা" পত্রিকার একটি বিশেষ সংখ্যা নজরুলের নামে উৎসর্গ করে। ঐ পত্রিকায় বুদ্ধদেব বসুর নিজের লেখা "নজরুল ইসলাম" এবং জীবনানন্দ দাশের "নজরুলের কবিতা" দুটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ।

বুদ্ধদেব বসু সেই প্রবন্ধে নজরুল ইসলামকে বায়রনের সঙ্গে তুলনা করেন এবং নজরুলের কাব্যও যে বায়রন-কাব্যের মত নানা দোষে দুষ্ট সে-কথা বলেন। বায়রন সম্বন্ধে গ্যোটের একটা বিখ্যাত উক্তি তাঁর ঐ প্রবন্ধে দৃষ্ট হয় : **The moment he thinks he is a child.** ঐ প্রবন্ধে অবশ্য এই ধরনের কথাও আছে :

১. 'বিদ্রোহী' পড়লুম ছাপার অক্ষরে মাসিক পত্রে—মনে হ'লো এমন কখনো পড়িনি। অসহযোগের অগ্নিদীক্ষার পরে সমস্ত মনপ্রাণ যা কামনা করছিলো এ-যেনো তাই, দেশব্যাপী উদ্দীপনার এই যেনো বাণী।

২. এইমাত্র শেষ করা গান কবির নিজের মুখে তক্ষুণি শুনতে শুনতে আমাদেরও মনের মধ্যে নেশা ধ'রে যেতো।

৩. 'বুলবুল' ও 'চোখের চাতকে' কিছু কিছু রচনা পাওয়া যাবে, যাকে অনিন্দ্য বললে অত্যন্ত বেশী বলা হয় না।

কিন্তু নজরুল-সম্বন্ধে এই মঙ্গলদায়ক উক্তিগুলির পরিবর্তে বুদ্ধদেব বসু লিখিত বিতর্কিত মন্তব্যগুলি অধিকাংশ নজরুল-সমালোচকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই প্রবন্ধে নজরুলকে বুদ্ধদেব বসু 'প্রতিভাবান বালক' বলে মন্তব্য করেছিলেন।

জীবনানন্দ দাশ তাঁর প্রবন্ধে বলেন :

১. তেবোশো পঁচিশ আটাশ তিরিশে ইতিহাসোথ কারণে সময়-পর্ব তাঁকে উদ্বুদ্ধ করছিল বলে তা একটা আশ্চর্য রক্তচ্ছটায বঞ্জিত হ'য়ে উঠেছিল—যাকে মৃত্যুর বা অরুণের জীবন বলে মনে কবতে পারা যেত।... এ রকম পরিবেশে হয়ত শ্রেষ্ঠ কবিতা জন্মায় না, কিংবা জন্মায়, কিন্তু মননপ্রতি । ও অনুশীলিত সুস্থিরতার প্রয়োজন। নজরুলের তা ছিল না। তাই তাঁর কবিতা চমৎকার কিন্তু মনোত্তীর্ণ নয়।

বলা বাহুল্য, ধন্যবাদ বুদ্ধদেব বসুকে তিনি এই 'প্রতিভাবান বালকে'র প্রতি দয়াপরবশ হয়ে 'নজরুল সংখ্যা' প্রকাশ করেন এবং একটি সম্পা- দকীযতে জীবনানন্দ দাশ লিখিত একই সঙ্গে 'চমৎকার কিন্তু মনোত্তীর্ণ নয়' এই বাক্যের সম্পূর্ণ অর্থ উদ্ধার করতে না পেরে জাবনানন্দের ভাষা সম্বন্ধে উক্তি করেন : 'সুদূর দুরূহ ভাষা'।

বস্তুত বুদ্ধদেব বসু ও জীবনানন্দ দাশ আসলে কি বলতে চান তা নজরুলের অনুরক্ত পাঠক না বুঝেও বুঝেছিলেন এবং 'বুদ্ধদেব বসু' তাঁর সম্পাদকীয়তে তা খানিকটা পরিষ্কার করে বলেও ছিলেন :

নজরুল মহাকবি নন, কিন্তু সত্যিকার কবি...আজকাল যে সব রচনা রাজনৈতিক কবিতা ব'লে আমাদের কাছে ধরা হয় তাঁর ধূসর নিরসতার সঙ্গে নজরুলের উদ্দীপ্ত আনন্দের প্রতিতুলনা সহজেই মনে জাগে। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের পরে একজনকেও দেখলাম না রাজনীতির প্রেরণা থেকে একটি লাইন কবিতা লিখতে। 'আজকাল যে সাম্যের বাণী লোকের মুখে মুখে বুলিতে পরিণত হ'য়েছে, বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে নজরুলই তাঁর প্রথম উদ্‌গাতা। রাজনীতিকে তিনি এড়িয়ে চলেননি, তার মধ্যে নিজেকে হারিয়েও ফেলেননি—তার থেকে বের করেছেন সুর-ঝংকার এবং সেটাই কবির কাজ।'

আসলে 'নজরুল-সংখ্যা' প্রকাশ করে বামপন্থী লেখকদের বিরুদ্ধে কিছু বলার একটা সুযোগ নিয়েছিলেন বুদ্ধদেব বসু—তাঁর বক্তব্য থেকে সে কথা-প্রমাণিত হয় :

> রাজনীতির যে প্রেরণা ভাবলোকের, তা থেকে যে-কবিতা রস আহরণ করেছে তাকে আমরা শ্রদ্ধার সংগে গ্রহণ করেছি। কিন্তু যে রচনা শুধু খবর বলা, কিংবা, যে রচনা শুধু সেকেলে গতানুগতিকতার বদলে একেলে গতানুগতিকতার সমষ্টি, তাকে আমরা বর্জন করার দিকেই লক্ষ্য রেখেছি।

যা হোক বুদ্ধদেব বসু কর্তৃক প্রকাশিত 'কবিতা'—নজরুল-সংখ্যা নজরুল-চর্চার ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এবং এ-জন্যেও যে এই সংখ্যা এবং এর পরের সংখ্যায় বুদ্ধদেব বসু অশেষ ক্লেশ স্বীকার ক'রে গ্রামোফোন কোম্পানী থেকে নজরুলের প্রায় দেড় হাজার গানের প্রথম পংক্তির একটি তালিকা পত্রিকাটির শেষ অংশে ছাপেন। যেটা পরবর্তীকালে আজহারউদ্দীন খান তাঁর "বাংলা সাহিত্যে নজরুল" গ্রন্থে উদ্ধার করেন এবং নজরুল-গীতি গবেষকদের গবেষণার পথ প্রশস্ত করে দেন।

প্রসংগত উল্লেখযোগ্য ১৯৪৩-এর আশ্বিনের 'সওগাতে' 'নজরুল কাব্যলোক' নামে আবদুল কাদির আরও একটি প্রবন্ধ লেখেন। এ প্রবন্ধটিতে নজরুলের রাজনৈতিক জীবন-দর্শন সম্বন্ধে কিছু আলোকপাত করা হয়েছে।

১৯৪৪-এর পরে বিভাগ-পূর্বকালে নজরুল বিষয়ে আর তেমন উল্লেখ-যোগ্য লেখা দেখা যায় না—একটিমাত্র প্রবন্ধ ছাড়া। এই প্রবন্ধটির লেখকও আবদুল কাদির। প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় ১৯৪৭-এর 'সওগাতে'র মে সংখ্যায়। বলা প্রয়োজন ১৯৪৭-এর ১৪ই আগস্টে ভারত বিভক্ত হয়। আবদুল কাদিরের এই প্রবন্ধটির নাম ছিল 'নজরুলের জীবন ও সাহিত্য'। ১৯৪১ সালের 'দৈনিক কৃষকে'র ঈদ সংখ্যায় 'নজরুল-জীবনী' বলে আবদুল কাদির যে প্রবন্ধ লেখেন সেটাকেই নজরুল-সাহিত্যের আলোচনায় সংযুক্ত ক'রে আরও বিস্তৃতভাবে লেখা। এই প্রবন্ধের উল্লেখ-যোগ্য বক্তব্য এখানে পরিবেশিত হল :

১. ভারতব্যাপী গণ-বিক্ষোভের দিনে নজরুল হ'য়ে উঠলেন বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ চারণ কবি। সবপ্রকার বন্ধনের বিরুদ্ধে তিনি গাইলেন মুক্ত জীবনের গান।...সেদিন তাঁর 'অগ্নি-বীণা' ও 'বিষের বাঁশী'র প্রভাব রবীন্দ্রনাথের 'নৈবেদ্য' ও 'বলাকা'র প্রভাবকেও বোধ হয় ছাড়িয়ে গিয়েছিল। তাঁর রচনার অমিত তেজ, উদ্দাম স্বতস্ফূর্ততা সুস্পষ্ট স্বাতন্ত্র্য সহজেই ভাবপ্রবণ বাঙালীর মন জয় করে নিয়েছিল।

২ বাল্য থেকেই নজরুলের ছন্দ ও সুরের কান প্রখর ছিল। তিনিই প্রথম রবীন্দ্রনাথের মুক্তক স্বরবৃত্ত ছন্দে কবিতা লেখেন, এই ছন্দে যে ওজস সৃষ্টি চলে তা 'কামাল পাশা' লিখে তিনি প্রমাণ করলেন। তাঁর 'বিদ্রোহী' সমিল মুক্তক মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত। প্রস্বরমাত্রিক ছন্দ বাঙলায় সর্বাপেক্ষা নিপুণ ও চটুল ছন্দ,—নজরুল আরবীর অনুকরণে সে ছন্দের কয়েকটি নতুন ধরন-ধারণ উদ্ভাবন করেন। ছন্দের সূক্ষ্ম কারুকার্য শেষে তাঁকে অনুপ্রাণিত করে সুরের রাগ-রহস্যের দিকে।

আবদুল কাদির এইভাবে সর্বপ্রথম একই সঙ্গে ঐতিহাসিক, রসবাদী, রূপবাদী এবং সমাজবাদী সমালোচকের দায়িত্ব পালন করে নজরুল সমালোচকদের পথিকৃতের ভূমিকায় উন্নীত হয়েছেন বলা যেতে পারে।

নজরুল-চর্চার ক্ষেত্রে বিভাগ-পূর্ব বাঙলার প্রথম গ্রন্থ চট্টগ্রাম পল্টন কলেজের বাংলার অধ্যাপক (বর্তমানে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর) আবুল ফজলের 'বিদ্রোহী কবি নজরুল'। ১৯৪৭ সালের মার্চে (চৈত্র, ১৩৫৪) প্রিন্সিপাল ইব্রাহিম খাঁ লিখিত ভূমিকা সংযুক্ত হয়ে এই গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। অধ্যাপক আবুল ফজলের ভূমিকা থেকে জানতে পারছি তিনি তাঁর গ্রন্থ রচনায় অন্যান্য লেখকের সাহায্য নিয়েছেন :

কয়েকটি নামের উল্লেখ অপরিহার্য বলেই মনে করি—কাজী আনোয়ারুল ইসলাম, কবি আবদুল কাদির, শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত সরকার, শ্রীযুক্ত পবিত্র গাঙ্গুলী ও কাজী আবদুল ওদুদ প্রভৃতির রচনা ...

গ্রন্থটিতে প্রথম অধ্যায় : 'জীবন-কথা', দ্বিতীয় অধ্যায় : 'মানুষ নজরুল', তৃতীয় অধ্যায় : 'কাব্য পরিচয়', চতুর্থ অধ্যায় : 'গল্প উপন্যাস নাটক', পঞ্চম অধ্যায় : 'সঙ্গীত'। পরিশিষ্টে নজরুল-লিখিত 'রাজবন্দীর জবানবন্দী'র আংশিক উদ্ধৃতি।

গ্রন্থটির সূচীপত্রই ব'লে দেয় যে লেখক কবির জীবন ও সাহিত্য বিষয়ের সব দিকে আলোকপাত করার চেষ্টা করেছেন। তীক্ষ্ণ বিচার-বিশ্লেষণ না থাকলেও (আর তা সম্ভবও ছিল না, কেননা ১৬ পষ্ঠার ফর্মার ডবল ক্রাউন সাইজের পাইকা টাইপে ছাপা ১৪৪ পৃষ্ঠার বইতে নজরুল-প্রতিভার আলোচনা ব্যাপক-গভীর হ'তে পারে না)—এতে প্রাথমিক পর্যায়ের এক ছক-নির্দশে পরবর্তী লেখকদেব ধারণাকে সুনিয়ন্ত্রিত করার সুযোগ দিয়েছে।

বিভাগপূর্ব-কালের নজরুল-চর্চার ইতি ঐখানেই।

এখন দেখা যাক বিভাগোত্তর কালে নজরুল-চর্চা কি-ভাবে কখন শুরু হল। এর প্রাথমিক পর্যায়ের সুষ্ঠু আলোচনা আমি সম্পূর্ণভাবে দিতে পারব না। কেননা ১৯৫৭-র আগে আমি ঢাকাতে আসিনি।

১৯৫৮ সালে আমার সংগে দেখা হয় আমীর হোসেন চৌধুরীর। কমলাপুরের এক সাহিত্য আসরে আমার মুখে নজরুলের কবিতা শুনে তাঁর বাড়ীতে তিনি আমাকে আমন্ত্রণ জানান। পবের দিনই তাঁর বাড়ীতে যাই এবং নজরুলের উপর লিখিত তাঁর দুটি গ্রন্থ দেখি। একটি ইংরেজীতে অপরটি বাংলায়। বাংলা গ্রন্থটি তাঁর মৃত্যুর পরে ১৯৬৬ সালে আমার সম্পাদনায় 'নজরুল কাব্যে রাজনীতি' নামে প্রকাশিত হয়েছে। ইংরেজী পাণ্ডুলিপিটি আজও প্রকাশিত হযনি। নাম তার 'Voice of Nazrul'।

নজরুল-পাগল ছিলেন আমীর হোসেন চৌধুরী। আমাকে পেয়ে তিনি অচিরেই International Nuzrul Forum (আন্তর্জাতিক নজরুল ফোরাম) নামে একটি প্রতিষ্ঠান তৈরী করেন। গণ্যমান্য লোকের মধ্যে এর একমাত্র সভ্য ছিলেন খান মুহম্মদ মঈনউদ্দীন। অনুবাদের মাধ্যমে নজরুলকে সমগ্র বিশ্বে প্রচার করার মহৎ উদ্দেশ্যে আমীর হোসেন চৌধুরী 'নজরুল ফোরামে'র নাম 'আন্তর্জাতিক নজরুল-ফোরাম' রাখেন। বিশ্বের নিপীড়িত মানুষের কবি বলে, হিন্দু-মুসলমানের ভেদাভেদ দূর করার সংগ্রামী প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন বলে এবং ভণ্ডামি ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে মসীযুদ্ধ করেছিলেন বলে নজরুলকে তিনি সব সময় আন্তর্জাতিক ভাবাপন্ন মহান

কবি বলে সম্মান করতেন এবং আজকের এই সাম্রাজ্যবাদী এবং ধার্মিক শ্রেণীর শোষণক্লিষ্ট সমাজের হতাশাক্রান্ত যুগে তাঁরই কবিতা সবচেয়ে কার্যকরী বলে তাঁর ধারণা ছিল। এই চিন্তায় অনুপ্রাণিত হ'য়ে তিনি নজরুলের 'আমার কৈফিয়ৎ', 'ফরিয়াদ', 'চল্ চল্ চল্', 'মানুষ', 'কারার ঐ লৌহ কপাট', 'জাতের বজ্জাতি', 'কুলি মজুর' প্রভৃতি কবিতা অনুবাদ করেছিলেন। নজরুলের 'সেবক' কবিতার মূল দু'লাইনের সংগে এখানে তাঁর অনুবাদের একটি নমুনা দেওয়া গেল :

মূল :

বিশ্বগ্রাসীর ত্রাসনাশি আজ আসবে কে বীর এসো,
ঝুট শাসনে করতে শাসন শ্বাস যদি হয় শেষও।

ইংরেজী অনুবাদ :

March ahead ye Brave, March forward
To quell the threat of world aggressors,
To punish the misıule,
Carenot if breıthing exhausts,
Ye Bʳaves ! Come forward come !!

তাঁর অনেকগুলি অনুবাদ অমৃতবাজার, তখনকার পাকিস্তান অবজারভার ও মর্নিং নিউজে ছাপা হয় এবং সেগুলি সুধীজনদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ১৯৬৪ সালে মাত্র পঞ্চাশ বছর বয়সে তিনি সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার কবলে পড়ে মারা যান। বেঁচে থাকলে তিনি নজরুলের অনেক কবিতার অনুবাদ করতে পারতেন—আজকের দিনে যার একান্ত অভাব।

এখনে বলা দরকার আমীর হোসেন চৌধুরী আমাকে ১৯৫৯-এ ইকবাল-নজরুল ইসলাম সোসাইটির চেয়ারম্যান মীজানুর রহমান সাহেবের সংগে পরিচয় করিয়ে দেন। সেখানে গিয়েই দেখতে পাই মীজানুর রহমান সাহেবও নজরুলের অনেক কবিতার অনুবাদ করেছেন এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকায় ছেপে সেগুলি প্রকাশ করছেন এবং প্রচার করেছেন। নজরুলের উপর তদানীন্তন পাকিস্তান অবজারভারে তিনি অনেকগুলি ইংরেজী প্রবন্ধও লেখেন। তাঁরই 'ইকবাল নজরুল সোসাইটি' থেকে

তিনি 'নজরুল ইসলাম' নামে একটি স্বরচিত ইংরেজী গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এঁর ভূমিকা লিখে দেন ব্যারিস্টার এস· রহমতউল্লাহ্। গ্রন্থের ১১ থেকে ৪৩ পৃষ্ঠা পর্যন্ত লেখক নজরুলের জীবন ও কাব্য-প্রতিভা সম্পর্কে একটি নাতিদীর্ঘ আলোচনা লেখেন। এর ৪৭ থেকে ১৫২ পৃষ্ঠা পর্যন্ত নজরুলের কয়েকটি বিখ্যাত কবিতার—'বিদ্রোহী,' 'কামাল পাশা', 'ওমর,' 'খালিদ', 'চিরঞ্জীব জগলুল,' 'অশ্রু পুষ্পাঞ্জলি', 'আত্মশক্তি', 'যৌবন-বন্দনা', 'জীবন-বন্দনা', 'দারিদ্র্য' এবং কয়েকটি-বিখ্যাত গান ও গজলের—'আমারে চোখ ইশারায় ডাক দিলে হায়', 'বাগিচায় বুলবুলি তুই', 'কে তুমি', 'আল্লাহ্ আমার প্রভু', 'বক্ষে আমার কাবার ছবি', 'তৌহিদেরই ফুল ফুটেছে সাহারা মরুর মাঝে', 'আল্লাহ নামের বীজ বুনেছি আমার মনের মাঠে', 'হে মদীনার বুলবুলি', 'কাবার জিয়ারতে ওগো কে যাও মদীনায়', 'দিকে দিকে পুনঃ জ্বালিয়া উঠিছে দ্বীন-ই ইসলামী লাল মশাল', 'শহীদী ঈদ্‌গাহে দেখ আজ জমায়েত ভারী', 'আমরা সেই সে জাতি', 'বাজিছে দামামা বাঁধরে আমামা'র গদ্য অনুবাদ করেন। এই গ্রন্থের ১৫৫ থেকে ১৬৮ পৃষ্ঠা নজরুলের বিখ্যাত গল্প 'পদ্ম গোখরো'র অনুবাদ। বাকী অংশে নজরুলের জীবন-দর্শনের উপর গোটা দুয়েক প্রবন্ধ আছে এবং তাঁর গ্রন্থের একটি তালিকা মুদ্রিত আছে।

বলা বাহুল্য, এই গ্রন্থটিতে নজরুলের 'সাম্যবাদ' ও 'সর্বহারা' যুগের কবিতার তেমন পরিচয় নেই যতটা আছে তাঁর প্যান ইস্‌লামিক দর্শন-ভিত্তিক কবিতার পরিচয়। তবু বিদেশীর কাছে পরিচয়ের জন্য গ্রন্থটির মূল্য অনস্বীকার্য। এর অনুবাদ যে খুব সার্থক হয়েছিল তা নয়। কিন্তু প্রাথমিক প্রয়াস হিসেবে এর ঐতিহাসিক কিছু মূল্য আছে।

এখানে উল্লেখ না করলে অন্যায় হবে, কবীর চৌধুরী নজরুলের 'বিদ্রোহী'-সমেত মানুষ, কুলি-মজুর, রাজা-প্রজা, চোর-ডাকাত, ধূমকেতু ছাত্রদলের গান, কৃষকের গান, কাণ্ডারী হুঁশিয়ার এবং অনেকগুলি ইসলামিক ও রোমান্টিক গান ও গজলের ইংরেজীতে অনুবাদ করেন ; এবং তা সুধী সমাজে সমাদৃত হয়। তাঁর অনূদিত কবিতা সংগ্রহ 'Selected Poems of Nazrul Islam' বাংলা একাডেমী প্রকাশ করেছে। আরও উল্লেখ করা যায় বাংলা একাডেমী মরহুম আবদুল হাকিম অনূদিত নজরুল ইসলামের

আরও কিছু কবিতার একটি সংকলনও প্রকাশ করেছেন। এ-গ্রন্থটির নাম 'The Firy Lyre of Nazrul Islam'। সংকলন গ্রন্থে নজরুল ইসলামের অনেকগুলি শ্রেষ্ঠ কবিতার অনুবাদ আছে। যেমন : বিদ্রোহী, ধূমকেতু, দারিদ্র্য, আমার কৈফিয়ৎ, ফরিয়াদ, পাপ, সাম্যবাদ, ঈশ্বর, পূজারিণী। দুঃখের বিষয় গ্রন্থটি ছাপার ব্যাপারে বাংলা একাডেমী তেমন যত্ন নিতে না পারায় মারাত্মক মুদ্রণ প্রমাদে গ্রন্থটি দুষ্পাঠ্য হয়েছে।

বস্তুত: মীযানুর রহমান সাহেব এবং আরও কিছুসংখ্যক প্রবাসী বাঙালী ও করাচীবাসী মিলে তদানীন্তন পশ্চিম পাকিস্তানে ১৯৫৩ সালের ২৪শে মে একটি নজরুল একাডেমী প্রতিষ্ঠা করেন। ঐ কমিটির সদস্য ছিলেন : মৌলভী তমিজুদ্দীন খান, জনাব এ. কে. ব্রোহী, জনাব এম. হাদি হাসান, মীযানুর রহমান, জনাব এস. এম. আলি, ডাক্তার আখতার হাসান ও মাহবুব জামাল জাহেদী প্রমুখ বাঙালি ও অবাঙালি। কার্যকর পরিষদের প্রথম নির্বাচিত সভাপতি হন জনাব এ. কে. ব্রোহী, কোষাধ্যক্ষ হন ফকরুদ্দীন বলিভয় এবং সম্পাদক হন মীযানুর রহমান।

এটিকে নজরুল-চর্চার কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করলেও প্রতি বছর নজরুল-জন্ম-দিবসে জয়ন্তী-উৎসব ছাড়া তেমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার কাজ এখান থেকে বেরিয়েছিল কিনা জানা যায়নি—দু' একটি ইংরেজী ব্রোসার ছাড়া। মনে হয় প্রবাসী বাঙালিরা এই একাডেমীতে কিছু বই পড়ার এবং একাডেমী স্কুলে কিছু বাংলাভাষা শিক্ষাদানের ও চর্চার সুযোগ পেতেন।

এই পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গের নজরুল একাডেমীর কথা উল্লেখ করতে হয়। ১৯৫৮ সালে কবির জন্মস্থান চুরুলিয়ায় প্রগতিশীল একদল তরুণ নজরুল সাহিত্য ও সংগীত-চর্চার জন্য নজরুলের জন্মভিটায় দু' কামরার ঘর বিশিষ্ট একটি 'নজরুল একাডেমী' খোলেন। এখান থেকে প্রতি বছর একটি ক'রে মুখপত্র প্রকাশিত হচ্ছিল। মুখপত্রগুলিতে পশ্চিম বঙ্গ সরকারের কিছু বাণীও ছাপা হ'ত ; সেই সঙ্গে থাকত একাডেমী সম্পাদকের কিছু বক্তব্য। এঁরা নজরুল জীবনের কিছু তথ্য সংগ্রহেও বোধ হয় সফল হয়েছেন। কিন্তু কোন গুরুত্বপূর্ণ গবেষণাকর্ম প্রকাশ করতে পারেননি—সম্ভবত অর্থাভাবে।

১৯৬২ সালে চীন-ভারত সংঘর্ষের পর পশ্চিমবঙ্গে নতুন ক'রে নজরুল-আলোচনা ও চর্চার সাড়া জাগে। ১৯৬৩ সালে মযহারুল ইসলাম, দিলীপ চক্রবর্তী প্রমুখের প্রচেষ্টায় 'নজরুল জন্ম-জয়ন্তী কমিটি' নামে একটি কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটির সভাপতি ছিলেন—শ্রী ব্রজকান্ত গুহ ; কার্যকরি সভাপতি ছিলেন—শ্রীশঙ্করপ্রসাদ মিত্র ; সহ-সভাপতি ছিলেন—সর্বশ্রী পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, কাজী আবদুল ওদুদ, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায, রেজাউল করিম, নরেন্দ্র দেব, প্রফুল্লরঞ্জন চক্রবর্তী, আবদুস সাত্তার, প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র এবং অহীন্দ্র চৌধুরী ; যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন—শ্রীদিলীপ চক্রবর্তী ও জনাব মযহারুল ইসলাম ; সংস্কৃতি সম্পাদক ছিলেন—শ্রীশক্তিব্রত ঘোষ ; সংগঠন সম্পাদক ছিলেন—শ্রীআবুল কাসেম রহিমউদ্দীন ও শ্রীদীপঙ্কর ঘোষ ; সদস্যবৃন্দ ছিলেন—সর্বশ্রী শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, আশুতোষ ভট্টাচার্য, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ মিত্র, পূরবী মুখোপাধ্যায়, মজহারউদ্দীন খান, নির্মল বসু, পরিমল মজুমদার, নরেশচন্দ্র ঘোষ, জ্যোতির্ময় দে, ধীরেন্দ্রচন্দ্র মিত্র, কমল দাশগুপ্ত, চিত্ত রায়, গিরীন চক্রবর্তী, সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়, আবদুস সালাম, আবুল আবছার, গজনফর রেজা চৌধুরী, নির্মলচন্দ্র কুণ্ডু, খায়রুল আলম সিদ্দিকী ও মহীউদ্দীন ; এর উপ-সমিতির সভাপতি ছিলেন—শ্রীধীরেন্দ্রচন্দ্র মিত্র ; সম্পাদিকা—ফিরোজা বেগম ; পরিচালক—কমল দাশগুপ্ত ও সদস্য—চিত্ত রায়, গিরীন চক্রবর্তী, সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়, সুচিত্রা মিত্র, দ্বিজেন চৌধুরী, রাধারানী দেবী, নরেন্দ্রনাথ রায়।

পশ্চিমবঙ্গে দীর্ঘকাল উপেক্ষিত নজরুল ইসলামকে এঁরা আবার নতুন করে বুঝবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। ব্রজকান্ত গুহ নজরুল-জয়ন্তীর সভাপতির ভাষণে বলেন :

> আজ যখন দেশ আক্রান্ত, দেশের সীমানায় পরদেশী লোভী হিংস্র শয়তানের সদম্ভ দাপট সেই ক্ষণে বিদ্রোহী কবি নজরুলের উদাত্ত আহ্বান আমাদের সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন ছিল, প্রয়োজন ছিল তাঁর বলিষ্ঠ জাগরণী মন্ত্রের—'বল বীর বল উন্নত মম শির'।

বিপ্লববাদের পটভূমিকায়, জাতির স্বাধীনতার স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে নজরুলের চারণ মানসের পর্যালোচনা আজকের সাহিত্যে শুধু সাময়িক মাত্রই নয়—সময়ের বিশেষ ধারাকে সঞ্জীবিত করার জন্যও আবশ্যিক প্রয়োগচেতনা।

এই কমিটির তরফ থেকে "নজরুল-জয়ন্তী" দিনে "নজরুল" নামে যে ক্ষুদ্র পুস্তিকাটি প্রকাশিত হয় তাতে বিখ্যাত ঔপন্যাসিক শ্রী তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় লেখেন :

> জাতির ইতিহাস মাত্র রাজনৈতিক উত্থান-পতনের ঘটনাপঞ্জী নয়। তার সঙ্গে আরও অনেক কিছু নিয়ে ইতিহাস নানান শাখা-প্রশাখা বিস্তার ক'রে বনস্পতির মত জাতির সঙ্গে বাড়ে। সংস্কৃতি সমাজ ধর্ম শিল্প এই মহাবনস্পতির মূল শাখাগুলির অন্যতম। কবি-সাহিত্যিক শিল্পীদের নাম এই অধ্যায়ে লিখিত থাকে। রাজনৈতিক সমাজনৈতিক সংগঠনের উপর তাদের প্রভাব পড়ে, আবার রাষ্ট্রসমাজে এর প্রভাব পড়ে কবি-সাহিত্যিক শিল্পীর উপর। এক একজন কবি থাকেন যিনি জাতির এ-জীবনের প্রয়োজনে সময়ে কলম রেখে হাতিয়ার তুলে নেন হাতে। কালে কালে জাতীয় সঙ্কটে এই কবির স্মৃতি, এই কবির কাব্য নতুন ক'রে খাপ-খোলা তলোয়ারের মত ঝলসে ওঠে। মনোবিলাসী ললিত কাব্যকলার অধিকারীরা বা সৃষ্টিকারীরা জীবনের শান্ত সময়ের এই কবিদের নিন্দা করেন। ১৯৬২ সালে চীন যখন ভারত আক্রমণ করেছে তখন এই সত্যটি নতুন ক'রে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠেছে কবি কাজী নজরুল ইসলাম সম্পর্কে।

এই সংকলনটিতে পশ্চিমবঙ্গের তদানীন্তন মুখ্য-মন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেনের নিম্নোক্ত বাণীটি ছাপানো হয় :

> আমাদের জাতীয় জীবনের এক সঙ্কট মুহূর্তে কবি নজরুল ইসলামের আবির্ভাব হয়েছিল। পরাধীনতার বহু লাঞ্ছনা নিপীড়ন ও দুঃখের মধ্য দিয়ে তিনি দেশপ্রেম ও মানবদরদের যে অপূর্ব কবিতা ও গানগুলি করেছিলেন সেগুলোর মূল্য আজও এতটুকু কমেনি।

সমিতি কর্তৃক ১৯৬৭ সালে প্রকাশিত আর একটি পুস্তিকায় "আমাদের কথা" শীর্ষক ভূমিকায় দেখতে পাই নজরুলের কবিতা বিভিন্ন ভারতীয় ও বিদেশী ভাষায় অনূদিত হচ্ছে :

'আজ নজরুল-সাহিত্য শুধু বাংলায় সীমাবদ্ধ নেই। হিন্দী, উর্দু, তেলেগু, অসমিয়া এবং ইংরেজী, রুশ, চেকোস্লোভাক ভাষায় নজরুল-কাব্যের বাণী ও রস কমবেশী পৌঁছেছে।'

এই সংকলনে কমরেড মুজফ্ফর আহমদের লেখা "উদ্বোধনী অভিভাষণে" আমরা লক্ষ্য করি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এককালে অনার্স কোর্সে নজরুল ইসলাম পড়ানো হলেও ষাটের দশকে তা অন্তর্হিত :

এখন দেখা যাচ্ছে যে কবির কোনো কবিতাই অনার্স কোর্সে পাঠ্য নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থায় এই ওলোটপালট কেন ঘটল ?

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য ১৯৬৩ সালে উক্ত কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তিকায় মুদ্রিত শ্রীশ্যামাপদ চক্রবর্তী লিখিত একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের পুত্র রথীন্দ্রনাথের কাছে লেখা রবীন্দ্রনাথের এই অসামান্য পত্রটি অন্তর্ভুক্ত হয়। এই পত্রটি 'দৈনিক বসুমতী'র ১৯শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৮, রবিবার সংখ্যায় ছাপা হ'য়েছিল :

কল্যাণীয়েষু,

রথী, নজরুল ইসলামকে Presidency Jail এর ঠিকানায় টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিলুম ; লিখেছিলম Give up hunger strike ; Ourliterature claims you। জেল থেকে Memo এসেছে The addressee not found। অর্থাৎ ওরা আমার message ওকে দিতে চায় না, কেননা, নজরুল প্রেসিডেন্সী জেলে না থাকলেও ওরা নিশ্চয় জানে সে কোথায় আছে। অতএব নজরুল ইসলামের আত্মহত্যায় ওরা বাধা দিতে চায় না।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কবির ৬৭তম জন্ম-দিবসে কমিটি যে পুস্তিকা প্রকাশ করে তাতে নজরুল সম্বন্ধে লিখিত শ্রীদিলীপকুমার রায়ের প্রবন্ধে দিলীপ রায়কে লিখিত সুভাষচন্দ্র বসুর একটি ইংরেজী পত্র উদ্ধৃত হয়। উল্লেখযোগ্য পত্রটির অনুবাদ এখানে তুলে দিলাম :

আমি কয়েদীদের দরদী হ'তে পারতাম না যদি জেলে না যেতাম। আমার মনে হয় শিল্পী ও সাহিত্যিকদের অনেক কিছু লাভ হবেই হবে যদি তাদের জেল-জীবনের অভিজ্ঞতা থাকে। কাজীকে

জেলে যেতে হয়েছিল—এ অভিজ্ঞতা থেকে তাঁর কাব্য কতখানি সমৃদ্ধ হ'য়ে উঠেছে বোধ হয় আমরা আজো উপলব্ধি করিনি।

এই কমিটির উদ্যোগে 'নজরুল একাডেমী' গঠিত হয়। ১৯৬৬ সালের ৫ই জুন নেতাজী ভবনে "পশ্চিমবঙ্গ নজরুল একাডেমী"র উদ্বোধন অনুষ্ঠান হয়। উদ্বোধন করেছিলেন কমরেড মুজফ্ফর আহমদ। এর সভাপতি হন বিচারপতি শ্রীশঙ্করপ্রসাদ মিত্র। সহ-সভাপতি হন মুজফ্ফর আহমদ, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, অমিয়নাথ বসু ও মৈত্রেয়ী দেবী। সাধারণ সম্পাদক হন কল্পতরু সেনগুপ্ত।

ঐ বছরে নজরুল জন্ম-জয়ন্তীর সভাপতির ভাষণে শঙ্করপ্রসাদ মিত্রের গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য এখানে উদ্ধৃত হ'ল :

> নজরুল-সংগীতের পুরাতন রেকর্ডগুলি তাঁর তিন হাজার গানের অধিকাংশের মত লুপ্ত হয়েছে। জনমতের চাপে গ্রামোফোন কোম্পানী যদিও নজরুল-সংগীতের নতুন রেকর্ড বার করেছে, কিন্তু এ ক্ষেত্রেও সকল গায়কের কণ্ঠে নজরুল-সংগীতের গায়কী পাওয়া যায় না। একাডেমী মনে করে ইন্দুবালা দেবী, আঙ্গুরবালা দেবী, যূথিকা রায়, রাধারানী দেবী, কমলা ঝরিয়া এবং প্রবীণ শিল্পীদের গাওয়া গানগুলির এ. পি. রেকর্ড হওয়া বাঞ্ছনীয়।

একাডেমী বার বার পঃ বংগ সরকারকে অনুরোধ করেছে কবির লেখাগুলি উদ্ধার এবং সরকার কর্তৃক প্রকাশের ব্যবস্থা করার জন্য।

এই একাডেমী যে কর্মসূচী গ্রহণ করে তাহ'ল :

১. বিদ্রোহী কবির লেখা ও পুরানো গানের রেকর্ড উদ্ধার,
২. নজরুল সাহিত্য ও সঙ্গীত অনুশীলন কেন্দ্র স্থাপন,
৩. ভারতের বিভিন্ন ভাষায় কবির রচনার অনুবাদের ব্যবস্থা,
৪. সুলভ মূল্যে নজরুল-সংগীতের স্বরলিপি ও গ্রন্থ প্রকাশ করা,
৫. নজরুল সাহিত্য সঙ্গীত ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনার ব্যবস্থা করা,

৬. আরো ব্যাপকভাবে নজরল জন্মদিবস অনুষ্ঠান করা,

৭. নজরুলের কপিরাইট, সংকলন প্রকাশ এবং বাসস্থান ও ভাতা ইত্যাদির জন্য সরকারের সঙ্গে ব্যবস্থা করা।

কল্পতরু সেনগুপ্ত তাঁর ইংরেজী ভাষণে বলেন :

> During the Congress regime nothing was done in the matter of the poets residence and allowance.

তাঁর বাংলা ভাষণে বলেন :

> পশ্চিমবঙ্গ নজরুল একাডেমীর কাজের জন্য যুক্তফ্রণ্টের শিক্ষামন্ত্রী আড়াই হাজার টাকা দানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এবং একাডেমীর আবেদন পত্রসহ জনদপ্তরে মঞ্জুরীর জন্য পাঠিয়েছিলেন। যুক্তফ্রণ্ট মন্ত্রিসভা খারিজের সঙ্গে সঙ্গে সম্ভবত এই সুপারিশ বাতিল ক'রে দেওয়া হয়েছে।

উল্লেখ করা যেতে পারে "পশ্চিমবঙ্গ নজরুল একাডেমীর" স্বপ্ন সার্থক হয়নি। সরকারের কাছ থেকে তাঁরা আশানুরূপ সাহায্য পাননি এবং ইচ্ছা থাকলেও নজরুল সম্পর্কীয় গবেষণা-ধর্মী কোনও কাজও তাঁরা দেখাতে পারেননি।

এবার ঢাকার "নজরুল একাডেমী' প্রসঙ্গ। ১৯৬৪ সালে—আমি তখন আন্তর্জাতিক নজরুল ফোরাম ছেড়ে পাকিস্তান লেখক সংঘের অফিস সম্পাদকের চাকরি করছি—একটা দাওয়াত পাই। (তখনকার দিনে এ্যাডভোকেট) জাস্টিস নূরুল ইসলাম সাহেবের ১১নং র‍্যাংকিন স্ট্রীটের বাড়ীতে নজরুল-জয়ন্তী উপলক্ষে দাওয়াত পত্রে আহ্বায়কের স্বাক্ষর ছিল কবি তালিম হোসেনের। আমি 'বিদ্রোহী' কবিতা আবৃত্তির আমন্ত্রণ পেয়েছিলাম। সে সভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী এবং একটি মূল্যবান প্রবন্ধ পড়েছিলেন তাখনকার দিনের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগের অধ্যক্ষ ডক্টর সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন। উপস্থিতদের মধ্যে ছিলেন আবুল কালাম শামসুদ্দীন, সিরাজউদ্দীন হোসেন, খান মোহাম্মদ মঈনউদ্দিন, মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ প্রমুখ সুধীবৃন্দ। ঘরোয়া

অনুষ্ঠানের ডায়াসের উপর শিল্পী আবুল কাসেম অঙ্কিত পদ্মাসনে উপবিষ্ট, মস্তকে নৌকাটুপি, বামহস্ত সেতারে রক্ষিত সংগীত-রচনায় অভিনিবিষ্ট সাধক নজরুলের একটি চিত্তহারী তৈলচিত্র ছিল। ছবিটি বহুদিন প্রথমে বাঙলা উন্নয়ন বোর্ড ও পরে বাঙলা একাডেমীর সচিব কক্ষের শোভা বর্ধন করেছে। এই সভাতেই কর্মীবৃন্দ "নজরুল একাডেমী' প্রতিষ্ঠানের প্রস্তাব গ্রহণ করেন। অফিস ১১নং ব্যাংকিন স্ট্রীট। সাধারণ সম্পাদক তালিম হোসেন। অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে ছিলেন : আবুল কালাম শামসুদ্দীন, সিরাজুদ্দীন হোসেন, মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ প্রমুখ সাহিত্যিক সাংবাদিক। তাঁরা এই উদ্যোগ গ্রহণ করেন। কিন্তু প্রার্থিত অর্থের অভাবে তাঁদের বাসনা মনোবাসনায় থেকে যায়। ১৯৬৭ সালে তাঁরা তাঁদের স্বপ্ন বাস্তবায়িত করার সুযোগ পান তদানীন্তন পাকিস্তান সরকারের আনুকূল্যে। আমি জানি না এই সুযোগ হারালে তাঁরা কোনদিন নজরুল একাডেমী করতে পারতেন কিনা। কারণ এই দারিদ্র্যলাঞ্ছিত দেশে শিল্প-চর্চায় অর্থ দান করার মত সংস্কৃতি-সেবী দানবীরের সংখ্যা একান্ত বিরল। এর পৃষ্ঠপোষকতা করেন তখনকার কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সবুর খান। রবীন্দ্র-বিতর্ক থেকেই তাঁদের যে এ সুযোগ এসেছিল এতে সন্দেহ নেই। নজরুল ইসলামের মত একজন শ্রেষ্ঠ মুসলমান কবির চর্চা বাড়লে ইসলামের চর্চা বাড়বে এবং তাতে তাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য কিছু সফল হবে এমন ধারণা সম্ভবত পাকিস্তান সরকারের ছিল। কিন্তু নজরুল একাডেমীর কর্মকর্তা-দের অনেকের মতাদর্শ ইসলামিক হলেও ঐ রকম সংকীর্ণ মনোভাব তাঁদের ছিল না। নজরুলের মত বিশাল প্রতিভাকে অবহেলা এবং উপেক্ষার অন্ধকার থেকে উদ্ধার করার সাধু প্রচেষ্টাও তাঁদের ছিল। কারণ এর সঙ্গে যাঁরা জড়িত ছিলেন—ইব্রাহিম খাঁ, আবুল কালাম শামসুদ্দীন, খান মোহাম্মদ মঈনউদ্দিন, বেনজীর আহমদ—কে না জানে নজরুলের সঙ্গে ঐতিহাসিক সূত্রে এঁদের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ।

তালিম হোসেন বাল্যকাল থেকে নজরুল-ভক্ত ছিলেন। তাঁর রচনায় নজরুলের অমিত প্রভাব দৃষ্টি এড়ায় না। তাঁর শব্দ গ্রহণেও আছে নজরুলের অনুসরণ-প্রচেষ্টা। সুতরাং একাডেমিক অর্থে তাঁকে নজরুলের ভক্ত উত্তর-সূরী বললে বোধ হয় ভুল হয় না।

এর প্রমাণ পেলাম একাডেমী প্রতিষ্ঠার বছরখানেক পরে আমাকে তিনি যখন "নজরুল একাডেমী পত্রিকা"র সম্পাদনার দায়িত্ব দেন। আমি বলেছিলাম (কেননা বাইরে থেকে "নজরুল একাডেমী" সম্বন্ধে নানান কথা শোনা যাচ্ছিল) একাডেমী পত্রিকায় সর্বস্তরের মানুষের ভালো ভালো লেখা ছাপার জন্যে আমাকে স্বাধীনতা দিতে হবে। তিনি পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছিলেন। "নজরুল একাডেমী পত্রিকা"র ১৯৬৯ ও ১৯৭০-এ প্রকাশিত সংখ্যা দেখলেই পাঠক তা বুঝবেন। সম্পূর্ণ সংস্কারমুক্ত।

বলা বাহুল্য এই দু' বছরে 'নজরুল একাডেমী' নজরুল-সাহিত্য ও সংগীত-চর্চায় যে কাজ করেছে তা বিস্ময়কর হয়ত নয়, কিন্তু তাদের আর্থিক অনটনের মধ্যে এই কাজ শ্রদ্ধালাভের যোগ্য। পরবর্তীকালে নজরুল-সাহিত্য গবেষণার ক্ষেত্রে "নজরুল একাডেমী পত্রিকা" এবং নজরুল একাডেমী থেকে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী বাঙালি জাতির জীবনে বিশেষ অবদান বলে বিবেচিত হবে। আমি নিজে নজরুল একাডেমীর সঙ্গে জড়িত অতএব তার প্রশংসায় মুখর হওয়া আমার উচিত না। কেননা এখনও ঢের কাজ বাকী।

প্রবন্ধ দীর্ঘ করে পাঠকের ধৈর্য পরীক্ষার অনিচ্ছায় বক্তব্য সংক্ষেপ করছি। এবার তাই নজরুল সাহিত্য ও সংগীত চর্চায় বিভাগোত্তর কালে পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গ কতটুকু কি করল তারই একটা জ্যামিতিক ছক হিসেবে এখানে নজরুলের উপর লিখিত, সংকলিত উল্লেখ-যোগ্য গ্রন্থতালিকা—গ্রন্থকার, সম্পাদকের নাম ও তাদের প্রথম প্রকাশকালের তারিখ সহ—তুলে দিলাম :

সংকলন গ্রন্থ (বাংলাদেশ)

১. নজরুল-পরিচিতি : সম্পাদক : আবদুল কাদির (মে, ১৯৫৯); ২. নজরুল-সাহিত্য : সম্পাদক : মীর আবুল হোসেন (মে, ১৯৬০); ৩. নজরুল-মানস-সমীক্ষা : সম্পাদক : জি. এস. হালিম (এপ্রিল, ১৯৬৮); ৪. নজরুল ইসলাম : সম্পাদক : মোস্তফা নূরুল ইসলাম (অক্টোবর ১৯৬৯); ৫. নজরুল সমীক্ষণ : সম্পাদক : মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান (১৯৭২); ৬. তোমার সাম্রাজ্যে-যুবরাজ : সম্পাদক :

হায়াৎ মামুদ ও জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত (১৯৭৩); ৭. নজরুল-নির্ঘণ্ট অভিধান : সম্পাদক : সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন (১৯৭০)।

সংকলন গ্রন্থ (পশ্চিমবঙ্গ)

১. কবি নজরুল সংস্কৃতির পরিষদ (১লা অক্টোবর, ১৯৫৭); ২. নজরুল-স্মৃতি : সম্পাদক : বিশ্বনাথ দে (১৯৭১); ৩. কাজী নজরুল : সম্পাদনা : শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় (সপ্তম অষ্টম শ্রেণীর জন্যে একটি চটি পাঠ্য বই)। ৪. নজরুল-কথা : সম্পাদনা : বিশ্বনাথ দে (১৯৭৩), ৫. রবীন্দ্রনাথ নজরুল ও বাঙলাদেশ : সম্পদনা : রঘুবীর চক্রবর্তী (১৯৭২), ৬. নজরুল স্মৃতিকথা : সম্পাদনা দিলদার (১৯৭১)

স্বরচিত একক গ্রন্থ : কবি-জীবন ও সাহিত্য সম্পর্কিত (বাংলাদেশ)

১. যুগ-স্রষ্টা নজরুল : খান মুহম্মদ মঈনউদ্দীন (১৯৫৭); ২. নজরুলকে যেমন দেখেছি : শামসুন্নাহার মাহমুদ (জুন, ১৯৫৮); ৩. Nazrul Islam Mizanur Rahman (১৯৫৯); ৪. নজরুল ইসলাম : সৈয়দ আলী আ সান (১৯৫৪।৫৫) (?) ; ৫. নজরুল সাহিত্যের ভূমিকা : শিবপ্রসন্ন লাহিড়ী (১৯৫৩); ৬. নজরুল-কাব্য পরিচিতি : ডক্টর কাজী মোতাহার হোসেন (১৯৪৯); ৭. নজরুল জীবনের শেষ অধ্যায় সুফি জুলফিকার হায়দার (১৯৬৪); ৮. Nazrul and Rabindranath : Amir Hossain Choudhury (১৯৬২); ৯. ছোটদের নজরুল ইসলাম : মেসবাহুল হক (১৯৬৫); ১০. নজরুল ইসলাম ও আধুনিক কবিতা : মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ (১৯৬৩); ১১. Introducing Nazrul Islam : Sirajul Islam Choudhury (১৯৬৮); ১২. নজরুল জীবনে প্রেমের এক অধ্যায় : সৈয়দ আলী আশরাফ (১৯৬৭); ১৩. নজরুল-কাব্যে রাজনীতি; আমীর হোসেন চৌধুরী (১৯৬৬), ১৪. কবি নজরুল : আতাউর রহমান (১৯৬৮); পরিবর্ধিত ও পরিবর্তিত নাম "নজরুল-কাব্য সমীক্ষা (১৯৭৪); ১৫. ছোটদের কবি নজরুল : এম. এ. মজিদ (১৯৬৮); ১৬. নজরুলের বিচার : গাজী শামসুর রহমান (১৯৬৮); ১৭. রেনেসাঁ ও নজরুল : মোহাম্মদ আবদুল কুদ্দুস (১৯৬৯); ১৮. নজরুল-প্রতিভা :

মোবাশ্বের আলী (১৯৬৯) ; ১৯. নজরুল-নির্দেশিকা : রফিকুল ইসলাম (১৯৬৯); ২০. নজরুল-অন্বেষা : রাজিয়া সুলতানা (১৯৬৯); ২১. নজরুল-কাব্যে ইসলামী ভাবধারা : মোহাম্মদ আবদুল কুদ্দুস (১৯৭০); ২২. শব্দ-ধানুকী নজরুল ইসলাম : শাহাবুদ্দীন আহ্‌মদ (১৯৭০); ২৩. জীবনশিল্পী নজরুল : বন্দে আলী মিয়া (১৯৭১) ; ২৪. নজরুল-জীবনী: রফিকুল ইসলাম (১৯৭২) ; ২৫. নজরুল-কাব্যের শিল্পরূপ : মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ্ (১৯৭৩) ; ২৬. অগ্নি-বীণা বাজান যিনি : অশোক গুহ (?); ২৭. নজরুল-প্রতিভা পরিচিতি : অশোককুমার মিত্র (১৯৬৯) ; ২৮. ছোটদের নজরুল : আ. ন. ম. বজলুর রশীদ (?); ২৯. ইসলামের সৌন্দর্য ও কবি নজরুল ইসলাম : বেগম জেবু আহ্‌মদ (১৯৭০) ; ৩০. জাতীয় জাগরণে নজরুল : শ্রীজয়গোবিন্দ ভৌমিক (১৯৬২) ।

একক গ্রন্থ (পশ্চিমবঙ্গ)

১. বাংলা সাহিত্যে নজরুল : আজহারউদ্দীন খান (১৯৫৪) ; ২. কাজী নজরুল : প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায় (২৬শে মে, ১৯৫৫) ; ৩. ছেলেদের নজরুল : সবুজ সাথী (শ্রীবামন দাস)— ১৯৫৩) ; ৪. নজরুল মানস-চরিত : ডক্টর সুশীলকুমার গুপ্ত (মে, ১৯৬০) ; ৫. আমার বন্ধু নজরুল (প্রথম নাম ‘কেউ ভোলে না কেউ ভোলে) : শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় (১৯৬৮)(?) : ৬. জ্যৈষ্ঠের ঝড় : অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত (১৯৬৬) ; ৭. নজরুল ইসলাম : স্মৃতিকথা : মুজফ্‌ফর আহমদ (১৯৬৬); ৮. নজরুল পরিক্রমা : আবদুল আজীজ আল-আমান (১৯৬৯) : ৯. Kazi Nazrul Islam : Basudha Chakravarty (১৯৬৮) ; ১০. কবি নজরুল : আবদুল কাদির (১৯৭০) ; ১১. ধূমকেতুর নজরুল : আবদুল আজিজ আল-আমান (১৯৭২) ; ১২. নজরুল-কথা : শান্তিপদ সিংহ (১৯৭২) । ১৩. নজরুলের সঙ্গে কারাগারে নরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তী (মে, ১৯৭০) ।

এ-ছাড়া বাংলাদেশে দুটি নাটক ও একটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। ১. (নাটক) কবি দা : আবদুস সাত্তার (১৯৬০) ; ২. (নাটক) বিদ্রোহী নজরুল : সায়েদুল ইসলাম (১৯৭০) ; ৩. (কাব্যগ্রন্থ) নজরুল স্মরণে : শ্রীসুধীরকুমার ভট্টাচার্য (১৯৬৮) ।

প্রসংগত কবি জসীমউদ্দীন তাঁর 'যাঁদের দেখেছি' এবং পরে 'ঠাকুর বাড়ীর আঙ্গিনা'য় নজরুল-স্মৃতির দীর্ঘ পরিচয় লিখেছেন। বিভাগোত্তর কালে পশ্চিমবঙ্গ থেকে গোটা বিশেক নজরুল-গীতির স্বরলিপি বেরিয়েছে। এ-স্বরলিপিগুলো জগৎ ঘটক, নিতাই ঘটক, কাজী অনিরুদ্ধ, কমল দাশগুপ্ত ও ফিরোজা বেগম করেছেন। বাংলাদেশ থেকে ফিরোজা বেগম কৃত দুটি স্বরলিপি বাংলা একাডেমী প্রকাশ করেছে। এ-ছাড়া মফিজুল ইসলাম, এ. এইচ. সাঈদুর রহমান ও সুরাইয়া খলিল একক প্রচেষ্টায় ৭।৮ খানি স্বরলিপি প্রকাশ করেছেন।

নজরুলের উপর লেখা উপরোক্ত ৬০ খানি বই-এর এ পর্যন্ত সন্ধান পাওয়া গেছে। এ-ছাড়া নজরুলের লেখা প্রকাশিত গ্রন্থ যে নেই তা এই মুহূর্তে বলা ঠিক হবে না। নজরুল একাডেমীর কাছে প্রকাশিতব্য ৫টি পাণ্ডুলিপি আছে। এর মধ্যে আবদুল মান্নান সৈয়দের 'নক্ষত্রের নাম নজরুল', আবদুল কাদিরের 'ছন্দশিল্পী নজরুল', মৎপ্রণীত 'নজরুল-দর্পণে নজরুল', একাডেমী সংকলিত 'নজরুল-সাহিত্য' ও 'নজরুল স্মৃতি' আছে। করুণাময় গোস্বামীও নজরুলের গানের উপর একটি প্রামাণ্যগ্রন্থ লিখতে চেষ্টা করছেন। তাঁর কিছু প্রবন্ধ পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

এই প্রকাশিত ও প্রকাশযোগ্য গ্রন্থ ছাড়াও 'মাহে নও', 'পূবালী', 'সওগাত', 'মোহাম্মদী', 'কণ্ঠস্বর', 'কালস্রোত' প্রভৃতি বহু সাময়িক পত্র এবং দৈনিক পত্রিকার অসংখ্য নজরুল-জয়ন্তী সংখ্যায় নজরুলের উপর লেখা হাজার হাজার প্রবন্ধ ছড়িয়ে আছে।

উপরে যে সব গ্রন্থের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তার সবগুলিই উপভোগ্য নয়। অনেকগুলো নেহাৎ গতানুগতিক আলোচনা। কিন্তু কয়েকটি জীবন-ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসম্বলিত গ্রন্থ—কমরেড মুজফ্ফর আহমদের 'নজরুল ইসলাম : স্মৃতিকথা', সুফী জুলফিকার হায়দারের 'নজরুল জীবনের শেষ অধ্যায়', খান মুহম্মদ মঈনউদ্দীনের 'যুগস্রষ্টা নজরুল', শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের 'আমার বন্ধু নজরুল', সৈয়দ আলী আশরাফের 'নজরুল জীবনে প্রেমের এক অধ্যায়', অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের

'জ্যৈষ্ঠের ঝড়', শামসুন্নাহার মাহমুদের 'নজরুলকে যেমন দেখেছি', আবদুল আজিজ আল-আমানের 'নজরুল পরিক্রমা', শান্তিপদ সিংহের 'নজরুল-কথা' এবং রফিকুল ইসলামের 'নজরুল-জীবনী' বিশেষ উপাদেয়, চিত্তাকর্ষক এবং সেই সঙ্গে ঔৎসুক্য-নিবারক গ্রন্থ।

সাহিত্য-সমালোচনা হিসাবে কবি আবদুল কাদিরের 'কবি নজরুল', সৈয়দ আলী আহসানের 'নজরুল ইসলাম', আজহার উদ্দিন খানের 'বাংলা সাহিত্যে নজরুল', ডক্টর সুশীলকুমার গুপ্তের 'নজরুল-মানস চরিত', মোহম্মদ মাহফুজউল্লাহর 'আধুনিক কবিতা ও নজরুল ইসলাম' এবং 'নজরুল-কাব্যের শিল্পরূপ', ডক্টর সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর 'Introducing Nazrul Islam' আতাউর রহমানের 'নজরুল-কাব্য সমীক্ষা' এবং মোবাশ্বের আলীর 'নজরুল প্রতিভা' চিত্তাকর্ষক ও সাহিত্য-জ্ঞানোদ্দীপক গ্রন্থ। গবেষণামূলক তথ্যভিত্তিক গ্রন্থের মধ্যে রফিকুল ইসলামের 'নজরুল নির্দেশিকা' এবং রাজিয়া সুলতানার 'নজরুল-অন্বেষা' নজরুল-গবেষকের কাছে অভিধান সুলভ প্রামাণ্যগ্রন্থ।

প্রকাশিতব্য গ্রন্থের মধ্যে আবদুল মান্নান সৈয়দের 'নক্ষত্রের নাম নজরুল', সমালোচনার নতুন দ্বারোদঘাটনের সহায়ক হবে ব'লে আশা করা যায়। এই গ্রন্থের প্রবন্ধগুলি ইতিপূর্বে 'সমকাল', 'নজরুল একাডেমী পত্রিকা', 'শিল্পকলা' ও 'কালস্রোতে' প্রকাশিত। নজরুল-কাব্যের শিল্পোৎকর্ষের পরিচিতিই এর মুখ্য বিষয়।

আবদুল কাদিরের 'ছন্দশিল্পী নজরুল'ও হবে পাণ্ডিত্য ও গবেষণার এক অননুকরণীয় নিদর্শন। এই গ্রন্থের দু'একটি প্রবন্ধ ইতিপূর্বে পত্র-পত্রিকা ও প্রবন্ধ সংকলনগুলিতে প্রকাশিত হয়েছে।

প্রবন্ধ সংকলনগুলি সম্পর্কে একটি কথা বলা আবশ্যক। এর প্রত্যেকটিতে যে নতুন নতুন প্রবন্ধ সংযোজিত হয়েছে তা নয়। এগুলিকে কিছুটা গতানুগতিক হয়ত বলা চলে। ব্যতিক্রম আছে কিন্তু যতটা বেশী পার্থক্য ও বৈচিত্র্য পাঠক আশা করে তা বোধ হয় সম্পূরণ করা সম্পাদকের পক্ষে সম্ভব হয়নি। একই লেখকের প্রবন্ধ বারংবার মুদ্রিত হয়েছে। অবশ্য এর মধ্যে নজরুলের ছন্দ সম্পর্কে কবি আবদুল কাদির ও সৈয়দ

আলী আহসানের প্রবন্ধ, মোতাহের হোসেন চৌধুরীর 'নজরুল ইসলাম ও রেনেসাঁস', কবির চৌধুরীর 'মুসলিম রেনেসাঁ ও কাজী নজরুল ইসলাম', আবদুল মান্নান সৈয়দের 'নজরুলের চিত্রকল্প', হাসান হাফিজুর রহমানের 'কবি নজরুল একটি সমীক্ষা', কাজী আবদুল ওদুদের ও বুদ্ধদেব বসুর 'নজরুল ইসলাম', বারংবার পাঠযোগ্য প্রবন্ধ যে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

বিভাগোত্তর কালের অভিনন্দনযোগ্য কীর্তি তদানীন্তন 'বাঙলা উন্নয়ন বোর্ড' কর্তৃক প্রকাশিত 'নজরুল-রচনাবলী' (১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড)। ধন্যবাদ বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী ও রচনাবলীর সম্পাদক আবদুল কাদিরকে। আবু সাঈদ চৌধুরীর উদ্যোগ ও বাঙালী বুদ্ধিজীবী সাহিত্যিকদের নিষ্কুণ্ঠ সমর্থনে 'নজরুল রচনাবলী' প্রকাশে পাকিস্তান সরকারের অনীহা বাধা ব'লে গণ্য হয়নি। এই বিরাট কর্মই নজরুলের "রেজারেকশন" বলা যেতে পারে। এই রচনাবলী এবং আবদুল কাদির সম্পাদিত আর একখানি অমূল্য গ্রন্থ 'নজরুল-রচনা-সম্ভার' নজরুল সমালোচকদের চিন্তাধারাকে নতুন খাতে প্রবাহিত করতে বাধ্য করেছে। মনে রাখা দরকার নজরুলের বহু গ্রন্থ ৩৫ থেকে ৪০ বৎসর পর্যন্ত লোকচক্ষুর অন্তরালে ছিল। তাই তার সমুদ্র-গভীর বিশাল চেহারাটা দেখবার সুযোগ অনেকেরই ঘটেনি। 'নজরুল-রচনাবলী' ও 'নজরুল-রচনা-সম্ভার' আমাদের সেই সুযোগ করে দিল।

মোটামুটি বাংলাদেশে, পাকিস্তানে ও পশ্চিমবঙ্গে নজরুল-চর্চার এই ইতিহাস এবার বাইরের দুনিয়ায় নজরুল-চর্চার ইতিহাস সম্পর্কে সামান্য কিছু বলে এই প্রবন্ধের উপসংহার রচনা করব। এ-ব্যাপারে আমার হাতের কাছে যেটুকু তথ্য আছে তাতে রাশিয়ার ভূমিকাই বোধ হয় সবচেয়ে অভিনন্দনযোগ্য।

প্রবন্ধের প্রসারিত শরীর দেখে পাঠকের আঁতকে ওঠার ভয়ে বিদেশে নজরুল-চর্চা প্রসঙ্গটি যথারীতি সংক্ষিপ্ত করতে বাধ্য হলাম। লোভ ছিল একটু বেশী বলার। কিন্তু লোভ ত পাপ বলে গণ্য হতে পারে। তবু লোভী পাঠককে বলব প্রথম বর্ষ নজরুল একাডেমী পত্রিকার 'বর্ষা' সংখ্যায় কুজনেৎসভ লিখিত "নজরুল ইসলাম : রুশ লেখকের চোখে"

এবং বসন্ত সংখ্যায বিশ্বজিৎ বায লিখিত "তরুণ রাশিযাব চোখে নজরুল" প্রবন্ধ দুটি পড়ুন। (বিশ্বজিৎ বাযেব লেখাটি সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকায প্রথমে প্রকাশিত হয।) আমি সেখান থেকে দু চারটি ক্ষুদ্র উদ্ধৃতি দেব—আমাব প্রবন্ধেব শিবোনামেব সার্থকতা নিরূপণেব জন্য :

১. কুজনেৎসভ

সাধাবণত বাঙালী কবি-সাহিত্যিকদেব লেখা পড়তে আমাব সামনে যে ছবি ফুটে ওঠে তা সুবিস্তৃত প্রশান্ত নদীব, উদ্বেল বন্যাতেও সে নদী কূল ছাপিযে ওঠে না, কেবল তাব স্রোতেব গতিটা বাড়ে মাত্র। কিন্তু নজরুল-কাব্যেব চবিত্র অন্য বকমেব, আশাব আগুন ঠিক্বে বেবচ্ছে তাঁব কবিতা থেকে, মনে হয -প্রখব সূযেব কবে উজ্জ্বল একটি উদ্দাম জল-প্রপাত। এই প্রতিভা তাঁব স্বদেশেব সকল মানুষকে বিদেশী উৎপীড়ক-দেব বিরুদ্ধে সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ কবে তুলেছিল, তাদেব শৃঙ্খলিত মাতৃভূমিব জন্যে তাদেব দেশপ্রেমকে ক'বে তুলেছিল প্রোজ্জ্বলিত। তাঁবই প্রতিভা জনসাধাবণকে তাঁদেব পর্বত, নদী এবং অবণ্যকে মুক্ত দেখতে সাহায্য কবেছে।

২ মিখাইল কুরগানঃ গিয়েভ অনূদিত নজরুল-কাব্যের ইয়েভগানি চেলিশেভ লিখিত ভূমিকা .

ভাবতেব শোষিত জনগণ ঔপনিবেশিক শাসনেব নাগপাশ থেকে যখন মুক্তিব জন্য ব্যগ্র হ'য়ে উঠেছিল তখন তাদেব সংগ্রামে স্বদেশ প্রেমাত্মক কবিতা আব গান পরিণত হযে উঠেছিল 'বোমা আব পতাকায'—এত গুরুত্বপূর্ণ ছিল তাদেব ভূমিকা। "মোসলেম ভাবত" পত্রিকায নজরুলেব আবির্ভাবেব সময ছিল বাঙলা সাহিত্যেব দ্রুত সমৃদ্ধিব যুগ। কিন্তু নজরুলেব স্বকীয়তা তাঁকে প্রথম থেকেই বিশিষ্ট কবেছিল। তাঁব কাব্যেব নানা অগ্নি-বর্ষী অংশ শোনা যেত বিভিন্ন জনসভায। শোষণ ও অনাচাবের বিরুদ্ধে নজরুলেব বিদ্রোহেব আহ্বান এবং জীবন আব মানুষেব জয়গান নজরুলেব কাব্যকে সর্বস্তবেব মানুষেব কাছে পৌঁছে দিয়েছিল।

৩। একজন সুশিক্ষিতা রুশীয় কাব্য-রসিকার বক্তব্য :

এই রকম বিপ্লবী ভারতীয় কবি এই প্রথম পড়লাম। ভারতের জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের কথা জানি, এই আন্দোলনের দর্শনের বিষয়েও পড়েছি। কিন্তু বিপ্লবী ভারতীয় কবিতা এই প্রথম। বইটির পরিধি বড় নয়,—(অনূদিত কবিতা গ্রন্থটি নজরুলের সামান্য কয়েকটি কবিতার সংকলন)—কিন্তু এর মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসছে পরাধীনতার গ্লানি আর স্বাধীনতার আকাঙক্ষায় অতি পরিচিত ছবি। সে-যুগের ভারতীয়দের নাড়ীর স্পন্দন অনুভব করা যায়। স্পষ্টই বুঝতে পারলাম যে, অসম অবস্থার প্রতিক্রিয়া সব দেশে একই রকম হয়। নজরুল সম্বন্ধে কিছু বাঙালী সমালোচকের ধারণা কবিতা লেখা সম্বন্ধে নজরুল Knows no rule. তাতো মনে হয় না। কাব্যের রূপগত উৎকর্ষের দিক দিয়েও তো নজরুলকে খুবই ভালো লাগলো। "যৌবন জল তরঙ্গ" কবিতাটি চিত্ররূপময় অথচ বিপ্লবাত্মক। এর মধ্যে কত যে ছবি। "ছাত্রদল" কবিতাটিতে কবি যদিও বলেছেন ভারতের যুবকদের কথা কিন্তু এ যেন নির্যাতিত সব জাতির যুবকদের জন্য প্রযোজ্য। আজকের দিনেও এ-কবিতার প্রয়োজন ফুরোয়নি। "চল্-চল্-চল্" এ নিশ্চয়ই গান। আমাদের দেশেও এ-রকম গান আছে। কিন্তু এর উপমা আর চিত্রকল্প এ ধরনের গানের পক্ষে আশ্চর্যজনক।

নজরুলের কবিতা রুশ, জার্মানী, ইংরেজী, চেকোস্লোভাকিয়া প্রভৃতি ভাষায় এবং উর্দু, ইরানী, আরবী, তুর্কী ভাষাতেও অনূদিত হয়েছে। কিন্তু তা যৎসামান্য। উল্লেখযোগ্য রাশিয়ায় নজরুল যেমন সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির জন্যে খ্যাত তেমনি আমেরিকাতে তিনি হুইটম্যানের মত মানবিকতাবাদী গণতন্ত্রের কবি হিসেবে বিখ্যাত। সম্ভবত ভালো অনুবাদের অপ্রতুলতার জন্যে তিনি বিদেশে আজও বিস্তৃতভাবে আলোচিত-সমালোচিত হওয়ার সুযোগ পাননি।

এ প্রবন্ধে নজরুলের সংগীত-চর্চার দিকটি বিশেষভাবে আলোচিত হতে পারল না। বাংলাদেশে এবং পশ্চিমবঙ্গে আজকাল নজরুল-গীতির

চর্চা উত্তরোত্তর বাড়ছে। কিন্তু আশানুরূপ নয়। ভারতীয় সংগীত-জগতের সুর-সৌরলোকের উজ্জ্বলতমদের অন্যতম এই মহা-জ্যোতিষ্কের সংগীত-সাধনার পটভূমি, ব্যাপ্তি, গভীরতা, বৈচিত্র্য ও ঐন্দ্রজালিক মহিমা নিয়ে গবেষণার সামান্যতম নিদর্শন কোথাও পরিলক্ষিত হয় না। না পশ্চিমবঙ্গে, না বাংলাদেশে। নজরুল-সঙ্গীত শিক্ষা দেওয়ার মত উপযুক্ত গুরু আজকের বাংলাদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গে একজনও আছেন বলে আমার জানা নেই। মুখের কথায় চিড়ে ভেজে না। সঙ্গীত কঠিনতম শাস্ত্র, দুরূহতম শিল্প। বাণী-প্রধান সংগীত শুদ্ধতম উচ্চারণাশ্রয়ী। সেই সঙ্গে সঙ্গীত-গুরুর এ ধারণা থাকা প্রয়োজন নজরুল তিন থেকে চার হাজার গান লিখেছিলেন। আর সে গানে আছে এক শ্রেষ্ঠ কবির গভীব জীবনবোধের বিচিত্র মনস্তাত্ত্বিক বাণী, এক নাটকীয় ভঙ্গির বিশেষ দ্যোতনা, কাব্য ও সুরের সূক্ষ্মতম ধ্বনি ও ছন্দ-ব্যঞ্জনা।

এইসব জেনে, নজরুল-জীবনের প্রতিটি ভাবনা-কল্পনা, আশা-নিরাশা, দুঃখ-সুখ, কামনা-বাসনা, কর্মচেতনা-মর্মচেতনা, শোক-অশোক, প্রেম-অপ্রেম, স্বপ্ন-দুঃস্বপ্ন এবং ভোগস্পৃহা ও ত্যাগস্পৃহার সংগে পরিচিত হয়ে চিত্র কি, কাব্য কি এবং সঙ্গীত কি এবং এ ত্রিবেণী সংগমে সৃজিত সৌন্দর্যময়তা কি, এ সমস্ত সম্পূর্ণভাবে অবহিত হয়ে, যিনি নজরুল-গীতি-শিক্ষাদানেব তপস্যা-কঠিন প্রস্তুতি গ্রহণ করবেন তিনিই হবেন নজরুল-গীতি-শিক্ষক, নজরুল-সংগীত-গুরু।

সেই সৎগুরু আবিভূর্ত না হওয়া পর্যন্ত আমাদের প্রচেষ্টা তা বলে স্তব্ধ হয়ে যাবে না ; এবং পশ্চিমবঙ্গের কিছু নজরুল-গীতি ভক্তের মত এ বাংলাদেশেও সে সাধনায় উত্তীর্ণ হওয়ার সাধু উৎসাহে নিরত আছেন মিউজিক কলেজ, ছায়ানট, বুলবুল একাডেমী, এবং বিশেষ করে, বলা বাহুল্য, নজরুল একাডেমী।

নজরুলের চিঠির ভাষা

'জাদু শব্দটি ফারসী। আমাদের ভাষায় এর আরও নাম আছে ভেল্‌কী ইন্দ্রজাল। ইংরেজী বললে বলতে হয় ম্যাজিক। শুনেছি এক সময় আরবীরা এই বিদ্যায় আশ্চর্য পারদর্শিতা লাভ করেন এবং দেশ-বিদেশের মানুষকে তাক লাগিয়ে প্রশংসা অর্জন করেন।

আমরা কারও কথাবার্তায় অভিনয়ে গানে এবং লেখায় মুগ্ধ হলে তার উপাধি দিই জাদুকর। এই প্রসংগে এ কথাটাও উহ্য না রাখা ভাল, সুন্দরী নারীকে আমরা পুরুষবশকারী বলে তাকে শঙ্কিত হৃদয়ে মায়াবিনী বলে থাকি।

বড় লেখকদের বড় কবিদের লেখায় এই জাদু থাকে, এই ইন্দ্রজাল থাকে, এই ভেল্‌কী অথবা ঐ ম্যাজিক কিংবা মায়া থাকে, ঐ মনভোলানী রূপ থাকে। তাই মানুষ মুগ্ধ হয়ে ব্যক্তিত্বের কাঁটাতার ডিঙিয়ে তার পিছনে ধায়। লৌহ যেমন চুম্বকের কাছে এসে দূরে থাকতে পারে না, তেমনি শক্তিমান লেখকের লেখার মোহিনী-শক্তির কাছে পরাজয় মানে পাঠকের অহংবোধ। যদি কোন লেখকের ভাষার পর্দান্তরাল থেকে মায়াবিনীর চারু চোখের বিদ্যুৎ ইশারা ঝিলকিয়ে না ওঠে জ্ঞানী হলেও, দার্শনিক হলেও তিনি পাঠকের প্রিয় লেখক হতে পারেন না, বড় লেখক হতে পারেন না।

এ-কথা ঠিক কেবল সারি সারি শব্দের রেলগাড়ী একাকী ভাষাকে মধুর করে না তার পিছনে থাকে সমাজ, ইতিহাস, ঐতিহ্য, প্রেম, দর্শন, বিজ্ঞান, বুদ্ধি এবং সর্বশেষে ঐ সব থেকে উদ্ভূত আবেগ এবং কল্পনা।

'কল্পনা'! এই একটি শব্দের উপর সবচেয়ে বেশী জোর দিই আমি— 'কল্পনা'! মধুসূদন কবির বেলায় এই শব্দটিকে ব্যবহার করেছিলেন—

'সেই কবি মোর মতে, কল্পনাসুন্দরী যার মন-কমলেতে পাতেন আসন।' আমি গদ্য লেখকের বেলায়ও এই শব্দটিকে ব্যবহার করতে চাই। ভাষাকে সুন্দর করে এই কল্পনাসুন্দরী। এই জন্যে বড় গদ্য লেখককে অনেকে কবি বলে থাকেন। বলা বাহুল্য বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় শুধু শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক নন, শ্রেষ্ঠ কবিও। ঐ কল্পনা-শক্তির জন্য কবি।

এবং বলা বাহুল্য বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাংলা গদ্যভাষার প্রথম জাদুগীর। আমরা লক্ষ্য করেছি এই পরম জাদুগীরের ভাষার উৎস থেকেই রবীন্দ্র–জাদুগীরের উদ্ভব হয়েছিল এবং রবীন্দ্র-জাদুগীর থেকে শরৎ-জাদুগীর। সাধু বাংলার এই যেমন ঐতিহ্যধারা তেমনি চলতি বাংলার গদ্য রূপের জাদুর ভেল্‌কি প্রথমে প্রমথ করাঙ্গুলে প্রকাশ পায়। আর তারই উপর কবিত্বের রঙ আর লালিত্য মিশিয়ে রবীন্দ্রনাথ নিজস্বনিয়মে কথ্য ভাষাকে দেন কাব্যের মাধুর্য। কথ্য ভাষার এই দুই মহান গদ্যশিল্পীর সংগে আবির্ভূত হলেন আর একজন গদ্যলেখক অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। প্রধানত চিত্রশিল্পী হলেও গদ্য রচনায় ইনি যে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে গেছেন তা কেবল মুক্তোর মূল্যে পাওয়া যেতে পারে। লেখনীই যেন তাঁর তুলির ভাষায় কথা বলে। কথায় তিনি ছবি আঁকেন। গদ্যভাষার এই উত্তরাধিকার নিয়ে আবির্ভূত হন কাজী নজরুল ইসলাম। রবীন্দ্রনাথের আভিজাত্য বৈঠকী ভাষার অমসৃণ শব্দ পরিহার করত সযত্ন প্রয়াসে। তিনি চলতি ভাষার মধ্যে প্রচলিত ইংরেজী শব্দকেও যথাসাধ্য বর্জন করে চলতে প্রয়াস পেতেন এবং সেই সংগে উদাহরণ উপমা দিয়ে ভাষাকে করে তুলতেন আকর্ষণীয়। প্রমথের ভাষায় ইংরেজী শিক্ষিত সমাজের নিত্য ব্যবহৃত ইংরেজী মিশোল ভাষার সাক্ষাৎ পাই আমরা, উদাহরণ পাই। কিন্তু উপমা তেমন পাই না। অবনীন্দ্রনাথে এই উপমা আমরা প্রায় লক্ষ্য করি এবং এর কারণ অবনীন্দ্রনাথ মূলত নির্বাক চিত্র-শিল্পের কবি। নজরুলের চিঠির ভাষাতে আমরা রবীন্দ্র-প্রমথ-অবনীন্দ্র এই ত্রয়ীর উপস্থিতি লক্ষ্য করি সেই সংগে তাঁর নিজস্বতা। অনুপ্রাস-প্রেমিক কবি গদ্যের মধ্যেও অনুপ্রাসের ব্যবহার করে নতুন ধরনের চমক সৃষ্টি করলেন, সেই সংগে মাঝে মাঝে আরবী-ফারসী শব্দের ব্যবহার। বলা বাহুল্য যেহেতু

ঘরোয়া শব্দে ও বৈঠকী ভাষায় আরবী-ফারসীর প্রভাব প্রবল সুতরাং প্রমথেব বৈঠকী ভাষাতে ঐ সব শব্দের ব্যবহার দৃষ্টি এড়ায় না। কিন্তু নজরুলের আরবী-ফারসী শব্দের ব্যবহার যে অন্য ধরনের আমরা আলোচনা প্রসংগে সে কথাও বলব।

পূর্ণাঙ্গ আলোচনা শুরুর পূর্বের ভূমিকায় আরও দুটি কথা বলব। নজরুলেব গদ্যভাষায় আরও দু'জন স্বনামধন্য সাহিত্যিকেব রক্ত মিশেছিল। এঁদের একজন বিবেকানন্দ অন্যজন প্যারিচাঁদ মিত্র। গদ্যভাষাব এঁরা কুশলী শিল্পী ছিলেন না। কিন্তু বিবেকানন্দের মধ্যে একটি তেজোদৃপ্ত পৌরুষ ছিল, ছিল উদার দৃষ্টিভঙ্গির মানবিক বোধ, আধ্যাত্মিক চেতনা এবং সমাজ-সচেতনা, সেই সংগে দেশপ্রেম ও মানব-প্রেমজনিত গভীর আবেগ। এই সমস্তের অনেকখানি নজরুলে বর্তেছিল। আর প্যারিচাঁদ মিত্র দিয়েছিলেন নজরুলকে জনগণের ভাষা থেকে শব্দ তুলে আনার গুপ্ত মন্ত্রণা। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মনোহর কিন্তু অতবল ভাষার পাশাপাশি প্যারিচাঁদ সাধারণের বোধগম্য এক বৈচিত্র্যময় ভাষা সৃষ্টির দ্বারোন্মোচন করেন। প্রকৃতপক্ষে এই ভাষাব মধ্যে দিয়েই বাংলা ভাষা ক্রমোন্নতির শীর্ষে ওঠার অবলম্বন পায়। এ জন্যে প্যারিচাঁদ নজরুলের সর্বাপেক্ষা অন্তরঙ্গ পূবসূরী। ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে নজরুল সর্বদা যে শুচিবায়ুকে অবলীলাক্রমে বর্জন করে চলতে পারতেন সেই শুচিবায়ুর দেয়ালটিকে প্রথম ভেঙেছিলেন প্যারিচাঁদ। এবং প্যারিচাঁদ তাঁর 'আলালের ঘরের দুলাল' গ্রন্থে 'ঠকচাচা' ও 'বাহুল্যে'র মুখে মুসলমানের গদ্যভাষার কিছুটা রূপের আভাষ দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে নজরুলের গদ্যে কখনও কখনও এর মার্জিত শুদ্ধ সাহিত্য ভাষার রূপ সুন্দরভাবে শিল্প-সুষমায় রূপলাভ করে।

এই প্রবন্ধে আমরা নজরুলের চিঠির গদ্যভাষা নিয়ে আলোচনা করব। কিন্তু তার আগে তাঁর সাহিত্যের গদ্যভাষার কিছু আলোচনা করে নিলে ভালো হয় বলে মনে করি। নজরুলের এই গদ্য সম্পর্কিত আলোচনায় আমাদের প্রথমাবধি একটি কথা গভীরভাবে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, নজরুল ইসলাম স্বভাবত কবি। এবং তাঁর গদ্যে কোন-না-কোন ভাবে এই কবির আবেগ মিশে আছে এবং সেই সংগে তাঁর কল্পনা—যে কল্পনা ভিন্ন

কোন সুন্দর শিল্পই সৃষ্ট হতে পারে না—যার উল্লেখ আমি পূর্বে করেছি। সাহিত্যজীবনের শুরুতেই নজরুল গদ্য লেখার চর্চায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তাঁর প্রথম প্রকাশিত লেখাটি ছিল একটি গল্প : 'বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী'। এই প্রথম গল্পেই নজরুলের গদ্যের একটি স্বতন্ত্র চেহারা ধরা পড়েছিল। এই প্রথম লেখাতেই সাহিত্যিকের জাদুকরী প্রতিভার সোনালী পরশ লেগেছিল। একটু নমুনা বোধ হয় এখানে তুলে ধরা যেতে পারে :

> কি ভায়া! নিতান্তই ছাড়বে না? একদম এঁটেল মাটির মত লেগে থাকবে? আরে, ছোঃ! তুমি যে দেখছি চিটে গুড়ের চেয়েও চামচিটেল! তুমি যদিও হচ্ছ আমার এক গ্লাসের ইয়ার, তবুও সত্য বলতে কি, আমার সে সব কথাগুলো বলতে কেমন যেন একটা অস্বস্তি বোধ হয়। কারণ খোদা আমায় পয়দা করবার সময় মস্ত একটা গলদ করে বসেছিলেন, কেননা চামড়াটা আমার করে দিলেন হাতীর চেয়েও পুরু, প্রাণটা করে দিলেন কাদার চেয়েও নরম। আর কাজেই দু'চার জন মজুর লাগিয়ে আমার এই চামড়ায় মুগুর বসালেও আমি গোঁপে তা দিয়ে বলব, "কুচ পরওয়া নেই", কিন্তু আমার এই 'নাজোক' জানটায় একটু আঁচড় লাগলেই ছোট মেয়ের মত চেঁচিয়ে উঠবো! তোমার 'বিরাশি দশ আনা' ওজনের কিলগুলো আমার এই স্থূল চর্মে স্রেফ আরাম দেওয়া ভিন্ন আর কোন ফলোৎপাদন করতে পাবে না, কিন্তু যখনই পাকড়ে বস, "ভাই তোমার সকল কথা খুলে বলতে হবে" তখন আমার অন্তরাত্মা ধুক ধুক করে উঠে, পৃথিবী ঘোরার ভৌগোলিক সত্যটা তখন হাড়ে হাড়ে অনুভব করি। ......
>
> "হাঁ, আমার ছোটকালের কোন কথা বিশেষ ইয়াদ হয় না। আর আবছায়া রকমের একটু একটু মনে পড়লেও তাতে তেমন কোন রস বা রোমান্স নেই। সেই সরকারী রাম-শ্যামের মত পিতামাতার অত্যধিক স্নেহ, পড়ালেখায় লবডঙ্কা, ঝুলঝাপপুর ডাণ্ডাগুলি খেলায় 'দ্বিতীয় নাস্তি', দুষ্টামি নষ্টামিতে নন্দদুলাল কৃষ্ণের তদানীন্তন অবতার, আর ছেলেদের দলে অপ্রতিহত প্রভাবে আলেকজাণ্ডার দি গ্রেটের ক্ষুদ্র সংস্করণ। আমার অনুগ্রহে ও নিগ্রহে গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা

বিশেষ খোশ ছিলেন কিনা তা আমি কারুর মাথায় হাত দিয়ে বলতে পারি না ! তবে সকলেই আমার পরমার্থ কল্যাণের জন্য যে সকাল-সন্ধ্যা প্রার্থনা করত সেটা আমার তীক্ষ্ণ শ্রবণেন্দ্রিয় না-ওয়াকেফ ছিল না।"

নিবিষ্টভাবে দেখলে উপরোদ্ধৃত ভাষায় কয়েকটি জিনিস চোখে পড়বে :

১। একটি চটুল ভঙ্গি। ২। আরবী ফারসী শব্দের ব্যবহার। ৩। ধ্বন্যাত্মক শব্দ, ৪। ইংরেজী শব্দের ব্যবহার ৫। পুরাণ প্রয়োগ। এই সব কিছু ছাড়াও ওর মধ্যে একটা তোড়ের সৃষ্টি হয়েছে —একটা নির্বাধ গতির, একটা স্রোততাড়িত বেগের। ইতিপূর্বে ঠিক এই ধরনের বেগবান ভাষা বাঙলা সাহিত্যে দেখা যায়নি। এই শব্দটি পুরোনো, এই শব্দটি অন্ত্যজ, অকুলীন, এই শব্দটি অসংস্কৃত, বিদেশী, শ্রেণীশাসিত, ভেদবুদ্ধিজাত শব্দবর্জনকারী সেই মনোভাব না থাকাতে শব্দ হাতড়ে ফেরার কোন দুরূহ প্রয়াস ওর মধ্যে ঠাঁই পায়নি। নজরুল বুঝেছিলেন ভাষা শব্দ বর্জনে সমৃদ্ধ হয় না, শব্দ অর্জনে সমৃদ্ধ হয়। আর সেই সঙ্গে এ-কথাও স্বীকার্য যে, অকুলীন শব্দ ব্যবহারে ভাষার সতীত্ব হানি হয় না, যদি তার প্রয়োগ হয় অভাবিতভাবে আকর্ষণীয়।

"বাংলা সাহিত্যে প্যারিচাঁদ মিত্রের স্থান" শীর্ষক প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন :

> গদ্যে ভাষার ওজস্বিতা এবং বৈচিত্র্যের অভাব হইলে ভাষা উন্নতি-শীলা হয় না। কিন্তু প্রাচীন প্রথায় আবদ্ধ এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষার মনোহারিতায় বিমুগ্ধ হইয়া কেহই আর কোন প্রকার ভাষায় রচনা করতেই ইচ্ছুক বা সাহসী হইত না। কাজেই বাংলা সাহিত্য পূর্ববৎ সংকীর্ণ পথেই চলিল।

বঙ্কিমচন্দ্রের মতে এই সংকীর্ণতা থেকে প্যারিচাঁদ ভাষাকে মুক্তি দিয়েছিলেন। প্যারিচাঁদের 'আলালের ঘরের দুলালে'র ভাষাকে তিনি বাংলা ভাষার আদর্শ বলেননি। কিন্তু সেই সংগে এ কথা বলেছিলেন যে, যে ভাষায় লিখিত "সাহিত্যের পাঁচ সাতজন মাত্র অধিকারী সে সাহিত্যের জগতে কোন প্রয়োজন নাই।"

প্যারিচাঁদের ভাষা সাহিত্যের আদর্শ ভাষা হতে পারেনি।. তার কারণ ভাষাকে সার্বজনীন করে তোলার হিতবুদ্ধি এবং শুভ্র কল্পনা প্যারিচাঁদের থাকলেও শব্দ ব্যবহারের ওস্তাদী কৌশল প্যারিচাঁদের আয়ত্তে ছিল না। তাঁর লেখক প্রতিভা এবং কবি প্রতিভাও যে না ছিল তা নয়। কিন্তু সে সঙ্গে মহৎ শিল্পীর জাদুকরী ওস্তাদী ছিল তাঁর অনায়ত্ত। মোট কথা পানিতে নামার সাহসের জন্যই তাঁর কৃতিত্ব। সাঁতারে সাগর পাড়ি দেওয়ার কৃতিত্ব তাঁর নয়। এই দক্ষতা প্রথমে নজরুল ইসলাম দেখালেন এবং "বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী"র ভাষাই প্রমাণ করে প্যারিচাঁদের অনায়ত্ত কৌশলটি প্রকৃত ওস্তাদের হাতে পড়লে তার যথার্থ রূপ কেমন হতে পারে।

উপরের যে বিশিষ্ট বিষয়গুলো নজরুলের উদ্ধৃত ভাষায় পরিলক্ষিত হয় সেগুলো ছাড়া আরও একটি অভিনব জিনিস তিনি পূর্ণ দক্ষতার সংগে প্রয়োগ করেছেন। আর তা হল 'প্রবাদ', "বাগধারা" এবং স্মরণোদ্ধৃতি। এই স্মরণোদ্ধৃতি ব্যবহারের একটি অপূর্ব নিদর্শন এখানে দেখানো যেতে পারে :

> চপেটাঘাত, মুষ্ট্যাঘাত, পদাঘাত ইত্যাদি চার হাত পায়ের যত রকম আঘাত আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়েছে, সব যেন রবিবাবুর গানের ভাষার "শ্রাবণের ধারার মত" পড়তে লাগল আমার মুখের পরে পিঠের পরে।

বলা বাহুল্য প্যারিচাঁদ "আলালের ঘরে দুলালে" মুসলমানদের চরিত্রের মুসলমানী বাংলার ভাষা প্রয়োগ করেছিলেন। কিন্তু সেগুলো ছিল কলকাতা অঞ্চলের খোট্টা মুসলমানী ভাষা, সেগুলো আদৌ বাংলা ছিল না। একটা নমুনা নিয়ে দেখানো যেতে পারে। "ঠকচাচা" *চরিত্রের একটি সংলাপ :*

> কেতাবীবাবু সব বাতাতেই ঠোকর মারেন। মালুম হয় এনার দুসরা কোই কামকাজ নাই। মোর ওমর বহুত হল, নূর ভি পেকে গেল, মুই ছোকরাদের সাত হর ঘড়ি তকবার কি করব? কেতাবীবাবু কি জানেন এ শাদীতে কেতনা রোপেয়া ঘরে ঢুকবে?

এ ভাষা উর্দু ত নয় বাংলাও নয়। এ উর্দু ভাষীর বাঙলা, বাঙলা ভাষী মুসলমানদের বাংলা না। সুতরাং প্যারিচাঁদের ঐ ভাষা নাট্য চরিত্রের ভাষা—নাট্যরস সৃষ্টির জন্যে এ বাক্য গঠন—সাহিত্যসৃষ্টির জন্য নয়। উর্দু 'দুসরা কোই কাম কাজ নেহি' কে সামান্য বদল করে প্যারিচাঁদ "দুসরা কোই কাম কাজ নাই" করেছেন। কিন্তু শুধু ক্রিয়া বদলে ভাষার চেহারা বদলানো যায় না এবং বাংলার মুসলমানরা ঐ ভাষায় আদৌ কথা বলেন না। তাঁরা যে ভাষায় কথা বলেন তারই প্রথম নমুনা নজরুল দিতে পেরেছিলেন. "খোদা আমায় পয়দা করবার সময় মস্ত একটা গলদ করে বসেছিলেন।' কিন্তু বলা বাহুল্য এ শুধু বাঙালী মুসলমানের একমাত্র ভাষা নয়—এ বাঙলা ভাষা। তাই আমরা প্রমথ চৌধুরীকেও লিখতে দেখি "কারণ তাঁর অঙ্গুলা ছিল মেজরাপ মণ্ডিত।"

শুধু প্রমথ কেন রবীন্দ্রনাথের ভাষা থেকে কি উদাহরণ দেওয়া শক্ত। রবীন্দ্র-সাহিত্যের যে-কোন একটা পৃষ্ঠা থেকে এমনি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে : "যখন প্রতিদিন মেহন্নৎ করিয়া আমরা হয়রান হই তখন কি সেই ভাষায় আমাদের হিন্দুভাবের কিছুমাত্র বিকৃতি ঘটে।"

আর অবনীন্দ্রনাথের সেই ছবির কথার ভাষায় ধরা পড়েনি কি আরবী-ফারসী শব্দ : "তেমনি ছবির ভাষা অভিনয়ের ভাষা এ সবেও দ্রষ্টার চোখ দোরস্ত না হলে মুস্কিল।" এ ভাষা'ত অবনীন্দ্রনাথেরই। সুতরাং আরবী-ফারসী শব্দ ব্যবহারে বাঙলা ভাষা মুসলমানী বাঙলা হয় না আরবী-ফারসী শব্দ ব্যবহারে বাঙলা খাঁটি বাঙলা হয়ে ওঠে যা কুলীনের হেরেমের বেড়া ভেঙে বাঙলার প্রকৃত জনসমাজের আত্মীয়তা লাভের অধিকারী হয়।

তবু পার্থক্য আদৌ নেই এমন কথা বলা সত্যকে অস্বীকার করা। মৌখিক ভাষার মধ্যে প্রচুর আরবী-ফারসী থাকলেও হিন্দুর চেয়ে বাঙলার মুসলমান যে তা একটু অধিক মাত্রায় ব্যবহার করেন সে কথা বলা বাহুল্য। এবং এ শুধু 'আল্লা' 'খোদা' এমনি ধর্মীয় শব্দ নয় সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানের কিছু শব্দ এর সংগে জড়িত। নজরুলের দু'টি গান থেকে এর উদ্ধৃতি দিয়ে বোঝানো যাক :

১. আজকে **শাদী** বাদশাজাদী পান করো শিরাজী।

২. ঢাল হৃদয়ের তোর **তশতরীতে**

শিরণী তওহিদের

তাব **দাওয়াত কবুল** করবেন **হজরত**

হয় মনে উমীদ।।

উদ্ধৃত পংক্তিসমূহের মধ্যে 'শাদী', 'তশতবী', 'তওহিদ', 'শিরণী', 'দাওযাত', 'কবুল', 'হজরত' শব্দগুলি মুসলমান সমাজেই সমধিক পবিচিত। সুতরাং এটাকে আলাদাভাবে বাঙালী মুসলমান সমাজের ভাষা বলা যেতে পাবে। নজরুল ইসলাম অপূর্ব দক্ষতায় একেই বাঙলা সাহিত্যেব ভাষায় উন্নীত করে গেছেন।

এখানে বলা আবশ্যক সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে সাহিত্য ভাষাব জন্ম দেওযা যেতে পাবে কিন্তু তাতে সমাজের রূপ ফুটে ওঠে না —সে হয অসামাজিক কুলীন ভদ্রলোকের ভাষা--সমাজের মানুষের সংগে তাব সত্যিকাব সম্বন্ধ নেই। নজরুল সমাজের অন্তস্তলে ছিলেন বলেই তাঁব সমাজের ভাষা তাঁর কণ্ঠে ফুটে উঠেছিল।

মুসলমান সমাজে পবিচিত অমনি শব্দের ব্যবহাব তাঁব গদ্য থেকেও উদ্ধার করে দেখানো যেতে পারে। এখানে কযেকটি উদ্ধৃতি দেওযা গেল :

১. দেখ, কাল **জুম্মা**। মুল্লুকের বাদশা আসছেন। এখানে **নামাজ** পড়বার সময় তোমরা **ইমামাত** করতে বলবেন।

২. **জুম্মার নামাজ** হ'চ্ছে। **এমাম** হ'যেছেন **কাজী সাহেব**। - [সালেক]

৩. তা আমার সে **দেরেগ** মাথা **রোনা** শুনে আর কি হবে **বহিন**। **দোওয়া** করি তুই চির এয়োতি হ। – [স্বামীহাবা]

৪. লোকে বলে, তাঁরা শুতেন হীরার পালঙ্কে, আর খেতেন লাল **জওয়াহের**। আর **কবরস্থানের** পশ্চিম দিকে ঐ যে **পীর সাহেবের দরগা** ওরই **বদোয়ায়** নাকি এমন সোনার শহর পুড়ে ঝাও হ'য়ে যায়।— [স্বামীহারা]

৫. **মামানি, নানী, মামু, খালাদের** কোল থেকে নামতে পেতাম না। – [বাঁধনহারা]

৬. **ভাবিজী** তাড়াতাড়ি তাল **শরবৎ** ক'রে দেন, মাথায় ঠাণ্ডা **পানি** ঢেলে তেল দিয়ে পাখা ক'রে দেন তবে তখন বেচারীর ধড়ে **জান** আসে। – [বাঁধনহারা]

৭. কোন **খাতুনের** মুখ-সরোজ তোর হিয়ার সরসীতে এমন চির-ন্তনী হয়ে ফুটেছে। – [বাঁধনহারা]

৮. **খালাজির পাক কদমানে** হাজার হাজার **আদাব** দিবি।
– [বাঁধনহারা]

এমনিভাবে ধর্মীয় শব্দ আল্লাহ, খোদা, খোদাতায়ালা, বেহেশত, জান্নাত, নামাজ, রোজা, বিসমিল্লাহ, জায়নামাজ, মোল্লা, মৌলবী; আত্মীয় সম্বোধনসূচক শব্দ আম্মাজান, বাবাজান, ভাইজান, বুবু, ভাবী সাহেবা, ভাই সাহেব, ফুপু, খালা, দাদা, এবং সংস্কৃতিগত শব্দ আদব, তমিজ, সালাম, দোওয়া প্রভৃতি তিনি অসংখ্যবার ব্যবহার করেছেন— সম্ভবত মুসলিম সামাজিক চিত্রকে তুলে ধরার জন্য।

নজরুলের চিঠি লেখার নৈপুণ্য আমরা তাঁর 'বাঁধনহারা' পত্রোপন্যাসে প্রথম দেখি। এখানে তিনি মুসলমান সমাজের চিত্র এঁকেছেন সে জন্যেই এই পত্রগুচ্ছের মধ্যে অসংখ্য আরবী-ফারসী শব্দ ত এসেছেই সেই সংগে মুসলমান সমাজে প্রচলিত পুঁথির কাহিনী থেকে এসেছে উদাহরণ। অবলীলাক্রমে তিনি একের পর এক মুসলিম পুরাণ কাহিনীর উল্লেখ করে গেছেন। এখানে মুসলিম সমাজে প্রচলিত পৌরাণিক কাহিনী, রূপকথা ও ধ্রুপদী সাহিত্যের কয়েকটি উল্লেখের উদ্ধৃতি দেওয়া যেতে পারে:

১. রাজকন্যা স্বপ্নরাণী পরীস্থানের বাদশাজাদী, ঘুমের দেশের আলোককুমারী বা ঐ কেসেমেরই যত উদ্ভট সুন্দরীদের রাঙা চরণের আশা যদি থাকে তোর, তবে দ্বিতীয় ভাগের সুবোধ বালকের মতন ওসব খামখেয়ালী এক্ষুণি ছেড়ে দে, ছেড়ে দে। গোলেবকাওলিতেই লেখা থাক বা আরব্য উপন্যাসের উজিরজাদীই বলুন—কিন্তু কই কাউকে ত

সত্যি সত্যিই কোন পাখনাওয়ালী পরী এসে উড়িয়ে নিয়ে গেছে বলে শুনলাম না।

২. তোর সজল, কাজল আঁখি প্রেয়সী যে কোন কোকাফ মুল্লুকের পরীজাদী, তাই ভেবে আমি কোকাফ মুল্লুকের পরী আকুল হচ্ছি।

৩. আমার সবচেয়ে আশ্চর্য লাগলো যে, আলবোর্জ পাহাড় ধ্বংসী **রুস্তমের** গোর্জের মত এই মস্ত ঠ্যাং দু'টো বয়ে এই মান্ধাতার আমলের পুরানো বুড়ী এত দূর এল কি করে।'

৪. যুদ্ধ থেমে গেছে। আর্মিসটিস। শান্তি! মহাপ্লাবনের পর পিতা **নুহ** যেন ধ্যানে বসেছেন।

কিন্তু একা মুসলিম পুঁথি পুরাণ রূপকাহিনীর উল্লেখই নয়—হিন্দু পুরাণও সমানভাবে তিনি ব্যবহার করেছেন। বিদেশাগত মুসলমানের সংগে এতদ্দেশীয় ধর্মান্তরিত মুসলমানের যোগাযোগের ফলে একটা মিশ্র সংস্কৃতির সৃষ্টি হয়েছিল ভারতবর্ষের মত বাংলাদেশেও। হিন্দু সমাজ মুসলিম সমাজের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সংগে পরিচিত না থাকলেও ধর্মান্তরিত মুসলমান পরিত্যক্ত সমাজের ঐতিহ্য সম্পর্কে ছিল সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল। একই সংগে তারা দুটি সংস্কৃতির উত্তরাধিকার অর্জন করে। এরই সঠিক চিত্র নজরুলের কাব্যের মত তাঁর গদ্য সাহিত্যেও ধরা পড়ল। তাঁর চিঠিপত্রেও তার উল্লেখ ঘন ঘন চোখে পড়ে।

১. সত্যি সত্যিই বোধ হয় **অহল্যা** নারী চিরকাল পাষাণী থাকতে পারে না।— [বাঁধন হারা]

২. **রাবণ রামের সীতাকে** হরণ করেছিল এইটেই লোকে শিখে রেখেছে, কিন্তু সীতা রামকে নিয়ে দেশান্তরী হয়েছে এমনি একটি মহাকাব্য লিখবার বাল্মীকি কেউ নেই।— [বাঁধন হারা]

৩. ভাগ্যি সেই সময় আমাদের সেই বেঁড়ে বেড়ালীটা তার নাদুস নুদুস বাচচা চারটে নিয়ে সপরিবারে আমার কামরায় **দুর্গতিনাশিনীর** মত এসে হাজির হল।

৪. সে আবার সংসারী হবে, তোর কিরণ-ছটায় তার সজল মেঘলা জীবনে ইন্দ্রধনুর সুষমা-মহিমা আঁকা যাবে—ও' সে কি দৃশ্য! বেহেশ্‌তে হুর গেলেমান বা স্বর্গে অপ্সরী কিন্নরী বলে কোন প্রাণী থাকলে এ খোশ-খবরের 'মোজদা' তারা স্বর্গের দ্বারে দ্বারে বিলিয়ে এসেছিল।

পবান প্রযোগের সংগে লোক-সাহিত্য থেকে, গ্রাম্য সমাজ থেকে বহু প্রচলিত গ্রাম্য প্রবাদ ও বাগধারা তিনি স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করেছেন। "বাঁধন হারা" থেকে কয়েকটি উদাহরণ :

১. এঁরাই আবার অর্ধচন্দ্র পেয়ে চৌকাঠের বাইরে এসে, আদর আপ্যায়নের ত্রুটি দেখিয়ে বে-ইজ্জতির অজুহাতে চক্ষু দু'টো উষ্ণ কটাহের মত গরম করে গৃহস্বামীর ছোটলোকত্বের কথা তারস্বরে যুক্তি প্রমাণ সহ দেখাতে থাকেন আর সঙ্গে সঙ্গে ইজ্জতের কান্নাও কাঁদেন। আহা! লজ্জা করে না এ সব বেহায়াদের? এ যেন '**চু'র কে চুরি উল্টো সিনাজুরি।**' থাক এসব পরের নিন্দে চর্চা, এখন বুঝলি, মেয়েদের এই '**ধান ভানতে শীবের গীত**' এক কথা বলতে গিয়ে—আরো সাত কথার অবতারণা আর করা গেল না। কথায় বলে "**অসৎসঙ্গে যায় মনে।**"

২. যাক বোন, আমাদের এ সব কথা নিয়ে, অধিকার নিয়ে বেশী ঘাঁটা-ঘাটি করতে গিয়ে শেষে কি "**আম্বরে বাঘ---না গলায় লাগ**" এর মত কোন সমাজপতির এজলাশে পেশ হব গিয়ে।

৩. কথায় বলে "**বাজায় জানে ছেলের বেদন।**" অবিশ্যি আমিও যদিচ এখনো তোদের মতই ন্যাড়া বোঁচা, কিন্তু আমার মন'ত আর বাঁজা নয়!

৪. কথ্যটা নিশ্চয়ই তোর মতন চুলবুলে "**কাজের মামুদ**"এর কাছে কাঁচা ছুড়ির মুখে পাকা বুড়ীর কথার মত বেজায় বেখাপ্পা শোনালো।

এমনিভাবে 'আপনার ভিটেয় কুকুর রাজা', 'যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা', 'মা মরে মাসি ঝুরে', 'ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করা', 'নিগুণো সাপের কুলোপনা ফণা', 'গোদের উপর বিষফোঁড়া', 'সজল সজন মিল গিয়া ঝুট পড়ে বরিয়াত', 'নিমুমুখো ষষ্ঠী, ছেলে খান দশটি', 'কপালে

নেই ঘি ঠক ঠকালে হবে কি' প্রভৃতি প্রবাদ ও বাগধারার ব্যবহারে গ্রাম্য সমাজের ঘরোয়া পরিবেশটিকে চিঠির ভাষায় ফুটিয়ে তুলেছেন নজরুল। সংস্কৃতিবান সাহিত্যিকের পক্ষে এগুলো ব্যবহার করতে হয়ত কুণ্ঠা জাগত, কিন্তু স্মরণ রাখা দরকার ঐ সমাজের সত্যিকার চেহারাটা কোন সুমার্জিত সংস্কৃত শব্দে সঠিকভাবে ছবির মত সুন্দর হয়ে প্রকাশ পেত না।

নজরুল পল্টনে যোগ দিয়েছিলেন। সাধারণত মিলিটারী ক্যাম্পে নানা দেশের ভাষা অবাধে ব্যবহৃত হয়। এরই সংগে থাকে টেকনিকাল সৈনিক ভাষা। 'রিক্তের বেদন' এবং 'বাঁধন-হারা'য় সেই ভাষা ব্যবহার লক্ষ্য করি।' দু'চারটি উদাহরণ:

১. এখানে কথায় কথায় প্রত্যেক কাজে হাবিলদারজীরা হাঁক পাড়ছেন, 'বিজলীকা মাফিক চটক হও, শাবাস জোয়ান'।

২. কাল প্রাতে দশ মাইল রুট মার্চ বা পায়ে হণ্টন।

৩. তার উপর আমাদের দয়ালু নকীব (বিউগ্লার) শ্রীমান গুপীচন্দর এই মাত্র 'নো প্যারেড বাজিয়ে গেল।'

৪. গানটা ক্রমে "আঙ্কোর প্লীজ" "ফিন জুড়ো" প্রভৃতির খাতিরে দু'তিনবার গীত হ'ল। তার পর যেই এসে সমের মাথায় ঘা পড়েছে, অমনি চিত্র-বিচিত্র কণ্ঠের সীমা ছাড়িয়ে একটা বিকট ধ্বনি উঠল, "দাও গরুর গা ধুইয়ে।"

ঐ ধরনের বিশিষ্টার্থক শব্দ সমষ্টির ব্যবহার ছাড়া সৈনিক জীবনের চিত্রটি যথাযথভাবে রূপ লাভ করত না। এখানে বলা দরকার সৈন্য জীবনের সংগে সংগে নজরুলের সংগীত-চর্চাও সমানে চলেছিল। এবং ঐ সময়ের মধ্যে তিনি সংগীতশাস্ত্রেও বিশেষ পারদর্শী হয়ে উঠেছিলেন তা সংগীত শাস্ত্রোক্ত তাঁর শব্দ ব্যবহারে প্রকাশ পেয়েছে। আমরা "রিক্তের বেদন" এবং "বাঁধন হারা"য় এই সংগীতশাস্ত্রীয় শব্দগুলির সুষ্ঠু ব্যবহার লক্ষ্য করি। দু'চারটি উদাহরণ :

১. আমি বুক ফুলিয়ে চুল দুলিয়ে মনটাকে খুব এক চোট বকুনি দিয়ে **আনন্দ-ভৈরবী** আলাপ করতে করতে ফিরলুম। এমন সাধা গলাতেও

আমার সুরটার **কলতান** শুধু হোঁচট খেয়ে লজ্জায় মরে যাচ্ছিল। আমার কিন্তু লজ্জা হচ্ছিল না। আমার বন্ধু **তানপুরাটা** কোলে করে তখন **শ্রীরাগ** ভাঁজছেন দেখলুম। তিনি হেসে বললেন, "কি য়ুসোফ, এ আসন্ন সন্ধ্যা বুঝি তোমার **আনন্দ-ভৈরবী** আলাপের সময়? তুমি যে দেখছি অপরূপ বিপরীত। [মেহের নেগার : রিক্তের বেদন]

২. ওস্তাদজী আঙ্গুর-গালা মদিরার প্রসাদে খুব খোশ-মেজাজে ঘোর দৃষ্টিতে আমার কাণ্ড দেখছিলেন। শেষে হাসতে হাসতে বললেন, "কি বাচ্চা তোর তবিয়ত আজ ঠিক নেই, না? মনের তার ঠিক না থাকলে **বীণার** তারও ঠিক থাকে না। মন যদি তোর বেসুরা বাজে, তবে যন্ত্রও বেসুরা বাজবে, এ হচ্ছে খুব সাচ্চা আর সহজ কথা।—দে আমি সুর বেঁধে দিই।" ওস্তাদজী বেয়াদব সুর-বাহারটার কান ধরে বার কতক মোলায়েম ধবনের **কানুটি** দিতেই সে শান্তশিষ্ট ছেলের মত দিব্যি সুরে এলো। সেটা আমার হাতে দিয়ে সামনের প্লেট হ'তে দু'টো গরম গরম শিক-কাবাব ছুরি দিয়ে ছাড়াতে ছাড়াতে তিনি বললেন, "আচ্ছা, একবার **বাগেশ্রী** রাগিণীটা আলাপ করত বাচ্চা। হাঁ,—আর ও সুরটা ভাঁজবার সময়ও হ'য়ে এসেছে। এখন কত রাত হবে। হাঁ, আর দেখ বাচ্চা, তুই গলায় আর একটু **গমক** খেলাতে চেষ্টা কর, তাহলেই সুন্দর হবে।" কিন্তু সেদিন যেন কণ্ঠ ভরা বেদনা। সুরকে আমার গোর দিয়ে এসেছিলুম ঐ ঝিলম দরিয়ার তীরের বালুকার তলে। তাই কষ্টে যখন অতি-তারের **কোমল-গান্ধারে** উঠলুম তখন আমার কণ্ঠ যেন দীর্ণ হয়ে গেল, আর তা ফেটে বেরুল শুধু কণ্ঠভরা কান্না। ওস্তাদজী দ্রাক্ষারসের নেশায় "চড় বাচ্চা আর **দু'পরদা পঞ্চমে**" বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গিয়ে সান্ত্বনা ভরা স্বরে কইলেন, "কি হয়েছে আজ তোর বাচ্চা? দে আমায় ওটা।" **বাগেশ্রীর** ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না ওস্তাদজীর গভীর কণ্ঠে সঞ্চরণ করতে লাগল **অনুলোমে বিলোমে** সাধা গলার **গমকে মীড়ে**! (মেহের নেগার : রিক্তের বেদন)।

৩. তখন ঝিলমের তীরে তীরে **ঝিঁঝিট** রাগিণীর ঝমঝমানি ভরে উঠেছিল [মেহের নেগার : রিক্তের বেদন]।

পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে এমনিভাবে তিনি প্রাচীন কবি থেকে শুরু করে তাঁর পূর্বসূরী অধুনিক রবীন্দ্রনাথের কাব্যের স্মরণীয় পদ উদ্ধৃত

ক'রে একটা নতুন ধরনের আমেজ দিলেন। হাফিজ উদ্ধৃত হ'ল, উদ্ধৃত হ'ল বিদ্যাপতি, জয়দেব, রবীন্দ্রনাথ, গ্রাম্য ছড়া এবং 'অজানা হিন্দী গীতিকারের প্রসিদ্ধ পংক্তি। দামী চুনী পান্না ও মুক্তার মত এগুলো ব্যবহৃত হতে লাগল ভাষার দেওয়ালের কারুকাজে। কয়েকটি উদ্ধৃতি :

১. আজ ভোর হ'তেই আমার পাশের ঘরে (কোয়ার্টারে) যেন গানের ফোয়ারা খুলে গেছে, মেঘ-মল্লার রাগিণীর—যার যত গান জমা আছে স্টকে, কেউ আজ গাইতে কসুর করছেন না। কেউ ওস্তাদী কায়দায় ধরছেন,—"আজ বাদরি বরিখেরে ঝম্ ঝম্।" কেউ কালোয়াতী চালে গাচ্ছেন,—"বঁধু, এমন বাসরে তুমি কোথায়।" এ উল্টো দেশে মাঘ মাসে বর্ষা, আর এটা যে নিশ্চয়ই মাঘ মাস ভরা ভাদর নয়, তা জেনেও একজন আবার কবাটি খেলার উঁচু ধরাব সুরে গেয়ে যাচ্ছেন,—'এ ভরা বাদর, মাহ ভাদর, শূন্য মন্দির মোর!' সকলের শেষে গম্ভীর মধুর কণ্ঠ হাবিলদার পাণ্ডে মশাই গান ধরলেন—"হেরিয়া শ্যামল ঘন নীল গগনে, সজল কাজল আঁখি পড়িল মনে।"

২. আমি বললুম, "তুমিই গাও, আমি শুনি"। সে গাইলে :

"ফারাকে জানাঁ সে হামনে
সাকীলোহু
পিয়া হেয় শরাব করকে
তপে আলম নে জিগর
কো ভূনা উয়ো—
হামনে খায়া-কাবাব
করকে।

৩. তোরও নিশ্চয় মুখে ব্যথা ধরবে পড়তে। এইবার—"শ্রান্ত বায়ে ক্লান্ত কায়ে ঘুমে নয়ন আসে ছেয়ে।"

৪. তোমার দেওয়া 'উদল জলদল কলরব' ভাবটা তার আজকাল একেবারে নেই।

৫. যাদের ঠোঁটের কোণে একটু হাসির রেখা দেখে আমরা আনন্দে 'দেহিপদপল্লবমুদারম্' বলে হুমড়ি খেয়ে পড়ি।

৬. বাড়ীর পাশে তখন একপাল ন্যাংটা ছেলে জলে ভিজতে ভিজতে গাইছিল :

"রোদে রোদে বিষ্টি হয়
খ্যাঁকশিয়ালের বিয়ে হয়।"

বলা বাহুল্য এসব কিছুই সাহিত্য রস-সৃষ্টির জন্যে যে ব্যবহৃত হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই এবং এগুলো তাঁর গদ্যে একটা নতুন মেজাজ, নতুন স্বাদ এনে দিয়েছিল। বস্তুত তাঁর গদ্যে প্রবল আবেগ শুধু নয়, মাঝে মাঝে উচ্ছ্বাসের প্রাবল্যও লক্ষণীয়। কিন্তু একটা আন্তরিকতা একটা মর্মস্পর্শী অনুভূতি ওরই সমান্তরালে হৃদয়ের দরোজায় আকুল আঘাত হেনে যায়। 'রিক্তের বেদন' থেকেই আমরা তাঁর গদ্যে একটা দর্শনীয় নাটকীয় ভাব লক্ষ্য করি। এই কৌশলটা তাঁর অন্যতম ইন্দ্রজাল বলে আমার ধারণা। পাঠকের মনে একটা আকস্মিকতার চমক দিয়ে তাকে কিছুক্ষণ যেন হতচকিত রাখে এই ধরনের বাক্যরাশি :

১. আঃ! একি অভাবনীয় নতুন দৃশ্য দেখলুম আজ! জননী জন্মভূমির মঙ্গলের জন্য যে-কোন অদেখা দেশের আগুনে প্রাণ আহুতি দিতে একি অগাধ অসীম উৎসাহ নিয়ে ছুটেছে তরুণ বাঙালিরা, আমার ভাইরা! [রিক্তের বেদন]

২. মা! মা! কেন বাধা দিচ্ছ? কেন এ অবশ্যম্ভাবী একটা অগ্ন্যুৎপাতকে পাথর চাপা দিয়ে আটকাবার বৃথা চেষ্টা করছ? আচ্ছা মা! তুমি বি. এ. পাশ করা ছেলের জননী হতে চাও, না বীর মাতা হতে চাও? নিঝুম ঘুমের আলস্যের দেশে বীর মাতা হবার মত সৌভাগ্যবতী জননী কয়জন আছেন মা? তবে কোন্‌টি বরণীয় তা জেনেও কেন এ অন্ধ স্নেহকে প্রশ্রয় দিচ্ছ? গরীয়সী মহিমান্বিতা মা আমার! ছেড়ে দাও! ছেড়ে দাও! তোমার এ জন্ম-পাগল ছেলেকে ছেড়ে দাও। [নান্নুর : রিক্তের বেদন]

আমরা হঠাৎ গদ্যের ভাষা ছাড়িয়ে দৃশ্যকাব্য নাটকের কোন দৃশ্যের যেন মঞ্চে অভিনীত হতে দেখি। দেখি অকস্মাৎ নায়ক যেন স্বগতোক্তিতে ডুবে আছেন :

১. যাক, এতক্ষণে লোকের ভক্তিশ্রদ্ধার আক্রমণ হতে রেহাই পাওয়া গেল। [রেলপথে : রিক্তের বেদন]

২. মন। বুঝে নাও কি জন্যে এত ভক্তিশ্রদ্ধা। ভেবে নাও কি ঘোর দায়িত্ব মাথায় করছ। [ঐ : ঐ]

'আমরা জানি অনুপ্রাস, উপমা, উৎপ্রেক্ষা কিংবা উদাহরণ এসব অলঙ্কার হিসেবে কবিরা কাব্যে প্রয়োগ করেন। গদ্যে এর ব্যবহার বিরল। কিন্তু বড় লেখকেরা প্রয়োজন বোধে গদ্যেও এ সবের ব্যবহার করেন গদ্যকে আকর্ষণীয় করার জন্যে, পাঠককে বক্তব্য বিষয়কে সুস্পষ্ট ভাবে, সুন্দর ভাবে বোঝানোর জন্যে।' এ ছাড়া মানুষের মন সৌন্দর্যাভিলাষী। কথার মধ্যে তাই রসের সন্ধান পেলে কথাকে মানুষ তৃপ্তিদায়ক খাদ্যবস্তুর মত গ্রহণ করতে আগ্রহী হয়। মনে রাখা দরকার 'লোকে মিষ্টি পছন্দ করে বলে দোকানী যেখানে সেখানে অগোছালো ভাবে মিষ্টি ছড়িয়ে রাখে না—সাজিয়ে রাখে। গদ্যেও এই অলঙ্কার সাজের মত।' এখানে নজরুল কি ভাবে চমৎকার উপমা, উৎপ্রেক্ষা ও অনুপ্রাসের ব্যবহার করেছেন তার কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া গেল :

অনুপ্রাস

১. সে ঝরণার মত ঝরঝর করে হাসির ঝরা ঝরিয়ে বললে, "আচ্ছা, তুমি কবি, না চিত্রকর।"

২. আবার তার মুখে যেন কে এক থাবা আবির ছড়িয়ে দিলে।

৩. সে কুটীর কোন নিকুঞ্জের আড়ালে, কোন তড়াগের তরঙ্গ মর্মরিত তীরে?

উপমা

১. পাকা তবলচির মত রেলগাড়িটা কি সুন্দর কারফা বাজিয়ে যাচ্ছে।

২. শিশির-বিন্দুর মত সুন্দর কয়েকটি বুভুক্ষু বালিকা ফোরাতের এক হাঁটু জলে নেমে আঁজলা আঁজলা জল পান করে ক্ষুণ্নিবৃত্তির চেষ্টা করছে।

৩. চাঁদ এল মদখোর মাতালের মত টলতে টলতে চোখ মুখ লাল করে। এসেই সে জোর ক'রে সন্ধ্যাবধূর আবরু ঘোমটা খুলে দিলে। সন্ধ্যা হেসে ফেললে। লুকিয়ে দেখা বৌ-ঝির মত একটা পাখি বকুল গাছে থেকে লজ্জারাঙা হয়ে টিটকারী দিয়ে উঠল, ছি,ছি।"

উৎপ্রেক্ষা

১. বাপরে বাপ, ওরা যেন চিলের সঙ্গে উড়ে ঝগড়া করে। মেয়ে ত নয় যেন কাহাববা।

খানিকটা যমকের মত অনুপ্রাসের একটি চমৎকার ব্যবহার কিংবা এটাকে বলা যায় শব্দ শ্লেষ :

১. অতিথি স্বরূপ দু'একদিন থেকে যাওয়াই সঙ্গত কুটুম বাড়িতে। আমি এখানে অতিথি মানে বুঝি যাদের স্থিতি বড় জোর এক তিথির বেশী হয় না। যিনি অতিথির এই বাক্যগত অর্থের প্রতি সম্মান না রেখে শার্দূলের লুব্ধা মাতৃষ্বসার মত আর নড়তেই চান না, তিনি ত স-তিথি। [বাঁধন-হারা]

বলা আবশ্যক একদিকে যেমন কবিত্বপূর্ণ গদ্য লেখায় নজরুল বিস্ময়কর কৃতিত্বের দাবিদার তেমনি শ্লেষাত্মক গদ্য রচনায়ও আশ্চর্য দক্ষতার অধিকারী। "বাঁধন-হারা"র মাহবুবার পত্রে এই শ্লেষের আমরা প্রথম সাক্ষাৎ পাই। এই শ্লেষের ভাষার রূপের কিঞ্চিৎ পরিচয় এখানে দেওয়া যাক :

ঐ কি বলে না, "আপনার ভিটেয় কুকুর রাজা" কুকুরের স্বভাব হ'চ্ছে এই যে, যত বড়ই শত্রু হোক, আর পেছন দিকে হাঁটবার সময় নেজুড় যতই কেন নিভৃততম স্থানে সংলগ্ন করুক, যদি একবার সোঁ সোঁ করে নিজের দরোজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, তবে আর যায় কোথা! আরে বাপরে, বাপ! অমনি তখন তার বুক সাহসের চোটে দশ হাত ফুলে ওঠে। তাই তখন সে তার নেজুড় যতদূর সম্ভব খাড়া করে, আমাদের বাঙালী পুরুষ-পুঙ্গবদের মত তারস্বরে শত্রুকে যুদ্ধে আহ্বান করতে থাকে।

নজরুলের চিঠিপত্রের ভাষার আলোচনার পূর্বে সাধারণভাবে আমরা তাঁর গদ্য রচনার ভাষার মোটামুটি একটা পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করলাম। কেবল আর একটি দিকের উল্লেখ বাকী থাকাতে সেটিও এখানে সামান্য আলোচনা করে আমাদের মূল আলোচনায় ফিরে যাব।

কবিতার মত নজরুল বাংলা গদ্যে একটা রৌদ্ররসের জ্বালাময়ী দীপকের সুর সৃষ্টি করেছিলেন। ভাষার এই তীব্র ভীষণ রূপটি তাঁর

হাতে যতটা মনোহর সুন্দরভাবে প্রকাশ পেয়েছিল তাঁর আগে অন্য কারো হাতে বোধ হয় তেমনভাবে প্রকাশ পায়নি। অগ্নিবীণা শুধু তাঁর কাব্যদেবীর হাতেই সুন্দর হয়ে বাজেনি, তাঁর গদ্য দেবতার হাতেও দীপ্ত তেজে বেজেছিল। একটি মাত্র নমুনা :

> মাভৈঃ! মাভৈঃ!! ভয় নাই, ভয় নাই—ওগো আমার বিষমুখ অগ্নিনাগ-নাগিণীপুঞ্জ! দোলা দাও, দোলা দাও তোমাদের কুটিল ফণায় ফণায়। তোমাদের যুগ যুগ-সঞ্চিত কা -বিষ আপন আপন সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে ফেল। তোমাদের বিভূতিবরণ অঙ্গ কাঁচা বিষের গাঢ় সবুজ রাগে রেঙে উঠুক। বিষ সঞ্চয় কর, বিষ সঞ্চয় কর—হে আমার তিক্ত-চিত ভুজগ তরুণ দল! তোমাদের ধরবে কে? মারবে কে? যে ধরতে আসবে, তার হাড় মাংস খসে খসে পড়বে উগ্র বিষের দাহনে।...... বিষ সঞ্চয় কর, হে আমার হলাহল পুরবাসী কূট নাগ-নাগিণীকুল। এত বিষ এমন বিষ—যা শুধু জ্যান্ত অবস্থাতেই অত্যাচারকে দংশে মারবে না, মরবার পরও যে বিষ শাশ্বত সম-তেজা সম-উগ্র হয়ে থাকবে। নিদাঘ মধ্যাহ্নের তাপদগ্ধ রুদ্র বৈশাখী ঝড়ে ঝড়ে চিতায় ভস্মীভূত তোমাদের বিষ-স্ফুলিঙ্গ উড়ে বেড়াবে দিগন্তের কোলে কোলে—গৃহীর প্রাঙ্গণে প্রাঙ্গণে, বলদর্পীর মহলে মহলে। মা ডুকরে কেঁদে উঠবে, আর জ্বালায় শিশুপুত্র তার আর্তনাদ ক'রে ক'রে নীল হয়ে, শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়ে মাতৃক্রোড়ে মরতে থাকবে, যেমন কারবালায় কচি শিশু আসগর "তৃষ্ণা তৃষ্ণা" করে জহর-মাখা তীর খেয়ে মরেছিল। (বিষবাণী : রুদ্র-মঙ্গল)

১৯১৯ থেকে ১৯২১-২২ পর্যন্ত তিনি যে গদ্য সাহিত্য রচনা করেছেন এই তাঁর ভাষার সাধারণ রূপ। গভীর মনোযোগ দিয়ে দেখলে আমরা বুঝতে পারব, শুধু বাংলা কবিতা নয় বাংলা গদ্যের ভাষাও তাঁর হাতে কতটা ঐশ্বর্যশালী হয়ে উঠেছিল এবং ভাষার গতিশীলতায়, দীপ্ততায়, সর্বজনীনতায়, কাঠিন্যে ও লালিত্যে, ঋজুতায় ও লাবণিমায়, কল্পনা ও প্রাণময়তায় উপমা, উল্লেখ, দৃষ্টান্ত, অনুপ্রাস ও উৎপ্রেক্ষায় যে অভিনবত্ব লাভ করেছিল একটি ছোট্ট প্রবন্ধে তার স্বরূপ তুলে ধরা সহজ-সম্ভব নয়।

নজরুলের চিঠির ভাষা

সাহিত্যে পত্র-সাহিত্যের একটি ভিন্ন বিভাগ আছে। শুধু মাত্র চিঠির মাধ্যমে সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন পৃথিবীতে এমন দু'চারজন লেখকের নাম অবশ্যই করা যায়। ইংরেজী সাহিত্যে কুপার, কীট্স এবং বাংলায় রবীন্দ্রনাথ পত্র-সাহিত্যের অসামান্য শিল্পী। এই সঙ্গে নজরুল ইসলামের নামটিও আমি জুড়ে দিতে চাই। নজরুল ইসলামও পত্র-সাহিত্যের এক-জন অতুলনীয় স্রষ্টা।

নজরুলের চিঠিপত্রকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। বন্ধু-বান্ধবের কাছে লেখা চিঠি, পূর্বসূরি সাহিত্যিকের কাছে লেখা চিঠি, উত্তরসূরি কবি সাহিত্যিকদের কাছে লেখা চিঠি, সম্পাদকের কাছে লেখা চিঠি, অপরিচিত ভক্তদের কাছে লেখা চিঠি, মেয়েদের কাছে লেখা চিঠি, মুরুব্বী শ্রেণী লোক অথবা লেখকদের এবং প্রতিষ্ঠানকে (ছাত্র সম্মেলন, কৃষক সম্মেলন) লেখা চিঠি।

বলাবাহুল্য তার সাহিত্য-জীবনের ব্যাপ্তি অনুযায়ী এবং তাঁর ভক্ত সংখ্যা অনুযায়ী তাঁর চিঠির সংখ্যা খুব বেশী নয়। 'বাঁধন-হারা'র পত্র সংখ্যা বাদ দিলে প্রায় ষাটখানার মত চিঠির সন্ধান পাওয়া যায়। এই চিঠির অধিকাংশ আবদুল কাদির সম্পাদিত "নজরুল রচনা-সম্ভারে" সংকলিত। অবশ্য ডক্টর কাজী মোতাহার হোসেনকে লিখিত পত্রসমূহ এখানে অনেকখানি কেটে-ছেটে সংকলিত। এই চিঠিগুলো সম্পূর্ণভাবে প্রকাশিত হয়েছে সৈয়দ আলী আশরাফ লিখিত "নজরুল জীবনে প্রেমের এক অধ্যায়" নামক তথ্যপূর্ণ গ্রন্থটিতে।

নজরুলের সব পত্রই সাহিত্যপদবাচ্য নয়। কিছু পত্র তাঁর জীবনের বিশেষ বিশেষ ঘটনার তথ্য নির্ণয়ের জন্য মূল্যবান। 'বাঁধন-হারা' পত্রোপন্যাস বাদ দিলে যে সব চিঠি-পত্র তিনি লিখেছেন তার মধ্যে বেগম শামসুন্নাহার, প্রিন্সিপাল ইব্রাহীম খাঁ, ডক্টর কাজী মোতাহার হোসেন, মিস ফজিলাতুন্নেসা, নজরুলের প্রথমা স্ত্রী নার্গিস আসর খানম ও আত্মশক্তির সম্পাদক শ্রীগোপাললাল সান্যালকে লিখিত পত্রসমূহ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

'বাঁধন-হারা'র পত্রের সাহিত্য গুণ এই পত্রগুলিতে আছে এবং এই পত্রগুলিতে নজরুলের পরিণত মানসের ছাপও আছে। বলা

আবশ্যক নজরুলের চিঠিপত্রের ভাষাই এ প্রবন্ধের প্রধান বক্তব্য বলে আমার বিচরণক্ষেত্র সীমাবদ্ধ। পত্রের বিষয় কিংবা পত্রে প্রতিফলিত নজরুলের ধ্যান-ধারণা,, চিন্তা-ভাবনা সম্পর্কে অন্তত এ লেখায় কোন বক্তব্য থাকবে না।

চিঠির ভাষা সম্পকে কতটুকুই বা বলা যেতে পারে। আর এ প্রবন্ধের প্রথম পর্যায়ে নজরুলের গদ্যের যে পরিচয় দিয়েছি চিঠির ভাষা সম্পর্কে বলতে গেলে সে কথারই প্রায় পুনরাবৃত্তি করতে হবে। এ পর্যায়ে শুধু এইটুকু বলা যেতে পারে 'বাঁধন-হারা' যুগের নজরুলের উদ্দাম আবেগ পরবর্তী পর্যায়ের পত্রগুলিতে কম। সে-জন্যে ভাষাব মধ্যে অভিজ্ঞতার সুস্পষ্ট ছাপ প্রতিফলিত। এখানে বাহুল্য কথার পরিমাণ ক'মে গিয়েছে পরিবর্তে অল্প কথার স্থৈর্যশীলতার সৌন্দর্য ফিরে এসেছে। আর ইচ্ছাকৃত ভাষার পরীক্ষা-নীরিক্ষার প্রদর্শনী ভাবটিও এখানে বর্জিত। এই সব চিঠির মধ্যে ঘন ঘন টের পাওয়া যাবে না প্রবাদ ও বাগধারার প্রয়োগ, অধিক পরিমাণ আরবী-ফারসী শব্দ। যদিও বক্তব্যের প্রয়োজনে তিনি বিষয়ের সঙ্গে সংগতি রেখে ভাষার প্রবর্তন ঘটিয়েছেন। যেমন ধরা যেতে পারে বাঙলার মাদ্রাসা ও মক্তবের মৌলভী সাহেবগণ ও কলকাতা মুসলিম ছাত্র সম্মেলনের উদ্যোক্তাদের কাছে লেখা চিঠি দু'টি। এর প্রথমটিতে প্রায় বিশ ভাগ এবং দ্বিতীয়টিতে প্রায় বারো ভাগ শব্দ আরবী ফারসী। এই চিঠি দুটি থেকে দুটি নমুনা এখানে তুলে দিলাম:

১. আস্‌সালামো আলায়কুম। কওমের খাদেম এই বান্দার নাম হয়ত আপনারা শুনিয়া থাকিবেন। আমি আমার কবিতায়, ইসলামী গানে-গল্পে, উপন্যাসে, নাটকে, প্রবন্ধে, বক্তৃতায় আশৈশব ইসলামের সেবা করিয়া আসিতেছি। আমারি বহু চেষ্টায় আজ ইসলামী গান রেকর্ড হইয়া ঘুমন্ত আত্মভোলা মুসলিম জাতিকে জাগাইয়া তুলিয়াছে। আরবী ফার্সী শব্দ বাঙলা সাহিত্যে আজ বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে—তাহাও এই বান্দারই চেষ্টায়।......

   আজ আপনাদের দরওয়াজায় এই খেদমতগার এক সামান্য আর্জি লইয়া হাজির হইয়াছে। আমার ভরসা আছে, আপনাদের দারাজ দিল্ ও দস্ত আমাকে রিক্ত হস্তে ফিরাইবে না।

২. সর্বশক্তিদাতা আল্লাহর কাছে মুনাজাত করুন—যেন আমার প্রতীক্ষার অন্ধকার রাত্রি নবযুগের সুবহ-সাদেকের অরুণালোকে আশু রঞ্জিত হ'য়ে ওঠে। আপনাদের এই উৎসাহ ও আগ্রহ যদি ঈদ মোবারকের শুভ দিনের শেষরাত্রির আনন্দ কলরব হয়—তবে তাকে আমি অভিনন্দিত করি। আমার সালাম জানাই। আল্লাহ্ আপনাদের "সেরাতুল মুস্তাকিম" সুদৃঢ় সরল পথে পরিচালিত করুন। যে অনাগত মোজাহেদীনের জন্য আল্লাহর ফেরদৌস-আলা আজও শূন্য রয়েছে—তার পবিত্র বক্ষ পূর্ণ করার জন্য আল্লাহর আহ্বান নেমে আসুক আপনাদের অন্তরে-দেহে আত্মায়। আল্লাহু আকবর।

ব্যক্তি, বিষয় ও বক্তব্যের সংগে সমতা বজায় রেখে অত্যন্ত দক্ষতার সংগে তিনি এই ভাষা রচনা করেছেন। এ ভাষা চিঠিতে প্রযুক্ত হ'লেও এটাকে কিছুটা লৌকিক ভাষা বলা যেতে পারে। চিঠির ভাষা হওয়া উচিত ব্যক্তিগত। সেখানে একটা ঘরোয়া অন্তরঙ্গতার সুর যত সুন্দর ভাবে ফুটে উঠবে ততই হবে তা আনন্দদায়ক ও চিত্তাকর্ষক। ডক্টর কাজী মোতাহার হো'সেনকে লেখা চিঠিতে এই আলাপচারী সুহৃদের ভাষা অকৃত্রিমভাবে প্রকাশ পেয়েছে। দু'টি উদাহরণ :

১. তোমার বৌ বেচারির বয়স কত হল। নিশ্চয়ই এখন ছেলে মানুষ। তার ওপর, তোমার মত ছেলেমানুষ নিয়ে ঘর করা। ও ব্যাচারিকেই বা দোষ কি?—দাঁড়াও বন্ধু, আগে একটা কথা জিজ্ঞেস ক'রে নিই—তোমার বৌও কি আমার চিঠি পড়েন? আমি হাত গুনতে পারি। আমি জানি, তুমি যেদিন শিশির ভাদুড়ির ভ্রমর দেখে এসেছিলে, সেদিন সারারাত বৌ-এর রসনাসিক্ত মধু-বিষের আস্বাদ পেয়েছিলে। অন্ততঃ তার মাথার কাঁটাগুলোর চেয়ে বেশী বিঁধছিল তার কথাগুলো তোমার বুকে।

২. শরিফের বিয়ের কি হ'ল? নূরন্নবী চৌধুরী এসেছিলেন কি? ...রক্তদান করিনি। ডাক্তার শালা বলে, হার্ট দুর্বল। শালার মাথা। মনে হচ্ছিল, একটা ঘুষি দিয়ে দেখিয়ে দিই কেমন হার্ট

দুর্বল। ব্রাহ্মণ ভদ্রলোক "মুসলমানের" রক্ত নিতে রাজী হলেন না। হায় রে মানষ হায় তার ধর্ম! কিন্তু কোনো হিন্দু যুবক আজো রক্ত দিলে না। লোকটা মরছে—তবুও নেবে না "নেড়ে"র রক্ত।

এখানে যে ভাবে সহজ সাধারণ ভাষা ব্যবহার করা হ'য়েছে এমন কি স্ল্যাং পর্যন্ত—তাতেই অন্তরঙ্গতার সুরটা সমস্ত কৃত্রিমতাকে মুছে ফেলেছে। চিঠি যে বন্ধুর কাছে লেখা হচ্ছে, শুধু কাজী মোতাহারকে নয় "মোতিহার" কে লেখা হচ্ছে, এর ভাষা মুহূর্তে তা স্মরণ করিয়ে দেয়। এখানে কবি নজরুল ইসলামের ব্যক্তিত্ব আচ্ছাদিত, বন্ধু নজরুল, মানুষ নজরুল উদ্‌ঘাটিত।

এই অন্তরঙ্গতার ভাষা ছাড়াও যে ভাষাটি বিশেষভাবে অভিনন্দিত হওয়ার যোগ্য তা এর সাহিত্য-ভাষা, কল্পনাভিত্তিক সাহিত্য-ভাষা। বঙ্কিমচন্দ্র সঞ্জীবচন্দ্রের পরিচয় দিতে গিয়ে মাঝে মাঝে বলেছেন "তাব প্রতিভা আবার জ্বলিয়া উঠিল।" ইব্রাহিম খাঁ, ডক্টর কাজী মোতাহাব হোসেন, শ্রীগোপাললাল সান্যাল, শামসুন্নাহার বেগম ও নার্গিস আসব খানমকে লেখা চিঠিতে নজরুলের সেই প্রতিভা জ্বলে উঠেছিল। এ কথা বলার কারণ, এই ভাষার পিছনে যে ব্যক্তি-মানুষটির মন কাজ করেছে সেই মনের উত্তাপ-নিরুত্তাপ এক কথায় তার অবস্থান্তরই ভাষাকে আকর্ষণীয় ক'রে তোলার জন্য দায়ী। শিল্পীর সৃষ্টির জন্যে রঙ-তুলির প্রয়োজন হয়, রঙ-তুলি ব্যবহারের শিক্ষারও প্রয়োজন হয়; কিন্তু কল্পনা ব্যতীত ধ্যানের প্রতিমাকে অবয়ব দান করা শিল্পীর পক্ষে সম্ভব হয় না। আরও একটি জিনিসের প্রয়োজন হয় তা হ'ল পরিচয়ের এবং অভিজ্ঞতার। গাছটা চেনা থাকলে গাছটা আঁকা যায়। এই পরিচয় অস্পষ্ট হলে কাক আঁকতে গেলে বক হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। শব্দ একজন লেখকের কাছে রঙ-তুলির মত। ছবি আঁকার মত লেখার জন্য ওটা উপাদানের মত অবশ্য প্রয়োজনীয় ব্যাপার। যে আগুনে পড়লে বক্তব্য অঙ্গারের মত জ্বলে ওঠে সেটা শিল্পীজীবনের একটি বিশেষ অবস্থা—তা প্রচণ্ড দুঃখ, প্রচণ্ড শোক, প্রচণ্ড আনন্দ, প্রচণ্ড অপমান অথবা প্রচণ্ড অভিমান। পৃথিবীতে জন্মে মানুষকে নানা রকম যুদ্ধের সম্মুখীন হ'তে

হয়। মানুষের মন ঠিক যে জিনিসটা পেতে চায় জগৎ সেটা তাকে দিতে চায় না। এই জঙ্গের ময়দানে এক একজন মানুষ এক একটা ভূমিকা পালন করে। কিন্তু প্রত্যেকের ভূমিকা এক একজন সৈনিকের মত। শিল্পী, কবি ও সাহিত্যিকের ভূমিকাও ঐ সৈনিকের, ঐ যোদ্ধার। অবস্থার চাপে পড়ে মানুষকে যেমন বাইরের প্রকৃতির সঙ্গে লড়তে হয় তেমনি তার অন্তর-প্রকৃতির সঙ্গেও যুদ্ধ করতে হয়। শিল্প, কাব্য কিংবা সাহিত্য শিল্পী-মানসের এই সংগ্রামের বহিঃপ্রকাশ। তুলি ও রঙের মত ভাষা একটা অস্ত্র মাত্র। কিন্তু বুদ্ধি ও শিক্ষা ছাড়া যেমন অস্ত্রের ব্যবহার সঠিক হয় না তেমনি ভাষা ও শব্দের ব্যবহারও প্রতিভা ভিন্ন অকল্পনীয়। নজরুলের ঐ চিঠির ভাষায় সেই প্রতিভার জাদু জ্বলে উঠেছে। সেই প্রতিভা শব্দকে, ভাষাকে, কবির শিক্ষাকে প্রয়োজনের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছে মাত্র। তবু কথা থেকে যায়, অস্ত্রের মধ্যে যেমন কার্যকারিতার দিক থেকে ভাল, কিছু ভাল এবং অনেক ভালোর পার্থক্য আছে তেমনি ভাষার মধ্যেও ভাল এবং অনেক ভালোর পার্থক্য আছে। লেখকের জন্যে তাই শব্দ কিংবা ভাষার বাছ-বিচারের প্রয়োজন হয়। ভালো যুদ্ধের জন্যও ভালো অস্ত্রের প্রয়োজন। অবশ্য এ কথাও মনে রাখা দরকার যে যেমন ভালোটাকে বেছে নেওয়ার জন্যে ভালো মাথার দরকার তেমনি সাধারণ ভালোকে অসাধারণ ভালো করে তোলার জন্যে দরকার অসামান্য বর্ণকুশলীর। সাদামাঠা ভাষা নিয়েও গভীর ভাব ব্যক্ত করার ক্ষমতাই ত সত্যিকারের বড় লেখকের ক্ষমতা। নজরুলের শেষ দিক-কার লেখা কয়েকটি চিঠিতে এই উভয় ধরনের কুশলতার আমরা পরিচয় পেয়েছি। দামী অস্ত্র ব্যবহারে আর অল্প দামী অস্ত্র ব্যবহারে তাঁর সমান পারদর্শিতা। এখানে প্রথমে দামী অস্ত্রের মত ভাষার ব্যবহারের একটা নমুনা দিই। ১৯৩৭ সালের ১লা জুলাই নজরুল তাঁর প্রথমা পত্নীকে যে চিঠি লেখেন তার আরম্ভের ভাষাটি এই :

> তোমার পত্র পেয়েছি—সেদিন নববর্ষার নবঘন-সিক্ত প্রভাতে। মেঘমেদুর গগনে সেদিন অশান্ত ধারায় বারি ঝরছিল। পনর বছর আগে এমনি এক আষাঢ়ে এমনি বারিধারার প্লাবন নেমেছিল—তা তুমিও হয়ত স্মরণ করতে পারো। আষাঢ়ের নব মেঘপুঞ্জকে আমার নমস্কার।

এই মেঘদূত বিরহী যক্ষের বাণী বহন করে নিয়ে গিয়েছিল কালিদাসের যুগে, রেবা নদীর তীরে, মালবিকার দেশে, তাঁর প্রিয়ার কাছে।

এরই সংগে একটি হাল্‌কা অস্ত্রের মত ভাষার ব্যবহার দেখানো যাক। প্রথমটির মত এর ওজন নেই কিন্তু তার চকচকে অগ্রভাগে ধার অসম্ভব। ১৯২৬ সে শ্রীগোপাললাল সান্যালকে লেখা চিঠি থেকে :

> শিবের গীত গাইতে ধান ভেনে নিলাম দেখে (ধান ভানতে শিবের গীত নয়) আপনি হয়ত অসন্তুষ্ট হচ্ছেন, কিন্তু আপনাকে মনে করিয়ে দিচ্ছি যে, এটা চিঠি, প্রবন্ধ নয়। আর চিঠিতে যে আবোল-তাবোল বকবার সকলেরই অধিকার আছে, তা 'শনিবারের চিঠি' পড়লেই দেখতে পাবেন। তাই বলে আমার এ চিঠিটা রবিবারের উত্তরও নয়। কেননা তাঁরা এত চিঠি লিখেছেন আমায় যে, তার উত্তর দিতে হ'লে আবার গণেশ ঠাকুরকে ডাকতে হয়। এটাকে মনে ক'রে নিন, আসল গান গাইবার আগে একটু তারাবা করে নেওয়া, যেমন আপনারা তারারা করেছেন গণবাণীর আলোচনা করতে গিয়ে।

লেখকের এই মুন্সিয়ানার উপমা দেওয়া যেতে পারে পাকা রাঁধুনীর সংগে। যিনি কেবল কোর্মা পোলাও রাঁধায় ওস্তাদ নন, শাক-চচ্চড়ি রান্নাতেও গুরু। 'শনিবারের চিঠি'র কথা উল্লেখ করে তিনি এক ঢিলে দুই পাখি মেরেছেন। সুতরাং ভাষার অস্ত্র নিক্ষেপে নজরুলকে আমরা সহজেই অর্জুনের মত সব্যসাচীর শিরোপা দিতে পারি। চিঠিতে শ্লেষের ভাষার ব্যবহার প্রথমে আমরা 'বাঁধন-হারা'র মাহবুবার চিঠিতে পাই। এখানে তারই পরিণত প্রকাশ লক্ষ্য করি।

'কিন্তু নজরুলের পত্রের ভাষার যে গুণটি আদর্শ সুন্দর তা হ'ল তাঁর কবি-কল্পনার মাধুর্যে রসায়িত ভাষা। আর এই ভাষাতে লেখা কাজী মোতাহার হোসেনকে লিখিত তাঁর পত্র-গুচ্ছ (সংখ্যায় মাত্র সাতটি) বাংলা পত্র-সাহিত্যের অমূল্য ঐশ্বর্য।' ১৯২৮-এ লেখা এই চিঠির লেখক নজরুল ইসলাম তখন শুধু কবিতা লেখার জাদুগীর নন, গদ্য লেখারও ঐন্দ্রজালিক। ঐ ঐন্দ্রজালিক ভাষার দু'একটি নমুনা এখানে দিয়ে এ প্রবন্ধে উপসংহার রচনা করব। পাঠক নিজেই দেখবার চেষ্টা করবেন এর রহস্য কোনখানে :

১. "সুন্দর" ও "বেদনা" এ দু'টি পাতার মাঝখানে একটি ফুল —বিকশিত বিশ্ব।

একটি মক্ষী-রাণী তাকে ঘিরেই বিশ্বের মধুচক্র। বাগানের মালি বাত দিন লাঠি নিয়ে বাগান আগলে আছে। বেচারা ডিঙিয়ে যেতে পারে না। মৌমাছি তাব মাথাব উপব দিয়ে গজল গান গেযে বাগানে ঢোকে, সুন্দরের মধুতে ডুবে যায, অফুট কুঁড়ির কানে বিকাশের বেদনা জাগায়, প্রস্ফুটিত যে—তাকে ঝরে পড়ার গান শোনায়,—তাব এতটুকু বাধে না, দেহেও না, মনেও না। বেচাবা মালি—যেন অঙ্কশাস্ত্রী মসাই।—হাঁ করে তাকিযে দেখে আব মৌ-মক্ষীব চরিত্রেব এবং আরো কত কির, সমালোচনা জুড়ে দেয। মৌ-মক্ষী কিছু শোনে না সে কেবলি গান করে—সুন্দবেব স্তব সে গান। তাকে মাব, সে সুন্দবেব স্তব করতে কবতে মরবে।

২. আজও লিখছি বন্ধুর ছাদে বসে। সব্বাই ঘুমিয়ে। তুমি ঘুমুচ্ছ প্রিয়াব বাহুবন্ধনে। আবো কেউ হয়তো ঘুমুচ্ছে—একা শূন্য ঘরে—কে যেন সে আমার দূবেব বন্ধু—তাব সুন্দর মুখে নিবু নিবু প্রদীপের ম্লান শিখা পড়ে তাকে আরো সুন্দর আবো করুণ করে তুলেছে— নিঃশ্বাস প্রশ্বাসেব তালে তালে তার হৃদয়ের ওঠাপড়া যেন আমি এখান থেকেই দেখতে পাচ্ছি—তার বাম পাশের বাতায়ন দিযে একটি তারা হয়ত চেয়ে আছে—গভীর রাতে মুয়াজ্জিনের আজানে আর কোকিলের ঘুম জড়ানো সুরে মিলে তার স্তব করছে —"ওগো সুন্দর! জাগো! জাগো!"...

নজরুলেব প্রথম জীবনের গদ্য ভাষার মধ্যে যে একটা প্রায় বল্গাহীন গতির প্রাণোচ্ছল সৌন্দর্য ছিল এখানে তা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। এখানে প্রতিটি বাক্য চিন্তার ভাবে শ্লথ, সংযত। মোতাহার হোসেনকে লেখা চিঠিতে নজরুল বলেছিলেন :

আমাব জীবনে সবচেয়ে বড় অভাব ছিল Sadness-এর। কিছুতেই Sad হ'তে পারছিলাম না। তাই ডুবছিলাম না। কেবল ভেসে বেড়াচ্ছিলাম। কিন্তু আজ ডুবেছি, বন্ধু।

সেই ডুবন্ত ভারাক্রান্ত হৃদয়ের রক্তের অন্তর্গত অশ্রু-সাগরের বুকের ভাষা উপরোদ্ধৃত চিঠির ভাষা। ওখানে শব্দপ্রয়োগে অসাবধানতা থাকলেও (সমালোচকের চোখে হয়ত আছে) ওর বেদনার সৌন্দর্য তা উপেক্ষা করতে মিনতি করে।

নজরুল ইসলামের গদ্য

গদ্য লেখক হিসেবে নজরুল ইসলামের কোন বৈশিষ্ট্য আছে কি না। বাঙালী পাঠকের সম্ভবত অজানা নয় যে, নজরুল ইসলামের প্রথম গদ্য লেখাই অনেক সাহিত্যরসিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। 'বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী' ছিল সেই প্রথম প্রকাশিত কাহিনী।

দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল কি গল্পের বিষয়ের জন্যে, না চিন্তার গভীরতার জন্যে? ঐ গল্পে বিষয়ের অথবা চিন্তার কোন মাহাত্ম্য ছিল না; ছিল যা, তা হ'ল লেখকের বলার বিশেষ ভঙ্গিটি। ঠিক ঐ ধরনের গদ্য লেখার ভঙ্গি এর আগে বাংলা সাহিত্যে ইতিপূর্বে দেখা যায়নি।

গল্পের শীর্ষদেশে লেখকের দেওয়া একটা নোট আছে। নোটটি হল:

> বাঙালী পল্টনের একটি বওয়াটে যুবক আমার কাছে তাহার কাহিনী বলিয়াছিল নেশার ঝোঁকে: নীচে তাহাই লেখা হইল। সে বাগদাদে গিয়া মারা পড়ে।

আঙ্গিক নতুন ধরনের কিন্তু আরও একটি জিনিস চোখে পড়ার মত—'বওয়াটে' শব্দটি। রুচিবান রবীন্দ্রনাথ তাঁর সমগ্র সাহিত্যে ঐ ধরনের শব্দ ব্যবহার করেননি। এ বিষয়ে নজরুল ইসলাম বোধ হয় শরৎচন্দ্রের অনুসারী। আটপৌরে, কখনও কখনও অমার্জিত বলে মনে হয়, এমন সব শব্দ শরৎচন্দ্রই প্রথম আমদানী করেন:

> 'তোর গায়ে ওটা কালোপ্যানা কি রে?'
> 'র‍্যাপার।'
> 'আহ্! র‍্যাপারের কি ছিরি! তেলের গন্ধে ভূত পালায়! ফুচুকে! পেতে দে দেখি, বসি!'

বাকভঙ্গিটি লক্ষণীয়। বাস্তবকে পুরোপুরি ধরতে গেলে শুধু চিন্তায় নয়, তাকে ভাষায় বাস্তবতা দিয়ে ধরতে হবে। তাহলে বাস্তব সর্বাংশে বাস্তব হয়ে উঠবে। সম্ভবত এই জন্যে নজরুল ইসলাম যখন 'মৃত্যুক্ষুধা' লেখেন, তখন সেই অতিবাস্তব পটভূমির উপর লেখা উপন্যাসের ভাষার রূপ হয় এমনি :

১. প্যাকালে তখন কন্নিক ফুটগজ সামনে রেখে থালায় একথালা জল নিয়ে ঝুঁকে পড়ে তার তেলচিটে চুলে বেশ করে বাগিয়ে টেড়ি কাটছিল।

২. কিন্তু চা'ল যদি-বা চারটে যোগাড় করা যেত ধাবধুব করে, আজ আবার চুলোও নেই। উনুন-শালেই পাঁচির ছেলে হয়েছে। ও-ঘর নিকুতে সন্ধ্যে হয়ে যাবে।

জীবনে বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকলেও, বাস্তব সাহিত্যে তাঁর অবদান থাকলেও মেজাজে নজরুল ইসলাম ছিলেন রোমান্টিক। তাই 'মৃত্যু-ক্ষুধা'র আরম্ভটা কাব্যিক ভাষার :

পুতুল খেলার কৃষ্ণনগর।
যেন কোন খেয়ালী শিশুর খেলাশেষের ভাঙা খেলাঘর।
খোকার চ'লে-যাওয়ার পথের পানে জননীর মত চেয়ে আছে—
খোকার খেলার পুতুল সামনে নিয়ে।
এরই একটেরে চাঁদ-সড়ক। একটা গোপন ব্যথার মত ক'রে গাছ-পালার আড়াল টেনে রাখা।

চারটি বাক্যের মধ্যে উপমা ব্যবহার করেছেন নজরুল তিনবার। দেখলে মনে হবে, যেন তিনি উপমা ছাড়াই কথা বলতে অভ্যস্ত নন। এটা দোষ কি গুণ, সেটা পরের কথা, কিন্তু বোঝা যায়, এটা কবির রচনা, যাঁর স্বভাব হল রঙে তুলি ডুবিয়ে ছবি আঁকা। উত্তরাধিকারী সূত্রেও নজরুল ইসলাম এই কাব্যিক গদ্য রচনায় পটুত্ব অর্জন করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের ভাষা দেখলে আমরা সেটা অনুমান করতে পারব :

১. যদিও সেই সন্ধ্যাকালে নিস্তব্ধ গিরিতটে, নির্জন প্রাসাদে কোথাও কিছুমাত্র শব্দ ছিল না, তথাপি আমি যেন স্পষ্ট শুনিতে পাইলাম,

নির্ঝরের শতধারার মতো সকৌতুক কলহাস্যের সহিত পরস্পরের দ্রুত অনুধাবন করিয়া আমার পার্শ্ব দিয়া স্নানার্থিনীরা চলিয়া গেল... সন্তরণকারিণীদের পদাঘাতে জলবিন্দুরাশি মুক্তামুষ্টির মতো আকাশে ছিটিয়া পড়িতেছে।..এবং অকস্মাৎ একটা বিদ্যুদ্দন্ত বিকশিত ঝড় শৃঙখলছিন্ন উন্মাদের মতো পথহীন সুদূর বনের ভিতর দিয়া আর্ত চিৎকার করিতে করিতে ছুটিয়া আসিল। [ক্ষুধিত পাষাণ]

২. যেমন মণির দ্বারা বলয়ের এবং বলয়ের দ্বারা মণির শোভা বৃদ্ধি হয়, তেমনি আমার মধ্যস্থতায় দারোগার এবং দারোগার মধ্যস্থতায় আমার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি ঘটিতেছিল। [দুর্বুদ্ধি]

উপর্যুক্ত উদ্ধৃতিতে উপমা ব্যবহারের আতিশয্য চোখ এড়িয়ে যাবার নয়।

কিন্তু এ এক ধরনের সাহিত্যিক ঐতিহ্য। কেননা, আমরা বঙ্কিম-চন্দ্রের লেখাতেও মাঝে মাঝে অমনি উপমা প্রয়োগ লক্ষ্য করি :

১ ক্রমে অন্ধকার হইল। শিশিরাকাশে নক্ষত্রমণ্ডলী নীরবে ফুটিতে লাগিল, **যেমন** নবকুমারের স্বদেশে ফুটিতে থাকে, তেমনি ফুটিতে লাগিল।

২. উভয় পার্শ্বে যতদূর চক্ষু যায়, ততদূর পর্যন্ত তরঙ্গভঙ্গ প্রক্ষিপ্ত ফেনার রেখা, স্তূপীকৃত : বিমল কুসুমদাম-গ্রথিত মালার ন্যায় সে ধবল ফেনরেখা হেমকান্ত সৈকতে ন্যস্ত হইয়াছে। [কপালকুণ্ডলা]

উদ্ধৃত বাক্যে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর কবিত্ব-কল্পনারই কি পরিচয় দেননি। এখানে বঙ্কিমচন্দ্র ত শুধু গদ্য লেখক নন তিনি আলঙ্কারিক কবি।

রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র উভয়ের লেখাতেই কাব্যিক বিশেষণের বাহুল্য লক্ষণীয়। বিশেষণের এই বাহুল্য তাঁদের লেখাতেও ঐ সাহিত্য-ঐতিহ্যের পথ ধরে এসেছে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের 'সীতার বনবাস' থেকে দু' একটা উদ্ধৃতি নেওয়া যাক :

১. তখন রাম বলিলেন, প্রিয়ে! যদি ক্লান্তিবোধ হইয়া থাকে, আমার গলদেশে ভুজলতা অর্পিত করিয়া ক্ষণকাল বিশ্রাম কর। সীতা **কোমল বাহুবল্লরী** দ্বারা রামের গলদেশ অবলম্বন করিলে তিনি অনির্বচনীয় স্পর্শসুখ অনুভব করিয়া বলিতে লাগিলেন...

২. সীতার মৃদু মধুর মহান বাক্য কর্ণগোচর করিয়া রাম বলিলেন, প্রিয়ে! তোমার কথা শুনিলে শরীর শীতল হয় ;

সমাসবদ্ধ এবং সন্ধিযুক্ত শব্দের সবকিছুর উত্তরাধিকার নজরুল তাঁর সাহিত্যিক পূর্ব-পুরুষদের কাছ থেকেই অর্জন করেছিলেন।

'মূলত কবি হলেও নজরুলের গদ্য সাধনাও উপেক্ষণীয় নয়। তিনি তাঁর সাহিত্যিক ঐতিহ্য অনুসরণ করলেও নিজস্ব একটি স্টাইল আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন।' বোঝা যায়, তাঁর লেখার মধ্যে বঙ্কিম-চন্দ্র, রবীন্দ্রনাথের রক্ত আছে, বিবেকানন্দ, মোশার্‌রফ হোসেনের আদল আছে, কখনো শরৎচন্দ্র, প্রমথ চৌধুরীর চেহারার আভাসও লক্ষণীয়, কিন্তু সব কিছুরও পরে নজরুলের চেহারা দীপ্ত ভাস্বর। 'নজরুলের সবচেয়ে বড় পরিচয় গতি, প্রাণ, আন্তরিকতা, আর মাঝে মাঝে চমকপ্রদ আরবী-ফারসী শব্দের ব্যবহার।'

গোপনে গোপনে তাঁর গদ্যচর্চার সাধনাও যে গভীর ছিল, 'বাঁধন-হারা'য় আমরা তার সাক্ষাৎ পাই। একদিকে সাধুভাষা এবং অন্যদিকে চলিত ভাষা, একদিকে গুরু-গম্ভীর সংস্কৃতবহুল কাব্যগুণান্বিত গদ্য, অন্য-দিকে কথ্যরীতিযুক্ত আটপৌরে ভাষা—এই দু'রকমের গদ্যের চর্চা তিনি প্রথম থেকেই করে আসছিলেন। 'বাঁধনহারা'য় তিনি একই প্রকৃতির দু' রকম বর্ণনার মাধ্যমে সাহিত্যিক ভাষার সঙ্গে মুখের ভাষার দু' ধরনের নমুনা দেখিয়েছেন :

> কাল সমস্ত রাত্তির ধ'রে ঝড়-বৃষ্টির সঙ্গে খুব একটা দাপাদাপির পর এখানকার উলঙ্গ প্রকৃতিটা অরুণোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই দিব্যি শান্ত স্থির বেশে—যেন লক্ষ্মী মেয়েটির মত ভিজে চুলগুলি পিঠের উপর এলিয়ে দিয়ে রোদ্দুরের দিকে পিঠ করে বসে আছে। এই মেয়েই যে একটু আগে ভৈরবী মূর্তিতে সৃষ্টি ওলট-পালট করবার যোগাড় করেছিল, তা' তার এখনকার এ-সরল শান্ত মুখশ্রী দেখে কিছুতেই বোঝা যায় না। এখন সে দিব্যি তার আসমানী রং-এর চলচলে চোখ দুটি গোলাবী নীল আকাশের পানে তুলে দিয়ে গম্ভীর উদাস চাউনীতে চেয়ে আছে। আর্দ্র ঋজু চুলগুলি বেয়ে এখনো দু' এক ফোঁটা করে জল ঝরে

পড়ছে আব নবোদিত অরুণের রক্তরাগের ছোয়ায় সেগুলি সুন্দরীর গালে অশ্রুবিন্দুর মত ঝিলমিল করে উঠছে। কিন্তু যতই সুন্দর দেখাক, তার এই গম্ভীর সারল্য আর নিশ্চেষ্ট ঔদাস্য আমার কাছে এতই খাপছাড়া খাপছাড়া ঠেকছে যে, আমি আর কিছুতেই হাসি চেপে রাখতে পারচিনে। বুঝতেই পারচ ব্যাপারটা ; মেঘে মেঘে জটলা, তার উপরে হাড়- টাটানো কন্‌কনে বাতাস ; করাচি-বুড়ী সমস্ত রাত্তির এই সমুদ্দুরের ধারে গাছপালাশূন্য ফাঁকা প্রান্তরটায় দাঁড়িয়ে থুরু থুরু করে কেঁপেছে, আর এখানকার শান্তশিষ্ট মেয়েটিই তার মাথার ওপর বৃষ্টিব পর বৃষ্টি ঢেলেছে। [নজরুল রচনাবলী : ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৯১]

সম্ভবত উপরকার ঐ প্রাকৃতিক বর্ণনায় তিনি আত্মতুষ্টি লাভ করতে পারেননি, তাই নূরুল হুদার চিঠির জবাবে তিনি বলেছেন :

তুই কবি না হ'লে ক্ষতি নেই, কিন্তু আমি যে একজন প্রতিভাসম্পন্ন জবরদস্ত কবি, তাতে সন্দেহ নাস্তি। প্রমাণস্বরূপ, আমি হলে তোর ঐ বর্ষাস্নাতা সাগরসৈকতবাসিনী করাচীর বর্ণনাটা কি রকম কবিত্বপূর্ণ ভাষায় করতাম, অবধান কর্‌।

তারপর তাঁর পরীক্ষিত ভাষার নমুনা দাঁড়ায় এই :

ঝরা থেমেছে। উলঙ্গ প্রকৃতির স্থানে স্থানে এখনও জলের রাশ থৈ থৈ করচে। দেখে বোধ হচেচ, যেন একটি তরুণী সবেমাত্র স্নান ক'রে উঠেছে, আর তার ভেজা পাতলা নীলাম্বরী শাড়ী ছাপিয়ে নিটোল উন্মুখ যৌবন ফুটে বেরিয়েছে। এখনও ঘুনঘুনে মাছির চেয়েও ছোট মিহিন জলের কণা ফিন্‌ ফিন্‌ করে ঝরছে। ঠিক যেন কোন সুন্দরী তার একরাশ কালো কশ-কশে কেশ তোয়ালে দিয়ে ঝাড়ছে, আর তারই সেই ভেজা চুলের ফিন্‌কির ঝাপটু আমাদিগকে এমন ভিজিয়ে দিচ্ছে! এখনও রয়ে রয়ে ক্ষীণ বিজুলী চম্‌কে চম্‌কে উঠছে, ও বুঝি ঐ সুন্দরীর তড়িতাঙ্গ সঞ্চালনের ললিতচঞ্চল গতিরেখা। আর ঐ যে ক্ষান্ত বর্ষণ-স্নিগ্ধ সন্ধ্যায় মুগ্ধ দু' চারটি গায়ক-পাখীর ঈষৎ' ভেসে আসা গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে, ও বুঝি ঐ স্নাতা সুন্দরীর চারু নূপুরের রুনু-ঝুনু কিংবা বলয় কাঁকনের সিঞ্জিনী। [প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫০৩]

' কাব্যরসিক মাত্রেরই অজানা নয় যে, কবির ভাব প্রকাশের মস্ত অবলম্বন উপমা ; সেই উপমা যখন গদ্যে ব্যবহার করা হয়, তখন সে গ ্য বিশেষ অর্থে কাব্যগুণান্বিত। নজরুল প্রধানত আলংকারিক কবি, তাই তাঁব কবিতার মত তাঁর গদ্যেও ঐ উপমার প্রাচুর্য লক্ষ্য করা যায়। কবিতায় যেমন তিনি অনর্গল উপমা ব্যবহাব ক'রে যান, যথা :

মোবা ঝঞ্ঝার মত উদ্দাম,
মোরা ঝর্ণার মত চঞ্চল,
মো'বা বিধাতার মত নির্ভয়,
মোবা প্রকৃতির মত সচ্ছল।
মোরা আকাশের মত বাধাহীন
মোরা মরু-সঞ্চব বেদুঈন।

তেমনি তাঁর বর্ণনামূলক গদ্যও হয়ে ওঠে তাঁব কবিতাব মত উপমা-বহুল। নজরুল সচেতনভাবে যে এটা করেছেন, তা তাঁব উল্লিখিত—"বর্ণনাটা কি রকম কবিত্বপূর্ণ ভাষায করতাম, অনুধাবন কব্"—বাক্যে বিধৃত।

উপরের উদ্ধৃতি দুটির মধ্যে লক্ষ্য করা যায "ঘুনঘুনে মাছির চেয়েও ছোট মিহিন জলের কণা ফিন্‌ফিন্ ক'রে ঝবছে"র মত মুখের চল্‌তি বুলির পাশে "সুন্দরীর তড়িতাঙ্গ সঞ্চালনেব ললিতচঞ্চল গতিরেখার" মত তৎসম-শব্দ বিন্যস্ত বাক্যরাশি। কিন্তু ঐখানেই নজরুলের নতুনত্ব নিহিত নয়। ঐ একই বর্ণনার মধ্যে আমবা প্রকৃত নরুজলকে দেখতে পাব। উপরের ঐ বর্ণনার শেষের দিকের লাইন ক'টি এই :

> আর ঐ যে তার শেফালীর বোঁটায়-ছোবানো **ফিরোজ** রং-এর **মল্‌মলের** মত মিহিন শাড়ী আর তাতে ঘন সবুজ পাড় দেওয়া, ওতে যেন কে **ফাগ্** ছড়িয়ে দিয়েছে। ও বোধ হয় আবিরও নয়, ফাগও নয়,—কোনও একজন **বাদশাজাদা** ঐ তরুণীর ভালবাসায় নিবাশ হ'যে ঐ দুটি রাতুল চরণতলে নিজকে বলিদান দিযেছে, আব তারই **কলিজ'র** এক ঝলক **খুন** ফিং দিয়ে উঠে সুন্দরীর বাসন্তী-বসন অমন করে রক্ত-রঞ্জিত করে তুলেছে,—

কয়েকটি জিনিস লক্ষ্য করবার মত। উপমা ত আছেই, আর আছে বিভিন্ন রঙকে প্রকটিত করে এমনি ধরনের শব্দ। কিন্তু সে শব্দগুলো শুধু সাধারণভাবে প্রচলিত শব্দ নয়। 'ফিরোজ', 'মলমল', 'ফাগ', 'কলিজা', 'খুন'—এমনি সব শব্দকে বিশেষ অর্থবোধক করে ব্যবহার করা হয়েছে। 'ফিরোজ' রঙটা সাধারণ রঙ নয়, সেটা "শেফালীর বোঁটায় ছোবানো ফিরোজ" রঙ। এই যে বিশেষণ দিয়ে রঙকে বিশিষ্ট ক'রে তোলার প্রকরণ, এটাই নজরুলের বিশেষ স্টাইল। এতে রঙটা হাল্‌কা ভাবে উপেক্ষণীয় হয়ে থাকে না, সেটা চোখের দৃষ্টির চারপাশ ঘিরে আরও বেশী প্রগাঢ় হয়ে ওঠে, বিশেষভাবে উজ্জ্বল হয়। এর আর একটা দিক হলো, 'রাজকুমার'-এর পরিবর্তে 'বাদশাজাদা', 'হৃদয়'-এর পরিবর্তে 'কলিজা,' 'নীল'-এব পরিবর্তে 'ফিরোজ' এবং 'রক্ত'-এর পরিবর্তে 'খুন' শব্দের ব্যবহার। কবিতায় যেমন তেমনি গদ্যেও এই বিশেষ ঢঙটা নজরুলের সৃষ্টি।

প্রকৃতপক্ষে কোনো ভাষাই চিত্তহারী হয় না, যদি-না তা হৃদয় থেকে উদ্‌গত হয়। ইকবাল তাঁর বিখ্যাত কবিতা 'জবাব-এ-শেকোয়া'র সূচনায় বলেছিলেন : 'দিল্‌ থেকে যদি ওঠে কোন বাণী প্রভাব রাখে সে সুনিশ্চয়। পাখনা না থাক, তবুও তাহার উর্ধ্বে ওঠার তাকিদ রয়।' এবং ফরাসী কবি রঁ্যাবো বলেছিলেন—This (new) language would be of the soul, for the soul containing everything smell, sounds, colours.

কবিতায় যেমন, তেমনি নজরুলের গদ্যেও ঐ 'Soul'-এর অভাব নেই। নজরুল ইসলামের সেই যে প্রাণ, আমরা তার যতটুকু খবর রাখি, তা আবেগে, আন্তরিকতায়, আত্মীয়তায়, ঔদার্যে, রসিকতায়, সারল্যে, সত্যে, বীর্যে, সাহসে, বীরত্বে, মনুষ্যত্বে, যৌবনে, তারুণ্যে ভরাট। তার থেকে নিরন্তর সৌরভ আর রঙ ঝরে পড়ছে এবং তাই কথাগুলো তাঁর রসে ভরে, রঙে উজ্জ্বল হয়ে গন্ধে জড়িয়ে বেরিয়ে আসছে, এমন তাঁর হৃদ্যতা, এমন প্রেমবিগলিত তাঁর আতিথেয়তা যে, একবার তাঁর দরজায় পা দিলে বেরুনো দুঃসাধ্য—ছন্দ, শব্দ, সুর, রঙ চতুর্দিক থেকে বন্ধুর আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরবে। কখনও কখনও পাগলামী, ছেলেমী ব'লে হয়ত মনে হবে, কিন্তু ঐ ভালবাসার দৌরাত্ম্য ছাড়িয়ে বেরিয়ে আসা সহজ

হবে না। বুদ্ধদেব বসু তাঁর 'নজরুল ইসলাম' প্রবন্ধে বলেছেন :

> গদ্য লেখক হ'য়ে তিনি জন্মাননি, কিন্তু গদ্যও তিনি লিখেছেন, এবং গদ্যে যে তাঁর অতিমুখর মনের অসংযত বিশৃঙ্খলা সবচেয়ে দুঃসহ হয়ে প্রকাশ পাবে, সে তো অনিবার্য।

যতদূর মনে হয় একমাত্র বুদ্ধদেব বসু ছাড়া এ ধরনের উক্তি অন্য কোন বাঙালী সমালোচক তাঁর গদ্য সম্পর্কে করেননি। বুদ্ধদেব বসুর উক্তিতে বোঝা যায় যে, গদ্য-সাহিত্যে নজরুলের কিছুমাত্র দান ত নেই-ই, উপরন্তু তা বিপুল দোষে দুষ্ট। চরিত্রগত দিক থেকে বুদ্ধদেব বসু অত্যন্ত 'কোল্ড' বলেই মনে হয়। নজরুলের গদ্যকে তিনি 'অতি-মুখর,' 'অসংযত' এবং 'বিশৃঙ্খল' ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত করেছেন। আর তিনি যে লিখেছেন, 'গদ্য লেখক হয়ে তিনি জন্মাননি', এটা বোধ হয় নজরুলের পরম অরাতিও বলবেন না। বললে সমালোচকের সাহিত্যজ্ঞান সম্পর্কে বাঙালী পাঠকের সন্দেহ হবে। বস্তুত নজরুল ইসলাম শুধু 'গদ্য লেখক হয়ে জন্মাননি' নয়, বাঙলা গদ্যকে তিনি অসম্ভব বলিষ্ঠ করে গড়ে তুলবার পথ দেখিয়েছেন, তাকে বেগবান, স্ফূর্তিমান করতে সাহায্য করেছেন, তাকে দিয়েছেন নতুন বর্ণ, নতুন ধ্বনি, যে ধ্বনি স্নিগ্ধতার যেমন, তেমনি উগ্রতার, উত্তেজনার, বীর্য প্রকাশনার।

> কি-সুন্দর জলে-ধোয়া আকাশ! কি স্নিগ্ধ নিঝুম নিশি ভোর! সারা প্রকৃতি এখনও তন্দ্রালস নয়নে গা এলিয়ে দিয়ে পড়ে রয়েছে! গোলাবী রং-এর মসলিনের মত খুব পাতলা একটা আবছায়া তার ঘুমভরা ক্লান্ত দেহটায় জড়িয়ে রয়েছে।

এই যেমন একদিকের স্নিগ্ধ ক্লান্ত কোমল সুর, তেমনি তার পাশেই তার অন্য মূর্তি, তার রুদ্র মূর্তি, বাঁশীর পাশে বজ্রের আওয়াজ :

> কিন্তু বজ্র তাদের তখন অগ্নি-গিরি গর্ভের বহ্নি-সিন্ধুর মত গর্জন করে উঠেছে, তাদের নিশ্বাসে নিশ্বাসে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হচ্ছে। আর পারে না! সব বুঝি জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যায় এবার। উদাসিনী এক গভীর অরণ্যের প্রান্তে এসে ছিন্নকণ্ঠ কপোতিনীর মত আর্তস্বরে কেঁদে উঠলো, "ম্যায় ভুখা হুঁ।"

প্রবল যন্ত্রণার এই যে জ্বালাময় বিস্ফোরণ, এমন এর বেগ, এমন এর গতি, এমন এর তীব্রতা, এমন এর অসহ্য উষ্ণতা, যা চিরকালের বাঙলা সাহিত্যে আগুনের মত ধ্বক-ধ্বক করে জ্বলবে। কারণ এ গলিত লাভার মত বেরিয়ে আসছে তেমনি এক অন্তর থেকে, যার ডাইনে-বামে, উর্ধ্বে-নিম্নে বিশাল অন্ধকার বুভুক্ষু অজগরের মত আঁকড়ে ধরেছিল এবং তাকে সজোরে ছিন্ন করার যন্ত্রণায় সে হয়ে উঠেছিল অধীর।

'বাঙলা সাহিত্যে নজরুল ইসলাম সেই শিল্পী, যিনি শুধু স্নিগ্ধ বন-প্রান্তরের ছবি আঁকেননি, পর্বতের পাথর কুঁদে বিরাট দানব মূর্তি এঁকেছেন।' ব্যথায় পিষ্ট, যন্ত্রণায় অধীর, মৃত্যু-যাতনায় কাতর সমস্ত আত্মারা যেন কোন বিশাল নরকের মধ্যে পড়ে হুহু করে কাঁদছে, আর তাদের আর্তনাদে ঘুমন্ত শবেরা পর্যন্ত যেন কবরের বুক ফেড়ে বেরিয়ে আসছে সেই আর্তনাদের উৎসের সন্ধানে। অন্তত আমরা যখন এই ধরনের গদ্যের মুখোমুখী হই :

> হরিৎ-বনের বুক চিরে বেরিয়ে এল এক রক্ত-কাপালিক। ভালে তার গাঢ় রক্তে আঁকা "অলক্ষণের তিলক রেখা", বুকে তার পচা শবের গলিত দেহ। আকাশে খড়্গ উৎক্ষিপ্ত করে কাপালিক হেঁকে উঠল—"বেটি রক্ত চায়!" কে যেন একটা থাবা মেরে সূর্যটাকে নিবিয়ে দিলে। শুধু অনন্ত প্রসারিত শ্মশান, তার মাঝে পাগলী বেটি ছিন্নমস্তা হয়ে আপনার রুধির আপনি পান করছে আর চ্যাচাচ্ছে "ম্যায় ভুখা-হুঁ—ম্যায় ভুখা-হুঁ!"

এটা শুধু বাগ্মিতার ভাষা নয়, অলংকারবহুল বক্তৃতা নয়, এ-হচ্ছে চিরকালের সাহিত্য-কাব্য; কারণ এতে আছে উচ্চকোটির মানবপ্রেম, যে বেদনা থেকে কাব্যের উৎপত্তি হয়েছিল, এর মধ্যে সেই অসহায় মানুষের আত্মার অরুন্তুদ চিত্র প্রকটিত। 'হরিৎ বনের বুক চিরে বেরিয়ে এল এক রক্ত কাপালিক' কিংবা 'কে যেন একটা থাবা মেরে সূর্যটাকে নিবিয়ে দিলে' এই দুটি চিত্রকল্প যিনি এখানে রচনা করেছেন, তিনি শুধুমাত্র একজন রাজনৈতিক বক্তা নন, তিনি একজন শিল্পী। সমস্ত যুগের দাহন-দগ্ধ অন্তরের আবেগকে কি নিশ্ছিদ্র সজাগ দৃষ্টি দিয়ে ধরা হয়েছে!

নজরুল ইসলামের গদ্য

গদ্যে অপর্যাপ্ত কাব্যিক শব্দ ব্যবহার, বিশেষণের ব্যবহার অথবা চিত্রকল্পের সৃষ্টি কিম্বা উপমা প্রয়োগ কোনো কোনো অতি সংযমী নিরাবেগ লেখক অথবা পাঠকের কাছে ত্রুটি বলে বিবেচিত হতে পারে, কিন্তু কতকগুলো কথা আছে যার কোন 'সাদা' প্রকাশ হয় না, অলংকার ছাড়া, উপমা ছাড়া, যার অর্থের তীব্রতা বাড়ে না, কেননা মুখের ভাষা আর হৃদয়ের ভাষা সম্পূর্ণ ভিন্ন। 'হৃদয়গ্রাহ্য হতে গেলে ভাষাকে হৃদয়-হারী হতে হয়। কবিতার মত গদ্যেও নজরুল ইসলাম বাঙলা সাহিত্যে ঐ হৃদয়-ভাষার স্রষ্টা।'

বাঙালী জাতীয়তাবাদ ও কাজী নজরুল ইসলাম

শিল্পীর আদর্শ সৌন্দর্য। কোন ধর্ম, জাতি, সম্প্রদায় অথবা পাত্র শিল্পীর আদর্শ নয়। সে জন্যেই খৃষ্টান মধুসূদনকে আমরা বলতে শুনি : When you sit down to read poetry, leave aside all religious bias.

এই রিলিজিয়াস বায়াস থাকলে মধুসূদনের পক্ষে 'মেঘনাদবধ কাব্য' কিংবা 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' কোনোটাই লেখা সম্ভব হত না। মধুসূদন হিন্দুধর্ম ত্যাগ করে খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু লক্ষ্য করবার বিষয়, ভারতীয় হিন্দু-সম্প্রদায়ের ঐতিহ্যকে তিনি দূরে সরিয়ে দিতে পারেননি। বন্ধু রাজনারায়ণ বসুকে লেখা এক চিঠিতে তিনি বলেছেন :

I must tell you, my dear fellow, that though, as a jolly Christian youth I don't care a pin's head for Hinduism, I love the grand mythology of our ancestors. It is full of poetry. If fellow with an inventive head, can manufacture the most beautiful things out of it.

এই উক্তি থেকেই সহজেই অনুমান করা যায় কবির সামাজিক অথবা সম্প্রদায়গত আদর্শ ও কবির শিল্পজীবনের আদর্শ দু'টি পৃথক ব্যাপার। এই ব্যাপারটিকে সুস্পষ্টভাবে বুঝতে পারলে কবি-চরিত্রের জটিলতা আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায়। ফেরদৌসী মুসলমান ছিলেন কিন্তু 'শাহ্‌নামা'য় প্রাক-মুসলিম যুগের ঐতিহাসিক চরিত্রের গুণগান করতে তাঁর মনে কোনো দ্বিধা জাগেনি। শিল্প এমনিভাবে দেশ-কাল-পাত্রের সীমা অতিক্রম করে সার্বজনীন হয়ে ওঠে। নজরুল ইসলামের জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে আমাদের উপরের কথাগুলি স্মরণে রাখতে হবে।

বাঙালী জাতীয়তাবাদ ও কাজী নজরুল ইসলাম

১৯২৯ সালে বাঙালী জাতির পক্ষ থেকে নজরুল ইসলামকে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। অভিনন্দন-পত্রে বলা হয় :

> তোমার অসাধারণ প্রতিভার অপূর্ব অবদানে বাঙালীকে চিরঋণী করিয়াছ তুমি। তোমার কবিতা বিচার বিস্ময়ের ঊর্ধ্বে সে আপনার পথ রচনা করিয়া চলিয়াছে পাগলা ঝোরার জলধারার মতো। সে স্রোতধারায় বাঙালী যুগ সম্ভাবনার বিচিত্র লীলাবিম্ব দেখিয়াছে। —বাংলার সরস কাব্যকুঞ্জ তোমার প্রাণের রঙে সবুজ মহিমায় বাড়িয়া উঠিয়াছে। তাহার ছায়া বাঙালীর পলকহারা নীল নয়নে নিবিড় স্নেহ অঞ্জন মাখাইয়া দিয়েছে। -----তুমি বাঙালীর ক্ষীণ কণ্ঠে তেজ দিয়াছ, মূর্ছাতুর প্রাণে অমৃতধারা সিঞ্চন করিয়াছ। --তুমি বাঙলার মধুবনের শ্যামাকোয়েলের কণ্ঠে ইরানের গুলবাগিচার বুলবুলের বুলি দিয়াছ। রসালের কণ্ঠে সহকার সাথে আঙুর লতিকার বাহু-বন্ধন রচনা করিয়াছ। তুমি বাঙালীর শ্যাম শান্ত কণ্ঠে ইরানী সাকীর লাল সিরাজীর আবেগ বিহ্বলতা দান করিয়াছ।

এবং ঐ সম্বর্ধনা সভার সভাপতি আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় বলেন : "আজ আমি এই ভাবিয়া বিপুল আনন্দ অনুভব করিতেছি যে, নজরুল ইসলাম শুধু মুসলমানের কবি নন, তিনি বাঙলার কবি, বাঙালীর কবি।" ঐ একই সভায় সুভাষচন্দ্র বসু বলেন :

> নজরুলের দুর্গম গিরি কান্তার মরু'র মত প্রাণ মাতানো গান কোথাও শুনেছি বলে মনে হয় না। কবি নজরুল যে স্বপ্ন দেখেছেন, সেটা শুধু তাঁর নিজের স্বপ্ন নয়, সমগ্র বাঙালী জাতির স্বপ্ন।

ঐ অভিনন্দন পত্র, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের ভাষণ এবং সুভাষচন্দ্রের ভাষণ থেকে মনে হয় যে, নজরুল বাঙালী জাতির আশা-আকাঙক্ষার বাণীরূপ দিতে পেরেছিলেন বলেই বাঙালী তাঁকে জাতীয় কবি হিসেবে সম্বর্ধনা দান করে। কিন্তু প্রশ্ন থাকে: বাংলাদেশে কি আর কবি ছিলেন না? তাঁদের বাণীতে কি বাংলার বাঙালীর অন্তরাত্মার প্রতিধ্বনি বেজে ওঠেনি? এবং নজরুল ইসলাম কি নিজেকে কেবল বাঙালীর কবি বলেই মনে করতেন?

অভিনন্দন পত্রেব জবাবে নজরুল বলেছিলেন :

> যাঁবা আমাব নামে অভিযোগ কবেন, তাঁদেব মত হলুম না বলে—তাদেব অনুবোধ, আকাশেব পাখীকে, বনেব ফুলকে, গানেব কবিকে তাঁবা যেন সকলেব কবে দেখেন। আমি এই দেশে এই সমাজে জন্মেছি বলেই শুধু এই দেশেবই, এই সমাজেবই নই। আমি সকল দেশেব, সকল মানুষেব। সুন্দবেব ধ্যান, তাব স্তবগানই আমাব উপাসনা, আমাব ধন। যে কুলে, যে সমাজে, যে ধর্মে, যে দেশেই জন্মগ্রহণ কবি, সে আমাব দৈব। আমি তাকে ছাড়িয়ে উঠতে পেবেছি বলেই আমি কবি।

অর্থাৎ যে-কোন সম্প্রদায়গত, মতবাদগত ও জাতিগত বন্ধনেব উর্ধ্বে তাব যে স্থান তা অনুমান কবতে বোধ হয বিলম্ব হওয়া উচিত নয। তাঁব এই কথাব সঙ্গে উনবিংশ শতাব্দীব ফবাসী দেশেব আব একটি কবি-কণ্ঠ মিলে যায। বোদলেযাব বলেছিলেন : "দ্রাঘিমা নেই তাঁব দেশেব। আব তিনি ভালবাসেন অমব দেবী সৌন্দর্যকে।" নজরুলও তাঁব অভিনন্দনেব এক জাযগায বলেছেন "সুন্দবেব ধেযানী দুলাল কীট্‌সেব মত আমাব মন্ত্র—Beauty is truth, truth is beauty."

মিলিযে দেখলে দেখা যাবে মধুসূদনেব, বোদলেয়াব-কীট্‌স ও নজরুল ইসলামেব কণ্ঠেব মূল সুবেব মধ্যে কোন তফাৎ নেই। মধুসূদন বলেছেন : "কবিতা পড়াব সময ধর্ম-আফিমেব নেশা থেকে মুক্ত হও।" বোদলেযাব কীট্‌সেব উপাস্য দেবী সৌন্দর্য। নজরুল বলেছেন : "সুন্দবেব ধ্যান, তাঁব স্তবগানই আমাব উপাসনা, আমাব ধর্ম।' তবু কেন তাঁব নামেব সঙ্গে "বাঙালী জাতীযতাবাদ" কথাটিব ইঙ্গিত ঝলকে ওঠে। কবিব নামেব সংগে জাতীযতাবাদের প্রশ্ন জড়িযে কবিকে কি ক্ষুদ্রতার সীমা বন্ধনীতে আশ্রিত কবা হয? এব সুস্পষ্ট জবাবেব পূর্বে "জাতীয-তাবাদ" শব্দটিব অর্থটি আমাদেব বুঝে নেওযা উচিত। জেনে নেওযা ভাল জাতীযতাবাদ সংকীর্ণতাব প্রশ্রযদাতা কিনা।

॥ ২ ॥

সাধাবণভাবে একটি বিশেষ ভৌগোলিক অবস্থানেব মধ্যে বসবাসকাবী কোন পবাধীন দেশেব বিভিন্ন সম্প্রদাযেব মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা ও তাদেব

মধ্যে স্বাধীনতাব স্পৃহা জাগ্রত কবার অর্থই জাতীযতাবাদ। এব সুস্পষ্ট নীতি হ'ল প্রত্যেক দেশেব প্রত্যেক জাতিব নিজেদেব দ্বারা স্বাধীনতা অর্জন, তাদেব ইচ্ছানুরূপ শাসনতন্ত্র প্রণযন ও বাজনৈতিক ভাগ্য নির্ধাবণ, সাম্রাজ্যবাদীদেব শাসনেব নাগপাশ থেকে নিপীড়িত জনগণেব স্বাধীনতা অর্জন, অন্য জাতিব সম্পর্ক বন্ধন থেকে মুক্ত হযে জাতিব স্বতন্ত্র স্বাধীন গঠন। বলা বাহুল্য, এই জাতীযতাবাদ ইউবোপীয বেনেসাঁসেব প্রত্যক্ষ অবদান। যাব প্রথম লক্ষ্য হ'ল বাজনৈতিক, সামাজিক বা অন্য কোন বিশেষ কাবণে অবলুপ্ত জাতীয সংস্কৃতিব বিভিন্ন ধাবাব পুনঃপ্রবর্তন। দ্বিতীযত, এব উদ্দেশ্য কেবল জড়তাপ্রাপ্ত ক্ষযিষ্ণু পুবনো জীবনকে ফিবিযে আনা নয, পুবনো ঐতিহ্যেব উপব নতুন আদর্শ সুপ্রতিষ্ঠিত কবা এবং পুবনো ঐতিহ্যেব সংগে নতুন ও পবিবর্তনশীল সামাজিক অবস্থাব সামঞ্জস্য বিধান। তৃতীয়ত, সমগ্র সমাজেব মধ্যে, বিশেষত, নবীন সমাজেব মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি কবে তাদেব মধ্যে অপূর্ব সৃজনী শক্তিব উন্মেষ ঘটানো যে সৃজনী শক্তি সকল বিষযে এক জাতিকে অগ্রগতিব পথ প্রস্তুত কবে। বস্তুত এ হ'ল একটি সর্ব-ব্যাপক সাংস্কৃতিক আন্দোলন। ইউবোপে এই আন্দোলনেব আগে মানুষেব ব্যক্তিসত্তা ও স্বাধীন চিন্তা পুবোহিতবাদীদেব ধর্মান্ধতাব অন্তবালে অর্গলবদ্ধ ছিল। বেনেসাঁস সেই বদ্ধ অর্গল বিচূর্ণ করে মানুষেব ব্যক্তি-সত্তা ও স্বাধীন চিন্তাকে মুক্তি দান কবে। বেনেসাঁসেব আবির্ভাবে মানুষ নিজেকে চিনবাব সুযোগ পায। সে বুঝতে পাবে মানবতা চিব-মুক্ত। এই আন্দোলনে ইউবোপ বিজ্ঞান, সাহিত্য, ভাস্কর্য, সংগীত ও ললিত-কলায প্রভূত উন্নতি সাধন কবে। সমগ্র ইউবোপ মানবমহিমাব গানে উচ্চকিত হ'যে ওঠে। জাতীযতাবাদ এই বেনেসাঁস আন্দোলনেব সঙ্গে গভীবভাবে সম্পৃক্ত থাকায কোন সংকীর্ণ চিন্তা শৃঙ্খলিত নয। আমবা জানি নজরুল ইসলামেব সাহিত্য উল্লিখিত গুণাবলী দ্বাবা সুশোভিত। সে জন্যেই বাঙালী মনীষীবা নজরুলকে বেনেসাঁসেব কবি বলে থাকেন। তাঁকে জাতীযতাবাদী বলাবও কারণ এই যে, ভাবতীয উপমহাদেশেব সকল সম্প্রদাযকে তিনি ঐক্যবদ্ধ কবতে চেযেছিলেন এবং বৃটিশ সাম্রাজ্য-বাদেব হাত থেকে সমগ্র ভাবতবাসীকে মুক্ত কবতে প্রয়াস পেয়েছিলেন। সবল কণ্ঠে একজন ভাবতীয় লেখক হিসেবে তিনিই প্রথম সুস্পষ্টভাবে

ইংরেজকে এদেশ থেকে চলে যাওয়ার নির্দেশ দেন। তাঁর একটি গদ্য রচনার কয়েকটি পংক্তি এমনি :

স্বরাজ-টরাজ বুঝি না, কেননা ও কথাটার মানে এক এক মহারথী এক এক রকম করে থাকেন। ভারতবর্ষের এক পরমাণু অংশও বিদেশীর অধীন থাকবে না। ভারতবর্ষের সম্পূর্ণ দায়িত্ব, সম্পূর্ণ স্বাধীনতা-রক্ষা, শাসনভার, সমস্ত থাকবে ভারতীয়ের হাতে। কোনো বিদেশীর মোড়লী করবার অধিকারটুকু পর্যন্ত থাকবে না। যাঁরা এখন রাজা বা শাসক হয়ে এ-দেশে মোড়লী করে দেশকে শ্মশান ভূমিতে পরিণত করছেন, তাঁদেরে পাততাড়ি গুটিয়ে, বোঁচকা পুঁটলি বেঁধে সাগর-পারে পাড়ি দিতে হবে।

লক্ষ্য করবার বিষয়, নজরুল ইসলাম যে দেশের স্বাধীনতা চেয়েছিলেন সে দেশ ভারতবর্ষ। উপর্যুক্ত উদ্ধৃতিতে ভারতবর্ষের কথাই উল্লেখিত আছে। যে কবিতায় তিনি বলেছিলেন :

প্রার্থনা করি যারা কেড়ে খায় তেত্রিশ কোটি মুখের গ্রাস
যেন লেখা হয় আমার রক্তলেখায় তাদের সর্বনাশ॥

সেখানে সমগ্র ভারতীয় জনসংখ্যার কথা উল্লেখ আছে। অন্য একটি কবিতায় বলেছিলেন :

"এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে" হে ঋষি
তেত্রিশ কোটি বলির ছাগল চরিতেছে দিবানিশি।

এখানেও সেই তেত্রিশ কোটি জন-সংখ্যার কথাও উল্লেখিত। অতএব নজরুলকে তখনকার দিনের এই তেত্রিশ কোটি জন-অধ্যুষিত ভারতের কবি বলাই সংগত হয়। জাতীয়তাবাদী কবি হলে তিনি এই ভারতীয় জাতীয়তাবাদীর কবি। তবে কি করে প্রমাণ করা যায় তিনি বাঙালী জাতীয়তাবাদের কবি।

॥ ৩ ॥

নজরুল ইসলামের সাহিত্য জীবনের প্রথম দিককার কবিতায় আমরা প্রায় মুসলিম জাতীয়তাবাদের একটা রূপ লক্ষ্য করি। সে সময়

জগদ্ব্যাপী যে প্যান-ইসলামিজমের আন্দোলন চলছিল, নজরুলের কবিতায় তারও সুর লক্ষ্য করা যায়। তাঁর একটি কবিতায় আছে :

"নাই তাজ তাই লাজ ?
ওরে মুসলিম খর্জুর শিষে তোরা সাজ।"

এখানে শতধা বিভক্ত মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্যে আবেদন আছে। কিন্তু মনে রাখা দরকার কবি কোন সংকীর্ণ মনোভাব নিয়ে এই আদর্শকে গ্রহণ করেননি। তিনি "শাতিল আরবে"র উপর কবিতা লিখেছেন, আরব বীরদের প্রশংসা করেছেন কিন্তু ঐ কবিতার শেষাংশে বলেছেন :

ইরাক বাহিনী। এ যে গো কাহিনী,—
কে জানিত কবে বঙ্গবাহিনী
তোমারও দুঃখে "জননী আমার।" বলিয়া ফেলিবে তপ্ত নীর!
রক্ত ক্ষীর—
পরাধীনা। একই ব্যথায় ব্যথিত ঢালিল দু'ফোঁটা রক্ত বীর।"

সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা শোষিত আরব-ভূমির সংগে এখানে বাঙালীর একাত্মতাবোধের চিত্রটি লক্ষণীয়। পরাধীন মানুষ যেখানেই থাকুক সে পরাধীনদের সগোত্রীয়। যে মুসলমানদিগকে নজরুল ইসলাম জাগাতে চেয়েছিলেন তারা পরাধীন। সে জন্যেই নজরুল ইসলাম 'কামাল পাশাকে' মুসলমান হিসাবে বন্দনা করেননি তিনি তাঁকে স্বাধীনতা আন্দোলনের অগ্রনায়ক হিসেবে বন্দনা করেছেন। বলা বাহুল্য, নজরুলের 'রসুল বন্দনা' মানব-মুক্তির বন্দনা। কেননা ইউরোপের রেনেসাঁস আন্দোলনের পূর্বেই মুহম্মদ (দঃ) আরবে রেনেসাঁসের সূত্রপাত করেন। তমসা আক্রান্ত এক জাতিকে তিনি আলোকের অনুসন্ধান দান করেন।

যা হোক ভারতবাসী হিসেবে নজরুল ইসলামের যেমন ভারতীয় জনগণের দিকে লক্ষ্য ছিল তেমনি বাঙালী হিসেবে বাংলাদেশের জনগণের প্রতি তাঁর বিশেষ লক্ষ্য ছিল। এখানে বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে ভারতের রেনেসাঁস আন্দোলন বাংলাদেশ থেকে শুরু হয়েছিল। প্রারম্ভে যে বাঙালীটি আন্দোলনের সূত্রপাত করেন তিনি রাজা রামমোহন।

কুসংস্কারের বিরুদ্ধে ধর্মীয় গোঁড়ামীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়েছিলেন বলে রামমোহনকে রেনেসাঁসের অগ্রদূত বল্‌লেও জাতীয়তাবাদীর সংজ্ঞা অনুযায়ী রামমোহন জাতীয়তাবাদী ছিলেন না। সার্বভৌম স্বাধীন রাষ্ট্রের স্বপ্নদ্রষ্টার বিপ্লবী ভূমিকা রামমোহনের নয়। এই ভূমিকা "নব হিন্দুবাদীদেরও" নয়।

হিন্দু ও মুসলমান সমাজের ঐক্য সাধনের শ্রেষ্ঠতম ভূমিকা হ'ল নজরুল ইসলামের। তিনি হিন্দু ও মুসলমান এই উভয় সম্প্রদায়কে শুধু মেলাবার চেষ্টা করেননি তাদের কৃষ্টি, সভ্যতা ও ঐতিহ্যকে তাঁর সাহিত্যে রূপায়িত করে তুলেছেন। একদিকে যেমন হিন্দু-পুরাণ অন্যদিকে তেমনি মুসলিম পুরাণকে নতুন রূপে ব্যবহার করে, ঐতিহ্যের পুনরাবর্তন করে পরিবর্তনশীল সামাজিক অবস্থার সংগে মিলিয়ে দিয়েছেন। তাঁর রাবণ, তাঁর এজিদ সাম্রাজ্যবাদী শোষক, তাঁর শ্যামা চণ্ডি, খালিদ মানুষের মুক্তি-চেতনা। সুতরাং বলা যেতে পারে ইতালীর মহাকবি দান্তে ও ইংল্যাণ্ডের মহাকবি চসারের যে ভূমিকা, নজরুল ইসলামের সেই একই ভূমিকা। এখানে বলা অপ্রাসংগিক হবে না যে, দান্তে অথবা চসার পৌত্তলিক না হয়েও গ্রীক-পুরাণকে বর্জন করেননি। রেনেসাঁসের যুগের কোন শিল্পী-সাহিত্যিকই গ্রীক-পুরাণকে বর্জন করেন নি। তার নতুন অর্থ দান করেছিলেন। একইভাবে নজরুল ইসলামও সেই ভূমিকা পালন করেছেন। এই নব চেতনা বাঙালী হিসেবে বাঙালীকে দান করতে পেরেছিলেন বলেই তিনি বাঙালী জাতির কবি। এবং ঐক্যবদ্ধভাবে প্রকৃত বাঙালী সংস্কৃতির উদ্বোধন ঘটিয়ে, শ্রেণী বৈষম্যের কাঠামো ভেঙে জাতিগত বৈষম্যের অহংকারের দেয়াল চূর্ণ করে একটি উদার, সাহসী এবং প্রগতিশীল জাতি সৃষ্টি করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন বলে তাঁকে বাঙালী জাতীয়তাবাদের কবি বলা যায়। অন্য যে-কোন কারণ অযৌক্তিক—কেননা নজরুল কবি হিসেবে ধর্ম-বর্ণ-জাতির উর্ধ্বে। তাঁর মৌল আদর্শ সৌন্দর্য—একমাত্র সৌন্দর্য।

নজরুল ইসলাম ও বুদ্ধদেব বসু

আমার অনেকদিন থেকে ইচ্ছা ছিল নজরুল ইসলাম ও বুদ্ধদেব বসু আমার একটি প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় হবে। এবং তা এ জন্যে যে, ত্রিশোত্তর পাঁচজন আধুনিক বাংলা-কাব্যের পথ-দ্রষ্টাদের মধ্যে নজরুলের উপর একটি ক্ষুদ্র নিবন্ধের লেখক জীবনানন্দ দাশ ছাড়া নজরুলকে তিনি বিভিন্ন সময়ে স্মরণ করেছেন, শ্রদ্ধা করেছেন, সমালোচনা করেছেন এবং সত্যিকার কবি বলে চিহ্নিত করেছেন। নজরুলের ব্যাপারে বুদ্ধদেব বসুর সকল মতামতকে আমি কখনও অভ্রান্ত বলে মেনে নিতে পারিনি। যদিও আমি লক্ষ্য করেছি এ বাংলাদেশের বহু অধ্যাপক, সমালোচক এব কবি বুদ্ধদেব বসুর ঐ মতামতকে অকাট্য সিদ্ধান্ত হিসেবে গ্রহণ করেছেন এবং নজরুলের উপর তাঁরা যে প্রবন্ধই লিখুন না কেন, আদর্শ হিসেবে বুদ্ধদেব বসুর মন্তব্যগুলোকে তাঁরা অনতিক্রম বলে মেনে নিয়েছেন। সাহিত্য ক্ষেত্রে তাঁর ব্যক্তিত্বের স্বরূপটা এর থেকে অনুমান করা যেতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠ পড়ুয়া ছাত্র হিসাবে, বিশ্ব-সাহিত্যের অতুলনীয় পাঠক হিসাবে, তুলনামূলক সাহিত্যের অদ্বিতীয় অধ্যাপক হিসাবে, প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যরসিক ও রসজ্ঞ হিসেবে আধুনিক বিশ্বকাব্যের রসভোক্তা হিসাবে, সর্বোপরি কবি, অনুবাদক, গাল্পিক, ঔপন্যাসিক, নাট্যকার ও প্রাবন্ধিক হিসাবে এবং আধুনিক কাব্যের রসপণ্ডিত ও ব্যাখ্যাতা হিসেবে নিজের যে মূর্তিকে তিনি গড়ে তুলেছিলেন তাতে তাঁর বক্তব্যকে সুতীক্ষ্ণ মনোযোগ দিয়ে নিজস্ব প্রজ্ঞাদৃষ্টির সহায়তায় বিচার করে গ্রহণ করার শক্তি পর্যন্ত অনেকের ছিল না। অভিধান যেমন শুদ্ধ বানানের নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ বুদ্ধদেব বসু তেমনি অনেকের কাছে নির্ভরযোগ্য শুদ্ধতম বিচারক। যদিও জানি আজকের দিনে মাইকেল মধুসূদন দত্তের উপর লেখা বুদ্ধদেব বসুর রচনাটি কোন মধুসূদন ভক্তের এবং মধুসূদনবিদের কাছে তেমন নির্ভরযোগ্য রচনা আদৌ

নয়। মধুসূদন সম্পর্কিত বুদ্ধদেব বসুর বিখ্যাত উক্তিগুলো এই প্রসংগে উদ্ধৃত করা যেতে পারে :

১. মাইকেলি ছন্দের প্রধান দোষ এই যে সেটা আগাগোড়াই অত্যন্ত বেশী কড়া, তাতে নিচু গলা কখনো শুনি না, নরম সুর কখনো বাজে না ! সেটা কোনোখানেই গান নয়, সমস্তটাই বক্তৃতা।

২. মাইকেল বিদ্যার অনুধাবন করলেও রুচি অর্জন করেননি।

৩. যদিও অনেকগুলি ভাষা শিখেছিলেন এবং পড়েছিলেন বিস্তর, তবু এ-কথা মনে করতে পারি না যে তিনি ঠিক মতো পড়া-শুনা করেছিলেন।

৪. তাঁর প্রায় সমস্ত রচনাতে কলাকৌশল যেন কলকব্জার মতো কাজ করে ! এই জন্যই তাঁর অনুপ্রাস শিশুদোষ, উপমা দ্যুতিহীন, পুনরুক্তি ক্লান্তিকর।

৫. তাঁর কর্মসূচীতে দেখতে পাই পরীক্ষার পর পরীক্ষা—পদ্যে ও গদ্যে, নাট্যে ও কাব্যে শুধু পরীক্ষা। অনেকটা তাঁর নিছক চর্চা, নিতান্তই লিখতে শেখা, প্রাক্ 'মানসী' রবীন্দ্র-রচনার সগোত্র, অনেকটাই অবিমিশ্র অপব্যয়, যে অপব্যয় যে-কোনো সৃষ্টি প্রক্রিয়ায় অপরিহার্য। দেখতে পাই, যেদিকে তাঁর সহজাত ক্ষমতা সেদিকে তাঁর যথোচিত মনোযোগ নেই ; যেটা তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ, যেন বাজি রেখে সেইটে করার দিকেই ঝোঁক।

৬. মাইকেলের ছন্দ ঢাকের বাদ্যির মতো, তাতে জোর আওয়াজ কিন্তু বেশ নেই।

৭. রবীন্দ্রনাথের সিদ্ধান্ত যদিও স্বীকার্য যে 'বাঙালী কবিকে তবলাওয়ালার দল থেকে প্রথম অব্যাহতি দিয়েছিলেন তিনিই' এবং এইখানেই তাঁর ঐতিহাসিক প্রাধান্য, তবু আন্তরিক বিচারে তাঁকে অপরিণত অকালমৃত কবির মতই আমাদের লাগে আজকাল ;—তাঁকে মনে হয় এমন কোনো কবি, নিজের শক্তির ব্যবহার যিনি জানেন না, নিজের উদ্দেশ্যকে নিজেই পরাস্ত করেন।

বুদ্ধদেব বসুর এই প্রবন্ধের অনুরূপ একটি তীব্র সমালোচনা কিশোর বয়সে লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। সেখানে তিনি "মেঘনাদবধ কাব্য" সম্পর্কে নিম্নোক্ত উক্তি করেছিলেন :

> মেঘনাদবধ কাব্যে ঘটনার মহত্ত্ব নাই, একটা মহৎ অনুষ্ঠানের বর্ণনা। তেমন মহৎ চরিত্রও নাই।...মেঘনাদবধ কাব্যের পাত্রগণেব চরিত্রে অনন্যসাধাবণতা নাই, অমরতা নাই। মেঘনাদবধে রাবণে অমরতা নাই, রামে অমরতা নাই, লক্ষ্মণে অমরতা নাই. এমনকি ইন্দ্রজিতেও অমরতা নাই। আমি মেঘনাদবধের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ লইয়া সমালোচনা করিলাম না—আমি তাহার মূল লইয়া তাহার প্রাণের আধার লইয়া সমালোচনা করিলাম, দেখিলাম তাহার প্রাণ নাই, দেখিলাম তাহা মহাকাব্যই নয়।

রবীন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে তাঁর ঐ কৈশোরিক উক্তির জন্য দুঃখ প্রকাশ কবে লেখেন :

> ...আমি অল্প বযসের স্পর্ধার বেগে মেঘনাদবধের একটি তীব্র সমালোচনাও লিখিয়াছিলাম। কাঁচা আমের রসটা অম্লরস—কাঁচা সমালোচনাও গালিগালাজ। অন্য ক্ষমতা যখন কম থাকে তখন খোঁচা দিবার ক্ষমতাটা খুব তীব্র হইয়া উঠে। আমিও এই অমর কাব্যের উপর নখরাঘাত করিয়া নিজেকে অমর করিয়া তুলিবার সর্বাপেক্ষা সুলভ উপায় অন্বেষণ করিতেছিলাম।

এবং মধুসূদনের কাব্যের প্রকৃত রূপ উদ্‌ঘাটন করে পরিণত বয়সে 'বাংলা সাহিত্যের ক্রমবিকাশ' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লেখেন :

> মধুসূদন সংগীতের দুর্নিবার উৎসাহ ঘোষণা করবার জন্যে আপন ভাষাকেই বক্ষে টেনে নিলেন। যে যন্ত্র ছিল ক্ষীণধ্বনি একতারা তাকে অবজ্ঞা করে ত্যাগ করলেন না, তাতেই তিনি গম্ভীর সুরের নানা তার চড়িয়ে তাকে রুদ্রবীণা করে তুললেন। এ-যন্ত্র একেবারে নতুন, একমাত্র তাঁরই আপনগড়া। অপরিচিত অমিত্রাক্ষর ছন্দের ঘন-ঘর্ঘর মন্দ্রিত রথে চড়ে বাংলা সাহিত্যে সেই প্রথম আবির্ভূত হ'ল আধুনিক কাব্য 'রাজবদুন্নতধ্বনি'—।

বঙ্গবাণীকে গম্ভীর স্বরনির্ঘোষে মন্দ্রিত করে তোলবার জন্য সংস্কৃত ভাণ্ডার থেকে মধুসূদন নিঃসঙ্কোচে যে-শব্দ আহরণ করতে লাগলেন সেও নূতন, বাংলা পয়ারের সনাতন সমবিভক্ত আল ভেঙে দিয়ে তার উপর অমিত্রাক্ষরের যে বন্যা বইয়ে দিলেন সেও নূতন, আর মহাকাব্য খণ্ডকাব্য রচনায় যে রীতি অবলম্বন করলেন তাও বাংলা ভাষায় নূতন।

এই দু'টি লেখাই বুদ্ধদেব বসু পড়েছিলেন। তবু রবীন্দ্রনাথের কৈশোরিক উক্তিকেই তিনি সঠিক বলে ভাবতে দ্বিধা করেননি। কিন্তু তাঁরও ভুল ভাঙে এবং এই ভ্রম অপনোদনের জন্য তিনি সচেষ্ট হন। সুধীন্দ্রনাথের 'পদধ্বনি'র সমালোচনা করতে গিয়ে তিনি সেই সুযোগ পান এবং সেখানে তিনি বলেন :

বলেছিলুম মধুসূদন 'নির্জীব' কিন্তু এই পূর্বসূরীর সঙ্গে—এমনকি মিল্টনের সঙ্গে—সুধীন্দ্রনাথের আত্মীয়তা ক্রমশই স্পষ্ট হয়ে উঠছে। আর যদিও 'বীরাঙ্গনা কাব্যে' 'সংবর্ত' কবিতার হার্দ্য আবেদন সুদূরপরাহত, তবু সুধীন্দ্রনাথ অন্তত এটুকু প্রমাণ করেছেন যে মধুসূদনের কাছে বাঙালী কবির এখনো কিছু শেখবার আছে।

বুদ্ধদেব বসুর সারা জীবনের সাহিত্যালোচনায় মাঝে মাঝে এই অব্যবস্থিতচিত্তের প্রকাশ ঘটেছে। অন্যের সাহিত্য বিচারে তাঁর মতের এই রদবদলের পরিমাণ বেড়ে যাওয়াতে নিজের সমালোচনার কৈফিয়ৎ হিসেবে সাহিত্য আলোচনা সম্পর্কে এক বিশদ প্রবন্ধে তিনি নিম্নোক্ত বক্তব্য প্রকাশ করেন :

সাহিত্য বা শিল্পকলা এমন বিষয়, যা নিয়ে শেষ কথা কেউ বলতে পারেনি, বলতে পারে না। কতগুলি সুনির্দিষ্ট নীতির প্রবর্তন করে সমালোচনাকে একটি সুবিন্যস্ত বিজ্ঞানের সীমার মধ্যে টেনে আনবার চেষ্টা হয়েছে বারবার, বারবার চেষ্টা ব্যর্থ করেছে নবীন জীবন্ত সাহিত্যের অভাবনীয়তা। যাকে এক্জাক্ট সায়েন্স বলে সমালোচনার প্রকৃতি ঠিক তার বিপরীত, এখানে সবই আপেক্ষিক, সবই আনুমানিক, সবই মোটামুটি কথা।

বুদ্ধদেবের নিজের সমালোচনা সম্পর্কে উদ্ধৃত উক্তি প্রযুক্ত হলে তাঁর সমস্ত জীবনের সমালোচনার মেরুদণ্ড ভেঙে যেতে বাধ্য, তাঁর কোন কথা কিছুতেই বিশ্বস্ত হতে পারে না, কিছুতেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। যাঁরা ইংরেজী সাহিত্যের ছাত্র, তাঁরাই বুঝবেন, বুদ্ধদেব নিজের উপলব্ধিজাত এবং অনুভূতিপ্রাপ্ত জ্ঞানের চেয়ে তিনি অন্যের জ্ঞান ও প্রজ্ঞাপ্রদীপ্ত বিচারের প্রতি আকর্ষণ বোধ করেছেন, অনুপ্রাণিত হয়েছেন, নিজের বক্তব্যের প্রতি গভীর আত্মবিশ্বাসের অভাবে অন্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন, নিজের চেতনালব্ধ সত্যকে কখনও বাগে আনতে পারেননি। এর কারণ সমালোচনায় তিনি সব সময় নিরাসক্ত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি প্রয়োগে অসমর্থ হয়েছেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে অনুভূতিসঞ্জাত আবেগের শিকার হয়েছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর পছন্দীয় বিষয় কি হতে পারে তা তাঁর লেখা দেখে অনুমান করা তেমন কঠিন নয়।

সাহিত্য, বিশেষ করে কাব্য, রসের ব্যাপার। পণ্ডিতেরা কাব্যের এই রসকে কেউ বা আট কেউ বা ন'ভাগে ভাগ করেছেন। এর মধ্যে প্রধান যে রস তা বীর ও রৌদ্র রস। এটাই মহাকাব্যের প্রধান রস। এর পাশাপাশি বীভৎস, করুণ, বাৎসল্য, শৃঙ্গার ইত্যাদি রসের অবস্থান। সাধারণ গীতি-কাব্যে বীর ও রৌদ্র রসের তেমন সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। গীতি-কাব্যে শৃঙ্গার, শান্ত ও করুণ রসের আধিক্য বেশী। কোন কোন রসপণ্ডিত কাব্যের আদি রসকে শ্রেষ্ঠ রস বলে মনে করেন। এই আদি রসের শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে কালিদাসের "মেঘদূত" মহাকাব্য। আর এই মহাকাব্যের কবি কালিদাস। কিন্তু পৃথিবীতে প্রধান স্বীকৃত চারটি মহাকাব্য ইলিয়াড, এনিড, রামায়ণ ও মহাভারত। বীর, রৌদ্র ও করুণ রস এই মহাকাব্য চতুষ্টয়ের প্রধান রস। বুদ্ধদেব বসুর লেখা থেকে বোঝা যায় যে, তাঁর পক্ষপাতিত্ব আদি রসের প্রতি। তিনি কোমলতা পছন্দ করেন এই জন্যেই মাইকেলের ছন্দ তাঁর কানে ঢাকের মত বেজেছে এবং বলা বাহুল্য "বিদ্রোহী"[১] কবিতা তাঁর কাছে "হৈ হৈ" বলে মনে হয়েছে।

১। যতদিন না 'বিদ্রোহী' কবিতার নিশেন উড়িয়ে হৈ হৈ করে নজরুল ইসলাম এসে পৌঁছলেন। রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরসাধক : সাহিত্য-চর্চা।

কড়া তীক্ষ্ণ উদ্দীপক স্বর তাঁর পছন্দ নয় বলে মধুসূদন তাঁর গভীর আক্রমণের লক্ষ্য হয়েছিলেন এবং নজরুল ইসলামও। 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র সংগে 'অগ্নিবীণা'র ছন্দের কোন মিল নেই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যে কারণে 'মেঘনাদবধ কাব্য'কে 'রুদ্রবীণা' বলেছেন সেই একই কারণে নজরুলের প্রথম কাব্য "অগ্নিবীণা"। কেননা উভয় কাব্যের প্রধান রস 'বীর' ও 'করুণ'। "মেঘনাদবধ কাব্যে"র ছন্দ যেমন মনকে একটা রাজকীয় গাম্ভীর্যে উত্তীর্ণ করে একটা বীর মেজাজে উদ্দীপ্ত করে, "অগ্নি-বীণা"ও তেমনি সুপ্ত মনকে জাগিয়ে দেয়, অধঃপতিত চিত্তকে গগনের মুখ-চুম্বনের স্পর্ধা দান করে। ১৯৪৪ সালে নজরুল ইসলামের উপব বুদ্ধদেব বসু যে প্রবন্ধ লেখেন সে প্রবন্ধের আক্রমণ ভাগের কথাগুলো বুদ্ধদেব বসুর একার নয়, বুদ্ধদেব বসুর পূর্বে কলকাতা সমাজের পণ্ডিতদেব তর্ক সভার কথা। যে তর্কের মধ্যে একদিন রবীন্দ্রনাথকেও অংশ নিতে হয়েছিল এবং যেখানে রবীন্দ্রনাথ এমনি উক্তি করেছিলেন : "যুগের মনকে যা প্রতিফলিত করে তা কাব্য নয়—মহাকাব্য।" এই তর্কসভার আলোচ্য কবি নজরুল ইসলামের কাব্যের লিখিত সমালোচনা না থাকলেও (—যাকে সত্যিকার সাহিত্য সমালোচনা বলা যায়—) মৌখিক সমালোচনা ছিল এবং নজরুলও এ-বিষয়ে অবহিত ছিলেন। এর প্রমাণ ইবরাহিম খাঁর কাছে লিখা নজরুল ইসলামের সাহিত্য-ঐশ্বর্যে বিত্তবান পত্রটি।

সমালোচনা সাহিত্যে নজরুলের কোন অবদান নেই বললেই চলে। কিন্তু মাঝে মাঝে গদ্য লেখায় তাঁর সমাজ যেমন সমালোচিত হয়েছে তেমনি অতি ক্ষীণ কিন্তু গভীরভাবে সাহিত্য সমালোচনায় তাঁর তীক্ষ্ণ দৃঢ় উজ্জ্বল দৃষ্টি ফুটে উঠেছে। এ দৃষ্টি আমরা তাঁর 'বড়র পীরিতি বালির বাঁধ' এবং "বিশ্ব সাহিত্য" নামক প্রবন্ধ দুটিতেও উপস্থিত দেখেছি। তাঁর যে আত্মসমালোচনা করবার মত শিল্পদৃষ্টি ছিল ঐ সব লেখা থেকে তা অনুমান করা যায় এবং বুদ্ধদেব বসু তাঁর কাব্য সম্পর্কে যে "চিন্তাহীন অনর্গলতা"* বিশেষণটি প্রয়োগ করেছিলেন সেটাকে অমনোযোগী নজরুল পাঠকের ভাবনাহীন উক্তি বলে মনে করা যেতে পারে।

* 'এ-দিক থেকে বায়রনের সঙ্গে নজরুলের সাদৃশ্য ধরা পড়ে—সেই কাচা, কড়া উদ্দাম শক্তি, সেই চিন্তাহীন অনর্গলতা, কাব্যের কলকব্জার উপর সেই সহজ নিশ্চিত দখল, সেই উচ্ছৃংখলতা—নজরুল ইসলাম : কালের পুতুল।

এখানে নজরুল তাঁর সমালোচকদের কি ভাবে জবাব দিয়েছিলেন ইব্রাহিম খাঁর কাছে লেখা পত্র থেকে তারই কিয়দাংশ উদ্ধার করা যাক :

'আমার লেখা কাব্য হচ্ছে না, আমি কবি নই" এ বদনাম সহ্য করতে হয়ত কোন কবিই পারে না। কাজেই যারা করছিল মানুষের বেদনার পূজা, তারা এখন করতে চাচ্ছে প্রাণহীন সৌন্দর্য সৃষ্টি। এমন একটা যুগ ছিল—সে সত্যযুগই হবে হয়ত—যখন মানুষের দুঃখ এত বিপুল হয়ে ওঠেনি। তখন মানুষ নিশ্চিন্ত নির্ভরতার সঙ্গে ধ্যানের তপোবনে শান্ত সামগান গাইবার অবকাশ পেয়েছে। কিন্তু যেই মাত্র মানুষ নিপীড়িত হতে লাগল, অমনি সৃষ্টি হ'ল বেদনার মহাকাব্য,—রামায়ণ, মহাভারত, ইলিয়াড প্রভৃতি। আর তাতে আজকালকার বেঁড়ে ওস্তাদ, সমালোচকদের তথাকথিত "বীভৎস বিদ্রোহ বা রুদ্র রসের" প্রাধান্য থাকলেও তা কাব্য হয়নি এমন কথা কেউ বলবে না।

অসাধারণ আত্মবিশ্বাসে সমুজ্জ্বল বিদ্রূপ-কটাক্ষে বলীয়ান এই সমালোচনা প্রমাণ করে নজরুল কি করতে চাচ্ছিলেন তা তাঁর সম্পূর্ণ জানা ছিল। দূর ভবিষ্যৎ পর্যন্ত তাঁর দৃষ্টি সম্প্রসারিত ছিল বলেই তিনি গভীর গর্বের সঙ্গে বলতে পেরেছিলেন :

এই বেদনার গান গেয়েই আমাদের নবীন সাহিত্য-স্রষ্টাদের জন্য সিংহাসন গড়ে তুলতে হবে। তারা যদি কালিদাস, ইয়েটস, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি রূপস্রষ্টাদের পাশে বসতে নাই পায়—পুশকিন, দস্তয়েভস্কি, হুইটম্যান, গোর্কি, যোহান বোয়ারের পাশে ধূলির আসনে বসবার অধিকার পাবেই। এই ধূলির আসনই একদিন সোনার সিংহাসনকে লজ্জা দেবে, এই ত আমাদের সাধনা।

আজকের দিনে এসে নজরুলের ঐ কথাগুলো ঋষিবাক্যের মত জ্বল জ্বল করে উঠেছে। আমরা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি রবীন্দ্রনাথদের মত রূপস্রষ্টা সাহিত্যিক কবিদের রচনার বাক্স খুলে তাঁদের ভক্তরাই তাঁদের সমাজতান্ত্রিক, গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গিকে আতিপাতি ক'রে খুঁজে বের করার

চেষ্টা করছেন। রবীন্দ্রনাথ যে এখনও তাঁদের কাছে গুরু সে তাঁর রূপ-সৃষ্টির জন্যে, অন্তত বর্তমানে নন, তাঁর সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি আংশিক পক্ষপাতের জন্যে। 'আফ্রিকা'র মত দু'একটি কবিতায় সাম্রাজ্য-বাদী শোষকের প্রতি রবীন্দ্রনাথের ঘৃণা কখনো রবীন্দ্রনাথকেও রূপস্রষ্টাদের কোল থেকে সরিয়ে এনেছিল। এবং এই এনেছিল বলেই রবীন্দ্রনাথ বামপন্থীদের পুরোপুরি আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হয়ে ওঠেননি। অর্ধ শতকের বেশী না বাঁচলে রবীন্দ্রনাথ মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গির কাছে খুব বেশী মর্যাদা পেতেন বলে মনে হয় না।

বুদ্ধদেব বসু নজরুল সম্বন্ধে লিখেছেন : "বিদ্রোহী" কবি, 'সাম্যবাদী কবি' কিংবা 'সর্বহারা'র কবি হিসেবে মহাকাল তাঁকে মনে রাখবে কিনা জানি না। এ কথার অর্থ এই দাঁড়ায় যে ঐ সব লেখা নেহাৎই অকাব্যিক তাতে চিরন্তন কাব্যের সুর নেই। তা হলে জিজ্ঞাসা জাগে মানুষের বেদনার গান—'ইলিয়াড, রামায়ণ, মহাভারত' কোন্ সুরের ?

' এখানে একটি বিষয় আলোচিত হওয়ার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি। রবীন্দ্রনাথ কাব্যকে দু'টি ভাগে ভাগ করেছেন। একটি কাব্য তখনই যখন তা ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ, শোক-অশোকের বীণাতন্ত্রীতে রূপা-ন্তরিত হয়। আর অন্য কাব্যটি তখনই মহাকাব্যের পর্যায়ে উন্নীত হয় যখন তার বীণাতন্ত্রীতে অনুরণিত হয়ে ওঠে মহাজাতির মহাবেদনার গান। "অগ্নিবীণা", "বিষের বাঁশী", "সন্ধ্যা". "সর্বহারা", "সাম্যবাদী' "জিঞ্জির" এইসব কাব্যগ্রন্থ মহাজাতির মহাবেদনার মহাদুঃখের আর্তকণ্ঠের মহাসংগীত। একটি জাতির একটি যুগের মৃত্যু-পীড়িত কণ্ঠের ভাষা রূপায়িত হয়ে উঠেছে ঐ সব কাব্যে। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের 'যুগের মনকে যা প্রতিফলিত করে তা কাব্য নয় মহাকাব্য।'—এই উক্তি প্রয়োগ করে মহাজাতীয় ঐ সংগীতকে মহাকাব্যের গান বলা যেতে পারে। '

১৯৪৪-এর নজরুলকে নিবেদিত বুদ্ধদেব সম্পাদিত "কবিতা"র দশম বর্ষের কার্তিক-পৌষ সংখ্যার সম্পাদকীয়তে বুদ্ধদেব বসু বলেন, "নজরুল মহাকবি নন, কিন্তু সত্যিকার কবি; তাঁর সম্বন্ধে চিন্তা করলে সাহিত্যের

মূল্যবোধ সাধারণের মনে ফিরে আসতে পারে,—ক্ষণ-যশস্বীও উপকৃত হতে পারেন।”—এই উক্তির মধ্যে যথেষ্ট শ্রদ্ধাবোধ দৃষ্ট হলেও নজরুলের প্রকৃত আসন কোথায় হতে পারে বুদ্ধদেব বসু তা সঠিক নির্ণয় করতে পারেননি। নজরুল ইসলাম যে যথার্থ মহাকবির কর্তব্য পালন ক'রছেন তা আজও আমরা পুরোপুরি হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছি বলে মনে হয় না। নজরুল তাঁর অধঃপতিত স্ব-সমাজের ক্লিষ্ট কণ্ঠের শ্রেষ্ঠতম রূপকার তো বটেনই তিনি এশিয়া তথা বিশ্বের নিপীড়িত বঞ্চিত মানুষের বেদনাপ্লুত হৃদয়-বীণারও তুলনাহীন শিল্পী। তাঁর এই সৃষ্টি-কমের পরিমাণ স্বল্প হতে পারে কিন্তু গুণগত ঐশ্বর্যে তা ন্যূন নয়।

এখানে বলা যেতে পারে জাতীয় চৈতন্যকে কাব্যবীণায় উপস্থাপিত না করে কেউ মহাকবি হতে পারে না। এবং এ কথাও সত্য একমাত্র “মহাকাব্য” লিখে “মহাকাব্যে”র সূত্রানুযায়ীই শুধু মহাকবি হওয়া যায় না। হাফিজ কেন গীতিকাব্যের লেখক হয়েও মহাকবি, রবীন্দ্রনাথ কেন গীতিকাব্যের লেখক হয়েও মহাকবি তার সূত্রানুসন্ধানেই বেরিয়ে পড়বে যে এক মহাজাতির হাজার হাজার বছরের ঐতিহ্যের, আকাঙক্ষার এবং চেতনার যোগ্যতম রূপকার হয়েই তবে মহাকবির গৌরব অর্জন করতে হয়। এই গৌরব নজরুল অর্জন করেছিলেন। নইলে তিরিশ বছরের একটি যুবককে গোটা জাতি মিলে সম্বর্ধনা জানায় না, সোনার দোয়াত-কলম পুরস্কার দেয় না। এ পুরস্কার নোবেল প্রাইজের চেয়েও বড় পুরস্কার। কেননা বড় বলে স্বীকার করার ঔদার্য নিজের লোকেরই অধিকাংশ ক্ষেত্রে থাকে না।

যা হোক, তবু বুদ্ধদেব বসু, একমাত্র বুদ্ধদেব বসুই নজরুলকে বহুবার বহুভাবে স্মরণ করেছেন। জীবিত থাকা অবস্থায় অনেক মহা-কবির পক্ষে সমকালীন লোকের কাছ থেকে স্বীকৃতি আদায় করে নেয়া সম্ভব হয়নি। ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ব্যক্তির মূল্য কখনও অমূল্য হয়ে ওঠে না। ব্যতিক্রম ব্যক্তিত্ব হিসেবে বুদ্ধদেব বসুর এই ঔদার্য ছিল বলেই তিনি জীবনানন্দ দাশের কাব্যের বাক্স খুলে তাঁর অন্তর্গত মণি-মুক্তা পাঠককে দেখাতে পেরেছিলেন, সুধীন দত্তের হিরন্ময় প্রতিভার প্রতি জানাতে পেরেছিলেন অকপট শ্রদ্ধা।

॥ ২ ॥

বস্তুত বুদ্ধদেব বসু, "কবিতা" পত্রিকার একটি সংখ্যা "নজরুল সংখ্যা" হিসাবে প্রকাশ করেছিলেন। নিজে সে সংখ্যায় নজরুল ইসলামের উপর প্রবন্ধ লিখেছিলেন, সম্পাদকীয় লিখেছিলেন। সে প্রবন্ধ "কালের পুতুল" গ্রন্থে ছেপেছেন। "সাহিত্য-চর্চা" গ্রন্থের 'রবীন্দ্রনাথ ও উত্তর সাধক'-এ নজরুল সম্পর্কে বুদ্ধদেব বিস্তারিত আলোচনা করেছেন, বলেছেন, "রবীন্দ্রনাথের পর বাংলা ভাষায় তিনিই প্রথম মৌলিক কবি", বলেছেন—"সত্যেন্দ্রনাথকে মনে হয় রবীন্দ্রনাথের সংলগ্ন, কিংবা অন্তর্গত, আর নজরুল ইসলামকে রবীন্দ্রনাথের পরে অন্য একজন কবি—ক্ষুদ্রতর নিশ্চয়ই, কিন্তু নতুন।" "যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত" শীর্ষক প্রবন্ধে বুদ্ধদেব বলেছেন—"সব কটা জানলা খুলে নতুনের হাওয়া প্রথম যিনি সবেগে বইয়ে দিলেন, তিনি নজরুল ইসলাম। নজরুলের ছিল দৃপ্ত কণ্ঠস্বর, অব্যবহিত আঘাতের শক্তি, তাই রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক কবিদের মধ্যে তাঁকেই আজ উজ্জ্বলতম সেতু বলে মনে হয়।" "গোলাপ কেন কালো" নামক বুদ্ধদেবের আত্মজীবনীমূলক উপন্যাসে "দিলদার নওরোজ" নামে যে কবির স্মৃতিচারণ করেছেন বুদ্ধদেব তিনি কাজী নজরুল ইসলাম। অকপটে বুদ্ধদেব বসু সেখানে স্বীকার করেছেন যে ঐশ্বর্যশালী সুরে রূপবান নজরুলের গানের মর্মস্পর্শী আবেদন হৃদয়কে যত গভীরভাবে আলোড়িত করে তাঁদের (বুদ্ধদেব বসুদেব) শ্রেষ্ঠতম কবিতাটিও সেই আবেগ সৃষ্টিতে কোনদিনই সক্ষম হবে না। স্বীকার করেছেন হৃদয়ের গভীরে তাই এক ঈর্ষা জেগে থাকে।

প্রসঙ্গক্রমে নজরুল সম্বন্ধে বুদ্ধদেব বসুর কয়েকটি বিখ্যাত উক্তি এখানে তুলে দেওয়া যেতে পারে :

১. "বিদ্রোহী" পড়লুম ছাপার অক্ষরে মাসিকপত্রে—মনে হলো এমন কখনো পড়িনি। অসহযোগের অগ্নিদীক্ষার পরে সমস্ত মন-প্রাণ যা কামনা করছিল, এ-যেন তা-ই; দেশব্যাপী উদ্দীপনার এ-ই যেন বাণী।

২. গানে তাঁর আন্না নেই, ঘুমের সময় ছাড়া সবটুকু সময় গাইতে হলেও তিনি প্রস্তুত। কণ্ঠস্বর মধুর নয়, ভাঙা ভাঙা খাদের গলা, কিন্তু

তাঁর গান গাওয়ায় এমন একটি আনন্দিত উৎসাহ, সমস্ত দেহ-মন-প্রাণের এমন একটি উদ্দাম ছিল যে আমরা মুগ্ধ হয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা শুনেছি। সে সময় গান রচনা করতেও দেখেছি তাঁকে—হার্মোনিয়াম, কাগজ আর কলম নিয়ে বসেছেন, বাজাতে বাজাতে গেয়েছেন, গাইতে গাইতে লিখেছেন। সুরের নেশায় এসেছে কথা, কথার ঠেলা সুরকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। —এইমাত্র শেষ করা গান কবির নিজের মুখে তক্ষুণি শুনতে শুনতে আমাদেরও মনের মধ্যে নেশা ধরে যেত।

৩. নজরুল চড়া গলার কবি, তাঁর কাব্যে হৈ চৈ অত্যন্ত বেশী—অনেক লেখা তিনি লিখেছেন যাতে শুধুই হৈ চৈ আছে, কবিত্ব নেই। প্রেমের বা প্রকৃতির বিষয়ে কবিতা লিখতে গিয়ে তাঁর এই দুর্বলতা বিশেষভাবে প্রকট হয়ে উঠেছে—একটি দু'টি স্নিগ্ধ কোমল কবিতা ছাড়া প্রায় সবই ভাবালুতায় আবিল, অনর্গল, অচেতন বাক্য বিন্যাসে রুদ্ধস্রোত।

৪. অদম্য স্বতঃস্ফূর্ততা নজরুলের রচনার প্রধান গুণ এবং প্রধান দোষ। যা কিছু তিনি লিখেছেন, লিখেছেন দ্রুতবেগে, ভাবতে, বুঝতে, সংশোধন করতে কখনো থামেননি, কোথায় থামতে হবে দিশে পাননি।

৫. 'আমি চিরশিশু, চিরকিশোর'—এ কথা বিদ্রূপের বাঁকা হাসির সঙ্গে নজরুলের সাহিত্যিক জীবনে সত্য হয়েছে। পঁচিশ বছর ধরে প্রতিভাবান বালকের মত লিখেছেন তিনি, কখনও বাড়েননি, বয়স্ক হননি, পর পর তাঁর বইগুলিতে কোন পরিণতির ইতিহাস পাওয়া যায় না, কুড়ি বছরের লেখা আর চল্লিশ বছরের লেখা একই রকম। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁর প্রতিভার প্রদীপে ধীশক্তির শিখা জ্বলেনি, যৌবনের তরলতা ঘন হ'ল না কখনো, জীবন দর্শনের গভীরতা তাঁর কাব্যকে রূপান্তরিত করল না।

৬. গানের ক্ষেত্রে নজরুল নিজেকে সবচেয়ে সার্থকভাবে দান করেছেন। তাঁর সমগ্র রচনাবলীর মধ্যে স্থায়িত্বের সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশী তাঁর গানের। বীর্যব্যঞ্জক গানে—চলতি ভাষায় যাকে 'স্বদেশী গান' বলে—রবীন্দ্রনাথের পরেই তাঁর স্থান, এবং সম্ভবত দ্বিজেন্দ্রলালের উপর।

৭. 'বুলবুল' ও 'চোখের চাতকে' কিছু কিছু রচনা পাওয়া যাবে, যাকে অনিন্দ্য বললে অত্যন্ত বেশী বলা হয় না। আরো বেশি গান যে অনিন্দ্য হয়নি তার কারণ নজরুলের দুরতিক্রম্য রুচির দোষ।

৮. তাঁর প্রেমের গান সরস, কমনীয়, চিত্রবহুল। কিন্তু তার আবেদন আমাদের মনে যখনই ঘন হয়ে আসে তখনই অধিকাংশ ক্ষেত্রে কোনো স্থূল স্পর্শে মোহ ভেঙে যায়। গীত রচয়িতার অন্য সমস্ত গুণ তাঁর ছিল—শুধু যদি এই দোষ না থাকত, তাহলে তাঁর মধ্যে একজন মহৎ গীতিকারকে আমরা বরণ করতে পারতাম। কিন্তু একটি দোষে অনেক গুণ ব্যর্থ হল।

লক্ষ্য করবার বিষয়, বুদ্ধদেব বসু মধুসূদনকে যে ভাবে আক্রমণ করেছিলেন নজরুলকে তেমনভাবে এক তরফা আক্রমণ করেন নি। তবু এর শতকরা নব্বুই ভাগ বক্তব্য তীব্রভাবে আক্রমণের দিকে। উদ্দীপ্ত স্বভাব জ্বালা থেকে কণ্ঠের শিরা ছিঁড়ে যেন অনেকগুলো কথা বেরিয়ে এসেছে।

বুদ্ধদেব বসুর নজরুল সম্পর্কিত বক্তব্যগুলিকে বিশ্লেষণ করে দেখা যেতে পারে। বুদ্ধদেব বসু লিখেছিলেন 'নজরুল চড়া গলার কবি। ঠিক একই কথা তিনি মধুসূদন সম্পর্কেও বলেছিলেন—'মাইকেলি ছন্দের প্রধান দোষ এই যে, সেটা আগাগোড়া অত্যন্ত বেশি কড়া; তাতে নীচু গলা কখনো শুনি না।' মধুসূদন সম্পর্কে বুদ্ধদেব বসুর এই মন্তব্য সত্যি হয়ত। কিন্তু বীর ও রৌদ্র রসের কাব্যে অমনি চড়া ও কড়া সুর খুবই স্বাভাবিক। নজরুলের বীররস ও রৌদ্ররসের কবিতায় স্বাভাবিকভাবে অমনি চড়া ও কড়া সুর আছে সেখানে নম্রতর কণ্ঠ অস্বাভাবিক। তবু উক্ত দুই মহাকাব্যে রুদ্রবীণা "মেঘনাদবধ কাব্য" ও "অগ্নিবীণা"য় যেখানে করুণ রস আছে সেখানে দু'জন মহাকবিই নম্রকণ্ঠের আভাস দিয়ে গেছেন। নজরুল সম্বন্ধে আরও বলা যেতে পারে "অগ্নিবীণা" ও "বিষের বাঁশী"র কড়া কণ্ঠের অথবা চড়া কণ্ঠের নজরুল ইসলাম সমস্ত নজরুল ইসলাম নন। "চক্রবাক", "দোলন চাঁপা", "ছায়ানট", "বুলবুল", "চোখের চাতকে"র কবি শুধু "হৈ হৈ"-এর কবি

নন। আর "অগ্নিবীণা", "বিষের বাঁশী" কিংবা "জিঞ্জির"-এ আদৌ হৈচৈ নেই। যা আছে তা শিল্পের প্রয়োজনেই আছে। যুদ্ধের মাঠের ছবি ফুটিয়ে তুলতে গেলে দামামাই বাজাতে হয়—সেখানে কৃষ্ণের বেণু কাজে লাগে না।

নজরুলের প্রেমের এবং প্রকৃতিবিষয়ক কবিতা সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করেছেন—"দু'টি একটি স্নিগ্ধ কবিতা ছাড়া প্রায় সবই ভাবালুতায় আবিল, অনর্গল, অচেতন বাক্যবিন্যাসে রুদ্ধস্রোত।" অথচ একই প্রবন্ধে "বুলবুল" ও "চোখের চাতক" গীতি কাব্যগ্রন্থ সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য হল, "বুলবুল ও চোখের চাতকে কিছু কিছু রচনা পাওয়া যাবে যাকে অনিন্দ্য বললে অত্যন্ত বেশী বলা হয় না।" বলা আবশ্যক নজরুল দুটি একটি স্নিগ্ধ প্রেম কিংবা প্রকৃতিবিষয়ক কবিতা লেখেননি, অসংখ্য ক্ষুদ্রাকৃতির অতুলনীয় গীতি-কবিতা লিখেছেন। আরও একটি কথা, স্নিগ্ধতাই যদি শ্রেষ্ঠ কবিতার পরিচয় হয় তাহলে বুদ্ধদেবের কবিগুরু বোদলেয়ারের নরক-যন্ত্রণা এবং তাঁর কাব্যের চিত্রশালার বীভৎস নারকীয় দৃশ্য তাঁর এত ভালো লেগেছিল কি ভাবে। সেখানে কাব্যের বীভৎস রসের প্রশংসা করতে ত বুদ্ধদেব বসুর বাধেনি। বোদলেয়ারের কাছে যা স্বাভাবিক ছিল নজরুলের পক্ষেও তা অত্যন্ত স্বাভাবিক ছিল। উভয় কবির বাস্তব জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতা তাঁদের কাব্যে ছায়াপাত করেছে। তবু নজরুল নারকীয় যন্ত্রণা থেকে নিজেকে মুক্ত করে আমাদের বহুবার স্বর্গের শরবৎ পান করিয়েছেন—কিন্তু বোদলেয়ার ত আগাগোড়াই নরক—অন্তহীন নরক। তাঁর কাব্যে নরক থেকে পরিত্রাণের কোন ইঙ্গিতও নেই যে-জন্যে এলিয়ট বলেছিলেন, "বোদলেয়ারে দান্তের নরক আছে কিন্তু স্বর্গ নেই।" জাহান্নামের মধ্যে বসেও যে নজরুল বুলবুলের কণ্ঠের গান আমাদের শোনাতে পেরেছিলেন সেখানেই ত নজরুল আমাদের কাছে নমস্য। যখন গোটা একটা যুগের পক্ষে নৈরাশ্যে পীড়িত হওয়া খুব স্বাভাবিক ছিল, নৈরাশ্যের গড্ডলিকা প্রবাহে যখন সবাই ছিল ভাসমান তখন একা নজরুল সেই স্রোতের প্রতিকূলে হেঁটেছিলেন হিমালয়ের মত মাথা উঁচু করে, নরকের মধ্যে তিনি আমাদের স্বর্গের স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন। এবং এই অসামান্য ক্ষমতার জন্যে গগনচুম্বী প্রতিভার অধিকারী রবীন্দ্রনাথের গ্রীবা নেমে এসেছিল নজরুলের ললাট-চুম্বনে।

অনেকের মত বুদ্ধদেব বসু নজরুলকে বায়রনের সঙ্গে তুলনা করেছেন। অবশ্যই বায়রনের স্বভাবের সঙ্গে নজরুলের স্বভাবের যথেষ্ট মিল আছে এবং বায়রনের কাব্য-চরিত্রের সংগে নজরুলের উদ্দীপনামূলক কাব্য-চরিত্রের মিল খুঁজে পাওয়া যাবে। উভয় কবিই সমসাময়িক কালের রাজনৈতিক পীড়ন ও সামাজিক ভণ্ডামীর বিরুদ্ধে মসীযুদ্ধ করেছেন। তবু কবি-শিল্পী হিসেবে নজরুলের সঙ্গে বায়রনের পার্থক্যও আছে। গ্যেটে বায়রন সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছিলেন—"দ্য মুমেন্ট হি থিংকস, হি ইজ এ চাইল্ড।" সেটাই বায়রন সম্বন্ধে একমাত্র সত্য উচ্চারণ তা কি সবাই মানবে? স্বদেশ, স্বসমাজ এবং বিশ্বমানব সম্বন্ধে যে-কবি গভীরভাবে চিন্তা করেছেন সেই নজরুল সম্বন্ধে তেমন মন্তব্যকে বা সবাই আদর্শ বলে মানবে কেন? বায়রনের মত নজরুল সামাজিক বোধে নিরাশা-পীড়িত ছিলেন না। সময়গত পার্থক্যের জন্য বায়রনের সঙ্গে নজরুলের চিন্তার পার্থক্য দুস্তর। উভয়েই স্বাধীনতা সংগ্রামী, কিন্তু সাধারণ মানুষের জন্য নজরুলের সংগ্রামী চেতনা বায়রনের ছিল না। বায়রনের অহং নজরুলের ছিল। কিন্তু নজরুল অহংকে ছাড়িয়ে সমষ্টিগত চেতনায় উদ্বুদ্ধ হতে পেরেছিলেন। নজরুল "সাম্যবাদে" যে মহামিলনের গান গেয়েছিলেন, যে সমন্বয়বাদী চেতনায় মানুষকে আকর্ষণ করেছিলেন, আজকের দিনে আমরা সেই চেতনায় উত্তীর্ণ হতে চলেছি। এই চেতনা শিশুর ভাবনা নয়, ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা ঋষির ভাবনা।

প্রবন্ধ অত্যন্ত বড় হয়ে যাচ্ছে। এখানে শুধু এইটুকু বলে রাখি যে বুদ্ধদেব বসু নজরুল সম্পর্কে যে-সব উক্তি করেছেন তা অনেকখানি অযৌক্তিক এবং অবৈজ্ঞানিক। তাঁর অব্যবস্থিত চিত্তের আলোচনা সম্পূর্ণভাবে অনির্ভরযোগ্য। "গোলাপ কেন কালো" গ্রন্থে তিনি অকপটে স্বীকার করেছিলেন নজরুলের জনপ্রিয়তা মনে ঈর্ষার উদ্রেক করে। সেই ঈর্ষাকণ্টকিত সমালোচনা ভবিষ্যতে তাই কুখ্যাত বলে বিবেচিত হবে। বলা বাহুল্য মাইকেল সম্বন্ধে তিনি তাঁর মন্তব্যকে নিজেই "কুখ্যাত" বিশেষণে বিশেষিত করেছেন —"এ-সব রচনা (সুধীন্দ্রনাথ দত্তের) বার বার পাঠ করার পর মধুসূদন বিষয়ে আমার একটি পুরোনো এবং কুখ্যাত উক্তি প্রায় প্রত্যাহরণ করতে লুব্ধ হচ্ছি।" আশ্চর্য

হতাম না নজরুল ইসলাম সম্বন্ধে বুদ্ধদেব বসু আরও কিছুদিন পরে ঐ ধরনের উক্তি করলে।

প্রসংগত আমার এই শেষ বাক্য উচ্চারণের অর্থ এই নয় যে নজরুল-সাহিত্য নিষ্কলঙ্ক। না, তা নয়। নজরুলের নিজের ভাষায় বলা-যাক কলঙ্ক আর জ্যোৎস্নায় মেশা "সুন্দর চাঁদ" তিনি। এবং পৃথিবীর যাবৎ সাহিত্যে ভিন্নদৃষ্টিতে এই কলঙ্কের অস্তিত্ব আছেই। এবং প্রত্যেক সমালোচকের সে ত্রুটি প্রদর্শনের অধিকার আছে। কেবল অধিকার নেই শিল্পীকে ভাবসাম্যহীন ভাষার ছুরিতে বিক্ষত করার। তা করলে নিজের লেখা অতল বিদ্বেষের রূপ পরিগ্রহ করে। কৈফিয়তেও তখন আর তার সংশোধন হয় না। নজরুল ইসলামের প্রতি বুদ্ধদেব বসুর সে বিদ্বেষ ছিল বলে ভাবতে পারি না। তাই তাঁর বক্তব্য সমূহকে তাঁর ভাষা ফিরিয়ে দিয়ে বলা যায়: 'চিন্তাহীন অনর্গলতা'।

নজরুলের 'বিদ্রোহী' ও মোহিতলালের 'আমি'

নজরুলের 'বিদ্রোহী' কবিতার বিপুল জনপ্রিয়তার সংগে সংগে 'বিদ্রোহী'কে কেন্দ্র করে যখন আলোচনা-সমালোচনার ঝড় বইছিল তখন মোহিতলাল দাবী করেন, নজরুল তাঁর "আমি" শীর্ষক একটি লেখার ভাব নিয়ে কবিতাটি লিখেছেন, অথচ কোন ঋণ স্বীকার করেননি।[১] বিভিন্ন মহলে মোহিতলাল এই কথাটি মুখে মুখে প্রচার করছিলেন। কমরেড মুজফ্ফর আহমদ তাঁর "কাজী নজরুল ইসলাম : স্মৃতিকথা" গ্রন্থে লিখেছেন :

> শুরুতে তিনি 'আমি'র ভাব নিয়ে 'বিদ্রোহী' রচনার কথাই বলে বেড়াচ্ছিলেন। সম্ভবত তাতে তেমন কাজ না হওয়ায় অনেক পরে তিনি বলা শুরু করেছিলেন যে নজরুল তাঁর লেখার ভাব 'চুরি' করেছে।"

এই ঘটনা প্রসঙ্গে মুজফ্ফর আহমদ বলেছেন যে ১৩২১ সালে প্রকাশিত 'মানসী'র পৌষ সংখ্যায় মোহিতলালের 'আমি' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। সেই গদ্য লেখাটি মোহিতলাল নজরুলকে পড়ে শোনান। যখন "আমি" প্রবন্ধটি মোহিতলাল নজরুলকে পড়ে শোনাচ্ছিলেন তখন কিভাবে নজরুল তা শুনছিলেন সে কথাটিও মুজফ্ফর আহমদ এইভাবে বলেছেন :

> মোহিতলাল জোরে জোরে লেখাটি পড়েছিলেন।... তক্তপোশের উপরে বসে তিনি লেখাটি পড়ছিলেন। নজরুল খানিকটা পিছিয়ে এসে এমনভাবে বসেছিল যে যাতে সে মোহিতলালের নজরে না পড়ে। আজ স্বীকার করতে আমার এতটুকু লজ্জা নেই যে মোহিতলালের লেখাটি আমি উপভোগ করতে পারিনি। নজরুলের বসার কায়দা হ'তে আমার মনে হয়েছিল যে মনোযোগ সহকারে লেখাটি শোনার জন্যে সেও প্রস্তুত ছিল না।

১। "কাজী নজরুল ইসলাম : স্মৃতিকথা" : মুজফ্ফর আহমদ

অর্থাৎ মুজফ্‌ফর আহমদের মতে নজরুল যেহেতু লেখাটি মনোযোগ দিয়ে শোনেন নি, অতএব তার ভাবসম্পদ চুরি করে 'বিদ্রোহী' লেখার ব্যাপারটি অবিশ্বাস্য। যদিও সাথে সাথে মুজফ্‌ফর আহমদ এ উক্তি করতেও ভোলেননি যে কবি হিসেবে এবং হিন্দুশাস্ত্র সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা থাকার জন্যে অন্যমনস্কভাবে শুনলেও তাঁর থেকে নজরুলের পক্ষে ঐ গদ্য লেখাটির মর্মানুসরণ অধিকতর সম্ভব ছিল। মুজফ্‌ফর আহমদের মতে নজরুল আদৌ মোহিতলালের "আমি" দ্বারা অনুপ্রাণিত হন নি। কারণ—

মহা বিদ্রোহী রণক্লান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত
যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন রোল আকাশে-বাতাসে ধ্বনিবে না
অত্যাচারীর খড়্গ-কৃপাণ ভীম-রণভূমে রণিবে না—

এই মানবিক তথা রাজনৈতিক চেতনা মোহিতলালের "আমি"র মধ্যে কোথাও উপস্থিত নেই।

অন্যদিকে অধ্যাপক শ্রীরবীন্দ্রনাথ গুপ্ত তাঁর "নীলকণ্ঠ কবি কাজী নজরুল ইসলাম"[২] শীর্ষক প্রবন্ধে লিখছেন :

> "মোহিতলাল মজুমদারের 'আমি' (জীবন জিজ্ঞাসার অন্তগত) প্রবন্ধের ভাববস্তুর সঙ্গে নজরুলের বিখ্যাত "বিদ্রোহী" কবিতাটির সাদৃশ্য অত্যন্ত স্পষ্ট।

রবীন্দ্রগুপ্ত জানিয়েছেন ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় নামক কোনো লেখকের গ্রন্থ থেকে মোহিতলাল 'আমি'র ভাবসম্পদ আহরণ করেন। কিন্তু "আমি"র সংগে "বিদ্রোহী"র সাদৃশ্য সত্ত্বেও একথা স্বীকার্য যে "নজরুলের কবিতাটি একান্ত আত্মগত প্রেরণার ফল"। যে কারণে রবীন্দ্র-সূর্য আকাশে উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও "দলগোষ্ঠী নির্বিশেষে" নজরুল সম্বর্ধিত হয়েছিলেন।

মুজফ্‌ফর আহমদ বলেছেন "অভয়ের কথা" নামে ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি বই মোহিতলাল নজরুলকে পড়াবার চেষ্টা করেও

২। বিংশ শতাব্দী : শ্রাবণ ১৩৭১

ব্যর্থ হয়েছিলেন, যে বইটিতে মোহিতলালের "আমি"র বীজ লুকানো ছিল এবং ডক্টর সুকুমার সেনের "বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস" থেকে মুজফ্‌ফর আহমদ প্রসংগ-সূত্র আবিষ্কার করে দেখিয়েছেন—"তাহাতে 'অভয়ার কথা'র লেখক ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিষ্যত্বই পরিস্ফুট।"

মুজফ্‌ফর আহমদ আমাদের এ তথ্যও জানিয়েছেন যে মোহিতলাল গুরুগিরি করার চেষ্টা করলেও নজরুলকে তাঁর পথে নামাতে পারেননি বরং তিনি নিজেই শিষ্যের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন, তার ইতিহাস লিখিত হয়েছে সুকুমার সেনের "বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে"র চতুর্থ খণ্ডে :

> ডক্টর সুকুমার সেন তাঁর বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস, চতুর্থ খণ্ডে লিখেছেন—"সত্যেন্দ্রনাথের প্রভাব মোহিতলাল সযত্নে কাটাইতে যত্নবান হইয়াছিলেন, কিন্তু কাজী নজরুল ইসলামের সংস্পর্শে আসিয়া নূতন করিয়া সত্যেন্দ্র-প্রভাব জাগিয়াছিল।......কাজী নজরুল ইসলামের প্রভাব কাটিতে একটু দেরী হইয়াছিল। তাহার উদাহরণ 'কালা পাহাড়' ও 'রুদ্র বোধন।'" এই দুটি কবিতা মোহিতলালের 'স্মরগরলে' সংকলিত হয়েছে। এই থেকে আমাদের বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না যে নজরুল ইসলাম মোহিতলালের ভাবসম্পদ আত্মসাৎ করেন নি বরঞ্চ মোহিতলাল নিজেই নজরুলের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন।

"বিদ্রোহী" ও "আমি"র সম্বন্ধের কিংবা সম্পর্কের ঐতিহাসিক দিক মোটামুটি এই। এখন দেখা যাক্—এই দুটি লেখার মধ্যে শারীরিক এবং আত্মিক সাদৃশ্য ও পার্থক্য কতখানি। স্থানাভাবে এখানে "আমি" প্রবন্ধটি অথবা সংগে "বিদ্রোহী" সম্পূর্ণ উদ্ধার করলাম না। আমরা কৌতূহলী পাঠককে "বিদ্রোহী" নয় "আমি" প্রবন্ধটি মুজফ্‌ফর আহমদের "কাজী নজরুল ইসলাম : স্মৃতিকথা" কিম্বা আবদুল আজিজ আল আমানের "নজরুল পরিক্রমা" থেকে পড়ে নিতে অনুরোধ করছি। অবশ্য এখানে আলোচনা সাপেক্ষে ঐ প্রবন্ধের দু'চার লাইন উদ্ধার করব।

প্রথমেই জানাতে চাই যে মোহিতলালের "আমি" প্রবন্ধের মধ্যে বর্তমান পৃথিবীর নিপীড়িত মানুষের মুক্তিচেতনার কোনো ইঙ্গিত নেই।

আমি পরশুরামের কঠোর কুঠার
নিঃক্ষত্রিয় করিব বিশ্ব, আনিব শান্তি শান্ত উদার।
আমি হল বলরাম-স্কন্ধে
আমি উপাড়ি' ফেলিব অধীন বিশ্ব অবহেলে নব-সৃষ্টির মহানন্দে।

পৃথিবীতে শান্তি স্থাপনের জন্যে ক্ষাত্রতেজে বলীয়ান বলদর্পী কুশাসনকে নিশ্চিহ্ন করে নতুন বিশ্ব সৃষ্টির স্বপ্ন বস্তুবাদী প্রোলেটারিয়েটের। এই নতুন রাজনৈতিক চেতনা মোহিতলালের "আমি'র দর্শন নয়—এ দর্শন মার্কসের এঙ্গেলসের, লেনিনের, বিপ্লবী রাশিয়ার। হিন্দু কিংবা মুসলমান শাস্ত্রেও এই দর্শনের নমুনা আছে: মহিষাসুরের অত্যাচারে প্রপীড়িত পৃথিবীকে উদ্ধার করতে চণ্ডীরূপা শ্রীদুর্গা আবির্ভূতা হন। যুগে যুগে এমনিভাবে সাধারণ মানুষ যখনই কোন অত্যাচারী রাজা বা শাসকের দ্বারা নিপীড়িত হয়েছে তখনই একজন মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়েছে পৃথিবীতে এবং তিনি উৎপীড়িত মানুষদের সেই পশুশক্তির হাত থেকে উদ্ধার করেছেন। এ কথা কোরানে আছে, বাইবেলে আছে, গীতায় আছে। নজরুলের প্রতীক ব্যবহার থেকে অনুমান করা যায় যে শাস্ত্রগ্রন্থ বিবৃত এইসব ঘটনা তার জানা ছিল এবং নতুন পটভূমিতে তিনি পুরাণাশ্রিত কাহিনীকে তাঁর রাজনৈতিক এবং সামাজিক চেতনার প্রকাশ মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করেছেন।

মোহিতলালের "আমি" প্রবন্ধের সংগে বিদ্রোহীর ভাবগত অথবা আকারগত সাদৃশ্য যে কোথাও একেবারে নেই তা নয়। যেমন "আমি"তে আছে: "আমি সুন্দর। শিশুর মত আমার ওষ্ঠাধর, রমণীর মত আমার কটাক্ষ"—এই লাইনটি হয়তো মনে করিয়ে দেবে "বিদ্রোহী"র 'আমি চির শিশু চির কিশোর' এবং 'আমি গোপন প্রিয়ার চকিত চাহনি'। এমনিভাবে "আমি"র 'আমিই হোম, আহুতি এবং হোতা' "বিদ্রোহী"র 'আমি হোমশিখা আমি সাগ্নিক জমদগ্নি/আমি যজ্ঞ, আমি পুরোহিত আমি অগ্নি,—"আমি"র 'আমি জগতে চেতনা দিয়া নিজে অচেতন' "বিদ্রোহী'র 'আমি অচেতন চিতে চেতন'—"আমি"র 'আমি আনন্দ—শরৎ প্রভাতের স্বর্ণালোক।'—"বিদ্রোহী"র 'আমি নৃত্য পাগল ছন্দা আমি আপনার তালে নেচে যাই আমি মুক্ত জীবনানন্দ' এবং "আমি'র

'আমি ভীষণ,—শ্মশানের চিতাগ্নি, সৃষ্টিনেপথ্যের ছিন্নমস্তা, ব্রাহ্মণের অভিশাপ কালবৈশাখীর বজ্রাগ্নি,······আগ্নেয়গিরির ধূমাগ্নিবসনেব মত, প্রলয়ের জলোচ্ছ্বাসের মত,······আমিই মহামারী·······আমি উন্মাদ' ইত্যাদি শব্দ বাক্যের সংগে যথাক্রমে "বিদ্রোহী"র 'আমি মহাভয় ······আমি শ্মশান······আমি ছিন্নমস্তা চণ্ডী······আমি অভিশাপ পৃথ্বির···আমি এলোকেশে ঝড় অকাল বৈশাখীর······আমি বজ্র, আমি ঈশান বিষাণে হুঙ্কার···আমি বসুধা বক্ষে আগ্নেয়াদ্রি···আমি বাবিধিব মহাকল্লোল···আমি মহামারী আমি ভীতি···আমি তুরীয়ানন্দে ছুটে চলি একি উন্মাদ, আমি উন্মাদ/আমি সহসা আমারে চিনেছি, আমাব খুলিয়া গিয়াছে সব বাঁধ'—এব শব্দগত মিল আছে। এমনকি "আমি"র মধ্যে রুদ্র ও মধুরের যে বিপরীত শব্দগত ভাবেব সমন্বয় আছে "বিদ্রোহী"তে তারও উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। যেমন "আমি"-তে একদিকে আছে 'আমি ভীষণ'—শ্মশানের চিতাগ্নি, কালবৈশাখেব বজ্রাগ্নি, ব্রাহ্মণের অভিশাপ' অপব দিকে তেমনি আছে 'আমি মধুর—জননীব প্রথম মুখ চুম্বনেব মত, তৃষিত বনভূমির উপর নববরষার পুষ্পকোমল ধাবা-স্পর্শের মত ;......যমুনাপুলিনে বংশীধ্বনির মত, প্রণয়িনীর সবম সঙ্কোচের মত, কৈশোর ও যৌবনের বয়ঃসন্ধিব মত।' ভীষণ মধুরেব ঐ পরস্পর বিবোধীভাব "বিদ্রোহী" কবিতাতেও স্পষ্ট স্বাক্ষরিত। সেখানেও একদিকে যেমন কবিকে বলতে শুনি 'আমি চিব দুর্দম, দুর্বিনীত, নৃশংস/মহা প্রলয়ের আমি নটরাজ, আমি সাইক্লোন, আমি ধ্বংস' তেমনি অন্যদিকে বলতে দেখি 'আমি উত্তরী বায়ু, মলয় অনিল উদাস পূরবী হাওয়া/আমি পথিক-কবির গভীর রাগিণী বেণুবীণে গান গাওয়া।'

কিন্তু এ-সত্বেও উভয়ের মধ্যে ভাব, উপলব্ধি, অনুভূতি ও চেতনার যে অপরিমেয় পার্থক্যও আছে এবার সে কথাই বলব। মোহিতলালের "আমি" প্রবন্ধের সূচনা এমনি :

> আমি বিরাট। আমি ভূধরের ন্যায় উচচ, সাগরের ন্যায় গভীর, নভো-নীলিমার ন্যায় সর্ব্বব্যাপী। চন্দ্র আমারই মৌলশোভা, ছায়াপথ আমার ললাটিকা, অরুণিমা আমার দিগন্ত সীমান্তের সিন্দুরচ্ছটা, সূর্য আমার তৃতীয় নয়ন এবং সন্ধ্যারাগ আমার ললাটচন্দন।

"বিদ্রোহী"র আরম্ভ এমনি :

বল বীর—
বল উন্নত মম শির।
শির নেহারি আমারি নত শির ওই শিখর হিমাদ্রির।
বল বীর—
বল মহাবিশ্বের মহাকাশ ফাড়ি'
চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা ছাড়ি',
ভূলোক দ্যুলোক গোলোক ভেদিয়া,
খোদার আসন 'আরশ' ছেদিয়া
উঠিয়াছি চির-বিস্ময় আমি বিশ্ব-বিধাত্রীর।
মম ললাটে রুদ্র ভগবান জ্বলে রাজ রাজ-টিকা দীপ্ত জয়শ্রীর।

এই দুটি লেখার মধ্যে প্রথমেই কল্পনার পার্থক্য ধরা পড়ে। মোহিত-লাল বলছেন "আমি বিরাট।" কি রকম বিরাট? 'ভূধরের ন্যায়'। ঐ "ভূধর" অর্থাৎ পর্বত কোনো নির্দিষ্ট পর্বত নয়। কিন্তু "বিদ্রোহী"র পর্বত সুনির্দিষ্ট পর্বত-হিমালয় যা পৃথিবীর সর্বোচ্চ পরত এবং সেই সর্বোচ্চ পর্বতটি "বিদ্রোহী"র 'আমি'কে দেখে মাথা নোয়ায়। এখানে সমানের প্রশ্ন নয়—এখানে 'ন্যায়' 'প্রায়' 'মত'র মত কোনো তুলনাবাচক শব্দে উপমার দ্বারা উপমানের সংগে সমতুল্যতা প্রদর্শনের প্রচেষ্টা নেই। কারণ এ "আমি" শুধু বিশ্ব নয়, মহাবিশ্বকেও ছাড়িয়ে গেছে—খোদার আরশ ছেদ করেও উপরে উঠেছে। এই কল্পনা শক্তি এবং কল্পনার এই রূপ নজরুলকে মোহিতলাল দিতে পারেননি। এর সংগে মিল খুঁজে পাওয়া যায় জালালউদ্দীন রুমীর একটি কবিতার এই পংক্তিসমূহের :

মা জা ফলক্ বর তরাযেস ও আজ মলক
আফজা ও তরাযেস
জই দো চেরা গোজারেস মনজিলে
মা কিবরিয়া।

অর্থাৎ আকাশের চাইতেও আমি উঁচু—ফেরেশতার চাইতেও আমি মহান। আমার লক্ষ্য খোদা ; তবে এ-দুইকে ছাড়িয়ে যাব না কেন?

সুতরাং প্রথমেই "বিদ্রোহী"র প্রথম স্তবকে আমাদের সংগে যার সাক্ষাৎ ঘটছে তিনি ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বৈদান্তিক শিষ্য মোহিতলাল নন তিনি হ'লেন শামসে তাবরেজের বন্ধু ও শিষ্য সুফী জালালউদ্দীন রুমী। এখানে বলা অনাবশ্যক যে "বিদ্রোহী" লেখার আগে "আমি"র সংগে নজরুলের যতটুকু পরিচয় হয়েছিল তার চেয়ে অনেক বেশী তাঁর পরিচয় হয়েছিল পারসিক কবি রুমী, জামি, হাফেজ ও খৈয়ামের সংগে। তখনকার সামাজিক পরিবেশে এঁরা পারস্যের "বিদ্রোহী" কবি ছিলেন— যে জন্যে নজরুল ইবরাহিম খাঁর কাছে লেখা এক চিঠিতে বলেছিলেন: "আমার 'বিদ্রোহী' পড়ে যাঁরা আমার উপর বিদ্রোহী হয়ে ওঠেন, তাঁরা যে হাফেজ রুমীকে শ্রদ্ধা করেন—এও আমার মনে হয় না। আমি ত আমার চেয়েও বিদ্রোহী মনে করি তাঁদেরে।"[৩]

এখানে একটি কথা গুরুত্ব সহকারে দেখবার আছে। "বিদ্রোহী" কবিতায় আমিত্বের যে প্রকট উদ্ধত প্রকাশ ঘটেছে সেই দুর্বিনীত মানুষের চেহারার আদল পর্যন্ত "আমি" প্রবন্ধে নেই। যেমন "বিদ্রোহী" কবিতার এই সমস্ত পংক্তি 'আমি অরুণ খুনের তরুণ, আমি বিধির দর্পহারী', 'আমি বিদ্রোহী ভৃগু ভগবান বুকে এঁকে দেবো পদচিহ্ন/আমি খেয়ালী বিধির বক্ষ করিব ভিন্ন'—যে অর্থ প্রকাশ করে তা প্রকৃতপক্ষে উনবিংশ বিংশ শতাব্দীর মানবচৈতন্যের ফলশ্রুতি। "বিদ্রোহী"তে বৈদান্তিকের অথবা সুফীর অহমজ্ঞান আছে। কিন্তু সেই সংগে আছে সামগ্রিকভাবে মানুষের বিজয় ঘোষণা। 'আমি বিশ্ব তোরণে বৈজয়ন্তী মানব বিজয় কেতন'-এ তিনি সব কিছুর উপরে মানুষের শক্তিকে স্থান দিয়েছেন। এই যে বিজয়ী শক্তিমান মানুষ, যে আপনাকে ছাড়া কাউকে কুর্নিশ করে না, যে আত্মবিশ্বাসে আল্লার সমকক্ষতা দাবি করে, সে ঠিক "আনাল হক" উচ্চারণকারী মধ্যযুগীয় পারসী সাধক মনসুর হল্লাজ নয়। কারণ উৎপীড়কদের উচ্ছেদ করে নিপীড়িতদের উদ্ধার করার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ দায়িত্বশীল চৈতন্যের কণ্ঠ মনসুর হল্লাজের ছিল না। আরও একটা কারণে "বিদ্রোহী"কে বেদান্তের 'আমি' থেকে স্বতন্ত্রভাবে দেখার আমি পক্ষপাতী। কাজী আবদুল ওদুদ তাঁর 'নজরুল ইসলাম' প্রবন্ধে বলেছেন:

৩ নজরুল রচনা সম্ভার ।। ২য় সংস্করণ ।। ৩৫১ পৃষ্ঠা

"অন্তরের গোপনতম প্রদেশে তিনি তাত্ত্বিক—আর সেই তাত্ত্বিকতা যেন তাঁর জন্মগত। তাঁর এই পরমপ্রিয় তত্ত্বের নাম দেওয়া যেতে পারে লীলাবাদ—ইংরেজীতে যা সাধারণত Pantheism নামে পরিচিত। এই দৃষ্টিতে ভালোমন্দ, পাপপুণ্য শেষ পর্যন্ত নেই—ভালো-মন্দ পাপপুণ্য, জন্মমৃত্যু উত্থানপতন, সব কিছুই ভগবানের লীলা"।

ঐ তাত্ত্বিকতা যে নজরুল-শোণিতে জন্মাবধি মিশ্রিত ছিল তাতে সন্দেহ নেই। নজরুলের গানে ও কবিতায় অসংখ্য বার আমরা তার সাক্ষাৎ পাই। কিন্তু ভুললে চলবে না বৈদান্তিক অথবা সুফীরা সংসারের অথবা পৃথিবীর প্রতি দায়িত্বপালনে সচেতন নয়। এবং 'ভালোমন্দে'র পার্থক্য Pantheist-এর দর্শনে না থাকতে পারে কিন্তু নজরুলের দর্শনে আছে। নজরুল যে পরিবর্তিত দুনিয়া চেয়েছেন সেখানে মানুষই সর্বেসর্বা, সেখানে মানুষ স্থায়ী সুখে বাস করবে। সেই পরিবর্তিত দুনিয়া মার্কসের চিন্তায় ছিল, বৈদান্তিকের ধারণায় ছিল না। ঐ জন্যে নজরুল যখন শ্যামা-সংগীত লিখেছেন তখন শুধু ভক্তিবাদের আশ্রয় নেননি। তিনি বলেছেন : 'শ্যামা আমার নিবর কেন মা রোদন ভরা বিশ্বমাঝে/কানে কি তোর যায় না, শ্যামা, মহাকালের শঙ্খ বাজে।' নিপীড়িত বিশ্বমানবের উদ্ধার করে মানুষের অন্তরে যে নিদ্রিত শিব অর্থাৎ শুভশক্তি আছে তাকেই তিনি জাগাতে চেয়েছেন এবং সে জন্যেই 'রক্তাম্বর ধারিণী মা' কবিতায় তিনি বলেছেন 'নিদ্রিত শিবে লাথি মার আজ/ভাঙো মা ভোলার ভাঙ-নেশা। এখানে অচেতন শিবকে তিনি জাগাতে বলেছেন। বিদ্রোহী কবিতাতেও তিনি বলেছেন—"আমি অচেতন চিতে চেতন।" বৈদান্তিকের শিব উদাসীন কেন না পাপপুণ্য, ভালোমন্দের প্রতি তার ভ্রূক্ষেপ নেই। নজরুল সেই উদাসীন শিবকে, সেই নিদ্রিত ভগবানকে লাথি মেরে জাগাবার প্রচেষ্টায় দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ।

প্রকৃতপক্ষে লীলাবাদের আক্ষরিক অনুসরণ আছে "আমি" প্রবন্ধে। সেখানকার আত্মজ্ঞানী দার্শনিক বলেন 'আমি জগতে চেতনা দিয়া নিজে অচেতন।' নজরুলের "বিদ্রোহী" সর্বক্ষণ পূর্ণ সচেতন। তাঁর "বিদ্রোহী"তে লীলাবাদের অনুরণন সমাজ-চেতনার বলিষ্ঠ ধাক্কায় ভেঙে পড়ে এবং আধুনিক মানুষের আত্মজ্ঞানকেই বিশেষভাবে আশ্রয় দান করে।

আরও একটি কথা। "আমি" প্রবন্ধে এমন কতকগুলো বাক্য অথবা বাক্যাংশ আছে যা ক্লীবত্বের নিদর্শন। যেমন: "আমি দুর্বল অসহায়। আমার ক্ষুদ্র তনুযষ্টি মাধবী মদিরায় ঘুরিয়া পড়ে, অসহ্য শীতরাতে আমার হস্তপদ যূপবদ্ধ পশুর মত কাঁপিতে থাকে।" যেমন: "আমি মূর্খ, আমি নির্বোধ।...আমি ভোগের অনন্ত উপকরণ কোলে করিয়া কাঁদিতেছি, অতীত স্মৃতি ও ভবিষ্যৎ ভয় আমাকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়াছে। নিষ্ফল স্বপ্ন ও কুতর্কজাল বিস্তার করিয়া আমি আপনাকে আপনি বন্দী করিয়াছি। জীবন আমার জন্য শোক করিতেছে, মৃত্যু অলক্ষ্যে দাঁড়াইয়া হাসিতেছে।"—এইসব অপৌরুষ উক্তি 'বিদ্রোহী' চৈতন্যের সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুবাসী। এ আত্মজ্ঞান 'বিদ্রোহী'র আত্মজ্ঞান নয়—এ হচ্ছে সম্পূর্ণ মেয়েলী আত্মসমর্পণ। "বিদ্রোহী" আত্মসমর্পণ নয় আত্ম-বিস্ফোরণ।

এ-কথা ঠিক নজরুল ইসলামও 'আমি উন্মন মন উদাসীর/আমি বিধবার বুকে ক্রন্দনশ্বাস হাহুতাশ আমি হুতাশীর' বলেছেন; কিন্তু এ হতাশার ভিতরেও আছে আগুনের তীব্র জ্বালা? কেননা তিনি বলেছেন—,"আমি অবমানিতের মরম বেদনা, বিষ-জ্বালা, প্রিয় লাঞ্ছিত বুকে গতি ফের।" বলেছেন—"আমি বঞ্চিত-ব্যথা পথবাসী চির-গৃহহারা যত পথিকের।" এ সমস্তের মধ্যে বেদনাশীল কবির সমানুভূতির আত্মপরিচয় উদঘাটিত। বঞ্চিতের প্রতি এই সমবেদনা প্রকাশ করেই তিনি বঞ্চিত, নিপীড়িতকে উদ্ধারের সংকল্প গ্রহণ করেছেন। এখানে কোথাও অসহায়ত্বের সুর নেই বরং আছে একটা চাপা বিদ্রোহের নিঃশব্দ গর্জন। "বিদ্রোহী" কবিতার মধ্যম পর্যায়ের এই চাপা কণ্ঠস্বর পতন নয়, দ্বিতীয় আঘাতের জন্য শক্তি সঞ্চয়ের বিশ্রাম। তৃতীয় পর্যায়ে ঐ ভয়াল কণ্ঠের নম্রতা লক্ষ্য করি। যেখানে কবি বলছেন:

> আমি অর্ফিয়াসের বাঁশরী,
> মহা সিন্ধু উতলা ঘুমঘুম
> ঘুম চুমু দিয়ে করে নিখিল বিশ্বে নিঝঝুম
> মম বাঁশরীর তানে পাশরি'।
> আমি শ্যামের হাতের বাঁশরি।

কিন্তু এটাকেও আমি চতুর্থ পর্যায়ের ঝড়ের পূর্ব-প্রস্তুতি হিসেবে দেখি। প্রবলতম আঘাত হানাব জন্যে এখানেও আছে বিশ্রামের শক্তি অর্জনের ক্ষণিক 'কমা', পূর্ণোচ্ছেদ নয়। এবং সেজন্যেই ঠিক এর পরের লাইন-গুলো মারাত্মক সাইক্লোনের মত, দুর্দমনীয় টর্ণেডোর মত ছুটে আসে এইসব কথার বারুদ মুখে নিয়ে :

আমি রুষে উঠে যবে ছুটি মহাকাশ ছাপিয়া,
ভয়ে সপ্ত নরক হাবিয়া দোজখ নিভে নিভে যায় কাঁপিয়া।

ফলে এর মধ্যে যে উত্তেজনা, যে দৃপ্তি, যে সাহস, যে পৌরুষ জেগে ওঠে তা ক্ষণিক পূর্বের বাঁশীর মূর্ছনাকে উড়িয়ে নিয়ে যায়।

বস্তুত "আমি"র ভাব পৌরাণিক বৈদান্তিকের এবং "বিদ্রোহী"র কণ্ঠ আধুনিক বিপ্লবীর।

নজরুলের এই বৈপ্লবিক সত্তা তাঁর তাত্ত্বিক সত্তার মত জন্ম শোণিতা-শ্রয়ী। সেজন্যে 'আমি' প্রবন্ধ প্রকাশিত হওয়ার একবছর আগে থেকে যে 'বাঁধন-হারা' পত্রোপন্যাস 'মোসলেম ভারতে' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছিল সেখানেও ছিল তাঁর ঐ 'বিদ্রোহী' কবি-কণ্ঠের গাদ্যিক বাণীরূপ। যেমন :

আমি চাচ্ছিলাম আগুন—শুধু আগুন—সারা বিশ্বের আকাশে-বাতাসে, বাইরে-ভিতরে আগুন, তার মাঝে আমি দাঁড়াই আমারও বিশ্বগ্রাসী অন্তরের আগুন নিয়ে।...মানুষকে আঘাত করে হত্যা করেই আমার আনন্দ। আমার এ নিষ্ঠুর পাশবিক দুষমনী মানুষের উপর নয়, মানুষের স্রষ্টার উপর। এই সৃষ্টিকর্তা যিনিই হন, তাঁকে আমি কখনই ক্ষমা করতে পারব না।... আমাকে লক্ষ জীবন জাহান্নামে পুড়িয়ে আমায় কব্জায় আনবার শক্তি ঐ অনন্য অসীম শক্তিধারীর নেই। তাঁর সূর্য, তাঁর বিশ্বগ্রাস করবার মত ক্ষুদ্র শক্তি আমারও অন্তরে আছে।

এই প্রচণ্ড উগ্র ক্ষুব্ধ কণ্ঠের আত্মপ্রকাশই 'বিদ্রোহী' কবিতা। এর জন্ম নজরুলের জীবনের অভিজ্ঞতায়, মোহিতলালের 'আমি'তে নয়।

প্রসংগত বিষ্ণুপুরাণে ভগবানের যে রূপ আঁকা হয়েছে মোহিতলালের "আমি"তে তার আদল আছে কিন্তু তার অনুভূতিগ্রাহ্য প্রকাশ নেই।

কিন্তু নজরুলের চেতনাশ্রিত সে অনুভূতির প্রকাশ হয়েছে অপূর্ব বাণীতে। যাহোক এতক্ষণ আমরা উভয় কবির দুটি রচনার ভাবগত সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য দেখাবার চেষ্টা করলাম। শব্দগত কিছু সাদৃশ্যও দেখিয়েছি। এবার আকারগত সাদৃশ্য বৈসাদৃশ্য দেখাতে চেষ্টা করি। "বিদ্রোহী" কাব্যিক অর্থে কিংবা সংজ্ঞায় কবিতা, অন্যদিকে 'আমি' গদ্য কবিতাও নয়, নিছক গদ্য। 'আমি'তে কবিকল্পনা আছে, উপমা আছে, চিত্রকল্পও আছে. নেই কাব্যের আবেগ, নেই ছন্দ, ছন্দোদ্ভূত ভাবাবেগ। নজরুলের কবিতায় উপমা চিত্রকল্পের ও ছন্দধ্বনির অভূতপূর্ব হিল্লোলের মধ্যে অনুপ্রাসের যে হীবকদ্যুতি চেতনাকে মোহিত করে "আমি"তে তার চিহ্ন মাত্র নেই। এমনকি গদ্য কবিতার মধ্যে যে ছন্দের শাসন থাকে "আমি"র গদ্যে সে শাসন নেই, গভীর বিষয়কে তৎসম শব্দের ব্যবহারে গম্ভীব করতে গিয়ে ভাব হ'য়েছে আড়ষ্ট, গতিহীন,—শব্দ, ধ্বনি, ছন্দ কোনোটাই পাঠককে উদ্বেলিত কিম্বা উদ্বুদ্ধ করে তোলে না। রবীন্দ্রনাথের 'পাগল' প্রবন্ধে কিম্বা 'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পে যে কাব্যাশ্রয়ী গতিশীল ভাষার উদ্ভব হয়েছে ভাষার সেই সৌন্দর্যও এখানে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। মোহিতলালের 'আমি'র ভাষাকে ঘোমটাপরা অলঙ্কারের ভারে ন্যুব্জ নিশ্চল নববধূব মত মনে হয়। মোহিতলালের ঐ দম্ভ-গম্ভীর-জড়পিণ্ড ভাষাব নমুনা এখানে উদ্ধার করলাম :

> আমি মধুর—জননীর প্রথম পুত্রমুখচুম্বনের মত, তমিত বনভূমির উপর নববরষার পুষ্পকোমল ধারা স্পর্শের মত; দিব্যমাল্যাম্বরধরা ব্রীড়া-বেপথুমতী বিবাহধূম্রারুণ লোচনশ্রী নববধূব পাণিপীড়নের মত, যমুনা পুলিনে বংশীধ্বনির মত, প্রণয়িনীর শরমসঙ্কোচের মত, কৈশোর ও যৌবনের বয়ঃসন্ধির মত। আমি ম্যাডনা-বক্ষে নিমীলিত নয়ন স্তনন্ধয় শিশু; আমি সাবিত্রী-অঙ্কে মৃত পতি; আমি বিদর্ভরাজ তনয়াব প্রণয়দূত—হংস; আমি তাপসী মহাশ্বেতার নয়নসলিলার্দ্র তন্ত্রী বীণা; আমি স্বামীর সহিত সপত্নীর মিলনে স্মিতমুখী বাসবদত্তা; আমি পতি পরিত্যক্তা "ত্বমেব ভর্ত্তা ন চ বিপ্রয়োগ"-বচনা জানকী।

'বিদ্রোহী'র স্রোতোদ্বেল সুরমন্দ্রিত রোমহর্ষক প্রাণচঞ্চল ভাষার সংগে এই বারিতগতি জড়িত ছন্দগদ্যের কোন তুলনা চলে কি?

নজরুলের গান কবিতা : নজরুলের কবিতা গান

গান সম্বন্ধে কিছু বলার যোগ্য ব্যক্তি আমি নই। কিন্তু গানের কথা নিয়ে আমি হয়ত কিছু বলতে পারি। কেননা গানের কথাকে আমি প্রথমত এবং প্রধানত কবিতা বলেই মানি। এ-ব্যাপারে ইতিমধ্যে আমি বিভিন্ন লেখায় সে-কথাটি বলতে চেষ্টা করেছি যে গান অর্থাৎ সংগীত এবং কবিতা দুটি পৃথক জিনিস।

নজরুল ইসলামের গান ও কবিতা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়েই ওই কথাটিকে আমি জোর দিয়ে বোঝাতে চেয়েছিলাম এবং এক স্থানে আমি বলেও ছিলাম যে রবীন্দ্রনাথ যে "গীতাঞ্জলির" জন্যে নোবেল পুরস্কার পান তা গানের জন্যে নয়, কবিতা তথা কাব্যের জন্যে। মনে রাখা দরকার এই কাব্য—সাহিত্য। তাই চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস প্রমুখ বৈষ্ণব কবিদের গানগুলিকে আমরা সাহিত্য হিসেবে পাঠ করি, কবিতা হিসেবে রসোপভোগ করি, এবং ঐ বৈষ্ণব গীতির লেখক হলেও যেহেতু তার মধ্যে কাব্যরস আছে সে-জন্য সে-গুলোকে কাব্য মনে করি বলেই বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস বাংলাদেশের পাঠকের কাছে গান লিখিয়ে নন—কবি। এই ব্যাখ্যার প্রয়োজন হত না যদি-না এক শ্রেণীর সমালোচক নজরুল ইসলামের কবিতাকে দু'টি ভাগে ভাগ করে তাঁর কবিত্বশক্তি সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলতেন। তাঁদের মূল বক্তব্য হচ্ছে, নজরুল ইসলাম ভাল কবিতা লেখেননি, ভাল গান লিখেছেন। মানেটা দাঁড়ায় এই যে, যেহেতু তিনি ভাল কবিতা লেখেননি অতএব তিনি ভাল কবি নন। কিন্তু যেহেতু তিনি ভাল গান লিখেছেন এতএব তিনি ভাল গান লিখিয়ে। এবং ভাল গান লিখিয়ে আর ভাল কবি দুজন পৃথক মানুষ। সুতরাং যিনি ভাল গান লিখিয়ে অর্থাৎ গীতিকার (সমালোচকদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী) তিনি কবি নন। তাহলে ব্যাপারটা এই দাঁড়ায়, গীতাঞ্জলির গান লিখিয়ে

কবি নন। এবং বৈষ্ণব গীতির গান লিখিয়েও কবি নন। কেননা তাঁরা গান লিখেছেন কবিতা লেখেননি।

কিন্তু ব্যাপারটা অন্য কবিদের বেলায়—সমালোচকদের (তথাকথিত) মতে সত্য না হ'লেও কি করে নজরুলের বেলায় সত্য হয়েছে। সে জন্যে নজরুলের কবিতা কিংবা কাব্যবিচারে গানটাকে পৃথক করে রাখা হয় এবং গান নয়—এমন কবিতাগুলোকেই শুধু কবিতা হিসাবে বিচার করা হয় এবং সে বিচারের ফল হয় এমনি : নজরুল কবি হিসেবে অসংযত উচ্ছৃঙ্খল কিন্তু গান লেখায় ভারী সংযমী। শিরোমণি পণ্ডিত, রসপণ্ডিত ও বিদ্বান সমালোচক-বুদ্ধিজীবীদের কাছে 'গীতাঞ্জলির' গান-লিখিয়ে, বৈষ্ণব-গীতির গান-লিখিয়েরা কবি হিসেবে বিচার পান আর "বুলবুল", "চোখেরচাতক", "চন্দ্রবিন্দু", "গুল-বাগিচা" "সুর-সাকী" কিংবা "গানের মালা"র গান লিখিয়ে বিচার পান একজন গীতিকারের। আমি এটাকে অবিচার বা অন্ধ-বিচার মনে করে (শুধু-মাত্র নজরুলের বেলায়) ঐ প্রতিবাদের সুরটিকে জিইয়ে তুলতে চেষ্টা করি এবং বলতে চেষ্টা করি নজরুল গান লেখেননি শুধু, কবিতাই লিখেছিলেন। আর সে গানের লেখক যদি সংযমী হন তাহলে কবি নজরুল ইসলামও সংযমী। ধরা যাক নজরুল ইসলাম "অগ্নি-বীণা" লেখেননি, তিনি "বিষের-বাঁশী", "ভাঙার-গান", "ফণী-মনসা", "সন্ধ্যা", "সর্বহারা', "সাম্যবাদী", "প্রলয়-শিখা", "জিঞ্জির", "দোলন-চাঁপা" কিংবা "সিন্ধু-হিন্দোল" এ-সব কিছুই লেখেননি, তিনি শুধু গান লিখেছেন। একদা যেমন "গীতাঞ্জলি"র লেখক গান লিখেছিলেন, যেমন বৈষ্ণব-গীতির গীতিকারেরা গান লিখেছিলেন। এই গান-লিখিয়ে নজরুল ইসলামকে বাংলা-সাহিত্য তা' হলে কি বলে সম্বোধন করবে! কেবল গীতিকার বলে? গান লিখিয়ে ব'লে? তা হলে এর-পর থেকে "গীতাঞ্জলি"র লেখক এবং বৈষ্ণব-গীতির লেখকগণও যুক্তিশাস্ত্র অনুযায়ী আর কবি হিসেবে চিহ্নিত হবেন না, হবেন গীতিকার হিসেবে।

আরও কথা আছে।—"তোরা সব জয়ধ্বনি কর" ব'লে যে জাগরণী গানটি গাওয়া হয় সেটিনজরুলের "অগ্নি-বীণা" কাব্যের প্রথম কবিতা : "প্রলয়োল্লাস",

এবং "আমরা জানি "বিষের বাঁশী" কাব্যগ্রন্থের ২৫টি কবিতার মধ্যে ৬টি কবিতা (১-ফাতেহা-ই দোয়াজ-দহম, ২-সেবক, ৩-জাগৃহি, ৪-অভিশাপ, ৫-মুক্তপিঞ্জর ও ৬-ঝড়) ছাড়া বাদবাকী ১৯টিই গান হিসাবে প্রচলিত।" সমানভাবে "দোলন চাঁপা", "ছায়ানট", "সর্বহারা" ইত্যাদি কাব্যগ্রন্থের বহু কবিতাকে "নজরুল-গীতি" হিসেবে গাওয়া হয়।" কয়েকটি উদাহরণ : "দোলন-চাঁপা" থেকে : ১. পউষ এলো গো ; ২. বেলা শেষে উদাস পথিক ভাবে ; ৩. কান্না হাসির খেলার মোহে অনেক আমার কাটল বেলা ; ৪. প্রিয়! এবার আমায় সঁপে দিলাম তোমার চরণ তলে ; ৫. প্রিয়! সামলে ফেলে চলো এবার চপল তোমার চরণ! ; ৬. তুমি মলিন বাসে থাক যখন, সবার চোখে মানায় ; ৭. তুমি আমায় ভালবাস তাইতো আমি কবি ; ৮. আমি শ্রান্ত হ'য়ে আসব যখন পড়ব দোরে ট'লে ; ৯. আজ চোখের জলের প্রার্থনা মোর শেষ বরষের শেষে ;

ছায়ানট থেকে : ১. হে মোর রাণী! তোমার কাছে হার মানি আজ শেষে ; ২. আমার বিদায় রথের চাকার ধ্বনি ঐগো এবার কানে আসে, ; ৩. ঐ সর্ষে ফুলে লুটালো কার হলুদ রাঙা উত্তরী ; ৪. কোন্ সুদূরের চেনা বাঁশীর ডাক শুনেছিস ওরে চখা ; ৫. তুমি অমন ক'রে গো বারেবারে জল-ছলছল চোখে চেয়ো না ; ৬. এই নীরব নিশীথ রাতে ; ৭. বন্ধু আমার! থেকে থেকে কোন সুদূরের নিজন-পুরে ; ৮. কোন্ মরমীর মরম-ব্যথা আমার বুকে বেদনা হানে ; ৯. আমার আপনার চেয়ে আপন যে জন ; ১০. করেছ পথের-ভিখারিনী মোরে কে গো সুন্দর-সন্ন্যাসী ; ১১. রেসমি চুড়ির শিঞ্জিনীতে রিমঝিমিয়ে মরম-কথা ; ১২. আদর–গর-গর ; ১৩. ঐ ঘাসের ফুলে মটর-শুঁটির ক্ষেতে ; ১৪. ঐ নীল গগনের নয়ন-পাতায় ; ১৫. চাঁদ হেরিছে চাঁদ-মুখ তার সরসীর আরসীতে ; ১৬. নাম-হারা গাঙের পারে বনের কিনারে ; ১৭. মোরা ঝঞ্ঝার মত উদ্দাম, মোরা ঝর্ণার মত চঞ্চল ; ১৮. অমর-কানন মোদের অমর-কানন! ১৯. এবার আমার জ্যোতির্দেহে তিমির-প্রদীপ জ্বালো ;

"ভাঙার গান" গ্রন্থের সব কবিতাগুলিই গান। "সর্বহারা" গ্রন্থের "ফরিয়াদ", "আমার কৈফিয়ৎ", "গোকুলনাগ" ছাড়া সব কবিতাই গান। "ফণিমনসা" থেকে : ১. বিদায় রবির করুণিমায় অবিশ্বাসীর ভয় ;

২. আজ না চাওয়া পথ দিয়ে কে এলে ; ৩. কোন অতীতের আঁধার ভেদিয়া আসিলে আলোক জননী ; ৪. চঞ্চল-চঞ্চল বাণীর দুলাল এসেছিল পথ ভুলে ; ৫. ওড়াও ওড়াও লাল নিশান ! ' " ; ৬. জাগো অনশন বন্দী ওঠরে যত ; ৭. ওরে ও শ্রমিক সম মহিমার উত্তর অধিকারী !

"সিন্ধু-হিন্দোল" থেকে : ১. পথের দেখা এ নহে গো বন্ধু ; ২. পথিক ওগো, চলতে পথে তোমায় আমায় পথের দেখা ; ৩. ওগো আজ কেন মন উদাস এমন কাঁদছে পূবের হাওয়াব পারা ; ৪. নতুন পথের যাত্রা-পথিক চালাও অভিযান !

"জিঞ্জির" থেকে : ১. নবজীবনের নব উত্থান আজান ফুকারী এস নকীব ; ২. আসিলে কে গো অতিথি উড়ায়ে নিশান সোনালী ! ৩. অগ্রপথিক হে সেনাদল !

"সন্ধ্যা" থেকে : ১. যে দুর্দিনের নেমেছে বাদল তাহারি বজ্র শিরে ধরি ; ২. চল্ চল্ চল্ ঊর্ধ গগনে বাজে মাদল ; ৩. বাজল কি রে ভোরের সানাই ; ৪. একি বেদনার উঠিয়াছে ঢেউ দূর সিন্ধুর পারে ;

"প্রলয় শিখা" থেকে : ১. আয় রে পাগল আপন বিভোর খুশীর খেয়ালী ; ২. অসুরের খল কোলাহলে এস সুরের বৈতালিক ; ৩. টলমল টলমল পদভরে ; ৪. আমাদের জমির মাটি ; ৫. জাগো হে রুদ্র, জাগো রুদ্রাণী ; ৬. বালাশোর—বুড়ী বালামের তীর, নব ভারতের হল্‌দি ঘাট ;

'অর্থাৎ আমি বলতে চাই নজরুলের অনেক গানকে সমালোচকেরা কবিতা হিসেবে ধরে নিয়েছেন—অবশ্য ভালো করে তলিয়ে না দেখে। "দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার"কে গান হিসেবে গাওয়া হয় আবার টেক্সট্ বুক বোর্ড সেটাকে ছাত্রদের কবিতা হিসেবে পাঠ্য করেন।'

'একটা কথা অবশ্য আলোচিত হতে পারে। আর তা হল গানের সুনির্দিষ্ট কাঠামো। যেমন : গানগুলিকে এতটা বড় হ'তে হবে যাতে তা আড়াই তিন মিনিটের মধ্যে গেয়ে শেষ করা যায় ; যাতে তাকে অস্থায়ী অন্তরা আভোগ সঞ্চারীতে ভাগ করে নেওয়া যায় ; যাতে

তার স্তবক বিন্যাসে এমন কৌশল থাকে যাতে প্রতি স্তবকের শেষের পংক্তির সংগে প্রথম স্তবকের প্রথম পংক্তির অন্তমিল সংরক্ষিত হয় অর্থাৎ তার মারফত অস্থায়ীতে প্রত্যাবর্তন করা যায়।'

এমনি অনুশাসন মানলে নজরুলের যে গানগুলো শুদ্ধভাবে গান হিসেবে লিখিত—তার যেমন দু'চারটি কবিতার আখ্যা পাবে তেমনি স্তবক-বিন্যাস ও অন্ত্যানুপ্রাসের গুণে তাঁর কিছু দীর্ঘ কবিতা পাবে গানের মর্যাদা। "বুলবুল" গীতিগ্রন্থে এমনি কিছু দীর্ঘ গান আছে যা গাইলে ঐ আড়াই তিন মিনিটে কুলোবে না। যেমন : ১. বসিয়া বিজনে কেন একা মনে; ২. মৃদুল বায়ে বকুল ছায়ে ; ৩. কে বিদেশী বন উদাসী, ৪. করুণ কেন অরুণ আঁখি ; ৫. এত জল ও কাজল চোখে। গাওয়ার সময় এই সব গানের কোন কোন স্তবক বাদ দিয়ে গাওয়া হয়। অনুরূপভাবে নজরুলের দীর্ঘ কবিতার অনেক স্তবক বাদ দিয়ে গানের উপযোগী করে নেওয়া হয়। যেমন : ১. যেদিন আমি হারিয়ে যাব বুঝবে সেদিন বুঝবে ; ২. তোরা সব জয়ধ্বনি কর ; ৩. অগ্রপথিক হে সেনাদল! জোর কদম চলরে চল। এর কারণ ঐ অস্থায়ীতে ফিরে আসার মত সুযোগ ঐ সব কবিতার প্রতি স্তবকের শেষ পংক্তি দান করে।

একটি উদাহরণ থেকে বোঝাব চেষ্টা করা যাক। আমরা 'প্রলয়োল্লাস" কবিতাটিই বেছে নিলাম। এর স্তবক সংখ্যা মোট আটটি। প্রথম ও শেষ স্তবক দুটি অপূর্ণ স্তবক এবং আঙ্গিকগত দিক থেকে মধ্যের দুটি স্তবক পূর্ণ স্তবক মনে করা যেতে পারে। প্রথম স্তবকটি এমনি :

তোরা সব জয়ধ্বনি কর।
তোরা সব জয়ধ্বনি কর॥
ঐ নূতনের কেতন উড়ে কালবোশেখির ঝড়।
তোরা সব জয়ধ্বনি কর।
তোরা সব জয়ধ্বনি কর॥

এটিকে আমি অপূর্ণ স্তবক বলেছি কারণ পূর্ণ স্তবকের উদাহরণ হিসেবে দ্বিতীয় স্তবকটি এমনি :

আসছে এবার অনাগত প্রলয়-নেশার নৃত্য-পাগল,
সিন্ধু-পারের সিংহদ্বারে ধমক হেনে ভাঙল আগল ;
মৃত্যু-গহন অন্ধকূপে
মহাকালের চণ্ড-রূপে—
ধূম্র-ধূপে
বজ্র-শিখার মশাল জ্বেলে আসছে ভয়ঙ্কর !
ওরে ঐ হাসছে ভয়ঙ্কর।
তোরা সব জয়ধ্বনি কর।
তোরা সব জয়ধ্বনি কর !!

এখন দেখা যাবে পূর্ণ স্তবকের শেষ পংক্তিটি এমনভাবে তৈরী যাতে প্রথম স্তবকের "তোরা সব জয়ধ্বনি কর" নিখাদভাবে মিলে যায়। ঐ মিলের জন্যেই ৩য় স্তবকের শেষ পংক্তি হল—'ওরে ঐ স্তব্ধ চরাচর।' ৪র্থ স্তবকের 'হাঁকে ঐ জয় প্রলয়ংকর।' ৫ম স্তবকের 'আলো তার ভরবে এবার ঘর।' ৬ষ্ঠ স্তবকের 'এই তরে তার আসাব সময় ঐ রথ-ঘর্ঘর। ৭ম স্তবকের—'ভেঙে আবার গড়তে জানে সে চিরসুন্দর' এবং ৮ম স্তবকের —'কাল ভয়ঙ্করের বেশে এবার ঐ আসে সুন্দর।' এই অপূর্ব সুন্দর অন্ত্যানুপ্রাসের জন্যেই অস্থায়ীতে বারবার ফিরে যাওয়া সহজ-সম্ভব হচ্ছে। তাই কবিতা হয়ে উঠছে বিশুদ্ধ গান। এমনিভাবে দেখলে "বিদ্রোহী" কাবতাটিকেও গানের ফর্মে নিয়ে আসা যায়। "বল বীর বল উন্নত মম শির।" এই দু'টি লাইন অস্থায়ীর রূপ। এর প্রথম স্তবকের প্রকৃত শেষ পংক্তি—'মম ললাটে রুদ্র ভগবান জ্বলে রাজ-রাজটীকা দীপ্ত জয়শ্রীর।' কবিতা হিসেবে 'শির' এর সংগে 'শ্রীর' মিল হল। আর গানে অস্থায়ীতে ফিরে যাওয়ার জন্যে হ'ল 'শ্রীর' উৎপত্তি। এইভাবে ২য় স্তবকের শেষ পংক্তি হল ; 'আমি বিদ্রোহী-সূত বিশ্ব-বিধাত্রীর।" ৩য় স্তবকের শেষ পংক্তি "আমি শাসন ত্রাসন সংহার আমি উষ্ণ চির-অধীর।" ৪র্থ স্তবকের শেষ পংক্তি : "আমি ব্যোমকেশ, ধরি বন্ধন-হারা ধারা গঙ্গোত্রীর।" ৫ম স্তবক থেকে ১২শ স্তবক পর্যন্ত অমনি অনুপ্রাসিত শেষ পংক্তি মিলবে না। কিন্তু কবি একেবারে শেষ দুটি লাইনকে অনুপ্রাসিত করে আবার প্রথম ও দ্বিতীয় পংক্তিকে

স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন—মনে হয়েছে হঠাৎ দমকা বাতাস খেয়ে ঘুড়িটা লাটাই থেকে অনেকখানি সূতো বের করে নিয়ে তবে পূর্বেব ছন্দ ফিরে পেল অথবা বড়শী গাঁথা কোন বড় মাছ প্রাণপণ শক্তিতে একটানে কল থেকে অনেক সূতো বের করে সূতোর টান রেখে থামল। এই দু' অবস্থাতেই সূতোর টানটি ধনুকের ছিলার মত ধনুকটিকে শিথিল হতে দেয় না। মনে রাখা দরকার ঐ ছোটাব গতির মধ্যে ক্ষমতার একটা ঋজু অনড় টান থাকে। ফলে মাঝখানের স্তবকে অনুপ্রাসিত পংক্তি না থাকলেও তার অস্তিত্বের চিহ্ন বিনষ্ট হয় না।

যা হোক আমবা "বিদ্রোহী" কবিতা ছেড়ে "অগ্নিবীণা"ব আবও দু'টি কবিতাকে এই আলোচনার বিষযভুক্ত করি। এই কবিতা দুটি : ১. শাত-ইল-আবব ; ২. 'কোববানী' ; "প্রলযোল্লাস" এর মত এই দুটি কবিতায় স্তবক বিন্যাসে স্বেচ্ছাচারিতা নেই, নেই কোনো উচ্ছৃঙ্খলতা

"শাত-ইল-আরব" কবিতার স্তবক সংখ্যা ৬ (ছয়)। এবং প্রথম লাইন "শাত-ইল-আরব। শাত-ইল-আরব॥ পূত যুগে যুগে তোমার তীর।" দ্বিতীয় লাইন'—"শহীদের লোহু দিলীরের খুন ঢেলেছে যেখানে আরব-বীর।"-এর সঙ্গে অন্ত্যানুপ্রাস ঘটেছে প্রথম স্তবকের শেষ পংক্তি "শমশের-হাতে আঁসু-আঁখে হেথা—মূর্তি দেখেছি বীর-নারীর।" এবং গানের অস্থায়ীর পংক্তিটিকে এব পরবর্তী পংক্তি করা হয়েছে—অর্থাৎ প্রথম স্তবকের প্রথম পংক্তিটিকেই প্রথম স্তবকের শেষ পংক্তি করা হয়েছে। এমনিভাবে ২য় স্তবকের প্রকৃত শেষ পংক্তি : গর্জে রক্ত-গঙ্গা ফোরাত,"—শাস্তি দিয়াছি গোস্তাখীর।" ৩য় স্তবকের প্রকৃত শেষ পংক্তি : "সাহারায় এরা ধুঁকে মরে তবু পবে না শিকল পদ্ধতির।" ৪র্থ স্তবকের প্রকৃত শেষ পংক্তি "জুল্‌ফিকার আব হায়দরী হাঁক হেথা আজো হজরত আলীর।" ৫ম স্তবকের শেষ পংক্তি "খঞ্জরে ঝরে খর্জুর-সম হেথা লাখো দেশ ভক্ত শির।" এবং ৬ষ্ঠ স্তবকেব শেষ পংক্তি : "পরাধীনা একই ব্যথায় ব্যথিত ঢালিল দু'ফোঁটা ভক্ত বীব।" আর এরাই ছিলার মত ১ম পংক্তিটিকে বারবার নুইয়ে এনে তার কণ্ঠে মিলের ফাঁসী পরিয়েছে। বলা বাহুল্য ১ম পংক্তিটি এমনি বাবংবাব উচ্চারিত হলেও তা কিন্তু অপরিবর্তিত ভাবে হয়নি। যেমন ২য় স্তবকে

এসে হয়েছে : 'দজলা-ফোরাত-বাহিনী শাতিল। পূত যুগে যুগে তোমার তীর।' ৩য় স্তবকে ঠিক থেকেছে। ৪র্থ স্তবকের সময় হয়েছে : 'শাতিল আরব। শাতিল আরব জিন্দা রেখেছে তোমার তীর।' (এখানে অবশ্য বাক্যের খাতিরে—।) ৫ম স্তবকে ঠিক থেকেছে। ৬ষ্ঠ স্তবকে হয়েছে 'শহীদের দেশ বিদায়, বিদায় এ-অভাগা আজ নোয়ায় শির।' এটাকে অতিরিক্ত পংক্তি মনে করলেও একমাত্র মিলের অপূর্বতায় সে তার বিকৃতিকে মুছে ফেলেছে। কারণ ঐ মিলের পরেও অতি সহজেই ঐ লাইনটিকে চুমো খেতে নূয়ে আসে প্রথম পংক্তির অতুলনীয় গ্রীবা।

একই কথা "কোরবানী" সম্পর্কেও প্রযুক্ত হয়। এর স্তবক সংখ্যা নয়। এবং স্তবক বিন্যাসের দিক থেকে এটি আরও শুদ্ধ। এর প্রথম ও দ্বিতীয় পংক্তি নিম্নরূপ :

"ওরে হত্যা নয় আজ 'সত্য-গ্রহ' শক্তির উদ্বোধন/দুর্বল! ভীরু! চুপ্ রহো ওহো খামখা ক্ষুব্ধ মন!" এরই সঙ্গে (অন্তরার সঙ্গে) মিল হয়ে প্রথম স্তবকের প্রকৃত শেষ পংক্তির "আজ শোর ওঠে জোর, খুন দে-জান দে'শির দে বৎস শোন!" ২য় স্তবকের শেষ পংক্তি : দুনো উন্মাদনাতে সত্য মুক্তি আনতে যুঝবো রণ!" ৩য় স্তবকের শেষ পংক্তির "ওরে শক্তি হস্তে মুক্তি, শাক্তি রক্তে সুপ্ত শোন।" ৪র্থ স্তবকের শেষ পংক্তির "এয় ইব্রাহিম আজ কোরবানী কর শ্রেষ্ঠ পুত্রধন।" ৫ম স্তবকের শেষ পংক্তির "তাই জননী হাজেরা বেটারে পরালো বলির পূত বসন।" ৬ষ্ঠ স্তবকের শেষ পংক্তির "আজ জল্লাদ নয়-প্রহ্লাদ সম মোল্লা খুন-বদন!" ৭ম স্তবকের শেষ পংক্তি "ওরে তাথিয়া তাথিয়া নাচে ভৈরব বাজে ডম্বরু শোন।" ৮ম স্তবকের শেষ পংক্তির "ওরে সত্য মুক্তি স্বাধীনতা দেবে এই সে খুন-মোচন।" ৯ম স্তবকের শেষ পংক্তির "আজ আল্লার নামে জান কোরবানে ঈদের পূত বোধন।"

অর্থাৎ ঠিক সেই গানের মত এর মিল-বিন্যাস। তার মানে আমি বলতে চাই "প্রলয়োল্লাস" কবিতা হ'য়েও যেমন গান, গান হয়েও যেমন কবিতা এগুলোও ঠিক তেমনি কবিতা হয়েও গান, গান হয়েও কবিতা। এবং এমনি ভাবেই প্রমাণিত হয়, খুব সহজেই প্রমাণিত হয়, নজরুলের সকল গানই আসলে কবিতা—সুরটা মাধ্যম মাত্র—প্রকাশ মাধুর্যের, প্রকাশ বৈচিত্র্যের।

মৃত্যুক্ষুধা এবং নজরুল ইসলাম

গীতি-কবির একটি কুললক্ষণ হল এই যে, সে বৃহৎ একটা বিষয়কে ক্ষুদ্র আধারে ধরে রাখার পক্ষপাতী। অসামান্য বিষয়কে, এবং অগাধ ভাবনাকে এবং বিরাট একটা কালকে কয়েকটা পংক্তিতে বেঁধে রাখাই তাঁর কৃতিত্বের পরিচয়। হাজার পৃষ্ঠা রচনা করে যে কথা বলা সম্ভব নয় গীতি-কবি একটিমাত্র গানে হয়ত সেই অসম্ভবকে ফুটিয়ে তোলেন। গোটানো এই স্বভাবের ফলে এবং ক্ষুদ্রের মধ্যে বৃহৎকে ধরে রাখার প্রকৃতির জন্যে তাঁর পক্ষে বিস্তৃত পটভূমির উপর ছবি আঁকা অস্বস্তিজনক। এবং ঐ কারণেই উপন্যাস রচনাও গীতি-কবির স্বভাব-ধর্ম নয়। এই কারণে যখন তিনি উপন্যাস লেখায় হাত দেন তখন তাঁর ভাগ্যে সার্থকতা সেই পরিমাণে জোটে না যে পরিমাণে ঔপন্যাসিকের ভাগ্যে জোটে। ঘটনাক্রমে নজরুল ইসলাম সেই ভাগ্যচক্রে বাঁধা পড়েছিলেন। অবশ্য তাঁর মত দুর্দমনীয় প্রতিভার পক্ষে অসম্ভব বলে কিছু আছে বলে মনে করি না। কিন্তু ভালো এবং মনোত্তীর্ণ উপন্যাস লেখার বয়সে পৌঁছেই তাঁর সাহিত্য-জীবনের সমাপ্তি ঘটেছে। সুতরাং সেই অঘটন-ঘটন-পটিয়সী কবি-প্রতিভা প্রতিশ্রুতির স্বাক্ষর মাত্র রেখে এবং বিরাট সম্ভাবনার সূচনা মাত্র করে অতৃপ্ত বাঙালী উপন্যাস-পাঠকের কাছ থেকে চিরদিনের জন্য বিদায় নিলেন। 'মৃত্যক্ষুধা' সম্বন্ধে আলোচনার আগে এই কটি কথা বলার প্রয়োজন এই জন্যে হল যে সেখানে একজন গীতি-কবির সংগে সংগে একজন সার্থক শিল্পী ঔপন্যাসিককে পেতে গিয়েও আমরা পেলাম না। পাল্লাপাল্লি করে ছুটতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত হার হল ঔপন্যাসিকের, জিৎ হল কবির।

ঔপন্যাসিকও কবি এবং ডিকেন্স থেকে শুরু করে ফ্লোবেয়ার, জোলা, তুর্গেনিভ, টলস্টয়, ডস্টয়ভস্কিকে কেউ অকবি বলবেন বলে মনে করি না। অন্তত 'কপালকুণ্ডলা'র যিনি লেখক, সেই বঙ্কিমচন্দ্রও যে আসলে কবি ছিলেন, সে-কথা অস্বীকার করবে কে? কিন্তু চরিত্র বিশ্লেষণ করে ঘটনার পর ঘটনা নির্মাণ করে ধীরে ধীরে একটি পরিণতিতে পৌঁছানো, ভাব, আবেগ এবং প্রাণশক্তির ব্যাপার নয়, অভিজ্ঞতা, যুক্তি এবং স্থৈর্যের ব্যাপার। সাধনা করে সেই স্থৈর্যকে আয়ত্ত করতে হয় এবং তার প্রয়োজন হয় সময়ের। নজরুল ইসলাম অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন, কিন্তু সময়াভাবে ঐ স্থৈর্যকে জয় করতে পারেননি; আর যা বলেছি সেই পূর্বের কথা, কম সময়ে বেশী সময়কে আটকাবার চেষ্টাই তাঁর সেই অস্থৈর্যের প্রমাণ।

কিন্তু, তাহলেও সবক্ষেত্রে যেমন, উপন্যাসেও তেমনি নজরুল ইসলাম তাঁর শক্তিমান হাতের স্পষ্ট স্বাক্ষর ফুটিয়ে তুলেছেন এবং 'মৃত্যুক্ষুধা'য় তিনি দেখিয়েছেন যে, উপন্যাস-শিল্পী হিসেবে তাঁর স্থান যাই হোক, কথা-শিল্পী হিসেবে তিনি প্রথম শ্রেণীর।' অর্থাৎ বাঙলা ভাষার নাড়ীজ্ঞান যেমন তাঁর অসাধারণ, তেমনি তার স্বভাবধর্মও তাঁর নখদর্পণে। কেবল ফারসী আত্মসাৎকারী বাঙলা নয়, গ্রাম্যবুলিভরা বাঙলা যে কত দক্ষতার সাথে ব্যবহার করা সম্ভব, 'মৃত্যুক্ষুধা' না পড়লে সেটা অনুমান করা যায় না। এবং 'বলতে কি, আধুনিক কবিতায় যেমন, তেমনি আধুনিক গদ্য-সাহিত্যেও ভাষা এবং বিষয়ের চরম বাস্তবতার তিনিই প্রথম পথিকৃৎ।' অন্তত তাঁর আগে অত নিম্নশ্রেণীর মানুষের ভাষা এবং জীবন-কাহিনী অমন দৃষ্টিকোণ থেকে যে আর কোন বাঙালী লেখক লেখেননি, সে-কথা নির্দ্বিধায় বলে দেওয়া যায়।' যায় এইজন্যে যে, আচার, নীতি, ধর্ম এবং সংস্কৃতির সমস্যাই যে জাতির একমাত্র দুঃখের কারণ নয়, দুঃখের কারণ তার অর্থ-নৈতিক সমস্যা, নজরুল সর্বপ্রথম স্পষ্টভাবে 'মৃত্যুক্ষুধা'য় সেই কথা উচ্চারণ করলেন। মেজ-বৌ খ্রীস্টান হত না, যদি সুঠাম অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় গড়ে ওঠা সমাজের অধিবাসী হতো সে, সেও না, প্যাকালেও না। আর সেটা যে কতদূর সত্য, সেটা প্যাকালেকে নজরুল বরিশাল থেকে ফিরিয়ে এনে পুনরায় মুসলমান করে দেখিয়েছেন। মাত্র দু'টি লাইনে

ঐ ইঙ্গিত করে নজরুল তাঁর অদ্ভুত সামাজিক, রাজনৈতিক এবং ঐতিহাসিক জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন :

> প্যাঁকালেকে স্থানীয় খান বাহাদুর সাহেব একটা কুড়ি টাকার চাকুরী জুটিয়ে দেওয়াতে সে আবার কলমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেছে।
>
> ধর্মান্তরিত হয়ে সে ন্যায় করল, না অন্যায় করল, পাপ করল, না পুণ্য করল, সেটা জানুক অথবা না জানুক, এটা সে ভাল করে জানে যে, এব জন্যে সে তিলে তিলে ধুঁকে মরারহাত থেকে বাঁচল।

সাধাবণ মানুষ সে, জীবনের ভোগের দিকটা তাব কাছে বড়, দুঃখের চেয়ে বড় তার কাছে সুখ, আত্মিক প্রেমের চেয়ে তার কাছে বড় দৈহিক প্রেম, ত্যাগের চেয়ে বড় ভোগ ; সুতরাং কুশিকে নিয়ে সংসার পাতলে সেই ভোগের এবং সুখের জীবনের অন্তরায় অভাবকে ঠেকাতে হবে প্রথমে। তাই সূক্ষ্ম ভাবনা-চিন্তার লতাতন্তুতে আটকাবাব আগেই সম্প্রসারিত অর্থলোভের আমন্ত্রণকে সে অগ্রাহ্য করতে পারেনি। কিন্তু যে কারণে তার মত অশিক্ষিত লোকের পক্ষে এটা সম্ভব হয়েছিল, সেই একই কার্য-কারণে কি মেজ-বৌয়ের মত ক্ষুরধার বুদ্ধিমতী নারীর পক্ষে সেটা সম্ভব হল ? অভাবের জন্যেই খ্রীস্টান হয়েছিল মেজ-বৌ ? না, তাকে খ্রীস্টান হতে বাধ্য করেছিল তার মন।

মনের মত সমস্যা বোধ হয মানুষের জীবনে আর কিছু নেই। এই মন যেমন মানুষের উন্নত জীবনের দিকে আকর্ষণ করে, তেমনি ঐ মনই মানুষের সুখের বাধা হয়ে দাঁড়ায়। পুরুষ বলে আমাদের সমাজে প্যাঁকালের অর্থের প্রয়োজন পড়েছিল, কিন্তু মেজ-বৌয়েব ঠিক অর্থের প্রয়োজন ছিল না। নারী আমাদের সমাজে অন্যের কাঁধে চাপে, নিজের কাঁধে অন্যকে চাপায় না। শুধু অর্থের প্রয়োজন পড়লে তার ভগ্নিপতিকে না হোক, অন্য কাউকে বিয়ে করে মেজবৌ সে চিন্তা থেকে রেহাই পেতে পারত। কিন্তু তার ইচ্ছা শুধু বাঁচার নয়, তার পিপাসা জীবনের। কুণ্ডলায়িত ঐ পরিবেশের মধ্যে আটকে থেকে তার বৃহৎ জীবনের মৃত্যু হচ্ছিল তিলে তিলে, সেই কঠিন নিষ্পেষণ থেকে উদ্ধার পাবার জন্যে, তার মত মেয়ের জীবনের পক্ষে বায়ুহীন,

রুদ্ধশ্বাস গৃহ থেকে উদ্ধার পাওয়ার প্রয়োজনে সে খ্রীস্টান ধর্ম গ্রহণ করেছিল। বোধ হয়, এই জন্যে সে আনসারের কথার উত্তরে বলেছিল : 'আমি ত হঠাৎ খ্রীস্টান হইনি। আপনারা একটু একটু করে আমায় খ্রীস্টান করেছেন।' বস্তুত এটা তার জীবনে আরও দ্রুত ঘটবার কারণ মেম সাহেবের সংগে তার সাক্ষাৎ। নারী হয়েও যে-সমাজে অত্যন্ত সহজ এবং স্বাভাবিকভাবে চলাফেরায় বাধা নেই সে-সমাজের প্রতি আকর্ষণ মেজ-বৌর মত স্বাধীন, প্রাণচঞ্চল, জীবনোন্মুখ নারীর পক্ষে খুবই স্বাভাবিক।

মেজ-বৌর পক্ষে আরও স্বাভাবিক এই কারণে যে, তার পূর্বোল্লেখিত 'মন' ছিল, আর সে ঐ পরিবেশে লালিত-পালিত-বর্ধিত আর পাঁচজন সাধারণ মেয়ের মত নয়—রূপেও নয়, গুণেও নয়। সুতরাং উপন্যাসে লেখক যখন তাকে খ্রীস্টান বানালেন, তখন আর সেটাকে আর কোন একটা উদ্ভট কাণ্ড বলে মনে হল না; বরং ঐ করে তিনি হতভাগ্য সমাজের যেমন একটা মর্মান্তিক চিত্র আঁকলেন, তেমনি একটা ভয়াবহ ইঙ্গিত করলেন ঐ সমাজকে উপলক্ষ করে—আচার দিয়ে, অনুশাসন দিয়ে, গোঁড়ামি, কুসংস্কার আর প্রগতিবিমুখতা দিয়ে নিজের বুকের মধ্যে সে মৃত্যুর জীবাণু পুষছে উদাসীনভাবে।

উদ্দেশ্যমূলক সাহিত্য-রচনায় পদার্পণ করেছিলেন নজরুল ইসলাম। সে কবিতাতেও যেমন, তাঁর গদ্য-সাহিত্যেও তেমনি। 'মৃত্যুক্ষুধা'ও তেমনি উদ্দেশ্যমূলক উপন্যাস। সে উদ্দেশ্য আমরা উপন্যাসের প্রতিটি পর্বে, প্রতিটি স্তরে প্রতিনিয়ত অনুভব করি। কী জঘন্য নোংরা পরিবেশের মধ্যেই না সমাজের একটি বৃহত্তম শক্তি ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে উদ্দেশ্যহীন, স্থূল, অপরিতৃপ্ত, অসুখী জীবনের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়ে। উপর-তলার অধিবাসীরা তাদের দেখেও দেখে না, মাথা ঘামাবার সময় পায় না তাদের নিয়ে; কিন্তু বিশেষ এক সময়ে তাদেরকে বড় করিৎকর্মা দেখা যায়। ধর্মের ব্যাপারে তারা বড় উৎসাহী, সেইখানে তারা পান থেকে চুন খসতে দেখলে চমকে ওঠে, যেন তাদের ইহকাল-পরকাল ধ্বসে যাচ্ছে। মেজ-বৌ ফিরে এলে তাই পাড়ার মোড়ল তাকে মুসলমান করার জন্য তৎপর হয় :

পাড়ার মোড়ল হিসেবি লোক, অনেক চিন্তার পর সে স্থির করল যে, পাড়ার কোন মুসলমান ছোকরাকে দিয়ে ওর রসস্থ মন ভুলাতে পারলে ওকে অনায়াসেই স্বধর্মে ফিরিয়ে এনে একজন নাসারাকে মুসলমান করার গৌরব ও পুণ্যের অধিকারী হ'তে পারবে।

ধর্ম চলে গেলে তার সর্বনাশ হবে, সে বোঝে। কিন্তু সে বোঝে না, দ্রুত ধাবমান দুনিয়ার সংগে সমান তালে পা ফেলে না চললেও তার সর্বনাশ হবে। খ্রীস্টান ধর্ম মেজ-বৌকে আকৃষ্ট করেনি, মেজ-বৌকে আকৃষ্ট করেছিল সাহেব এবং মেম-সাহেবের আচার-আচরণ, শিক্ষা এবং মানুষের প্রতি মানুষের মনুষ্যোচিত ব্যবহার। চিকিৎসার জন্য তারা শুধু ওষুধ বিলায় না, পথ্যের পয়সা পর্যন্ত দেয়। গরীব বলে, কুলী-বস্তিতে থাকে বলে, ঘৃণা করে তাদের দূরে সরিয়ে রাখে না, কাছে টেনে এনে বসায়, অপরিচ্ছন্ন থাকলে পরিচ্ছন্ন হতে সাহায্য করে, অশিক্ষিত হলে শিক্ষিত হবার পথ বাতলে দেয় :

> মিস্ জোন্স মেজ-বৌকে তার বিছানায় জোর করে বসিয়ে বললে, 'একটু চা খাও আমার সাটে টারপর কঠা হবে'।

কিংবা

> এ-কথার সে-কথার পর মিস্ জোন্স হঠাৎ বলে উঠল, 'ডেখো, টোমার মটো বুদ্ধিমটী মেয়ে লেখাপড়া শিখলে অনেক কাজ করটে পারে। টোমাকে ডেখে এট লোভ হয় লেখাপড়া শেখাবার'।*

এখন বুঝতে আর বাকী থাকে না, কিসের আকর্ষণে মেজ-বৌ ধীরে ধীরে পা বাড়াচ্ছিল। নিজের ধর্মের প্রতি তার গভীর টান থাকা সত্ত্বেও নিজের মন নামক নিঃসঙ্গ বস্তুটির খাদ্য জোটাতে পারছিল না সেখান থেকে। অথচ মন তার বুভুক্ষু। তাই মসজিদের আজান ধ্বনির কথা মনে ওঠার পর এবং সেই সঙ্গে একটা পাপ-বোধ জাগলেও জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাওয়ার লোভেই যেন তাকে আবার টান দিল অন্যদিকে,

---

* এটা মনে করা উচিত হবে না যে মেম সাহেবের ঐ সৌজন্যসুলভ ভদ্র আচরণ কৃত্রিম নয়। তাদের ঐ আচরণের পিছনে যে মুখোসধারী রাজনীতিকের চেহারা বিদ্যমান সেটাও নজরুল বোঝাতে চেয়েছেন।

আজানধ্বনি তাকে নিরস্ত করতে পারল না, ফেরাতে পারল না, অন্তত লেখকের মতে। যে কারণে ফেরে, সে কারণও আছে 'মৃত্যুক্ষুধা'তে। সেই কারণ দেখাবার জন্যেই বুঝি উপন্যাসের পনের পরিচ্ছেদের পর ঘটনা সম্পূর্ণ অন্যদিকে বাঁক নিল। এই বাঁক নেওয়ার ফলে পাঠক হঠাৎ বিভ্রান্ত হয়, আকস্মিকতার ফলে কেমন যেন নিরুৎসাহ হয়ে পড়ে; মনে হয়, মূল ঘটনা বাদ দিয়ে লেখক অন্য ঘটনায় লাফিয়ে চলে গেলেন, প্রথম কাহিনী শেষ করার প্রয়োজন মনে করলেন না। কিন্তু ব্যাপারটা ঠিক তা নয়। মেজ-বৌকে কেবল তার বাৎসল্য-প্রেম ফিরিয়ে আনেনি, জীবনকে সঞ্জীবিত রাখার জন্য নারীর জন্যে যে পুরুষ-প্রেমের প্রয়োজন মেজ-বৌয়ের জীবনে ছিল তার একান্ত অভাব। সেই প্রেমও তাকে আকর্ষণ করেছিল। আর আকর্ষণ করেছিল মধ্যবিত্ত সংসারের মেয়ে লতিফা। আনসার ও লতিফার কাছে সে যখন তার ব্যক্তিসত্তার মর্যাদা পেল, তখন আবার তার মন উজান বইতে শুরু করল। যদিও বাৎসল্য প্রেমের কাছে পরাজয় মেনে সে পুনরায় মুসলমান হল, কিন্তু তার আবার মুসলমান হতে বেগ পেতে হল না এই জন্যে যে, কয়েকজন শুভাকাঙক্ষীর ভালবাসা ইতিমধ্যে সে পেয়েছিল।

এইখানটায় এসে লেখকের মৌল বক্তব্যকে যেন কিছুটা কুয়াশাচ্ছন্ন বলে মনে হয় এবং এই জন্যেই আমি বলেছি যে, কবি এবং ঔপন্যাসিকের পাল্লাপাল্লিতে শেষে কবি জিতলেন। অর্থাৎ দ্বিতীয় পর্যায়ে ক্রমেই উপন্যাস ইঙ্গিতপূর্ণ হতে লাগল, যেন কয়েকটা মাত্র রেখার টানে লেখক তাঁর বক্তব্য পেশ করবেন আর সেই দ্রুততর পরিণতি হল শেষ পর্যন্ত রুবির আবেগভরা চিঠি। অর্থাৎ নদী মাঝপথে শুকিয়ে গেল, সমুদ্র পর্যন্ত পৌঁছল না। তা না পৌঁছুক, তবু 'মৃত্যুক্ষুধা'র ইঙ্গিতটুকু আমাদের সমাজের কাছে সাপের মাথার মণির মত, অন্ধকার পথে উজ্জ্বল প্রদীপ।

ছুঁৎমার্গ ইসলাম ধর্ম নয়। ছোট-বড়র ভেদাভেদও ইসলামে নেই। সুতরাং একজন হিন্দুর পক্ষে বরং খ্রীস্টান হওয়া যত সোজা, মুসলমানের পক্ষে সেটা হওয়া তত সোজা ত নয়ই, বরং তা কিছুটা অস্বাভাবিক। কেননা, মানবিক মর্যাদাবোধের ব্যাপারে ইসলাম খ্রীস্টান ধর্মের চেয়ে আর কয়েক ধাপ উপরের। এটা খ্রীস্টান ধর্মকে ছোট করে দেখানোর কথা নয়

এটা প্রামাণিক বাস্তবিকতা। কিন্তু সেই বাস্তবিকতা মুসলমান সমাজে যথার্থ পালন হয় কোথায়? লেখক ইসলাম ধর্ম কি, তা জানেন এবং জানেন বলে 'মৃত্যুক্ষুধা'ব দ্বাবিংশ পবিচ্ছেদে তিনি লিখছেন :

> মসজিদের ভিতর থেকে মৌলবী সাহেবের কণ্ঠ ভেসে আসে। কোবানেব সেই অংশ—যার মানে—'আমি তাহাদের নামাজ কবুল কবি না, যাহাবা পিতৃহীনকে হাঁকাইয়া দেয।"* মৌলবী সাহেব জোবে জোবে পাঠ কবেন, ভক্তবা চক্ষু বুঁজিযা শোনে।

"মৌলবী সাহেব জোরে জোবে পাঠ কবেন, ভক্তরা চক্ষু বুঁজিযা শোনে" বটে, কিন্তু ঐ মৌলবী সাহেবই আবার 'ভুখা আছ, মর গো ভাগাড়ে গিযে' বলে ক্ষুধিত মুসাফিরকে তাড়িয়ে দেন। তার মানে ধর্ম তাঁর গ্রন্থেই বাঁধা পড়ে থাকল, তাঁর ব্যবহারিক জীবনে কোন কাজে এল না।

নজরুল ইসলাম গভীব বস্তুবাদীর দৃষ্টিকোণ থেকে উপন্যাস শুরু করেছিলেন। ইংরেজ শাসনের ফলে সাধাবণ মানুষের জীবনে যে কি বিকট ভয়াবহ অবস্থা নেমে এসেছিল, তা তিনি মর্মে মর্মে অনুধাবন করতে পেবেছিলেন। উপন্যাসেব প্রথম দিকে প্যাঁকালের সংসারের যে ছবি তিনি এঁকেছেন, তা বোধহয় এখনও অনেক বস্তুবাদী লেখকেবও কল্পনাব বাইরে। বীভৎস দাবিদ্র্য বলে যদি কিছু থাকে, তার নগ্ন ভীষণ মূর্তি প্রকটিত হযেছে সেখানে, আব কঙ্কালের মত তাব নারকীয় চেহারা যেন অবিরাম থুথু ছিটোচ্ছে ভদ্র-সমাজের মুখে। কয়েকটা দৃশ্য উদ্ধৃত কবে দেখা যেতে পাবে :

* 'সুবা আল-মাউন'-এব বাংলা অর্থ এই :--তুমি কি চিন তাহাকে যে মিথ্যা জানে কিয়ামতকে ? সে ঐ ব্যক্তি যে বিতাড়িত কবে অনাথকে. আব [লোকদেব] প্রবৃত্তি দেয় না পবিত্র ভোজনে। আর আফসোস সেই উপাসকদের জন্য যাহাবা নামায্ বিষয়ে অসতর্ক, যাহাবা চায যে লোকে দেখুক আর দেয় না [প্রতিবেশীকে] নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তু। নজরুল নিজে তাঁর "কাব্য আমপারা" গ্রন্থে এই সুরাটির অনুবাদ করেছেন এইভাবে :

১. আয়নার অভাব সে কিছুদিন থেকে থালার জলেই মিটিয়ে আসছে।

২. কিছুদিন থেকে সে রোজই তার রোজের পয়সা থেকে তার চার আনা আলাদা করে রাখে, আর মনে করে, আজ একটা আয়না কিনবেই। কিন্তু যেই বাড়ীতে এসে বাজার করতে গিয়ে দেখে, ছ' আনায় সকলের উপযোগী চালই হয় না, তখন লুকানো সিকিটাও তাকে বের করতে হয় কোঁচড় থেকে।

৩. প্যাঁকালে চ'লে যাবার পরই তার দ্বাদশটি ক্ষুধার্ত ভাইপো-ভাইঝি মিলে যে বিচিত্র সুরে ফরিয়াদ করতে লাগল ক্ষুধার তাড়নায়, তাতে অন্নের মালিক যিনি, তিনি এবং পাষাণ ব্যতীত আর সব কিছুই বুঝি বিচলিত হয়।

৪. সেজ-বৌ হপ্তাখানেক হ'ল টাইফয়েড থেকে কোনো রকমে বেঁচে উঠেছে মাত্র। বেঁচে থাকার চিহ্ন শ্বাস-প্রশ্বাসটুকু ছাড়া তার আর কিছু নেই। দেহের যেটুকু অবশিষ্ট আছে, তা কবরে দেওয়া ছাড়া আর কোন কাজে লাগে না। যেন কুমীরে চিবিয়ে গিলে আবার উগলে দিয়ে গেছে।

৫. কসাই যেমন করে মাংস থেঁতলায়, রোগ-শোক-দুঃখ-দারিদ্র্য এই চারটিতে মিলে তেমনি করে যেন থেঁতলেছে ওকে। ওরই কোলে খোকা—স্বামীর শেষ স্মৃতিটুকু। মাত্র দু'মাসের। জন্মে অবধি মায়ের দুধ না পেয়ে শুকিয়ে চামচিকের মত হয়ে গেছে।

৬. শুষ্ক ক্ষীণকণ্ঠে অসহায় শিশু কাঁদে, আর একবার করে তার কণ্ঠের চেয়েও শুষ্ক মায়ের বুকে একবিন্দু দুধের আশায় বৃথা কান্না থামায়। আবার কাঁদে। কান্না ত নয়, যেন বেঁচে থাকার প্রতিবাদ। যেন ওকে কে গলা টিপে মেরে ফেলছে।

"তুমি কি দেখেছ, বলে ধর্ম মিথ্যা যেই ? পিতৃহীনে তাড়াইয়া দেয়, ব্যক্তি এই / দরিদ্র কাঙালগণে অন্নদান তরে/এই লোক উৎসাহ দান নাহি করে। / যারে ভণ্ড তপস্বীরা বিনাশ হইয়া, /শান্ত যারা নিজেদের নামায লইয়া ;/সৎকার করে . যারা দেখাইতে লোক/বাধা দেয় দান ধ্যানে, ধ্বংস তা'রা হোক !"

উদ্ধৃতাংশে নজরুল এই সুরারই ইঙ্গিত করেছেন।

৭. ওব মা তখন চেঁচিয়ে বলে, "আল্লা গো, আর দেখতে পারিনে, তুলে নাও বাছাকে তোমার কাছে। ও মরে বাঁচুক।" চোখের জলে বুক ভেসে যায়।

খোকা কান্না থামিযে সেই নোনা জল চাটে, আবার কাঁদে।*

কিন্তু এই দুর্মর দারিদ্র্যের মধ্যে মেজ-বৌ যেন এক স্থল-কমল। ভীষণ দারিদ্র্যের সংগে যুদ্ধ করে বেঁচে থাকাব যে একটা দুর্বার শক্তি কবির নিজেরই ছিল, তা যেন ঐ মেজ-বৌব চরিত্রে ফুটে উঠেছে।

ফলত শুধু দারিদ্র্য নয়, ওরই সংগে দু'জন নায়কের প্রেমের কাহিনীও উপন্যাসে চিত্রিত হয়েছে। সে প্রেম প্যাঁকালের এবং আনসারের। প্যাঁকালে গরীব-মজদুব আর আনসার স্বাপ্নিক বস্তুবাদী হয় ত কবির কবিসত্তা।

প্যাঁকালের প্রেম-কাহিনী লিখতে গিয়ে কবি মানব-জীবনেব একটা গভীব দিকের প্রতি অঙ্গুলি সংকেত করেছেন। সে ক্ষুধার্ত, তার অন্ন জোটে না, কিন্তু প্রেযসীর সামনে সে সাজতে চায় সম্রাট। ফলে :

প্যাঁকালে মাঝে মাঝে থিয়েটারের ইয়ার বাবুদের কাছে দু'একটা সিগারেট চেয়ে রাখে এবং সেটা কুশির কাছ ছাড়া আর কারুর কাছেই খায় না।

অর্থাৎ সবকিছুর ভিতরে প্রকৃতি তার কাজ চালিয়ে যেতে ভোলে না। একদিকে ভয়ংকর মৃত্যু যখন সবকিছু গ্রাস করতে উদ্যত, তখন জীবন অলক্ষ্যে ধীরে ধীরে পা ফেলে এগিয়ে আসে। প্রেমিকের কাছে ধর্ম-মন্দিরের চেয়ে সুন্দরতম হয় প্রেমিকা—পাঁকালের কাছে মজিদের (মসজিদের) চেয়ে বড় হয় কুশি, এমন-কি সাহসিনী প্রেমিকা যেন প্রকৃতির সংগে একীভূত হয়ে প্রেমিকের সাধারণ ধারণাকে বদলে দেয়। সে মজিদের (মসজিদের) চেয়েও বড় কিনা জিজ্ঞাসা করা হলে হেসে বলে :

হলুমই ত। সে হাসিতে রাজা-বাদশা বিকিয়ে যায়। প্যাঁকালে থাকতে না পেরে একটা অতি বড় দুঃসাহসের কাজ কবে বসে।

---

* দারিদ্র্য পীড়িত সংসারের এই অভিজ্ঞতা নজরুল তাঁর নিজের জীবন থেকেই লাভ করেছিলেন। কৃষ্ণনগর থাকা কালীন তিনি চরম দারিদ্র্যের সম্মুখীন হন। তাঁর সেই বিকট অভিজ্ঞতা রূপ পেয়েছে তাঁর বিখ্যাত 'দারিদ্র্য' কবিতায়।

কুশি খুশি হয়, রাগও করে। মুখটা সরিয়ে দিয়ে বলে, 'যা, ভাল লাগেনা, কেউ দেখে ফেলবে এখনি।'

প্যাঁকালেও জানে, যে-কোন লোক যে-কোন সময়ে দেখে ফেলতে পাবে। কিন্তু ঐ হাসি! ঐ চোখ! ঐ ঠোঁট! ঐ দেহের দোলান! দেখুকই না লোকেবা! প্যাঁকালে যেন মাতাল হযে পড়ে। হুঁশ থাকে না।

সৃষ্টিব কাজ ধ্বংসের মধ্যে এমনিভাবে অব্যাহত থাকে। প্রকৃতিকে রুখতে পারে না দারিদ্র্য। হঠাৎ যেন আমরা সেই দার্শনিক নজরুলকে দেখি, যিনি লেখেন:

মোর ডাইনে হাসে সদ্যোজাত,
জরা মবা বামপাশে।
[আজ সৃষ্টিসুখের উল্লাসে]

উপন্যাসের মাঝখান থেকে অন্য দিকে লেখকের ছিটকে পড়ার বোধ হয এও আব একটা কারণ। হঠাৎ কবিব চোখে দুঃখ যেন সত্য হয়ে দেখা দিল, তেমনি তার চেয়ে আরও বেশী সত্য বলে প্রতিভাত হল প্রেম।

ঐ প্রেমের জন্য মেজ-বৌব যেমন খ্রীস্টান ধর্ম থেকে প্রত্যাবর্তন, তেমনি তাবই প্রবল আকর্ষণে রুবির কাছে বৈধব্য-সূচী নিরর্থক এবং বিপ্লবী, স্বাপ্নিক এবং রাজনীতিক আনসারের কাছে ওই প্রেমের সুধা ছাড়া জীবন মৃত্যু-যাতনাব চেয়েও কষ্টকর। পেটের ক্ষুধা সত্য বটে কিন্তু হৃদয়েব ক্ষুধাও মিথ্যা নয—'মৃত্যুক্ষুধা'য় তাই বস্তুবাদের উপর জয হল ভাববাদের। শুধু তাই নয়, পাঠকেব চোখে আঙুল দিয়ে নজরুল দেখিয়ে দিলেন, আমাকে বস্তুবাদী বলে মনে হলেও আসলে আমি ভাববাদী; এ-রচনার গড়নটা উপন্যাসের, কিন্তু এর ধ্যান-ধারণাটা কবির, নজরুল ইসলামের। যিনি 'সারা পথ তাঁর পায়ের তলায় কাঁদতে থাকে'—এমনি লাইনে সৌন্দর্যের জন্যে তাবৎ দুনিয়ার লোকের আত্মার ক্রন্দন শুনিয়েছেন।

যুদ্ধ কবিতা ও নজরুল ইসলাম

সাহিত্য-জীবনের শুরু থেকে নজরুল ইসলাম তাঁর সাহিত্য-কর্মকে এক অর্থে অস্ত্রের মত ব্যবহার করতে থাকেন। তাঁর লেখা পড়ে এ-কথা ভাবা অনুচিত হবে না যে, তাঁর জীবন-দর্শনই ছিলো সংগ্রামের সপক্ষে। ১৯২১-এ প্রকাশিত 'বিদ্রোহী' কবিতাতে তিনি ঘোষণা করেছিলেন :

মহা-বিদ্রোহী রণ-ক্লান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত,
যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন-রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না
অত্যাচারীর খড়্গ-কৃপাণ ভীম-রণভূমে রণিবে না
বিদ্রোহী রণ-ক্লান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত।

এর কয়েক-বছর পর ১৯২৫-এর 'বিজলী'তে প্রকাশিত তিনি তাঁর বিখ্যাত কবিতা 'আমার কৈফিয়ত'-এ লেখেন :

প্রার্থনা করি যারা কেড়ে খায় তেত্রিশ কোটি মুখের গ্রাস
যেন লেখা হয় আমার রক্ত-লেখায় তাদের সর্বনাশ!

এই দুটি কবিতা-স্তবক বিশ্লেষণ করলেই বোঝা যাবে, নজরুল তাঁর সমস্ত ধ্যান-ধারণাকে কিসের বিরুদ্ধে শাণিয়ে তুলেছিলেন এবং তাঁর মৌল অভিপ্রায় কি ছিল?

প্রথম স্তবকটিতে নজরুল বলছেন

'আমি সেই দিন হব শান্ত/যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন-রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না/অত্যাচারীর খড়্গ-কৃপাণ ভীম রণ-ভূমে রণিবে না।'

/অর্থাৎ যতদিন না পৃথিবীব উৎপীড়িত, অত্যাচারিত মানুষ জালিমের কিংবা অত্যাচারী উৎপীড়ক শোষকের উৎপীড়ন এবং অত্যাচার থেকে অব্যাহতি না পাবে ততদিন আমি আমার যুদ্ধ থেকে অবসর গ্রহণ করব না—তারা স্তব্ধ হলে আমিও শান্ত হব।,

এখানে কোনো বিশেষ দেশ-কাল-পাত্রেব কথা বলা হয় নি—সমগ্র লাঞ্ছিত বঞ্চিত উৎপীড়িত বিশ্বমানবের জন্যে সংগ্রামের কথা বলা হয়েছে।

দ্বিতীয় স্তবকটিতে নজরুল বলেছেন যে 'তেত্রিশ কোটি মানুষের মুখের গ্রাস যারা কেড়ে খায় আমার এই লেখা যেন তাদেব সর্বনাশ সাধন কবে অর্থাৎ ধ্বংস করে।' এই তেত্রিশ কোটি মানুষ বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের ভারতবাসী এবং তাদের মুখেব গ্রাস লুণ্ঠনকারী হল সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ। এখানে বিশেষ দেশ-কাল-পাত্রের কথা আছে এবং এখানে শত্রুও সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত।

সুতবাং এ-থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা যেতে পারে, নজরুল প্রথম থেকেই কয়েক বকমের শত্রুব বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু করেছিলেন। তাঁর এই সংগ্রামকে আমরা এমনি কযেকটি ভাগে ভাগ করে নিতে পারি :

১. সাম্রাজ্যবাদী পররাজ্যলোভী বৃটিশেব বিরুদ্ধে সংগ্রাম।
২. বঞ্চনাকারী ভোগলিপ্সু শোষকের বিরুদ্ধে সংগ্রাম।
৩. অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে সংগ্রাম।
৪. ভণ্ডামী ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম।
৫. শ্রেণী-বৈষম্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম।
৬. সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম।

যদিও কোন-না-কোন ভাবে লেখা মাত্রই এক ধরনের সংগ্রামশীল চিন্তাধারার বহিঃপ্রকাশ তবু নজরুল ইসলামের এই যুদ্ধ বিশেষ অর্থ বহন কবে। তাঁর সমস্ত লেখার পিছনে একটা মহান উদ্দেশ্য, একটা মহান প্রেরণা ক্রিয়াশীল ছিল এবং এই প্রেরণা ও উদ্দেশ্যেব পিছনে ছিল মানুষ ও দেশের মানুষের প্রতি তাঁর অকৃত্রিম ভালবাসা। এই ভালবাসার গভীরতাই তাঁকে সৈনিক লেখকে পরিণত করেছিল এবং প্রকৃত অর্থে অন্যায়ের মোকাবেলায় জেহাদের মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে তিনি লেখার

রণাঙ্গনে প্রবেশ করেছিলেন এক রকম জেহাদ ঘোষণা করে—'আমি সেই দিন হব শান্ত/যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন-রোল আকাশে-বাতাসে ধ্বনিবে না।'

ফলে 'যুদ্ধ'কে সংগ্রামশীল মানব-জীবনের পক্ষে অত্যাবশ্যক প্রয়োজনীয় ব্যাপ্যার বলে তিনি ভেবে নিয়েছিলেন। 'আনন্দময়ীর আগমনে' কবিতায় তিনি যখন বলেন :

মাদীগুলোর আদি দোষ ঐ অহিংসা বোল নাকি নাকি
খাঁড়ায় কেটে কর মা বিনাশ—নপুংসকের প্রেমের ফাঁকি !

তখন বোঝা যায়—যে তথাকথিত প্রেম ও শান্তির বাণীকে তিনি নিছক দুর্বলতা ও কাপুরুষতার পরিচয় বলে ধরে নিয়েছিলেন। এর ব্যাখ্যা হিসেবে তিনি তাঁর 'বিদ্রোহীর বাণী' কবিতায় বলেন :

"ব্যাঘ্র সাহেব, হিংসে ছাড় পড়বে এসে বেদান্ত !",
কয় যদি ছাগ, লাফ দিয়ে বাঘ অমনি হবে কৃতান্ত !
থাকতে বাঘের দন্ত-নখ
বিফল ভাই ঐ প্রেম-সবক !

অর্থাৎ দাঁতনখওয়ালা ব্যাঘ্ররূপী মানুষকে বেদান্ত পাঠ করালে কিছু হবে না। কেননা তাঁর মতে সাপের দাঁত না ভেঙে যে মন্ত্র দ্বারা সাপ বশ করতে যায় সে হ'চ্ছে নির্বোধ। সুতরাং 'প্রেমের বাণী' এবং 'ধর্ম-কথা' যত উচ্চ স্তরের ব্যাপার হোক মূলত যে অমানুষ তার কাছে ও-সবের কতটুকু দাম! সুতরাং ঐ নর-পশুদের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার একমাত্র উপায় তাদেরকে যুদ্ধে পরাস্ত করা, অস্ত্রের সাহায্যে পরাভূত করা। তাঁর মতে ওরা পরাজিত হলেই তখন মানুষও হবে। কেননা—"চোখের জলে ডুবলে গর্ব শার্দূলও হয় বেদ-পাঠক।" আজ যে অস্ত্র এবং অর্থের জোরে মানুষের প্রতি অন্যায় আচরণ করছে এবং কোনো প্রেম ও শান্তির বাণীতে কর্ণপাত করছে না, সে যদি সহিংস অস্ত্রের যুদ্ধে পরাজয় বরণ করে ত সেও তখন নিজেকে মানব-প্রেমিক বলে পরিচয় দেবে।

এখানে বলে রাখা দরকার, নজরুল ইসলাম ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অহিংস নীতিকে মেনে নিতে পারেননি। ১৩২৮ অর্থাৎ ইংরেজী

১৯২১ সালে তাঁর লেখা বিদ্রোহী কবিতায় তাঁর যে মনোভাব তিনি প্রকাশ করেছিলেন ১৯৪২ সালে রোগাক্রান্ত হওয়ার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত তিনি তাঁর সেই মনোভাবে অনড় ছিলেন। ১৯৪১।৪২-এর দিকে লেখা তাঁর একটি কবিতা থেকে উদ্ধৃতি দিলে এ-বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়। উদ্ধৃতি :

'প্রেম' ও 'প্রহার' এই দুটি মোর নীতি।
এই দুটি মোর আল্লার দান গাহি ইহাদেরই গীতি।
যারা নিপীড়িত যারা নির্জিত দুনিয়ায় নিশিদিন,
তাহাদের তরে পথে পথে আমি বাজাই প্রেমের বীণ।
উহাদের লাগি নিতি ভিখ মাগি দুয়ারে দুয়ারে আসি,
ওদেরি মুক্তি চাহিয়া শক্তি যাচিতেছি দিবাযামী।
প্রাণ যার আছে তারি কাছে চাই উহাদের তরে প্রাণ,—
যারা যত পারে উহাদের তরে করুক আত্মদান।
যুক্তিতে ঐ মুক্তি আসে না, তাই প্রেম দিযে ডাকি,
রস-সুন্দর রথ ত্যাগ করে চলি পথধূলি মাখি।
আত্মারে যারা বন্দী রেখেছে না করে আত্মদান,
যাহাদের ভোগ-বাসনা এনেছে অশেষ অকল্যাণ—
ভিক্ষা চাহিলে ভিক্ষা দেয় না সর্বহারার তরে
জনগণে রাখি উপবাসী ঘরে ধন সঞ্চিত করে,
ধর্ম যাদের শুধু বঞ্চনা, আর বঞ্চিত করা,
মর্মে বেদনা নাই, শুধু যারা চর্মমাংসে ভরা,
তাদের প্রাপ্য প্রেম নয়, ওরা গলিবে না কভু প্রেমে,
প্রহার পাইলে উহাদের প্রেম গলিয়া আসিবে নেমে!
প্রেম ও জ্ঞানের কেন্দ্র দেখিবে দিব্য খুলিয়া যাবে,
যেদিন তাহারা আষ্টে পৃষ্ঠে নিদারুণ মার খাবে!
বহু তপস্যা করিয়া জেনেছি ভাই,

প্রেম জাগাইতে প্রহারের মত অমোঘ ঔষুধ নাই।
বনের সিংহ বাঘ পোষ মানে, প্রেম ভরে চাটে পা,
যদি অকরুণ প্রহারের চোটে হাড়ে হাড়ে ফোটে ঘা

মানব-দানব মদ-গর্বীরা সকলেই হয় বশ,
বক্ষে বসিয়া—টুঁটি টিপে যদি—খাওয়াও প্রহার-রস।
—(প্রেম ও প্রহার)

১৯২১-এ লেখা 'বিদ্রোহী' এবং ১৯২৪ সালে লেখা 'বিদ্রোহীর-বাণী'তে নজরুলের যে জীবন-দর্শন ১৯৪১-এও তা বদলে যায়নি যে উপরোক্ত কবিতাংশ তার প্রমাণ। কারণ ঐ সময় পর্যন্ত ভারতীয় উপ-মহাদেশের শাসক ইংরেজই ছিল এবং তার উৎপীড়নও ছিল। উৎপীড়নের ক্রন্দন-রোল তখনও পর্যন্ত থামেনি। সুতরাং নজরুলের লেখনীও তখন যুদ্ধের বাণী প্রচার করে চলেছিল।

॥ ২ ॥

জীবন মানেই যুদ্ধ। সুতরাং জীবনবাদী লেখকের লেখনীতে যুদ্ধের বাণী যে সুষমামণ্ডিত হয়ে প্রকাশিত হবে তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু একদল লেখক তা মনে করেন না। আর এ মনে না করার জন্যে বাঙলা-ভাষার এক অংশের মরমী ও বৈষ্ণব-সাহিত্য দায়ী। মরমী ও বৈষ্ণব-সাহিত্যের পাঠকের ধারণা—অস্ত্রের ঝনঝনাৎকারী শব্দিত সাহিত্য অথবা কাব্য—সাহিত্য কিংবা কাব্য নয়। এঁদের ধারণা যুদ্ধাবস্থার কোন সাহিত্যই সাহিত্যই নয়। কিন্তু একটু চোখ খুলে দেখলে দেখা যাবে পৃথিবীর সমস্ত মহাকাব্যগুলো যুদ্ধাবস্থাকালীন সাহিত্য। সবগুলিই সমসাময়িককালের ইতিহাসকে এবং ঐতিহাসিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে রচিত। আর বলা বাহুল্য সব ঐতিহাসিক ঘটনার পিছনে আছে মানুষের সংগ্রামশীল চেতনা। হোমারের ইলিয়াড, ভার্জিলের এনিড, বাল্মীকির রামায়ণ এবং ব্যাসের মহাভারত কোনটাই যুদ্ধের ঘটনাকে বাদ দিয়ে লিখিত হতে পারেনি। এগুলো আত্মকেন্দ্রিক লেখকের আত্ম-জৈবনিক প্রেম-কাহিনী অথবা কোনো মরমী সাহিত্য নয়—এগুলো সংগ্রামশীল মানব-সমাজের এবং প্রপীড়িত মানবচৈতন্যের ইতিহাস। নজরুল ইসলাম এই সংগ্রামশীল মানব সমাজের ইতিহাসই লিখেছেন। তাই তাঁর কাব্য শুধু সাময়িক নয়, চিরন্তন, তাই তাঁর কাব্য শুধু কাব্য নয়, মহাকাব্য। তিনি তাঁর কাব্যে বিংশ-শতাব্দীর প্রাচ্য দেশের এশিয়ার জাগ্রত মানব-চৈতন্যকে তাঁর কাব্যে

ধরে রেখেছেন। তুরস্ক থেকে আফগানিস্তান, মিসর থেকে ইরান, আরব থেকে ভারতবর্ষ পর্যন্ত সমসাময়িক মানব-মনীষার ইতিহাস খুঁজে পেতে গেলে আমাদের তাঁর কাব্যের কাছে ফিরে যেতে হবে। প্রাচ্যের ঐতিহ্য, প্রাচ্যের সংস্কৃতি, প্রাচ্যের পুরাণকে খুঁজতে হলে তাঁরই ঐ সাময়িক ঘটনা কেন্দ্রিক কাব্য-সমুদ্রে আমাদের অবগাহন করতে হবে। কেননা তিনি যে সাময়িক ঘটনার উপর কবিতা লিখেছেন তার পিছনের ইতিহাস চিরন্তন মানব-সভ্যতার শ্রেণী সংগ্রামের ইতিহাস, মানবতাকামী মানসচৈতন্যের ইতিহাস। জগলুল পাশা, আনোয়ার পাশা, কামাল পাশা, আমানুল্লাহ, রীফ সর্দার, মাওলানা মোহম্মদ আলী, চিত্তরঞ্জন দাস, ওমর, খালেদ,—এরা সবাই মানুষের কল্যাণ চেয়েছেন, মানুষের মুক্তির জন্য সংগ্রাম করেছেন। সুতরাং এঁদের কথা লিখে এঁদের সমসাময়িক কালের যে ইতিহাস তিনি রচনা করেছেন সে ইতিহাস সংগ্রামী মানব-চৈতন্যের ইতিহাস। তাই তাঁর কাব্য ঐতিহাসিক মহাকাব্যের পর্যায়ে পড়ে। সেইজন্যে তাঁর কবিতায় 'ক্ষুদ্র প্রেমের শূদ্রানী' নেই।

॥ ৩ ॥

১৯২০। ২১। ২২ সালে নজরুল ইসলাম যখন মারাত্মক অস্ত্রের মত তাঁর কবিতাকে ব্যবহার করছেন তখন বিশ্বব্যাপী মহাযুদ্ধের অবসান হয়েছে। এই ভয়ানক যুদ্ধের পরিণাম থেকে পাশ্চাত্যের অনেক লেখক যুদ্ধের প্রতি একটা বিরূপ ধারণা পোষণ করছিলেন। এই যুদ্ধের বিরুদ্ধে সোচ্চার বিদ্রোহ করেন সীগফ্রেড সেসুন, ওইলফ্রেড ওয়েন, আইজেন রোজেনবার্গ এবং আর্থার গ্রীম ওয়েষ্ট প্রভৃতি ইংরেজ কবি। যুদ্ধের প্রতি এই ঘৃণার মনোভাব কিভাবে প্রকাশ পেয়েছে তার উদাহরণ দিতে আমি আর্থার গ্রীম ওয়েষ্টের একটি পুরো কবিতা এখানে তুলে দিলাম। কবিতাটির নাম "God ! How I Hate you." :

God ! How I hate you, you young cheerful men,
Whose pious poetry blossoms on your graves.
As soon as you are in them...Hark how one chants
'Oh happy to have lived these epic days'—
'These epic days' ! And he'd been to France,

And seen the trenches, glimpsed the huddled dead
In the periscope, hung on the rusty wire :
Choked by their sickly foetor, day and night
Blown down his throat : stumbled through ruined hearths,
Proved all that muddy brown monotony.
Where blood's the only coloured thing. Perhaps
Had seen a man killed, a sentry shot at night,
Hunched as he fell, his feet on the firing-step,
His neck against the back slope of the trench
And the rest doubled between, his head
Smashed live an eggshell and the warm grey brain
Spattered all bloody on the parados···
Yet still God's in his heaven, all is right
In this best possible of worlds...
God loves us, God looks down on this our strife
And smiles in pity, blows a pipe at times.
And calls some warriors home ......

How rare life is !

On earth, the love and fellowship of men.
Men sternly banded : banded for what end ?
Banded to maim and kill their fellow men
For even Huns are men. In Heaven above
A genial umpire, a good judge of sport
Won't let us hurt each other ! Let's rejoice
God keeps us faithful, pens us still in fold.
Ah, what a faith is ours (almost, it seems,
Large as a mastered seed)— we trust and trust,
Nothing can share us ! Ah how good God is
To suffer us to be born just now, when youth
That else would rust, can slake his blade in gore
Whose very God Himself does seem to walk
The bloody fields of Flanders He so loves.

রণক্ষেত্রের একজন সৈনিকের মৃত্যুদশা বর্ণনা করে আর্থার গ্রীম ঈশ্বরের প্রতি তাঁর ঘৃণার মনোভাব ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু যুদ্ধের প্রতি এই সোচ্চার ঘৃণা সকলের কণ্ঠ থেকে নিঃসৃত হয়নি। কোনো কোনো ইংরেজ কবি যুদ্ধের সপক্ষে তাঁদের মনোভাব ব্যক্ত করেছেন। এবং এদের মধ্যে আছেন রুপার্ট ব্রুক, লরেন্স বিনিয়ন ও জুলিয়ান গ্রেণফেল। কিন্তু এদের কথা বলার আগে বলে রাখি—কিপলিঙও যুদ্ধের সপক্ষে ছিলেন। মাতৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষার জন্যে যুদ্ধ ছাড়া অন্য কোন উপায় তিনি ভাবতে পারেননি। তাই তিনি বলেন:

No easy hopes or lies
Shall bring us to our goal,
But iron sacrifice
Of body, will, and soul.
There is but one task for all—
One life for each to give.
Who stands if Freedom fall ?
Who dies if England live ?

শহীদের জীবনোৎসর্গের মধ্যেই পেতে হবে স্বাধীনতার আস্বাদ। তবু কিপলিঙ জানতেন যুদ্ধের পরিণাম। তাই তিনি Unknown Female Corpse কবিতায় লেখেন :

Headless, lacking foot and hand,
Horrible I come to land.
I beseech all women's sons
Know I was a mother once.

কিন্তু এ-জেনেও তিনি যুদ্ধের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেছিলেন। কেননা তিনি জানতেন : Who stand if Freedom fall? স্বাধীনতা গেলে আর থাকে কি?

তবু প্রথম মহাযুদ্ধের ভীষণতা দেখে যুদ্ধের প্রতি অনেকেই আস্থা হারান। সে-জন্যে লরেন্সের মত কবি এই মনোভাব ব্যক্ত না করে পারেননি :

Let us rise up and go from out this grey
Last twilight of the Gods, to find again

The lost Hesperides where love is pure.
For we have gone too far, oh much too far,
Towards the darkness and the shadow of death,
Let us turn back, lest we shall all be lost.

যুদ্ধক্লান্ত হৃদয়ের এটা স্বাভাবিক উক্তি। কিন্তু লরেন্স ঐখানেই শুধু থেমে থাকেননি। তারও চেয়ে ঘৃণার মনোভাব প্রকাশ করেছিলেন 'New Heaven and Earth' কবিতায় :

At last came death, sufficiency of death
and that at last relieved me, I died.
I buried my beloved : it was good, I buried myself and
was gone.

War came, and every hand raised to murder !
Very good, very good, I am a murderer !
It is good, I can murder and murder, and see them fall,
the mutilated, horror-struck youths, a multitude
one on another, and then in clusters together
smashed, all oozing with blood, and burned in heaps
going up in foetid smoke to get rid of them,
the murdered bodies of youths, and men in heaps.
and heaps and heaps and horrible reeking heaps
till it is almost enough, till I am reduced perhaps ;
Thousands and thousands of gaping, hideous foul dead
that are youths and men and me
being buried with oil, and consumsed in corrupt thick
smoke,

that rolls
and taints and blacken the sky, till at last it is dark,
dark as night, or death or hell..

রণাঙ্গণের এই ভয়াবহ ছবির কথা মনে করেই বাঙালী জীবনানন্দ দাস যুদ্ধের প্রতি এই ঘৃণার মনোভাব ব্যক্ত করেছিলেন :

আমার চোখের পাশে জালিও না সৈন্যদের মশালের আগুনের রং
দামামা থামায়ে ফেল;
পেঁচার পাখার মত—
অন্ধকারে ডুবে যাক রাজ্য আর সাম্রাজ্যের সং।

কিন্তু বলা বাহুল্য, প্রথম মহাযুদ্ধের পর ক্লান্ত ইংরেজ কবির কণ্ঠের সংগে নজরুলের কণ্ঠের কোন মিল নেই। আর এই মিল না থাকার কারণ ইংরেজের যুদ্ধ ছিল স্বাধীনতা রক্ষার আর নজরুলের যুদ্ধ ছিল স্বাধীনতা অর্জনের।

যে ঘটনাকে কেন্দ্র করে ইউরোপে প্রথম মহাযুদ্ধের দাবানল সৃষ্টি হয় সেখানে ইংরেজদের প্রধানত স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হওয়ার ব্যাপার ছিল। পূর্ব চুক্তি অনুযায়ী তাই তাঁরা ফরাসীদের সংগে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে জার্মানীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং এক পর্যায়ে বৃটেন জার্মানীর আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হয়ে দাঁড়ায়। সে-জন্যেই কিপলিঙের লেখার প্রয়োজন পড়েছিল এই কথার—Who stands if Freedom fall ?

কিন্তু বিদেশ বিভুঁয়ে গিয়ে ইংরেজরা প্রকৃত ন্যায়ের পক্ষে যুদ্ধ করছিল কিনা তা তাদের জানা ছিল না। নজরুল যে সম্পূর্ণ ন্যায়ের পক্ষে যুদ্ধে নৌজোয়ানদের আহ্বান করেছেন এটা তিনি সজ্ঞানভাবে জানতেন। ন্যায়ের পক্ষের এই যুদ্ধকে তিনি কখনও অপরাধ বলে ভাবতে শেখেননি। এ-প্রসংগে একটা কথা বলা যেতে পারে, যে-ইংরেজ কবি যুদ্ধকে বীভৎস বলে মনে করছিলেন—নিষ্পেষিত, স্বাধীনতাহীন এবং তাঁদেরই হাতে লাঞ্ছিত ভারতবাসীর কি করে মুক্তি ঘটতে পারে তা তাঁরা কোনদিন ভাবেননি। সেই সংগে এতদ্দেশীয় যে মনীষী কবিরা যুদ্ধকে ঘৃণা করেছেন এবং বিদ্রোহী কবিকে জঙ্গীবাজ কবি বলে মনে করেছেন তাঁরাও ভারতবর্ষের মুক্তি কিসে আসবে তা বলতে পারেননি। আমি জানি—A Note on War Poetry—তে T.S.Eliot বলেছিলেন : War is not a life it is a situation. কিন্তু ঐ উচ্চারণ শৃঙ্খলিত ভারতবাসীর পক্ষে সম্ভব ছিল কি না? কথা হল, শান্তির সপক্ষে রায় দিয়ে কোন জাগ্রত জাতি পরের অধীনতা মেনে

নিতে পারে কি না ? আর সে অবস্থা মেনে নিলে জাতি হিসেবে তার আর কোন অস্তিত্ব থাকে কিনা ? ফলাফলের এই সিদ্ধান্ত নজরুলের মত আর কোন ভারতীয় কবি নিতে পারেননি। নজরুলের উত্তরসূরী কোন কোন অনুজ কবি তাঁর এই জীবন-দর্শন মেনে নিয়েছিলেন : তাঁদের মধ্যে প্রখ্যাত দু'জন কবি সুভাষ এবং সুকান্ত। বাংলাদেশের যুদ্ধের পর দু' একজন আধুনিক কবিও বলতে শুরু করেছেন—'যুদ্ধই উদ্ধার,' 'যুদ্ধই ঈশ্বর'। বাস্তবিক? সব কিছু situation—এর উপর নির্ভরশীল।

॥ ৪ ॥

নজরুলও যুদ্ধের পরিণতির অবস্থা যে জানতেন না তা নয়। এর একটি করুণ চিত্র তিনি তাঁর বিখ্যাত কবিতা 'কামাল পাশায়' দেখিয়েছেনও :

সত্যি কিন্তু ভাই!
যখন মোদের বক্ষে বাঁধা ভাইগুলির এই মুখের পানে চাই—
কেমন সে এক ব্যথায় যেন প্রাণটা কাঁদে যে সে।
কে যেন দুই বজ্র-হাতে চেপে ধরে কলজেখানা পেষে।
নিজের হাজার ঘায়েল জখম ভুলে তখন ডুক্‌রে কেন
কেঁদেও ফেলি শেষে।
কে যেন ভাই কলজেখানা পেষে॥
ঘুমোও পিঠে ঘুমোও বুকে, ভাইটি আমার আহা।
বুক যে ভরে হাহাকারে—যতই তোরে সাব্বাস দিই,
যতই বলি বাহা।
লক্ষ্মীমণি ভাইটি আমার, আহা॥
ঘুমোও ঘুমোও মরণ-পারের ভাইটি আমার, আহা॥

মরণ-বধূর লাল রাঙা বর। ঘুমো!
আহা। এমন চাঁদ-মুখে তোর কেউ দিল না চুমো।

যুদ্ধের বেদনাদায়ক দিকটিকে তিনি এমনি করুণ ক্লান্ত ভাষায় ফুটিয়ে তুলেছেন—যা পড়তে পড়তে হৃদয় অশ্রুভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। দেশের জন্য জীবন যারা উৎসর্গ করে কবি বলেছেন 'তাদের সত্যিকারের ব্যথার ব্যথী' কেউ বুঝি নেই।

কিন্তু এই বিমর্ষ মনোভাব নজরুলের উদ্দেশ্যকে বিচলিত করতে পারে না। নিহত সৈনিকদের সরিয়েই তাই তিনি বলে ওঠেন:

মৃত্যু এরা জয় করেছে কান্না কিসের ?
আব-জম্-জম্ আনলে এরা, আপনি পিয়ে কল্সী বিষের!
কে মরেছে ? কান্না কিসের ?
বেশ করেছে।
দেশ বাঁচাতে আপনারি জান্ শেষ করেছে।
বেশ করেছে!!
শহীদ ওরাই শহীদ!!

বীরের মতন প্রাণ দিয়েছে, খুন ওদেরি লোহিত।

দেশোদ্ধারের জন্যে এই যে যুদ্ধ, এ যুদ্ধ গৌরবের যুদ্ধ। সুতরাং এর জন্যে কোন আফসোসের কান্না কেঁদে লাভ নেই। কেননা জীবন যাঁরা দিয়েছেন তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল মহৎ ভাবনায় সমৃদ্ধ। এবং বলা বাহুল্য নজরুলের যুদ্ধবিষয়ক সমস্ত কবিতাই মানব-মুক্তির মহান ভাবনায় উজ্জ্বল।

যতি নয়, জিজ্ঞাসা

যদি কেউ নজরুল ইসলামকে বাঙালী চরিত্র বলে উক্তি করেন তাহলে কি আমবা বিস্মিত হব? নজরুলকে পড়তে যেয়ে বারবার মনে হয়েছে নজরুল বাঙালী বলে কি সত্যই বাঙালী?

প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত যে অস্থিরতা, চঞ্চলতা, বিপন্ন মানসিকতা এবং একই সঙ্গে স্ববিরোধিতার যে ছবি তিনি পাঠক-মনে জাগিয়ে তোলেন তার সাথে শান্ততায়, সহনশীলতায় প্রায় স্থবির বসন্ত-বিলাসী বাঙালী চবিত্রেব গরমিল কি সহজলক্ষ্য নয়?

আমাদের উপবোক্ত মন্তব্যের কাবণ এই যে মাত্র কয়েকটি ভমিকম্পের মত দিনের স্মৃতি পাঠকের চিত্তে চিত্রিত করে তিনি বাঙালীর মানস থেকে প্রায় অপসৃত হতে চলেছেন। শুধু মাত্র প্রথাপরিমিত জন্মতিথি উদ্‌যাপন ব্যতিরেকে আমরা তাঁকে শ্রদ্ধা জানাবার দ্বিতীয় অবসর খুঁজে পাইনে। অথচ সত্যিকার কবি হিসেবে, আজও এখনও তাঁর সেই অভিমানক্ষুব্ধ 'কৈফিয়তে'ব পরও, অনির্বাণ দীপাকাঙক্ষী কবি হিসেবে এমনকি আমাদের কুণ্ঠিত শ্রদ্ধাটুকু পর্যন্ত ছিনিয়ে নেওয়ার শক্তি কি তাঁর নেই?

অনেকের মতে কবিতায় তিনি উৎকৃষ্ট শিল্প-চারিত্র্যের পরিচয় দিতে পারেননি; অসাবধানতার জন্য অসচেতনতার দরুন অসংযমের কারণে গভীরভাবে পাঠকের আকাঙিক্ষত বস্তুটিকে শিল্পসম্মত রূপ দিতে যেয়ে ব্যর্থ হয়েছেন। হয়ত কখনও কোথাও কোথাও এই অভিযোগ সত্যের দিকে ঝুঁকে পড়েছে; কিন্তু আমরা বলব অনেক সময় অনেকবার সে সত্যকে তিনি মিথ্যার দিকে বহুদূর পর্যন্ত ঠেলে নিয়ে গিয়েছেন। কেননা যথার্থ অর্থে তিনি শক্তিমান এবং মৌলিক অর্থে প্রতিভাবান, যা চেষ্টা, অধ্যবসায়, পরিশ্রম কোনটারই মুখাপেক্ষী নয়।

আমরা বলেছি নজরুল সত্যই বাঙালী-চরিত্র কিনা। একই কথার এই পুনরুচ্চারণের কারণ হিসাবে আমরা, যিনি মোটেই কবি ছিলেন না, সেই সুভাষচন্দ্র বসুর একটি কথার এখানে উল্লেখ করে আমাদের মূল বক্তব্যের দিকে এগিয়ে যাব। সুভাষ বলেছিলেন, নজরুল একটি 'জীয়ন্ত' মানুষ। তাঁর কবিতা সম্বন্ধে কিছু বলবার আগে এই 'জীয়ন্ত' শব্দটিকে আমাদের ভাল করে বুঝতে হবে। তাঁর কবিতার মর্মমূলে এই 'জীয়ন্ত' কথাটি একেবারে অনস্থির বিদ্যুতের মত। কিন্তু বাঙালী জীয়ন্ত নয়, জীবন্ত নয়, জীবনের উর্মিমুখর চাঞ্চল্যকে, সংঘাত, দ্বন্দ্ব এবং অমীমাংসিত সংগ্রামকে সে আন্তরিকভাবে পছন্দ করেনা বলেই ক্ষণকালের স্বাধীনতালুব্ধ সময়ের কাছে আত্মসমর্পণ করেই আপনার নিরবচ্ছিন্ন নিদ্রার আবেশের মধ্যে প্রত্যাবর্তন করেছে। সৈনিকের ডাক শুনে একদিন যে শয্যা ছেড়েছিল, ঠাণ্ডা স্তিমিত চোখে কুণ্ঠিত অনীহার দৃষ্টি মেলে সে আজ সেই সৈনিক থেকে মুখ ফিরিয়েছে, বেছে নিয়েছে তার অমর সহচর শয্যাকে।

নজরুল বুঝতে পেরেছিলেন তা। তাই একদিন 'বিধি ও নিয়মে লাথি মেরে ঠুঁকি বিধাতার বুকে হাতুড়ী' একথা বলেও গভীর শোকে তাঁকে উচ্চারণ করতে হয়েছিল—

> তোমাদের পানে চাহিয়া বন্ধু আর আমি জাগিব না
> কোলাহল করি সারা দিনমান কারও ঘুম ভাঙিব না।

বস্তুত তাঁর মস্তিষ্কবিকৃতির কয়েক বছর পূর্ব থেকে এই শোকানুভূতি যেন তাঁকে পেয়ে বসেছিল। গতজীবনের লেখার প্রতি তিনি নিজেই যেন মনে মনে বিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন। তাই পূর্বকৃত অপরাধের জন্য তাঁর শেষের অনেক লেখায় সেই অনুতাপই উজ্জ্বল বেদনায় রূপায়িত হয়েছে। অন্তরের কোথায় এক মস্ত দুর্বলতা অজগরের মত তাঁর কবি সত্তাটিকে অবিরাম প্যাঁচের পর প্যাঁচে নিষ্প্রাণ করে তুলছে আর তাঁর বলীয়ান মানসিকতার দিকে যেন ক্ষুধিত ক্রুদ্ধ চোখ তুলে এগিয়ে যাচ্ছে।

আমরা একথা মানতে বাধ্য যে তাঁর প্রথম দিকের অগ্নিগর্ভ কবিতা-গুলোর প্রতি তাঁর বিশ্বাসের ভাতে ঘুণ ধরেছিল। আপাত স্বীকৃতি

হিসেবে রবীন্দ্রনাথের 'তলোয়ার দিয়ে দাড়ি চাঁচা' কথাটাও তিনি মনে মনে মেনেও ছিলেন বোধ হয়। আমাদের মনে হয় তাঁর কবিতার কোন সর্বনাশ যদি হয়ে থাকে তবে তা এই নীরব পরাজয়ের অন্ধকারে।

বুদ্ধদেব বসু বলেছেন, 'পঁচিশ বছর ধরে প্রতিভাবান বালকের মতো লিখেছেন তিনি, কখনো বাড়েননি।' আমরা দুঃখিত হতাম না প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত নজরুল যদি সেই শিশু বালক থাকতেন। কিন্তু সত্যিকার চোখ দিয়ে তাকালেই কি বোঝা যায় না তার পরিণত রচনাতে ক্রমেই একটি বয়স্ক মানুষের ভাবনা গড়ে উঠছে। সে ভাবনা সফল কিনা, সার্থক কিনা সে বিচার আরম্ভের পূর্বেই কি বলে দেয়া যায় না যে আমরা যাঁকে পাব আশা করেছিলাম তিনি হারিয়ে গেলেন।

বাঙলা কবিতায় প্রেমের কবিতার অভাব ছিল না। এবং ধ্রুপদী সাহিত্যে স্থান পাবার মত উচ্চশ্রেণীর প্রেমের কবিতা আমাদের সাহিত্যে দুর্লভ নয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছিলেন 'অরুগ্ন', সেই চরিত্র লক্ষণাক্রান্ত কবিতা সর্বপ্রথম নজরুলেই সম্পূর্ণরূপে দেখি।

আমি মানুষ, এবং মানুষই মহীয়ান। এই ভীষণ এবং দারুণ সত্যের উপলব্ধিতে 'ভগবান বুকে' 'পদচিহ্ন' এঁকে দেবার দুঃসাহসিক স্পর্ধায় সুতীক্ষ্ণ তীরের মত আকাশের দিকে ধাবমান সূর্যের রৌদ্রে ঝলকানো অনুভূতিটিই কি আমাদের সাহিত্যের পৌরুষ-মর্যাদাকে মাল্যভূষিত করেনি? সবল জীবনের প্রতি আস্থাবান আশাবাদী মানুষ কি একে নিছক আবেগ বলে উড়িয়ে দেবে?

নজরুলের মধ্যে একজন মিশ্র মানুষের পরিচয় মেলে। এ-জন্যে অনেকেই তাঁকে চরিত্রবর্জিত এবং আবেগসর্বস্ব কবি বলে মনে করেন। কিন্তু আমরা যদি বলি এটাই তাঁর চরিত্র, অপরূপ বৈপরীত্যই তাঁর মৌলিকত্ব; তিনি অস্থির বলেই অনন্য, অনিয়ম বলেই অসাধারণ; এবং এই ধরনের চরিত্র নিয়ে জগতের অনেক সাহিত্যিকের শ্রেষ্ঠ হতে প্রয়াস পেতে হয়নি।

'ব্রাদার্স কারামাজভে' দেখেছি, কারামাজভ, আইভান, আলিওশা এবং সাধু জোসিমার মধ্যে যে দস্টয়েভস্কিকে আমরা দেখি তা কি এমন মিশ্রিত মানুষের অনুভূতি নয়? যিনি একদিকে আত্মার প্রতি শ্রদ্ধাবান,

অন্যদিকে সেই আল্লার প্রতি অনীহ এবং ধর্মের প্রতিপক্ষ অথচ ধার্মিক। কিন্তু সবার উপরে যে বস্তুটির দিকে উপন্যাসের সমস্ত দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত তা কি? সত্য? এবং আত্মার আবরণ উন্মোচনে সেই সত্যের প্রকৃত রূপ ঐ বেদনা—অক্ষত, অন্তহীন, অমর বেদনা। এই বেদনাই বিক্ষোভ, এই বিক্ষোভই বিদ্রোহ।

আমরা গভীরভাবে দেখলে বুঝতে পারব এই অবিরাম আশ্চর্য বেদনা নজরুলেব বিদ্রোহী সত্তার অন্তরালে পুঞ্জীভূত আগুনের মত উত্তাপ সঞ্চার করছে। এবং বেদনা কিসের জন্য? সত্যের জন্য, পরম সত্যের জন্য।

নজরুলের 'বিদ্রোহী' কবিতাটিকে এমন কি তাঁর অনেক সমালোচক ভক্তও বলেছেন অযৌক্তিক আবেগের পরিস্ফুতি। সেখানে আবেগ যে কিছুটা সীমা অতিক্রম করেছে তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু আবেগের উৎসের দিকে নজব দিলেই বুঝতে কষ্ট হবে না তা কেন এমন প্রচণ্ড আক্রোশে কেঁপে কেঁপে উঠেছে। এ শুধু চেঁচামেচি নয়, মর্মান্তিক সত্য অনুভূতি, আন্তরিক এবং ঐকান্তিক। সে বেদনা কোন আধারে আবদ্ধ থাকবার নয় বলেই তা এমন কূলপ্লাবিত।

আজকাল অনেক মনীষী সমালোচকের লেখা পড়ে জানতে পারি বোদলেয়ার ইয়েটসের মত কবিদের চরিত্রেও এই কনট্রাডিকশন লক্ষ্য করা যায়। বোদলেয়ার এবং ইয়েটসও এই কনট্রাডিকশ্‌ন পছন্দ করতেন। জীবন মানেই দ্বন্দ্ব এবং সংঘাত—ইয়েটসের ব্যক্তিগত ধারণাই ছিল তাই। হয়ত সচেতনভাবে গড়ে উঠেছিল বলে তাকে মোটামুটি একটা দর্শনের তুলাদণ্ডে আমরা চাপিয়ে দিতে পারি। কিন্তু তবু সমালোচকদের মতে, বোদলেয়ারের একটা system ছিল বটে, কিন্তু তাকে শিক্ষিত দার্শনিকের সুস্থ দর্শন হিসাবে মোটেই গণ্য করা যায় না। তাই যদি হয়, দর্শন হিসাবে মূল্য যদি না-ও পায় তবু শ্রেষ্ঠ কবি হতে তার বাধা হয়েছে কি? আর যদি দর্শনকে মানি তা হলে তেমন সচেতন ঘোষণা নজরুলের মুখ থেকে না শুনলেও তার মর্মে মর্মে যে সে অনুভূতি কাজ করেনি তাই বা কেমন করে বলি?

দর্শন হিসাবে স্বীকার না করলেও জীবন সম্বন্ধে তাঁর বোধটাকে কি অসত্য বলে উড়িয়ে দেব? তাঁর পর পর কয়েকটি কবিতায় আমরা একটি কথা ফিরে ফিরে পাই। "অগ্নিবীণা"র 'প্রলয়োল্লাসে'—

ধ্বংস দেখে ভয় কেন তোর? প্রলয় নূতন সৃজন-বেদন।
আসছে নবীন,—জীবন-হারা অসুন্দরে করতে ছেদন।
তাই সে এমন কেশে-বেশে
প্রলয় বয়েও আসছে হেসে
মধুর হেসে।
ভেঙে আবার গড়তে জানে সে চির-সুন্দর।

অথবা 'কামাল পাশা'র—

ইস্! দেখেছিস্। ঐ কারা ভাই সাম্‌লে চলেন পা,
ফস্‌কে মরা আধ-মরাদের মাড়িয়ে ফেলেন বা!
ও তাই শিউরে ওঠে গা।
হাঃ হাঃ হাঃ।
মরল যে সে মরেই গেছে,
বাঁচলো যারা রইল বেঁচে।
এইতো জানি সোজা হিসাব। দুঃখ কি আর আ!
মরায় দেখে ডরায় এরা! ভয় কি মরায়? বাঃ!

কিংবা 'সৃষ্টি সুখের উল্লাসে' কবিতায়: 'মোর ডাইনে শিশু সদ্যোজাত জরায় মরা বাম পাশে'—পংক্তিতে কি একটা দার্শনিক উপলব্ধি ধরা পড়েনি?

মোটের উপর তিনি একটি সুন্দর জীবনের প্রত্যাশা করেছিলেন, পূর্ণাঙ্গ জীবনের। হয়ত এ কারণেই তিনি আধুনিকের কাছে মাত্রাতিরিক্ত রোমান্‌টিক। কিন্তু যে বাস্তববিলাসী কবিরা অসুস্থ জীবন-বোধের রূপকার তাঁরাও কি সুন্দর জীবনের অপ্রাপ্তির ব্যর্থতায় রোমাণ্টিক চেতনায় সমারূঢ় নন? বরং বলব নজরুল ইসলাম বাস্তবের সামনা-সামনি দাঁড়িয়ে সংগ্রাম করতে চেয়েছেন। কেননা মৃত্যু নয়, জীবনই তাঁর সাধনা। শাক্ত-সঙ্গীত রচনার সময় মৃত্যুচেতনাময় একজন কবি তাঁর মধ্যে জেগে উঠেছিল। কিন্তু সে তাঁর মূল চৈতন্য নয়। তাঁর মূল চৈতন্য সেই 'পার্থ সারথী' গানটিতে জাগ্রত। যেখানে তিনি বলেছেন: 'মৃত্যু জীবনের শেষ নহে নহে'।

মৃত্যু আমাদের আছে, অবশ্যই মৃত্যু আছে আমাদের এবং এই পৃথিবীতে উন্মীলিতচক্ষু জীবনও শত শত বার মৃত্যুকে আলিঙ্গন করছে ; কিন্তু তবু আমাদের জীবনও আছে, সমগ্র বিশ্বসত্তা হিসাবে নিজেকে পরিকল্পনা করলে এ মানুষ সেই জীবনেরই উত্তরাধিকারী।

সেই জীবনকে সেই আলোকের প্রতিভূকে নজরুল ভালবেসেছিলেন। তাই এক অনিঃশেষিত, অনিদ্রিত, তীব্র, ক্ষুব্ধ, চঞ্চল যৌবনে তাঁর কবিতার ধমনী উদ্বেলিত। তাঁর কবিতার শরীর তাই এক রোগহীন তারুণ্যের দীপ্তিতে ঝলকিত। যার স্পর্শ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকারও যে অর্থ আছে তা মুহূর্তে টের পেতে বিলম্ব হয় না। বাঙালীর ঠাণ্ডা হৃদয় রক্তিম যৌবনের এই শক্তিকে ভয় করে। রৌদ্রবিকচ আকাশের চেয়ে অরণ্যের ছায়ার দিকে টান তার বেশী। তাই হয়ত শুধু কয়েকটি প্রেমের কবিতার লেখক বলেই তাদের কেউ কেউ নজরুলকে কবি বলে স্বীকৃতি দিতে চেয়েছেন।

প্রেমের কবিতা অবশ্য নজরুল লিখেছেন। আর সেগুলো যে বাজে হয়েছে তা কোন সৎ পাঠকই বলবেন না। কিন্তু শুধু কবিত্বময় কথা থাকলেই কি আমরা তাকে কবিতা বলব? আমাদের বাংলাদেশে কি তেমন অনেক কবিই নেই যাঁরা সুন্দর কবিতার শব্দ দিয়ে কবিতা রচনা করেছেন? নজরুল যদি তাই করতেন শুধু যদি তেমনি ধরনের প্রেমের কবিতার রচয়িতা হতেন তাহলে কি আমরা তাঁকে বিশেষভাবে, পৃথকভাবে, একান্তভাবে চিনতে পারতাম?

তাঁর কবিতার একটা বড় অংশ জুড়ে আছে নারী-প্রেমের জন্যে কাতরোক্তি। কিন্তু তার জ্বালাটা বোধ হয় সেইখানে নয়। মিথুনলগ্নে ক্রৌঞ্চ-হত্যা দর্শনে ব্যথিত বাল্মীকির মুখ থেকে কবিতার পংক্তি উচ্চারিত হয়েছিল। পরিপূর্ণ বেদনায় অভিষিক্ত তা। নর-নারীর বিচ্ছেদজনিত এই বিরহব্যথা সংবেদনশীল কবিমনে আন্দোলিত হওয়া স্বাভাবিক। বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণজনিত মনোভাবের জন্য এই দৌর্বল্য কবির কাব্যে সৌন্দর্যসৃষ্টির পরিপূরক হিসেবে গণ্য কিন্তু জীবনানন্দের ভাষায় 'আরো এক বিপন্ন বিস্ময় আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভিতরে খেলা করে।' অর্থাৎ নারী-প্রেম ছাড়াও মানুষের ব্যথা পাওয়ার

অনির্ণেয় কারণ আছে। নজরুলের কবিতায় সেই অতৃপ্ত মনের বেদনা অব্যাহত। তা না হলে তাঁর কবিতা হ্যাকনিড হয়ে যেত। অবশ্য পরিপূরক হিসেবে কেবল বলা যাবে না তিনি বিশ্বপ্রেমিক ছিলেন এবং তাঁর যথার্থ প্রেম ছিল মানুষের জন্য। সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই যে মানুষের প্রতি তার ভালবাসা ছিল অপরিমেয়। এবং এ কারণেই নিপীড়িত মানুষের জন্যে তাঁর বেদনাও ছিল অপরিসীম। কিন্তু এই-ই সব নয়। এই নৈর্ব্যক্তিক চেতনার সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিক অন্তর্চেতনা তাঁর মধ্যে ছিল জীবন্ত। 'বাতায়ন পাশে গুবাক তরুর সারি', 'পথচারী' প্রভৃতি কবিতায় সে মানুষটিকে আমরা খুঁজে পাই যে বলে 'বন্ধু আমার। থেকে থেকে কোন্ সুদূরের নিজন পুরে, ডাক দিয়ে যাও ব্যথার সুরে?' এ-বন্ধু শুধু তাঁর প্রিয়তমা নয়, তাঁর আত্মিক চেতনা, আধ্যাত্মিক চেতনা; তা নইলে কেন সে অতৃপ্ত বলবে—

আমি ব'য়ে যাই—বয়ে যাই আমি কুলুকুলু কুলুকুলু,
শুনি না—কোথায় মোরই তীরে হায় পুরনারী দেয় উলু।

এ কি সে অজানার প্রতি টান নয়? যা পাওয়া যায় না, আর পাওয়া যাবে না বলে যে যন্ত্রণা মৃত্যুহীন হয়ে ওঠে?

শেষের দিকে আধ্যাত্মিকতায় ঝুঁকে পড়েছিলেন তিনি। অন্য সব কিছুকে ঝাপসা করে দিয়ে আত্মার অন্ধকার উন্মোচনে ব্যক্তি-কেন্দ্রিক চেতনা প্রবল হয়ে উঠেছিল। সুস্থ হলে, সুস্থির হলে সর্বোপরি ধীরে ধীরে প্রস্তুত হলে পাঁপড়ির পরে পাঁপড়ি খুলে ফুটে উঠতে পারতেন তিনি। কিন্তু ডষ্টয়েভস্কির মত আবেগানুভূতি তা তাঁকে হতে দেয়নি। সেই মিশ্রমানব অটল হযে দাঁড়াতে দেয়নি তাঁকে। একদিকে আল্লা অন্যদিকে মানুষ, একদিকে ধর্ম অন্যদিকে ব্যক্তিধর্ম—এই বিভিন্ন টানাপোড়নের মধ্যে লক্ষ তরঙ্গ-চঞ্চল নদীতে চাঁদের প্রতিবিম্বের মত ভেঙে ভেঙে গেছে তাঁর ধী-চেতনা। আর ট্রাজেডীতে হয়েছে সেই মানসিকতার সমাপ্তি।

কিন্তু এসমস্ত আমাদের দুঃখ। আসলে আমরা বলতে চেয়েছি তাঁর কবিতার বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে অবিরাম আছে এক অনন্ত অতৃপ্তির বেদনার ঢেউ। যা মহৎ কবিতার যথার্থ লক্ষণ।

হুইটম্যানের কবিতা প্রসঙ্গে বলতে গিয়া লরেন্স বলেছেন:

Whitman truly looked before and after. But he did not sigh for what is not.

কিন্তু নজরুল দীর্ঘশ্বাস ফেলেছেন! তাঁর হৃদয় অতখানি শক্ত তারের বাঁধনে বাঁধা নয় বলেই তাতে অনুতাপ আছে; তাতে বিশ্রাম আছে; আছে দুর্বল মানুষের জন্য আত্মীয়তা। এইখানেই বোধ হয় তাঁর বাঙালী-চরিত্র আবরণ সরিয়ে স্বমূর্তিতে প্রতিষ্ঠিত। এবং এই জন্যেই প্রতীচ্যের চরিত্রের মত ঋজু, বলিষ্ঠ, সংগ্রামী হলেও প্রাচ্য-চরিত্রের বিনীত মাধুর্যে তিনি বিকশিত। এই অর্থে নজরুল বাঙালী হলেও প্রাচ্য-প্রতীচ্যের মিলিত স্বভাবের বাঙালী।

নজরুল এবং একজন পাঠকের জিজ্ঞাসা

নজরুল কি বনস্পতি? কোন সুনিয়ন্ত্রিত শিক্ষায় নজরুল শিক্ষিত হতে পারেননি; সমালোচকের পরামর্শমত সুশাসিত শিল্পের নিয়ম মেনে চলেননি। তার কারণ তিনি যত্নলালিত ধনীগৃহের উদ্যানে অবস্থিত রক্তগোলাপের গাছ নন, তিনি বনভূমির পুষ্পবৃক্ষ।

তাঁর বাঁচবার জন্য মানুষের সহায়তার প্রয়োজন হয়নি, আপন বন্যপ্রকৃতির দুর্বার প্রাণশক্তির বলে চতুর্দিকের বৃক্ষরাজির বাধা অপসারণ করে তিনি আকাশের দিকে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিলেন। আকাশের অকৃপণ বৃষ্টি আর আল্লার দুনিয়ার আলো-হাওয়া, আপন প্রয়োজনেই তাঁকে সৃষ্টি করেছিল।

প্রকৃতির উদার প্রাঙ্গণে লালিত বলে তাঁর মধ্যে কৃত্রিমতার চিহ্ন নেই, তিনি স্বভাবের নিয়মে সুন্দর। মানুষের প্রাঙ্গণের মধ্যে জন্মালে তিনি ইচ্ছামত বাড়তে পারতো না, তাঁকে মানুষের আকাঙ্ক্ষার পরিমাপে বাড়তে হ'ত, তাঁকে ভদ্র চেহারার হ'তে গিয়ে তাঁর বন্যবাড়ন্ত যৌবন শীর্ণ হয়ে যেত।

পাঠক, একবার ভেবে দেখুন তাঁর লেখাপড়ার জীবন কতটুকু, কত সামান্য। তাঁর আশে-পাশে সেই পথিক নেই যে তাঁকে পথ দেখাতে পারেন, সেই অভিভাবক নেই যে তাঁকে শৃঙ্খলায় গড়ে তুলতে পারেন। অনিয়মেই জীবনের শুরু তাঁর।

এতে কি সত্যিই ক্ষতি হয়েছে। প্রচলিত নিয়মের বন্ধনে আনলে তাঁকে কি আরও বড়, আরও মনোহর, আরও সুন্দর করে তোলা যেত? ধরা যাক, কবিতার সকল অনুশাসন এবং শিল্পের মৌলিক উদ্দেশ্যের পরিমাপ মেনে তিনি 'বিদ্রোহী' কবিতা লিখেছেন। তাহলে আমরা যেটা এখন তাঁর কাছ থেকে পেয়েছি, সেটা কি পেতাম? যে কবি-চরিত্রকে

দেখে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন : 'অরুগ্ন, হিংস্র, বলিষ্ঠ, নগ্ন বর্বরতার ভাবমূর্তি,—এই কাজীর কবিতা।' আমরা কি তাঁর কাছ থেকে সেই কবিতা পেতাম ?

এ কবিতা সম্পর্কে সমালোচকেরা বলেছেন : কবিতাটি লক্ষ্যভ্রষ্ট, কবিতাটি অনিয়ন্ত্রিত। মাঝখানে ক্লান্ত শ্লথ পংক্তির উপস্থিতি একে অকস্মাৎ মন্থর করেছে, এর স্পিরিটকে নষ্ট করেছে ; কথার পুনরুক্তি, শব্দের পৌনঃপুনিকতা এর কাব্য-সৌন্দর্যকে বিঘ্নিত করেছে। সত্য বটে, কবিতা লিখবার সময় নজরুল আবেগকে নিরস্ত করতে পারেননি, শিল্পচৈতন্যের বাঁধা পথে চলেননি। কিন্তু প্রকৃতই কি তাই ?

কবিতা কাকে বলে ? সেই কি কবিতা নয় যা আমাদের সমস্ত সত্তাকে মুখরিত করে ? সকল ইন্দ্রিয়কে উৎকর্ণ করে তোলে ? যা একখানি শাণিত ঝকঝকে ছুরি, রৌদ্রে ধরলে যার উপর আলোর আগুন কেঁপে ওঠে ? যা একখানি ছুরির মতই চোখকে বিমূঢ় করে হৃদয়ে প্রবেশ করে কিংবা হৃদয়ে প্রবেশ করে হৃৎপিণ্ডের রক্ত মেখে এসে পাঠকের সামনে পাঠকের অন্যমনের মৃত্যু ঘটায় ? যার মধ্যে আছে উজ্জ্বল আলোর সংগে নিরন্ধ্র অন্ধকারের দ্বন্দ্ব ? যুগপৎ আবেগের সঙ্গে সংযমের লড়াই, বাস্তবের রূঢ়তার সংগে অলৌকিকের সংঘর্ষ ? মানুষিক চেতনার সংগে মানসিক চেতনার সংগ্রাম ?

এ-সব যদি সত্যি হয় তবে 'বিদ্রোহী' একটি দারুণ কবিতা। যাকে মাধুর্য বলে বিদ্রোহী কবিতার মধ্যে তার উন্মোচন ঘটেছে। যেমন : 'চিত চুম্বন চোর কম্পন আমি থর থর থর। প্রথম পরশ কুমারীর'।

কিন্তু এতে কি বিদ্রোহের আগুন আচমকা নিভে গেছে ? প্রশ্ন করি যে অন্তরটা বিদ্রোহ করল সেটা কি চেতনাহীন অমানুষিক প্রাণ ? প্রেমিকের সংগে কি বিদ্রোহের বিভেদ আছে ? আমাদের মনোনয়নে প্রেমই ত বিদ্রোহ ?

আমি বঞ্চিত ব্যথা পান্থবাসী চির-গৃহহারা যত পথিকের,
আমি অবমানিতের মরম বেদনা বিষজ্বালা প্রিয়লাঞ্ছিত বুকে গতি ফের' :

এ দুটি লাইনের প্রেমিক বিদ্রোহী নয় ?

নজরুল এবং একজন পাঠকের জিজ্ঞাসা

ইন্দ্রিয়ের শৃঙ্খলা ঘুচিয়ে জানার জগতে পৌঁছতে চেয়েছিলেন র‍্যাবো। অমনি সচেতনতায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নজরুল কি কবিতা লিখতে শুরু করেছিলেন? না, তা নয়। তাহলে ঐ 'বিদ্রোহী'র চারিত্র্য নিয়ে তাঁর অনেক কবিতা জন্মাত। কিন্তু সেটা হয়নি অপরাপর কবিতার বেলায়। ধারণাতীত যে আনন্দের সবল আঘাতে ইন্দ্রিয়ের শৃঙ্খলা হারিয়ে গিয়ে উন্মাদনার যে আশ্চর্য প্রদীপ 'বিদ্রোহী'তে জ্বলে উঠেছিল সে প্রদীপ অন্য কোন কবিতায় আর নিরাবরণ হল না। এই হয়নি বলেই কবিতার এইরূপ গুণ তাঁর অন্য কোন কবিতায় উন্মীলিত নয়।

আমরা জানি 'বিদ্রোহী' কবিতার উচচনাদের মধ্যে গান আছে, চিৎকারের মধ্যে গুঞ্জন আছে। কিন্তু এই জন্যেই ত তার মধ্যে জীবনের সংগে জীবনের পরপারের অথবা জীবনের পিছনের অন্ধকার এবং আলো, দেবতা আব শয়তান আছে। যা ধ্বংস-সৃষ্টি উভয়ের মধ্যে আবর্তিত।

প্রসঙ্গত নজরুলের চরিত্র বিশ্লেষণে এখানে আর একটি কবিতার কথা উল্লেখ করার প্রয়োজন মনে করি। নজরুলের 'দারিদ্র্য' কবিতাটি কোন অভিসন্ধিতে সংরচিত তা কি বোঝা যায়? যে সংযত গুরুগম্ভীর কথার ধ্বনিতে প্রথমে যে মহত্তম ঋষির আত্মা প্রকটিত হল—'দারিদ্র্য' তাকে 'খ্রীষ্টের সম্মান' দান করেছে বলে, কবিতার দ্বিতীয় স্তবকে 'দারিদ্র্যে'র প্রচণ্ড আঘাতে কেন উপবাসীর সে অহমিকা বিচূর্ণ হয়ে গেল? কেন কবি লিখলেন:

> শীর্ণ করপুট ভরি সুন্দরের দান
> যতবার নিতে যাই হে বুভুক্ষু তুমি
> অগ্রে আসি কর পান। শূন্য মরুভূমি
> হেরি মম কল্পলোক।

অকস্মাৎ এই পরাজয়ের অর্থ কি?

অর্থ এই যে মানুষ প্রকৃতই দুর্বল। প্রবৃত্তির সরল গতিতে বন্ধন রচনা করে অনবনমিত আদর্শের কাষ্ঠাসনে বসালে মানুষ আর মানুষ থাকে না, শাসনের কারাগারে বন্দী হয়ে সে অন্য কোন গ্রহের জীবে

পরিণত হয়। তাই মানুষ হলে মানুষকে দুর্বল হতে হয় এবং মানুষের মধ্যেই থাকে চেতন-অবচেতনের দ্বন্দ, নিদ্রিত-জাগ্রতের যুদ্ধ।

এই দ্বন্দটাই নজরুল-প্রকৃতির সমস্যা। একটি নয়, দুটি চরিত্র তার মধ্যে পাশাপাশি বাস করে। একজন সামাজিক মানুষ, বাস্তবচারী মানুষ আর অন্যজন বাস্তবাতীত রহস্যময় মানুষ, কবি মানুষ—যাঁর দেশ নেই, কাল নেই, পাত্র নেই, ধর্মাধর্ম নেই, স্বর্গমর্ত্য নেই।

এই ডুয়েল ক্যারেক্টার বা ডবল ক্যারেক্টার তিনি কেবল একদিকে 'ঐ ঈশ্বর শির উল্লঙিঘতে আমি আগুনের সিঁড়ি' এবং অন্যদিকে 'খোদা প্রেমে শারাব পিয়ে বেহুস হয়ে রই পড়ে' লিখেছিলেন বলে নয়, তিনি কবি ছিলেন বলে। আমরা যেন ভুলে না যাই যে নজরুল শুধু 'বিদ্রোহী' নয় বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ওষ্ঠ উন্মুক্ত করার জন্য নয়, শ্বাসরোধকারী সমাজাচার, দেশাচার, ধর্মাচারের বিরুদ্ধে মুষ্ট্যাঘাত করার জন্য। নজরুল কবি বলে বিদ্রোহী। ফলত শিল্পীর মধ্যে বিদ্রোহী সত্তা না থাকলে সে স্রষ্টা হতে পারে না। অবস্থাকে মেনে নিয়ে কবি হওয়া যায় না যা আছে তাকে অস্বীকার করেই কবি হতে হয়। সৃষ্টি কাকে বলে? যা নেই তাকে নির্মাণ করাই সৃষ্টি। এবং এই 'নেই'কে আসন দিতে গেলে 'আছে'কে সরাতেই হবে। অতএব বিদ্রোহী না হওয়া মানেই স্রষ্টা হওয়া নয়।

শিল্পীর মধ্যে এই চৈতন্যের সৃষ্টি হয় বৃত্তের বৈপরীত্যে পরিচালিত দুটি আত্মিক ক্ষুধার সংঘর্ষে, যার থেকে অসন্তোষের জন্ম হয়, অশান্তির জন্ম হয় এবং বাঁধা নিয়মের, প্রচলিত নিয়মের সংগে বিবাদ হয়। এই বিবাদ থেকেই নতুনের জন্ম। নজরুলের বেলায়, তিনি প্রকৃতি-লালিত বনভূমিতে না জন্মালে হয়ত একই জীবনে এই দুই রকম জীবন অথবা বহুজীবনের মিলন ঘটত না, হয়ত বন্দী জীবন সম্বন্ধে মুক্ত জীবনের প্রশ্ন এসে উঁকি দিত না, হয়ত ধর্মীয় জীবনের সংগে অধর্মীয় জীবন সংযোজিত হত না, হয়ত নিজ ধর্মের সঙ্গে অন্য ধর্মের সংগতির মূল খুঁজবার চেষ্টা হত না।

কোন কোন সমালোচকের মতে নজরুল যে এই নতুনকে উৎপাদন করলেন সেটা তাঁর অচৈতন্যপ্রসূত ফলশ্রুতি। কোন রকম ব্যতিক্রম

নয়, স্বাভাবিক নিয়মে পুরনো কবরের উপর উৎসৃষ্ট এই পল্লবিত বৃক্ষ। অর্থাৎ তিনি স্বভাব কবি। জীবনানন্দ দাশের কথা অনুযায়ী ধরা যাক, 'সকলেই কবি নয়, কেউ কেউ কবি।' অর্থাৎ কবিতা লিখলেই কবি হওয়া যায় না। স্বভাবের আশীর্বাদ নিয়েই কবি হতে হয়। এ অর্থে বড় কবি মাত্রেই কে স্বভাব কবি নয়? এমন কি প্রকৃতি-বিদ্বেষী বোদলেয়ার কি স্বয়ম্ভূ? তিনি আপনাকে আপনি সৃষ্টি করেছিলেন? কবি কি নিজেকেই নিজে সৃষ্টি করেন?

মানুষ জন্মেই কেউ শিক্ষিত হয় না। গর্ভ থেকে মুক্তি পেয়েই কেউ বলে না, আমি সর্বজ্ঞাতা। পৃথিবীতে জন্মে মানুষকে মানুষের অনুকরণ করেই মানুষ হতে হয়। তেমনি, কবিকেও কবিকে অনুকরণ করে কবি হতে হয়। এবং এটা যথার্থ সত্য হলে নজরুলকে বিশেষ অর্থে 'স্বভাব কবি' বলে শিল্পীর গৌরব থেকে বঞ্চিত করা যায় না। নজরুল কি একেবারে কিছু না শিখেই কবি হয়েছিলেন? নজরুলও শিখেছিলেন। হয়ত তাঁর পক্ষে গৃহের শিক্ষা সম্ভব হয়নি, হয়ত বিদ্যালয়ের সুষ্ঠু শিক্ষা সম্ভব হয়নি, কিন্তু তিনি শিক্ষা পেয়েছিলেন, যেমন বনজবৃক্ষ আঙিনায় না থেকেও আলো পায়, বাতাস পায়, বৃষ্টি পায়, তেমনি। এবং সে শিক্ষাও সামান্য ছিল না, ওই বায়ুর মত, বৃষ্টির মত আলোর মত আকাশজোড়া ছিল সেই শিক্ষা।

যদি বলি নজরুল যে কবিতা লিখেছেন তার কোন্‌টা ছন্দহীন? তিনি যে গান রচনা করেছেন তার কোন্‌টা অসংগীত? এসব কি হঠাৎ হয়ে গেছে? হঠাৎ কি তাঁর কবিতার মধ্যে আমাদের বাংলাদেশ, আমাদের বাঙালী-মানস, আমাদের বাউল, আমাদের পুঁথি রচয়িতারা, ভারতচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন দত্ত, হাফিজ, হুইটম্যান, ওমর আবিষ্কৃত হয়েছেন? আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে হঠাৎ কি তাঁর কবিতার মধ্যে মুসলিম-পুরাণ এবং হিন্দু-পুরাণ ঠাঁই পেয়েছে?

আসলে নজরুলের শিক্ষারও একটা পরিসর ছিল। সেটা আবদ্ধ স্থানের, পরিমিত স্থানের এবং শাসিত, নিয়ন্ত্রিত, পরিমিত ও কুণ্ঠিত, সংকুচিত জীবনের শিক্ষা নয়। নজরুলের সাহিত্যে এবং বিশেষত তাঁর কবিতায় যে একটা অবারিত, অসংকুচিত এবং বিস্তৃত উদার চৈতন্য কিংবা বিশেষ

অর্থে চরিত্রের পরিচয় পাই তা ঐ গৃহাঙ্গনে একের যত্নে পালিত বৃক্ষ অথবা টবে উৎপন্ন একের মনোমত ফুল-বৃক্ষ থেকে পাওয়া যেত না। মনে রাখতে হবে একটি গোলাপের সঙ্গে একটি বন্য-কুসুমের পার্থক্য কতটা? গোলাপ যত সুন্দর হোক, যত সুগন্ধি হোক সে বিশেষের জন্যে, বিশিষ্টের জন্য, কিন্তু বনের ঐ ফুলের গাছটি নির্বিশেষের জন্যে বিশিষ্ট-অবিশিষ্ট সবার জন্যে। তার জন্যে কি তার মূল্য কমে গেল? শিল্প কি বিশিষ্টের জন্য কেবল?

প্রয়োজনের জন্য লেখা বলে, কবিতার সংজ্ঞা মানা হয়নি বলে, ব্যাকরণকে উপেক্ষা করা হয়েছে বলে, দর্শন নেই বলে, মননশীল না বলে, কোন বিশেষ লক্ষ্যে নিবদ্ধ নয় বলে, অগভীর বলে, কোন কোন সমালোচক তাঁর কবিতাকে শাশ্বতের দরবারে অল্পায়ু বলে চিহ্নিত করেছেন অথবা মেকী বলে হেসে উঠেছেন। কিন্তু এসব কথা কি তাঁরা নজরুলের কবিতাকে আলিঙ্গন করে উচ্চারণ করেছেন? তাঁর স্পর্শ নিয়ে, আপন ত্বকে তার উষ্ণতা অনুভব করে, আপন নাড়ীতে তার নাড়ীর স্পন্দন অনুভব করে, এসব কথা কি তাঁরা উচ্চারণ করেছেন?

আমাদের কথা হল আধুনিক পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবিদের কবিতা আর কি উনবিংশ শতাব্দীর সংজ্ঞা দিয়ে বিচার করা হয়? কবিতা সম্বন্ধে এ পর্যন্ত সমালোচকেরা যা কিছু বলেছেন তার মধ্য থেকে ধ্রুব বলে কার কথাটিকে মেনে নেওয়া হয়েছে? আমরা ত এই চোখের সামনে দেখছি যাকে আমরা এতদিন গদ্য বলে চিনতাম, সে এসে কখন কবিতার আসন জুড়ে বসেছে। কবিতার জন্যে আজ আর কোন বিশেষ আঙ্গিক আছে বলে সংজ্ঞা নিরূপণ করা হচ্ছে না। আধুনিক কবিতার প্রতি কটাক্ষপাত করলেও স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন এবং সত্যসত্যই তাঁর শেষ বয়সে তাঁর পঞ্চাশপূর্ব জীবনের ধারণা অটল হয়ে থাকতে পারেনি। রবীন্দ্রনাথ কেন সংক্রমিত হলেন? "এ যুগ বাস্তবকে অবমানিত করে সমস্ত আব্রু ঘুচিয়ে দেওয়াকেই সাধনার বিষয় বলে মনে করে" ইত্যাদি বলেও তিনি নিজের মধ্যে সেই পীড়াকে টানতে শুরু করেছিলেন কেন? তিনি কি প্রকৃত কবি নন বলে?

, আসল কথা হল কোন এক যুগের, কোন এককালের, কোন এক সময়ের ধারণা দিয়ে অন্য যুগ, কাল, সময়ের ধারণার বিচার করা যায় না,

'তেমনি কোন এক ব্যক্তির, কোন এক মনীষীর, কোন এক সমালোচকের কবি কিংবা সাহিত্যিকের ধারণা দিয়ে অন্য ব্যক্তি, মনীষী, সমালোচক কবি-সাহিত্যিকের ধারণার বিচার হয় না। অর্থাৎ ঘূর্ণায়মান, অস্থবির পৃথিবীতে সব কিছুই আপেক্ষিক। চিরন্তন হয়ে টিকে থাকবার মত এখানে কিছু নেই।'

কবি জীবনানন্দ দাশ কবিতার সমস্ত সংজ্ঞা জেনেও লিখেছিলেন :

কবিতা কি এ-জিজ্ঞাসার কোন আবছা উত্তর দেওয়ার আগে এটুকু অন্তত স্পষ্টভাবে বলতে পারা যায় যে কবিতা অনেক রকম। হোমারও কবিতা লিখেছিলেন, মালার্মে র‍্যাবো ও রিলকেও। শেকস-পীযর, বোদ্‌লেযর, রবীন্দ্রনাথ ও এলিয়টও কবিতা রচনা করে গেছেন।

ঐ যে "কবিতা অনেক রকম" লিখলেন তিনি তাতে কি এই মনে হয না যে কবিতাব প্রকৃত সংজ্ঞা নির্ধারণে তিনি সংশয়ী হয়ে উঠেছিলেন।

এই সংশয়ের জন্য কি আধুনিক কবিতা বিচিত্র রূপে, বিচিত্র চরিত্রে এবং বিচিত্র আঙ্গিকে পরীক্ষা-নিরীক্ষার নদীতে এগিয়ে চলেছে? এবং কোন অন্ধকার জিজ্ঞাসা কিংবা কোন অদৃশ্য সংশয নজরুলের অচেতন মনে শক্তিরূপে জেগে উঠেছিল নতুনের সৃষ্টিতে?

কারণ এ-কথা সত্য যে প্রথাগত শাসনে শৃঙ্খলিত না থাকার জন্যে আজকের বাঙালী কবিদের জন্য তিনি গুহামুখের পাথর সরিয়ে পথ আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন।

একটি কথা, কবিতা অনেক রকম বলে যে কেউ কবিতা লিখব বলে কবিতা লিখলে কবিতা হয়ে যায়? এমন কি যাঁরা কবি তাঁরাও কবিতা লিখলেই কবিতা হয়ে যায়? এবং নজরুল কি যত কবিতা লিখেছেন সব কবিতা হয়ে গেছে? এখানে আমরা দুটি কবিতার উদ্ধৃতি দিয়ে আমাদের এ আলোচনাটিকে শুদ্ধ করব। এর একটি ই. ই. কামিংসের অন্যটি মিসেস সিটওয়েলের। কামিংস তাঁর কবিতাটিকে এমনি করে সাজিয়েছেন :

Among
these
red pieces of
day (against which and

quite silently hills
made of blueandgreen paper
scorchbend ingthem
-selves-U
pcurv E, into :
anguish (clim
b) ing
s-p-i-r-a-
l
and, disappear)

আর সিটওয়েলের কবিতাটি এমনি :

Said Il Magnifico
Pulling a fico—
With a stoccado,
And a gambado
Making a wry
Face : "This corraceous
Round orchidaceous
Laceous porraceous
Fruit is a lie !
It is my friend king Pharaoh's head
That nodding blew out of the Pyramid.

কবি-সমালোচক সুধীন্দ্রনাথ দত্ত উপরের উদ্ধৃতিটাকে কবিতা বলেছেন, নীচেরটাকে তিনি কবিতা বলতে পারেননি। পারেননি তার কারণ তিনি বলেছেন যে "সিটওয়েলের ছন্দ তাঁর হৃদয়াবেগের প্রতিবিম্ব নয়।" তাহলে কি আমরা এখন বলব যে কবিতা লিখলেই হয় না, তার মধ্যে এই "হৃদয়াবেগের প্রতিবিম্ব" থাকা চাই ? আর নজরুলের কবিতার মধ্যে কি এই জিনিসটি সবচেয়ে বেশী নেই ?

এবং সুধীন্দ্রনাথ দত্ত যে বলেছেন "রূপ রসিক মাত্রের মনেই লুকিয়ে থাকে; কবির কাজ অহমিকা ছেড়ে পাঠকের মানসে সেই নিহিত রূপের উদ্বোধন।" রসিকের মনের সেই "নিহিত রূপের উদ্বোধন" কি নজরুল ঘটাতে পারেননি? তাঁর কবিতা পড়ে কি আমাদের সত্তা মুখরিত, গুঞ্জরিত হয় না, আমাদের ইন্দ্রিয় জেগে ওঠে না, আমাদের রক্ত, আমাদের হৃৎপিণ্ড কি অশান্ত হয়ে ওঠে না? তা যদি না হয় তাহলে সত্যিই নজরুল কবিতা লেখেননি।

নজরুলের গান এবং তার বৈশিষ্ট্য

কেউ কেউ বলেন, নজরুল ইসলামের গানের কোন বৈশিষ্ট্য নেই—যেমন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গানে আছে। রবি ঠাকুরের যে-কোন গান গাইলেই বোঝা যায় যে সেটা রবীন্দ্রনাথের গান—যেমন বোঝা যায় রামপ্রসাদের রামপ্রসাদীকে। ঠিক ঐ রকম একটা চারিত্র্য নজরুল-গীতির নেই। তবু আমরা যারা সংগীত-সাধক নই, সংগীত-ভক্ত মাত্র, সেই আমরাও যেন নজরুলের গান শুনে বুঝতে পারি, সুর শুনে চিনতে পারি যে গানটি নজরুল ইসলামের। কীর্তনের যেমন একটা বিশেষ ঢং আছে, রবীন্দ্রনাথের তেমনি একটি রবীন্দ্রিক ঢং আছে। সেও ওই কীর্তনের মত বিশেষ একটা ধারা। সেখানে সুর-তালের বৈচিত্র্য আছে ঠিকই, কিন্তু তাদের গঠন রীতিটা তাদের চেহারাটা সকলের এক সমান। ইউরোপের মানুষের যেমন এক রকম চেহারা, যেমন চীনাদের, যেমন আফ্রিকানদের, নিগ্রোদের রবীন্দ্রনাথের গানের চেহারাটা তেমনি। সেখানে যেমন একটি মানুষের সংগে অন্য মানুষটির আকৃতিগত যথার্থ মিল নেই, রবীন্দ্রনাথের একটি গানের সংগে তেমনি অপর গানের রাগের অমিল আছে—সেটা উঁচু দরের সংগীতবিদমাত্রই জানেন। নজরুল ইসলামের গানের ঐ রকম বিশেষ চেহারা আছে কিনা আমাদের এই নিবন্ধের আলোচ্য বিষয়টা তাই।

নজরুল ইসলাম নানা রকম গান লিখেছেন। আধুনিক গান, গজল গান, ইসলামী গান, কীর্তন, রামপ্রাসাদী এবং শ্যামা-সংগীত ও বিভিন্ন রাগ-সংগীত। নজরুলের ইসলামী গান কি নজরুল-গীতি? নজরুলের গজল, কীর্তন, রামপ্রসাদী, শ্যামা-সংগীত এসব কি নজরুল গীতি? এগুলো শুনলেই কি মনে হয় গানটা নজরুলের? তিনি একা

অজস্র ইসলামী গান লিখেছিলেন বলে এবং বাংলা ভাষায় তাঁর ইসলামী গান সবিশেষ পরিচিত বলে আমরা ইসলামী গান শুনলেই মনে করি সেটা নজরুলের। ইসলামী গান গোলাম মোস্তফা সাহেবও কয়েকটা লিখেছিলেন এবং আরও অখ্যাত কবি কেউ কেউ। কিন্তু নজরুলের মত সামগ্রিকভাবে জনচিত্ত গ্রাস করতে পারেননি তাঁরা কেউ।

এ না পারার কারণ তাদের কেউ নজরুলের মত কবি নন এবং নজরুলের মত সংগীত-কলাবিদ্‌ও নন:

(ইসলামী গান লিখলেও ঐ গানের মধ্যে যে উন্নত ধরনের উপমা চিত্রকল্প আছে তা যে-কোন শ্রেষ্ঠ কবির দর্শনীয় ব্যাপার আর তারই সংগে আছে ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সংগীতের ঠুংরী টপ্পা, খেয়ালের সুরের আশ্চর্য মিশ্রণ।) এই নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের জন্যে ওগুলো নজরুল গীতি ছাড়া অন্য কিছু নয়।

ঠিক ঐ একই কথা নজরুলের গজল গান সম্বন্ধে বললে অত্যুক্তি করা হয় না। (বাংলা ভাষায় নজরুলের আগে কেউ গজল গান আমদানী করেছিলেন কিনা সঠিক জানা যায় না।) কারো কারো মতে এ ব্যাপারে অতুলপ্রসাদ অগ্রণী। তা হোক তবু গজল গান মানে নজরুল-গীতি এই জন্যে যে নজরুলের গজল থেকে সুবিশাল বাংলার জগতের সামান্য মানুষই অব্যাহতি পেয়েছিল বোধ হয়। আঙিনা থেকে দিগন্ত পর্যন্ত ব্যাপক গন্ধ ছড়িয়ে দিয়েছিল তাঁরই গজল। সে গজল কেউ গাইলে, সে গজল কোথায়ও গাওয়া হলে নজরুল ছাড়া আমরা আর অন্য কারও চেহারা মনে করতে পারি না। কবিত্বে, কল্পনায়, রূপে রঙে তা ইরানী গজলের সমতুল্য এবং বলতে দ্বিধা নেই ভারতীয় সংগীতের তুলনাহীন সুর এবং ইরানের কাব্য-সুষমার এক মহামিশ্রণ নজরুলের এই গজল। তার অন্য নেই বলে সে শুধু নজরুলের গজল হয়ে আছে—হয়েছে নজরুল গীতি।

নজরুলের শ্যামা-সংগীত সম্বন্ধেও বোধ হয় ঐ একই কথা খাটে। একমাত্র রামপ্রসাদ ছাড়া বাংলা ভাষায় শ্যামা-সংগীত লিখে নজরুলের মত আর কেউ এত বেশী নাম করতে পেরেছিল কিনা অথবা পেরেছেন কিনা জানি না। অবশ্য রামপ্রসাদের রামপ্রসাদীর

যেমন একটা ঢং আছে, নজরুলের শ্যামা-সংগীতেরও তেমনি একক যন্ত্রের মত সুর নেই ; তাঁর সঙ্গীতে অর্কেষ্ট্রার সুর, বহুচারিতায় সে সুন্দর। নজরুলের শ্যামা-সংগীতগুলোর একটা বিশেষ সাহিত্য-মূল্য আছে বলে আমার ধারণা। সেগুলো শুধু গান নয়, কবিতা হিসেবেও উচ্চ পর্যায়ের। সেখানে তিনি উপমা রূপককে এমন যথার্থ-ভাবে ব্যবহার করেছেন যে দেখলে মুগ্ধ হতে হবে এবং তারই সংগে তাঁর অধিকাংশ গান উচ্চাঙ্গ ভারতীয় সংগীতের সুরে বাঁধা হওয়াতে তার একটা স্বতন্ত্র ক্যারেক্টার ফুটে উঠেছে। এই স্বাতন্ত্র্যটুকুর জন্য সেগুলোকে অনায়াসে অন্যান্য শ্যামা-সংগীত থেকে আমরা পৃথক করে চিনতে পারি, অনায়াসে বুঝতে পারি গানগুলো কবি নজরুল ইসলাম লিখেছেন। অতএব ঐ শ্যামা-গীতি মানেই নজরুল-গীতি।

এর পরে আমরা নজরুলের অন্যান্য গান সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করব। নজরুল কিছু স্বদেশী গান এবং বিপ্লব-গীতি লিখেছিলেন. কিছু স্বদেশী সুরে, কিছু বিদেশী সুরে। ঐ রীতি-ধর্মী গান তাঁর আগে অনেকে লিখেছেন, রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, দ্বিজেন্দ্রলাল লিখেছেন, মুকুন্দ দাস, অতুলপ্রসাদ এবং আরও অনেকে। কিন্তু নজরুলের ঐ-সব গান দেশী-বিদেশী সুরে সৃষ্ট হলেও সেটা নজরুলের গান। সে গানের সুর-তান-লয় সব নজরুলের স্বভাবকে কেন্দ্র করে তাদের পাপড়ি খুলে ফুটে উঠেছে। নজরুলের মার্চ–সংগীতের শ্রোতারা তার গান শুনে কখনই সেটা অন্য কোন গীতকারের গান বলে ধারণা করতে পারবে না। শুধু সেই জন্যেই সে গান নজরুলের গান—নজরুল-গীতি।

কিন্তু আধুনিক গানেই বোধ হয় নজরুল তাঁর ঐ চরিত্রটাকে ঠিকমত ফোটাতে পারেননি ? না ফুটিয়েছেন তিনি ? 'যবে তুলসী তলায়, প্রিয় সন্ধ্যা বেলায়, তুমি করিবে প্রণাম। তব দেবতার নাম নিতে ভুলিয়া বারেক প্রিয় নিও মোর নাম।' কিংবা 'আমি দ্বার খুলে আর রাখব না পালিয়ে যাবে গো' ইত্যাদি গানের ভিতর দিয়ে নজরুলকে চিনে নেওয়া যায় কিনা দেখতে হবে। একটা কথা, নজরুল শুধু বিদ্রোহী কবি নন, নজরুল প্রেমিক কবিও বটেন। নজরুলের এই প্রেমের মনে হয় একটা ক্যারেক্টার আছে। নজরুলের কবিতায় সেই প্রেমিক

নজরুলের গান এবং তার বৈশিষ্ট্য

নজরুলের চেহারাটা অত্যন্ত স্পষ্ট। নজরুলের অনেক গান নজরুলের কবিতাও বটে। সেই কবিতার প্রেমিক আর সেই গানের প্রেমিক অনন্য। আমরা সেই প্রেমিকের রূপটিকে চিনে থাকলে আমরা নজরুলের গানটিকেও চিনে নিতে পারব।

নজরুলের এই প্রেমিক রূপটি তাঁর রাগ-সংগীতে আর তাঁর গজলে সবচেয়ে সুন্দরভাবে ধরা পড়েছে। 'কাবেরী নদীজলে কে গো-বালিকা'; 'আজি এ শ্রাবণ-নিশি কাটে কেমনে'; 'বসিয়া বিজনে কেন একা মনে', 'ভরিয়া পবাণ শুনিতেছি গান' ইত্যাদি রাগ-সংগীত এবং 'বাগিচায় বুলবুলি তুই ফুলশাখাতে দিসনে আজি দোল' ও 'আমাকে চোখ ইশারায় ডাক দিলে হায় কে গো দরদী' ইত্যাদি গজলে নজরুল ইসলাম তাঁর গোটা চেহারা নিয়ে প্রদীপ্ত।

ভারতীয় রাগ-সংগীতের ঐতিহ্যগত সুরকে পরিবর্তন না করে তিনি বাংলা গানে বাণীর মাধ্যমে তাকে সজীব করে তুলেছেন। এখানে তাঁর স্বকীয়তা অসাধারণ। বাংলাদেশের আর কোন সংগীতকার এই কাজটি এমন নিপুণভাবে করতে পেরেছেন বলে অন্তত আমার জানা নেই। তবু ঐ সুরের মধ্যে নিজের প্রাণসত্তাটুকুকে তিনি জীবন্ত করে রেখেছেন। ঐ সব গান শুনলেই মনে হয় ওর প্রতিটি ধমনীতে, রক্তস্রোতে নজরুল ইসলাম প্রবাহিত। গায়ক নজরুল ইসলাম, সংগীতজ্ঞ নজরুল ইসলাম, সুর-স্রষ্টা নজরুল ইসলাম এবং কবি নজরুল ইসলাম তাঁর ব্যক্তিত্ব নিয়ে সর্বস্তরে বিদ্যমান। এবং তিনি আমাদের ভুলতে দেন না ঐ সব গান তাঁর, নজরুল ইসলামের এবং ঐ গানগুলো তাই একান্তভাবে নজরুল-গীতি।

বলা বাহুল্য, নজরুল ইসলাম তাঁর অধিকাংশ গানের সুর দিয়েছেন তিনি নিজে এবং যেহেতু তিনি প্রবল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ সুতরাং তাঁর সেই সব গান তাঁর ব্যক্তিত্বের স্পর্শ থেকে অব্যাহতি পায়নি। তাই তাঁর স্বতন্ত্র ধারা সৃষ্টির কোন স্বেচ্ছাকৃত প্রচেষ্টা না থাকলেও তাঁর অজান্তে, তাঁর অজ্ঞাতে তাঁর কবিতার মত তাঁর গানেও একটা বিশেষ চরিত্র গড়ে উঠেছে। আমাদের কেউ সেটা অস্বীকার করলে জানব,

আমরা যাঁরা এই মত পোষণ করি তাঁরা কেউ সংগীত-রসিক নই।

কাজী নজরুল ইসলাম পরবর্তীকালে বিখ্যাত সংগীতশিল্পী মহান জমীরউদ্দিন খান, ওস্তাদ মঞ্জু সাহেব, ওস্তাদ্ ফৈয়াজ খাঁর কাছে গান শিখে-ছিলেন। গায়ক হিসেবে হয়ত তিনি তাঁদের সমপর্যায়ে ওঠেননি, কিন্তু স্রষ্টা হিসেবে, শিল্পী হিসেবে তিনি তাঁর শিক্ষাকে পুরোপুরি কাজে লাগাতে পেরেছিলেন। তিনি ভারতীয় ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পাও ঠুংরীকে বাংলা গানের মেজাজে মেলাতে পেরেছিলেন এবং বিভিন্ন রাগের মিশ্রণে সৃষ্টি করেছিলেন মিশ্ররাগেব গান— এবং পূর্ণ সফলতার সংগে।

সমালোচকের উর্ধ্ব-ভ্রূ দৃষ্টিতে চাইলেও কে অস্বীকার করবেন যে বাংলাদেশে বীর্যবন্ত সংগীত একমাত্র নজরুলই সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁর আগে এবং তাঁর পরে চকিতে মানুষের রক্তকে টগবগিযে ফুটিয়ে তোলার মত সাংঘাতিক ক্ষমতা আর কেউ দেখাতে পেরেছেন কি? এমন কি যে রবীন্দ্রনাথের যাদুময়ী লেখনী বাংলা ভাষায় সংগীতের এক বিরাট স্বর্গ রচনা করেছে, যাঁর লেখনীতে এই অসম্ভব সম্ভব হয়েছে, তিনিও তাঁর সংগীতের বিরাট বীণায় বীর্যের জ্যোতির্দীপ্ত সুরটিকে ঠিক নজরুলের মত আনতে পারেনানি। এখানে নজরুল একজন পরাক্রান্ত সম্রাট এবং সেখানে তাঁর স্বকীয় বৈশিষ্ট্য তুলনাহীন।

নজরুল বাংলা গানের এগিয়ে চলাব সমস্ত বাধাকে অপসারণ করে তাকে দিগন্ত স্পর্শ করার ক্ষমতা যুগিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথও বাংলা গানের মুক্তি চেয়েছিলেন। 'সংগীতের মুক্তি' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন :

> আমাদের সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, চিত্রকলা সবই আজ অচলতা'র বাঁধন হতে ছাড়া পেয়েছে। এখন আমাদের সংগীতেও যদি এই বিশ্বযাত্রার তালে তাল রেখে না চলে তবে ওর আর উদ্ধার নেই।

আসলে রবীন্দ্রনাথ ওস্তাদী ধ্রুপদ ও খেয়ালের একঘেয়েমী থেকে গানকে উদ্ধার করে 'দিশী' গানের উৎকর্ষ সাধনে মনোযোগ দেন। অবশ্য তিনি উচচাঙ্গ সংগীতের রাগরাগিণী বর্জন করেননি। তাকে আত্মসাৎ করেই তার কঠোর অনুশাসনের বন্ধন উন্মোচন করে গানকে শ্রোতার হৃদয়গ্রাহী করে তুলেছিলেন। তাঁর গানকে এই হৃদয়গ্রাহী করে

তোলার পিছনে কাজ করেছিল তাঁর অসামান্য ভাষার কারুকাজ, তাঁর কথার মাহাত্ম্য, তাঁর বাণীর ঐশ্বর্য। কিন্তু একটি কথা না বলে উপায় নেই, মুক্তি চাইলেও রবীন্দ্রনাথ গানকে সর্বতোভাবে মুক্তি দিতে পারেননি। নিজের সবিশেষ ভংগীকে প্রাধান্য দিতে গিয়েই তিনি নিজের গানকে ভারতীয় ওস্তাদদের মত প্রায় ঘরোয়া কবে তুললেন, অভিজাতদের ঘরের-বাঁধন থেকে মুক্তি দিতে গিয়ে অভিজাতদেরই ঘরে আশ্রয় নিলেন তিনি, যে কাবণে সংগীতের উদ্ধার চেযেছিলেন তাঁর দ্বারা সেই সত্যিকাব উদ্ধাব বোধ করি সম্ভব হয়নি, তিনি তাঁর গান নিয়ে সর্বস্তবেব মানুষেব দ্বারে পৌছতে পেরেছেন বলে আমার মনে হয় না। ববং সে তুলনায নজরুল তাঁর অন্তরের স্বাভাবিক তাগিদে যে গান সৃষ্টি কবেছেন তা জনগণের মনের আরও বেশী কাছে পৌছতে সক্ষম হযেছে। নজরুলের সার্থকতার মূলে আছে বাংলা গানের বিভিন্ন শাখায় ফুল ফোটাবার দক্ষতা।

আলোচনাব শেষ প্রান্তে বলি নজরুল ইসলাম সুর নিয়ে পরীক্ষা করে গেছেন, কিন্তু সুরকে তিনি সংরক্ষণ করার চেষ্টা করেননি। তাঁর সবই আছে, কিন্তু সব ছড়িয়ে আছে, সব অবিন্যস্ত আছে, একবার শুধু গুছিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করলে রবীন্দ্রনাথ যে কাজটা করে গেছেন সেটা তাঁর পক্ষে করা কঠিন হত না। তাঁর মনে সে কল্পনা ছিল কিনা জানি না, তবে এটা জানি তাঁর অবসর ছিল না এবং তিনি অবসর পেলেন না। কিন্তু তাঁর অবসরের এই কাজটুকু তাঁর ভক্তের দল দিয়ে হয়ত সিদ্ধ হতে পারত, কিন্তু তাঁর অনেক ভক্ত থাকলেও সেই পরিশ্রমী গুছিয়ে তোলা ভক্তদের আজও আমরা দেখা পাইনি। কারণ সে ভক্ত হওয়া নিছক আবেগের ব্যাপার না, তাঁকে হতে হবে দায়িত্বশীল এবং ধৈর্যশীল।

নজরুল বহু গান লিখেছেন। প্রথম কাজ হবে সেই দায়িত্বশীল ব্যক্তির সেই অসংখ্য গানের মধ্য থেকে উত্তমগুলোকে বাছা। সেই উত্তম গানগুলোর সুর সংগ্রহ করা. যে সুর নজরুল ইসলাম দিয়েছিলেন অবিকৃতভাবে নিখুঁতভাবে তাকে চয়ন করা, সুন্দর কণ্ঠ খুঁজে সেই কণ্ঠে সেই গান পরিবেশন করা। নজরুলের সুর দেওয়া গানে

সুনিশ্চিতভাবে একটা নজরুলী ঢং আছে। তীক্ষ্ণ বোধসম্পন্ন, নিখুঁত শ্রবণশক্তি সম্পন্ন সংগীতজ্ঞ একদল গুণী মানুষ যদি শান্তিনিকেতনের মত গানের বিদ্যালয় খুলে শুধু কেবল নজরুলের গানের প্রচারের চেষ্টা করেন তাহলে আমার একান্ত বিশ্বাস কীর্তন, ভাটিয়ালী, ভাওয়াইয়া, রামপ্রসাদী, রবীন্দ্র-সংগীতের মত নজরুল-গীতি বেশ স্বতন্ত্র একটা গর্বের শির তুলে দাঁড়াতে পারবে। কিন্তু সেই প্রাথমিক নিষ্ঠায় আত্মাহুতি দেবে কে ?

গানের সাম্রাজ্যে নজরুল

নজরুল ইসলামকে পূর্ণভাবে জানতে হলে তাঁর গানের সাম্রাজ্যে প্রবেশ করতে হবে। কেননা, তাঁর জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার বিকাশ ঐসব সংগীতের ভিতর দিয়ে নিঃসৃত হয়েছে। জীবনে তিনি কম গরল পান করেননি, তাঁর ভক্ষিত সেই গরলের জ্বালা থেকে যে বিষাদ গীতির সৃষ্টি হয়েছে, তার মাধুর্যে মুগ্ধ হবে না, এমন শ্রোতা অথবা এমন পাঠক বিরল। আর তাঁর গান শুধু গানই নয়, সেগুলো বর্ণোচ্ছল কবিতাও। সে কবিতার আকৃতি ক্ষুদ্র, কিন্তু তার আত্মায় আছে সামুদ্রিক আবেগ।

কবিতায় সুর দিয়ে নজরুল ইসলাম একই সংগে দুটি শিল্পের মিশ্রণ ঘটিয়েছিলেন। গানটিকে যদি কবিতা হিসেবে পড়ি, তাহলে তাতে যেমন কবিতার স্বাদ পাব, তেমনি ঐ কবিতার গান হিসেবে শুনলেও তার রসানুভূতি থেকে আদৌ বঞ্চিত হব না।

বলা বাহুল্য, বাঙলা-সাহিত্যে ঐ দুই যুগ্ম মহৎ শিল্পের সংমিশ্রণ ঘটিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ এবং নজরুল। অবশ্য আরও দু'একজন ক্ষুদ্রতর কবির (যেমন দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত এবং অতুলপ্রসাদ) মধ্যে যে ঐ গুণ অদৃষ্ট, তা নয়, কিন্তু এতটা বিশাল বিস্তার তাঁদের মধ্যে ছিল না; অতটা উর্ধ্বে উড্ডয়ন তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয়নি, এবং সাফল্য ও সার্থকতাও তাই তাঁদের সামান্য।

রবীন্দ্র এবং নজরুল গানের রাজ্যে পিতৃপুরুষহীন নন। বাঙলা দেশে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, রামপ্রসাদ সুবিখ্যাত কবি-গীতিকার ছিলেন। তাঁদের সংগীত-ধারাটি রবীন্দ্রনাথ এবং নজরুলে এসে আরো বেশী প্রসারতা, গভীরতা এবং স্বাস্থ্য লাভ করেছে।

নজরুল ইসলামের আর একটি অতিরিক্ত সুবিধা ছিল।' পারসী কবিদের গজল-রুবাইয়ের রূপৈশ্বর্য, বর্ণলালিমা তাঁর গীতি-কবিতার কিংবা গানের দ্যুতিকে করেছে মোহনকান্তি রূপসী। বস্তুত, নজরুলের গানের রাজ্যে ঢুকলে মনে হয়, আমরা যেন কোন বিচিত্রবর্ণ ফুলের বাগানে পা দিয়েছি, মানুষের জীবনের সুখ-দুঃখ, মিলন-বিরহ, আনন্দ-বিষাদ বহুরূপী পুষ্প হয়ে ফুটে আছে সেখানে। আর ঐসব ফুল এক অন্তহীন সৌরভে ভরিয়ে তুলছে প্রাণমন। সবকিছু দেখে মনে হয়, এক রঙিন কল্পনার জগৎ আমাদের চোখে দোলায়িত হচ্ছে রামধনু-বিম্বিত নদীর মত।

প্রতিটি বাক্যেই প্রায় ছবি এঁকে যাওয়া তাঁর স্বভাব। এই জন্যে দেখা যায়, শ্যামা-সংগীত এবং ইসলামী-সংগীত রচনাতেও তিনি রামপ্রসাদ অথবা কোন মুসলিম বাউল কবিদের গোত্রের নন—তিনি হাফিজ উমরের উত্তরসূরী।

শিল্প হিসেবে রামপ্রসাদী গানের চেয়ে নজরুলের শ্যামা-গীতি উৎকৃষ্টতর। অন্তত, উপমা-চিত্রকল্পে যে বিরাট কল্পনার জগৎ নজরুল ইসলাম সৃষ্টি করেছেন, তা বোধ করি রামপ্রসাদের স্বপ্নেও ছিল না। 'মন তুমি কৃষিকাজ বোঝ না। এমন মানব জনম রইল পড়ে, আবাদ করলে ফলত সোনা।' এই রামপ্রসাদীতে একটি মহৎ জীবনের ভাবনা আলিঙ্গনাবিষ্ট। আঁধারসুন্দর কবিতাও আছে এতে। কিন্তু এর মধ্যে শিল্পীর আঁকা মহৎ চিত্র নেই। আর ছবি থাকলেও তাতে সে রং নেই, যা আঁখিকে আমন্ত্রণ জানায়, যা দৃষ্টিতে দুর্নিবার লোভের জন্ম দেয়। উপকরণটি নজরুলে আছে। যখন আমরা পড়ি অথবা শুনি:

আমার কালো মেয়ের পায়ের তলায়
দেখে যাবে আলোর নাচন।
মায়ের রূপ দেখে দেয় বুক পেতে শিব
তার হাতেই মরণ বাঁচন॥
কালো মায়ের আঁধার কোলে
শিশু রবি শশী দোলে,
মায়ের একটুখানি রূপের ঝলক
ঐ স্নিগ্ধ বিরাট নীল গগন॥

তখন আমাদের চোখে অর্থের চেয়ে রঙটাই উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে বেশী করে। তখন আমরা রঙের তুলিতে আঁকা কোনো শিল্পীর ছবি দেখতে থাকি।

শ্যামা-সংগীতে যেমন, তেমনি ইসলামী সংগীতেও ঐ-রঙ দিয়ে কবি ছবি এঁকেছেন :

তোরা দেখে যা আমিনা
মায়ের কোলে
যেন উষার কোলে
রাঙা রবি দোলে ॥

উদ্ধৃত গান দু'টিতে আমরা দু'টি মায়ের চিত্র অবলোকন করি। ঐ ছবির সঙ্গে প্রাকৃতিক দৃশ্যটিও এমনিভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে যে, আসল ব্যক্তি দু'জনের সঙ্গে সঙ্গে উষাকালের সূর্য ওঠার দিকে আমাদের মনোযোগ আকর্ষিত হয়। বস্তুত, দুটি ছবির কোনটিই পেন্সিলে আঁকা ছবি নয়। অরুণরাগ-রঞ্জিত উষার মত মা, রাঙা রবির মত সন্তান এবং যার রূপের ঝলকে গগন স্নিগ্ধ নীল, সেই কালো মা এবং তার শিশু রবি ও শশী সবাই পৃথক রঙের প্রতিভূ। যেন কবি বলতে চান, আমার ভাবনার জগৎ দেখ না, আমার কল্পনাব জগৎ দেখ, আমার স্বপ্নের জগৎ দেখ, আমার সুন্দরের জগৎ দেখ। কেননা, আসলে কবির জগৎটাই কল্পনার, স্বপ্নের, সুন্দরের।

'নজরুল-রচনাবলী'র তৃতীয় খণ্ডে * নজরুলের সংগীত-গ্রন্থগুলিতে কবির সেই বিশাল কল্প-জগতের রূপ সমুদ্ভাসিত। কবির সাতখানা গানের বই এই ৭৩০ পৃষ্ঠার গ্রন্থের সংকলিত হয়েছে। এর মধ্যে আছে : নজরুল-গীতিকা, বনগীতি, জুলফিকার, সুর-সাকী, গুল-বাগিচা, গীতি-শতদল, গানের মালা। সবকটি গানের বই-ই কবি সুস্থ থাকাকালীন ছাপা হয়েছিল। এ-খণ্ডের ভূমিকায় সম্পাদক আবদুল কাদির লিখেছেন :

* নজরুল-রচনাবলী—৩য় খণ্ড ॥ সম্পাদক : আবদুল কাদির ॥ প্রকাশক : বাঙলা-উন্নয়ন বোর্ড।

নজরুল তাঁর সাহিত্য-জীবনের তৃতীয় যুগে প্রধানত গীতিকার সুর-স্রষ্টা রূপেই প্রথিত-কীর্তি ও প্রতিষ্ঠাপন্ন। রোমান্টিক কবি-কৃতির সকল লক্ষণ তাঁর এ যুগের সাহিত্য সৃষ্টিতে সুস্পষ্ট। ঝঞ্ঝাহত অরণ্যের আন্দোলন ও উন্মত্ত সমুদ্রের ঊর্মিলতা নজরুলের কাব্যে যেমন বাঙ্ময়, মিলনের উদ্দাম আনন্দ ও বিরহের ব্যাকুল বেদনা তাঁর প্রেমের গানে তেমনই ব্যঞ্জনাময়। তাই অনবদ্য সৃষ্টির দিক দিয়ে নজরুলের শিল্পীজীবনের দ্বিতীয় যুগকে যদি বলা হয় তাঁর কাব্যসাধনার শ্রেষ্ঠ যুগ, তাহলে এই তৃতীয় যুগকে নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে তাঁর সংগীত-সাধনার শ্রেষ্ঠ যুগ।

'নজরুল-রচনাবলী'র এই তৃতীয় খণ্ডে কবির সাহিত্য-জীবনের তৃতীয় যুগের সৃষ্টিগুলোকে সংকলিত করা হয়েছে। অবশ্য 'নজরুল-গীতিকা'তে তাঁর প্রথম ও দ্বিতীয় যুগের অনেকলো গানও আছে। আমার মনে হয়, এ-খণ্ডে তাদের পুনঃপ্রকাশের কারণ 'নজরুল-গীতিকা' গ্রন্থটির সংকলন।

সম্পাদকের একটি কথা সামান্য বিশ্লেষিত হলে মনে হয় ভাল হত। 'কাব্য-সাধনার' যুগ এবং 'সংগীত-সাধনার' যুগ বলতে তিনি ঠিক কি বোঝাতে চেয়েছেন, সেটা আর একটু স্পষ্ট হওয়ার দরকার ছিল। কেননা, তাঁর উল্লিখিত বক্তব্যে যে কবি-কৃতির কথা তিনি উল্লেখ করেছেন, সে কবির রচিত ঐ সংগীতগুলো কাব্য কিনা এবং ঐ 'চিত্র কল্প' কবিতার বিষয় কিনা এবং তা কবিতার বিষয় হলে 'কাব্য-সাধনা' আর 'সংগীত-সাধনা' দুটো পৃথক ব্যাপার কিনা, তা বিস্তৃত করে বলার অপেক্ষা রাখে। এ-প্রশ্ন আমার মনে জাগার কারণ, নজরুলের গান-গুলিকে আমি শুধু গান বলে মনে করি না, সেগুলোকে এক-একটি কবিতা-মুক্তা বলেই মনে করি। গানের কবি নজরুল ইসলাম, আর 'অগ্নি-বীণা' 'বিষের বাঁশী', 'ছায়ানটে'র কবি নজরুল ইসলাম দুটি পৃথক মানুষ হিসেবে যে আমাদের সাহিত্যে চিহ্নিত হচ্ছেন এবং এক শ্রেণীর সমালোচকও যে বলে চলেছেন যে, কবিতা লিখিয়ে নজরুলের চেয়ে গীতিকার নজরুল বড়—এ কথাটির নিষ্পত্তি হওয়ার প্রয়োজন। সমালোচকরা হয়তো দেখেননি, যে 'অগ্নি-বীণা'র 'প্রলয়োল্লাস' কবিতাটি যেমন কবিতা, তেমনি গান, অপর পক্ষে 'কাণ্ডারী হুঁশিয়ার'-এর মত গানকে আমরা কবিতা হিসেবেও পাঠ করি। এবং 'অগ্নি-বীণা', 'দোলন চাঁপা',

'ছায়ানট', 'পূবের হাওয়া', সর্বহারা', 'ফণিমনসা', 'জিঞ্জির', 'সিন্ধু-হিন্দোল', 'সন্ধ্যা', 'প্রলয়-শিখা' ইত্যাদি কাব্যগ্রন্থের কবিতাকে সংগীত হিসেবে 'নজরুল-গীতিকা'য় উৎকলন করা হয়েছে। রচনাবলীর এই তৃতীয় খণ্ডের 'গ্রন্থ-পরিচয়'-এ পাঠক তাঁর নিদর্শন পাবেন। বলা বাহুল্য, নজরুলের 'বিষের বাঁশী'র অনেকগুলো কবিতাকেও গান করে গীত হতে শোনা যায়, কিংবা গানগুলো কবিতা হিসেবে পাঠ করা হয়। অতএব গানের কবি নজরুল ইসলাম এবং কাব্যস্রষ্টা নজরুল ইসলাম দুই ব্যক্তি নন, ঐ দুই শিল্পের স্রষ্টা একই কবি-পুরুষ এবং তাঁর মাহাত্ম্যও কেবল সংগীত-স্রষ্টা হিসেবে নয়, কবি হিসেবেও। তাঁব সামগ্রিক পরিচয় মিলবে তাঁর কাব্যগ্রন্থ এবং সংগীত গ্রন্থের সম্মিলিত প্রকাশে এবং তাঁর কাব্য আলোচনাও সম্পূর্ণ হবে তাঁর কাব্যগ্রন্থ এব সংগীত গ্রন্থের সম্পূর্ণ পাঠে।

বলা বাহুল্য, তাঁর গানের কাব্যের মত তাঁর গানের সুরের দিকটাও স্বতন্ত্র গভীর আলোচনার বিষয়। তাঁর কাব্য-সাধনার যেমন একটি বিরাট দিক আছে, তেমনি তাঁর সুর সাধনার দিকটাও অসাধারণ। প্রকৃতপক্ষে তাঁর এবং রবীন্দ্রনাথের গান, কাব্য ও সুরের সহযোগিতায় শাশ্বতীকে জয় করেছে। তাঁর গানের ঐ সুরের দিকটা আমাদের মত সংগীত বিষয়ে অনভিজ্ঞ শ্রোতার পক্ষে আলোচনা সহজসাধ্য নয়, তবু তাঁর গান নিয়ে আমার জ্ঞানে যেটুকু বুঝেছি, তাতে ঈষৎ আলোচনা অযৌক্তিক হবে না।

নজরুল একদা বলেছিলেন যে, কবিতায় তিনি কতটুকু দিতে পেরেছেন, তা তিনি জানেন না, কিন্তু সংগীতে কিছু তিনি দিতে পেরেছেন।* তাঁর এই মন্তব্য গানের কাব্য এবং সুর এই দুই বিষয় সম্পর্কেই। তবু সুরের ক্ষেত্রে তাঁর গানের ইঙ্গিতও আছে ঐ দৃঢ় ভাষণের মধ্যে।

* "কাব্যে ও সাহিত্যে আমি কি দিয়েছি জানি না। আমার আবেগে যা এসেছিল, তাই আমি সহজভাবে বলেছি। আমি যা অনুভব করেছি, তাই আমি বলেছি। ওতে আমার কৃত্রিমতা ছিল না। কিন্তু সঙ্গীতে যা দিয়েছি, সে-সম্বন্ধে আজও কোন আলোচনা না হলেও ভবিষ্যতে যখন আলোচনা হবে, ইতিহাস লেখা হবে, তখন আমার কথা সবাই স্মরণ করবেন, এ বিশ্বাস আমার আছে। সাহিত্যে দান আমার কতটুকু তা আমার জানা নেই; তবে এইটুকু মনে আছে সঙ্গীতে আমি কিছু দিতে পেরেছি।"—(জন-সাহিত্য)

বাঙলা গানের সুরের কোন্ কোন্ দিকের উৎকর্ষ সাধনে নজরুল সক্ষম হয়েছিলেন ? নজরুলের 'শিউলি মালা' গল্পের একস্থানে আছে :

'প্রফেসর চৌধুরী খুশি হয়ে বলে উঠলেন, 'আহা হা হা ! বল্‌তে হয় আগে থেকে। তাহলে যে গানটাই আগে শুনতাম তোমার। আর গান হিন্দী ভাষায় না হলে জমেই না ছাই। ও ভাষাটাই যেন গানের ভাষা। দেখ, ক্লাসিক্যাল মিউজিকের ভাষা বাংলা হতেই পারে না। কীর্তন, বাউল আর রামপ্রসাদী ছাড়া এ-ভাষায় অন্য ঢং-এর গান চলে না।' আমি বললাম, 'আমি যদিও বাংলা গান জানিনে, তবু বাংলা ভাষা সম্বন্ধে এতটা নিরাশাও পোষণ করি না'।

উপরের ঐ কথাগুলোর মধ্যে বাংলা গানে নজরুলের সুর-সাধনার বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কিন্তু এ-সম্পর্কে আলোচনার আগে, ১৯২৯ সালে বাঙালী জাতির পক্ষ থেকে নজরুলকে যে অভিনন্দন-পত্র দেওয়া হয়, তার একটি উক্তি এখানে উদ্ধৃত করা অসংগত হবে না। সুলিখিত অভিনন্দন পত্রটির একস্থানে ছিল :

'তুমি বাংলার মধুবনের শ্যামা-কোয়েলার কণ্ঠে ইরানের গুলবাগিচার বুলবুলের বুলি দিয়াছ, রসালের কণ্ঠে সহকার সাথে আঙ্গুর-লতিকার বাহুবন্ধন রচনা করিয়াছ। তুমি বাঙালীর শ্যামশান্ত কণ্ঠে ইরানী-সাকীর লাল-শিরাজীর আবেশ-বিহ্বলতা দান করিয়াছ।'

ক্লাসিক হিন্দী-উর্দু গানের এবং পারসী গজলের আঙ্গিক ও সুর বাংলা ভাষায় সার্থকভাবে ফুটিয়ে তোলেন নজরুল। বলা বাহুল্য, মধ্য-এশিয়ার ত' বটই, এমনকি, দু' একটি গানে তিনি তুরস্কের সুর পর্যন্ত আমদানী করেছিলেন। 'ক্লাসিক্যাল মিউজিকের ভাষা বাংলা হতেই পারে না'—এই মনোভাবের বিরোধিতা করে নজরুল যে ক্লাসিক্যাল রাগভিত্তিক গানের সৃষ্টি করেন, সেটা যেমন তাঁর নিজের, তেমনি 'বাঙলার মধুবনের শ্যামা-কোয়েলার কণ্ঠে ইরানের গুল-বাগিচার বুল-বুলের বুলি'ও তাঁরই একার। এই দুটি বিষয় যাঁরা জানেন, তাঁদের পক্ষে নজরুলের গান নিমেষে চিনে নেওয়া বুঝি কঠিন নয়। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে রবীন্দ্র-সংগীতের বৈশিষ্ট্য যেমন সহজ শ্রুতিগ্রাহ্য, নজরুল-গীতিও তেমনি। প্রেমের গানে যেমন, তেমনি ইসলামী গানে

এবং সংগীতেও খেয়াল, ঠুংরী, টপ্পা, কাওয়ালীর আরোপ দেখেই বোঝা যায় যে, কর্মটি নজরুলের দ্বারাই সম্পন্ন হয়েছে। 'এ কোন্ মধুর শারাব পিয়ে' ও 'আর লুকাবি কোথায় মা কালী' এ-দুটি গানের কথার বৈশিষ্ট্যটাই শুধু গুরুত্বপূর্ণ নয়, এর সুরের কারুকার্যও অনুপম। ইচ্ছা-কৃতভাবে ঐসব গানের সুরকে নির্দিষ্ট কাঠামোয় ধরে খুশিমত গাইবার স্বাধীনতা গায়ককে দেওয়া হ'যেছে, যা সাধারণত খেয়াল গানের প্রতিভাশালী গায়কেরা পান।

বলা বাহুল্য, এমনকি ঐ অসামান্য প্রতিভা ক্লাসিক ঢঙে গাইবার জন্য অভিনব কৌশলে হাসির গান সৃষ্টি করেছেন। 'সুর-সাকী'র ৯৭ নং হাসির গানটি 'বামছাগী গায় চতুরঙ্গ বেড়ার ধারে' দেখলেই বোঝা যাবে যে, সুরের সঙ্গে কথার ও শব্দের কি নিবিড় সৌহার্দ্যে এই রসের নির্ঝরের সৃষ্টি। বলা বাহুল্য, এর কথা দেখে শুধু এর পূর্ণ স্বাদ পাওয়া সম্ভব নয়, এর পূর্ণ স্বাদ মিলবে ঐ গানটি শ্রবণে। মনে হয়, গান ও কবিতার পার্থক্য এইখানে।

'নজরুল-গীতিকা'য় আমরা বিভিন্ন ধরনের গানের সাক্ষাৎ পাই। সূচীপত্রে নজরুল-গীতিকার গানগুলিকে এই ক'টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে :

১. জাতীয় সংগীত, ২. ঠুংরী, ৩. হাসির গান, ৪. গজল, ৫. ধ্রুপদ, ৬. কীর্তন, ৭. বাউল-ভাটিয়ালী, ৮. টপ্পা, ৯. খেয়াল।

মোটের উপর, গানের প্রতিটি বিভাগের বহু বিখণ্ড শাখ-প্রশাখায় বিচিত্রভাবে নিজেকে তিনি প্রকাশ করতে করতে এগিয়ে চলেছিলেন। উপরের ঐ বিভাগগুলোর মধ্যে আলাদাভাবে কোনো ইসলামী গান অথবা শ্যামা-সংগীতের উল্লেখ নেই। এবং জুল্‌ফিকারের ইসলামী গানের সুরগুলো যেমন মার্চ, খাম্বাজ, ভৈরবী, জয়জয়ন্তী, সিন্ধু, বাগেশ্রী, আশাবরী ইত্যাদি সুরে বিভক্ত তেমনি 'গানের মালা'র 'কে পরালো মুণ্ডুমালা', 'নাচেরে মোর কালো মেয়ে', 'মাতল গগন অঙ্গনে ঐ' ইত্যাদি শ্যামা-গীতিগুলোও যথাক্রমে 'ভূপালী', 'নটনারায়ণ', 'দরবারী', 'কানাড়া' প্রভৃতি সুরের নামাঙ্কিত। বস্তুত, গান বলতে তাঁর ঐ সুরকে বোঝায়, তাঁর কথাকে নয়।) শ্যামা-সংগীত কোন সুর নয়, ইসলামী গানও কোন

সুর নয়, শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনও কোনও সুর নয়। রামপ্রসাদ শ্যামাসংগীত লিখলেও তার বিশিষ্ট সুরের জন্য তাঁকে শ্যামা-গীতি না বলে রাম-প্রসাদী বলা হয়। বিভিন্ন রাগরাগিনীর সঙ্গে কালী-কীর্তনের সুর মিশে রামপ্রসাদ নিজের মত করে একটা সুরের জন্ম দিয়েছিলেন এবং ব্রহ্ম-সংগীত লিখলেও রবীন্দ্রনাথ ভারতীয়, ইউরোপীয় এবং বিশেষ করে কীর্তন, ধ্রুপদ ও বাউল গানের সুরের সমন্বয়ে রবীন্দ্র-সংগীত সৃষ্টি করলেন। এবং একইভাবে ইসলামী, কালী এবং প্রেমের গান লিখলেও অমনি বিভিন্ন সুরেব মিশ্রণ ঘটিযে—কিন্তু এবার শুধু বাউল কীর্তনকে বিশিষ্ট করে নয়—গজল, কাওয়ালী, ঠুংরী, টপ্পা, খেয়ালকে বিশিষ্ট করে নজরুল সৃষ্টি করলেন নজরুল-গীতি। দেশজ প্রকৃতি যেমন রবীন্দ্রনাথেব সুরেব বৈশিষ্ট্য, নজরুলেরও তাই এবং বাংলার মাটির গন্ধ যাতে তাঁব গান থেকে উবে না যায়, সেই জন্যে তিনি ভাটিয়ালী, বাউল-কীর্তনকেও তাঁর সুবেব বৃত্তে বন্দী করেছেন। / বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথের গানের সবগুলোব সুব যেমন তাঁব একাব দেওয়া নয়, নজরুলের অনেক গানেব সুরও তেমনি তাঁর সম্পূর্ণ একার নয়। অবশ্য যাঁরা তাঁর গানে সুব দিয়েছেন, তাঁবা নজরুলেব গানেব বিশেষ ঢঙেব কাঠামোতে ফেলেই সুর দিয়েছেন তাঁব সম্মতি নিয়েই। /

নজরুল বহু বিচিত্র ঢঙেব গান লিখেছেন। কবিতার আঙ্গিকের দিক থেকে যেমন, তেমনি সুরের দিক থেকেও তাতে একঘেঁয়েমির প্রপীড়ন নেই। একজনের যে গানটি ভালো লাগছে না, অন্যজনকে সেই গানটি আনন্দ যোগাবে; একজনের যে সুরটি অপছন্দ হবে, আর একজনকে হয়তো সেই সুরটিই করবে স্পন্দিত। যিনি তাঁর কোনো গানের সুর পছন্দ করবেন না, তিনি তাঁর ঐ গানের কাব্য-সৌন্দর্যে মুগ্ধ হবেন; যে গানে কাব্য নেই বলে আপত্তি করছেন, হয়তো তার সুর শুনে কান পেতে থাকবেন। কাব্য ও সুব দুটোর হরগৌরী মিলন সব গানে না হলেও বেশী গানে হয়েছে। বিশাল তাঁর সংগীত মঞ্চে তিনি একাধারে বহু সুরশিল্পী, সুরকারের প্রতিভূ হয়ে বিরাজ করছেন—একবার তার ভিতরে না গেলে যা অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়।

বলা বাহুল্য, নজরুলের গানগুলোকে গান বলার আর এক কারণ, এর musical setting, সেইজন্যে সেটা কবিতা না হয়ে গান ; কিন্তু কাব্য-সৌন্দর্যে তা সুবঞ্জিত এবং কবিতার সমস্ত শর্ত তাতে সুরক্ষিত বলে তারা কবিতাও।

'নজরুল-বচনাবলী'ব এই ৩য় খণ্ডে নজরুলের দুটি অনুবাদ গ্রন্থও সংযোজিত হয়েছে। একটি 'কাব্য আমপারা', অপরটি 'রুবাইয়াত-ই-হাফিজ'। নজরুল ইসলাম পণ্ডিতদের মত আরবী-ফারসী ভাষা জানতেন কিনা, জানি না। কিন্তু রুবাইগুলো যে তিনি মূল পারসী থেকে অনুবাদ করেছিলেন. সে বিষযে সন্দেহ নেই। তিনি রুবাইয়াত-ই-হাফিজের ভূমিকায় লিখেছেন : 'আমি অরিজিন্যাল (মূল) ফার্সী হতেই এর অনুবাদ কবেছি।'

কিন্তু শুধু ভাষাবিদ হলেই যে তিনি অনুবাদ করতে পারবেন, এমন কোন কথা নেই। কবিতার অনুবাদ সত্যিকার কবিই সার্থকভাবে করতে পারেন। তার কারণ, তাঁর ঐশ্বর্য, তাঁর কল্পনা-শক্তি। হাফিজের অনুবাদের বেলায নজরুল তাঁর কল্পনা-শক্তির ব্যবহার যে দক্ষতার সঙ্গে করতে পেবেছিলেন. তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত স্বচ্ছ অনুবাদই তার প্রমাণ। একটি রুবাই এখানে উদ্ধৃত করে দেখান যায় যে, ক্ষুদ্রাকৃতির কবিতার কঠিন আঙ্গিক কত বিনীতভাবে তাঁর হাতে ধরা দিয়েছে :

কুঁড়িরা আজ কার্বা-বাহী
বসন্তের এই ফুল-জলসায়।
নার্গিসরা দল নিয়ে তার
পাত্র রচে ফুলের আশায।
ধন্য গো সে হৃদয় যে আজ
বিম্ব হ'য়ে মদের ফেনায়
উপ্‌চে পড়ে শারাবখানার
তোরণ দ্বারে পথের ধূলায়॥

রুবাই অর্থ চার লাইনের ক্ষুদ্র গীতি-কবিতা, যার প্রথম লাইনের শেষ শব্দটির সঙ্গে দ্বিতীয় এবং চতুর্থ লাইনের শেষ শব্দটির মিল থাকবে, তৃতীয় লাইনের শেষ শব্দটির সঙ্গে মিল থাকবে না। নজরুল

ইসলাম তাঁর অনুবাদে ঠিক সেই পদ্ধতির অনুসরণ করেননি। এখানে কবিতাটি আট লাইনে লেখা, আসলে চার লাইনের কবিতা ভেঙে তাকে তিনি ঐভাবে নির্মাণ করেছেন। কিন্তু রুবাইয়ের মিল এখানে রক্ষিত হয়নি। উল্লিখিত রুবাইটিকে আমরা চার লাইনে দাঁড় করালেই বুঝতে পারব :

কুঁড়িরা আজ। কার্বা-বাহী। বসন্তের এই। ফুল্-জলসায়। ১
নার্গিসেরা। দল নিয়ে তার। পাত্র রচে। সুরার আশায়। ২
ধন্য গো সে। হৃদয়, যে আজ। বিম্ব হয়ে। মদের ফেনায়। ৩
উপ্‌চে পড়ে। শারাবখানার। তোরণ-দ্বারের। পথের ধূলায়। ৪

প্রকৃতপক্ষে চারমাত্রার স্বরবৃত্তের চটুল ছন্দে প্রতিটি পংক্তিকে চারটি পর্বে ভাগ করেই অনুবাদ সম্পন্ন করা হয়েছে। তৃতীয় পংক্তির শেষ শব্দটি এখানে অমিল নয় কিন্তু অষ্টম পংক্তির শেষ কবিতা অনুযায়ী সপ্তম পংক্তিতে ঐ অমিলের আভাষ বেখে ঐ ধাক্কা খাওয়া দোলের ছন্দটা রক্ষা করা হয়েছে। বস্তুত, নজরুল হাফিজের রুবাই সম্বন্ধে ভূমিকায় যে মন্তব্য করেছেন :

এ যেন তাঁর অতল সমুদ্রের বুদ্বুদ-কণা। তবে এ ক্ষুদ্র বিম্ব হলেও এতে সারা আকাশের গ্রহ-তারার প্রতিবিম্ব পড়ে একে রামধনুর কণার মত রাঙিয়ে তুলেছে।

সে রামধনু নজরুলের অনুবাদেও অবিকল রূপ নিয়ে প্রতিবিম্বিত। মিলের চমৎকারিত্ব, যেটা নজরুলের বিশেষত্ব—এখানে তা অদৃষ্ট নয়। ৫৫ নং রুবাইটির-'রাত' 'পাত'-এর সংগে শেষ পংক্তির 'আব-ই-হায়াত'-এর মিল নজরুলের সেই "কাণ্ডারী এ তরীর পাকা মাঝি মাল্লা"র সংগে 'লা-শরিফ আল্লার' অনায়াস মিলের কথা মনে করিয়ে দেয়।

অবশ্য হাফেজ অনুবাদে নজরুল ইসলাম কৃতিত্ব দেখালেও কোরান অনবাদে তিনি সেই সফলতা অর্জন করতে পারেননি। কোরানের অনুবাদগুলো পড়লে সন্দেহ হয় যে, সত্যিই সেগুলো নজরুলের হাত দিয়ে হয়েছে কি না। ছন্দকে যিনি পুতুলের মত নাচিয়েছেন, সুবাধ্য ঘোড়ার মত যিনি তার ইচ্ছামতো পথে চালিয়েছেন, এখানে সেই অলৌকিক ক্ষমতার স্বাক্ষর রাখতে ব্যর্থ কেন হলেন তিনি? তার

কারণ, কোরান নিজেই সুরাশ্রিত গদ্যকাব্য, বিভিন্ন ধরনের ছন্দ-কলায় এবং শৃঙ্খলিত মাত্রাবিন্যাসে সে এক ভীষণ আবেগকে কন্ঠালিঙ্গনে জড়িয়ে রেখেছে। যে-কোনো রকম অনুবাদে আরবী ভাষার ঐ মাধুর্য (কারীরা যাকে বহু প্রকাব কৌশলে আবৃত্তি করেন) সৃষ্টি অসম্ভব। তাছাড়া সামাজিক কারণে এবং ধর্মের প্রতি আনুগত্যবশত তিনি এই অনুবাদে তাঁর কবি-কল্পনার স্বাধীনতাকেও প্রশ্রয় দিতে ছিলেন অপারগ। ভূমিকায় তিনি বলেছেনও :

> খুব বেশী কৃতার্থ যে হয়েছি, তা বলতে পারিনে—কেননা, কোর-আন পাকের একটি শব্দও এধার-ওধার না করে তার ভাব অক্ষুণ্ন বেখে কবিতায় সঠিক অনুবাদ করার মত দুরূহ কাজ আর দ্বিতীয় আছে কিনা, জানিনে।

অবশ্য 'নজরুল-রচনাবলী'র সম্পাদক আবদুল কাদির বলেছেন :

> মূল পাণ্ডুলিপিখানা দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল, তা ছন্দের বিচাবে ছিল সম্পূর্ণ নিখুঁত।

ঐ নিখুঁত ছন্দের দু'একটি নিদর্শন যে এখানেও নেই, তা নয়। কিন্তু শুধু ছন্দের দিক থেকে নিখুঁত হলেও কবিতা সব সময় ভাব-স্পন্দিত হয় না। কিন্তু যে উদ্দেশ্যে নজরুল ইসলাম এই অনুবাদ কর্মে হাত দিয়েছিলেন :

> আমার বিশ্বাস, পবিত্র কোরআন শরীফ যদি সরল বাংলা পদ্যে অনূদিত হয়, তাহ'লেই তা অধিকাংশ মুসলমানই কণ্ঠস্থ করতে পারবেন, অনেক বালক-বালিকা সমস্ত কোরআন হযত মুখস্থ করে ফেলবে।

সেই উদ্দেশ্য যে আংশিকভাবে সার্থক হতে পারে, তাতে সন্দেহ নেই। তাঁর ঐ অনুবাদটি এখানে দুষ্প্রাপ্য ছিল। বাঙলা উন্নয়ন বোর্ডের তৎপরতায় এবার পাঠক তার স্বাদ থেকে বঞ্চিত হবেন না।

আলোচ্য খণ্ডেও নজরুলের কতকগুলি গদ্য লেখা আছে—তাঁর ছোট গল্প গ্রন্থ "শিউলিমালা", তাঁর নাটক "আলেয়া", চারটি ক্ষুদ্র নিবন্ধ, 'সত্যবাণী', 'ব্যর্থতার ব্যথা', 'ধূমকেতুর আদি উদয় স্মৃতি', 'ধর্ম ও কর্ম'। আর আছে তাঁর গুরু ও ভক্তদের গ্রন্থের উপর লেখা তার কিছু প্রশংসামূলক এবং উৎসাহমূলক ক্ষুদ্র ভূমিকা।

বলা বাহুল্য, নজরুল ইসলামের পরিচয় শুধু কবি হিসেবে নয়, ব্যক্তি এবং ব্যক্তিত্ব হিসেবেও তিনি বিংশ শতাব্দীর অবিস্মরণীয় পৌরুষ। এবং তাঁর দান শুধু সাহিত্য-শিল্পে এবং সংগীত-কলায় নয়, তা রাজনীতিতেও সম্প্রসারিত। কিন্তু সেই জন্যেই প্রচারসর্বস্ব হয়ে যায়নি তাঁর সাহিত্য ; এবং 'আমার কৈফিয়ৎ' -এ তিনি তেত্রিশ কোটি' মানুষের মুখের গ্রাস কেড়ে-খাওয়া দানবের 'সর্বনাশ' সাধনের জন্যে 'রক্তলেখা'র আশ্রয় নিয়েছিলেন ব'লে জবাবদিহি করলেও তাঁর প্রচার-ধর্মী সাহিত্য তাঁর মূল সাহিত্যকর্মের তুলনায় ক্ষুদ্রতর।

বলেছি, 'নজরুল ইসলামের পরিচয় শুধু কবি হিসেবে নয়।' এবং উল্লিখিত গদ্য রচনা, নিবন্ধ, গল্প, নাটক রসিকজনের চিত্তাকর্ষণে সমর্থ। যদিও এই বিভাগটিতে তাঁর সাফল্য তাঁর কাব্যসৃষ্টি ও সুরসৃষ্টির তুলনায় মলিনকান্ত, তবুও সন্দেহ নেই, বাংলা গদ্যের রাজ-সভায় তিনি উন্নতমস্তক রাজন্যবর্গের একজন।

এ-আলোচনার এখানে সমাপ্তি টেনে 'নজরুল-রচনাবলী'র সম্পাদনা সম্পর্কে দু'একটি কথা বলতেই চাই। বর্তমান খণ্ডের 'সংযোজন" অংশে নজরুলের ৪৩টি গান ছাপা হয়েছে, যেগুলো আগে কোন বইতে ছাপা হয়নি, এর কথাগুলো বিকৃত না হয়ে এখানে মুদ্রিত হয়েছে কিনা জানি না। ১৬ নং গানটির (ঘুমিয়ে গেছে শ্রান্ত হ'য়ে আমার গানের বুলবুলি) শেষ পংক্তিটিতে 'আর' শব্দটি কবির লিখিত গানে প্রথম ছাপা হয়েছিল বলে মনে হয়। এটা মুদ্রণপ্রমাদ নয় বলেই মনে করি। 'আর' শব্দটি বাদ দিয়ে সুরের জন্য গানটি এইভাবে রেকর্ড হয়েছে : 'আলেয়ার এ-আলোতে আসবে না কেউ কূল ভুলি', 'আলেয়ার এ-আলোতে আর আসবে না কেউ কূল ভুলি' নয়। 'গ্রন্থ-পরিচয়' থেকে অনুমান করা যাচ্ছে, সম্পাদক ১৩৪৪ সালে প্রকাশিত 'বুলবুল' পত্রিকার মাঘ সংখ্যা থেকে গানটি নিয়েছেন। গানটি সেখানে ঐ ভাবে সম্ভবত ছাপা হয়েছে॥ রেকর্ডিংয়ের সময় কবি গানের শব্দ অনেক সময় বদল করতেন। ভূমিকায় সম্পাদক বলেছেনও :

> ভাবের প্রেরণায় নজরুল যে-সকল গান প্রথমে যেরূপ লিপিবদ্ধ করেন, সেরূপেই সাময়িকপত্রে প্রকাশিত হয় : কিন্তু পরে সেগুলি

রেকর্ড করার সময় সুরের প্ররোচনায় যেভাবে পরিবর্তন করেন, সেভাবেই গ্রন্থবদ্ধ কবা হয়েছে।

ঈষৎ বক্তব্য আছে এই মন্তব্য সম্পর্কে। 'সুরের প্ররোচনায়' পরিবর্তিত গান এখানে গ্রন্থিত হ'লে আমি বলব "আর" শব্দটি অতি-রিক্ত সংযোজন এবং 'গানের মালা'র ২৫ নং গানটি ('যবে সন্ধ্যা বেলায় প্রিয তুলসী তলায') সম্ভবত রেকর্ডে গীত হয় 'যবে তুলসী তলায প্রিয সন্ধ্যা বেলায' উচচারণে। এসব নজরুল-গীতি-বিশেষজ্ঞদের বিষয় বলে আমবা এ-আলোচনা এখানেই শেষ করলাম।

সনেট ও নজরুলের গান

নজরুল ইসলাম সনেট লেখেননি কখনো। কেন? তিনি আবেগ-চারী ছিলেন বলে? কোন কোন সমালোচককে লিখতে দেখেছি যে, যেহেতু নজরুল ইসলাম আবেগের স্রোতে ভেসে যেতেন, সুতরাং তাঁর পক্ষে সনেট লেখা সম্ভব ছিল না। সম্ভব ছিল না এই জন্যে যে, সনে-টের আঙ্গিক কঠিন রীতির রজ্জুতে বদ্ধ—যে রীতির কক্ষে বিচরণ নজরুল স্বভাবের কাছে অপরিজ্ঞাত—এই তাঁদের যুক্তি। কিন্তু এই যুক্তি যে ভ্রান্তির ফাঁসিতে লম্বমান, তার প্রমাণ দেখতে চাইলে নজরুলের গীতি-গ্রন্থগুলো দেখবার জন্যে সকল পাঠক সমালোচককে আমন্ত্রণ জানাই। ক্ষুদ্রাকৃতি গীতি-কবিতার কত কঠিন আঙ্গিকের পরীক্ষানিরীক্ষা যে নজরুল ইসলাম করেছিলেন, সেটা তাঁর প্রতিটি গানের গঠন-নৈপুণ্য অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে না দেখলে বোঝার উপায় নেই। একটা সীমিত বৃত্তের মধ্যে অসীম আবেগকে যে কী ভাবে আন্দোলিত করা যায়, তা ঐ গানগুলো না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। প্রশ্ন উঠতে পারে, সনেট আর গান কি এক জিনিস? কিন্তু যিনি প্রশ্ন করবেন, তাঁকে যদি উল্টে জিজ্ঞাসা করা হয়, আপনি কি সংগীত কাকে বলে, তা জানেন? এই সমস্যার সমাধান হতে পারে যদি আমরা সংগীত ও কাব্য সম্বন্ধে অবহিত হই।

একটি কবিতা যখন অক্ষরে-শব্দে বন্দী থাকে, তখন সে কবিতা, সুর ছাড়া তাকে আবৃত্তি করলে তখনও সে কবিতা থাকে—কেননা, কবিতা যে অর্থ জ্ঞাপন করে, অনুচ্চারিত থেকেও সে চোখের কাছে, মনের কাছে তা পৌঁছে দিতে পারে। স্তব্ধ থেকে চিত্রকলা যেমন আনন্দ দেয়, কবিতাও তেমনি নিনাদিত না হয়েও চিত্তে তৃপ্তি সঞ্চার করতে সক্ষম। তবে ধ্বনি ও ছন্দের প্রয়োজন হয় কেন কবিতায়? হয় এই জন্যে যে, ধ্বনিত না হলেও সে ধ্বনির আধার বলে শব্দহীন অবস্থায়

মনের মধ্যে সে ধ্বনি সঞ্চার করে? কিন্তু গানকে ধ্বনিত হতে হয়—নিনাদিত না হলে সে তার রূপ প্রকাশ করতে পারবে না। সে কোনো অর্থময় বাক্য, চিত্রময় বাক্য এবং কল্পনা অথবা ভাব কিংবা ভাবনাময় বাক্যের অপেক্ষা না করে শুধুমাত্র ধ্বনি এবং নাদের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করতে সক্ষম। বলা যেতে পারে, কথা ছাড়াই গান হতে পারে, কিন্তু কথা ছাড়া কবিতা হয় না। এবং এমনিভাবে প্রমাণ করা যেতে পারে, গান কবিতা হতে পারে না, কিন্তু কবিতা গান হতে পারে। গান কবিতা হতে পারে না। কারণ গান অর্থময় ভাষার ফলশ্রুতি নয়, কিন্তু কবিতা গান হতে পারে, কেননা, সে ধ্বনিত এবং নিনাদিত হতে পারঙ্গম, এবং স্বর ও সুরের মাধ্যমে আপনার অবগুণ্ঠন উন্মোচনে সে অলজ্জ। গান যদি বাক্যের প্রত্যাশা না করে, তবে বাক্যকে কবিতার আঙ্গিকে সাজিয়ে গান গাওয়ার রেওয়াজ প্রচলিত হল কেন?

সংগীতকে শ্রেষ্ঠতম শিল্পকলা বলা হয়। চিত্তে আনন্দ সৃষ্টিতে সংগীতের উপর অন্য কোন শিল্প নেই। ঐ আনন্দ কথা কিংবা কবিতা ধারণ করতে অসমর্থ। বলা যেতে পারে, কথা কিংবা কবিতার আনন্দের যেখানে শেষ, গানের আনন্দের সেখান থেকে শুরু। অনেক সময় মনে মনে কবিতা পড়ে আমরা যখন তৃপ্তি পাই না, তখন আমরা শব্দ করে পড়ি; যাকে আবৃত্তি বলে, সেই আবৃত্তিতে আমরা যেন সেই আনন্দের কিছুটা তৃপ্তি সাধন করি। কিন্তু আরও একটা পর্যায় আসে, যখন আবৃত্তিতে আনন্দ পাওয়া যায় না—যখন আমরা সুরের আমন্ত্রণ জানাই, আর সুরের মাধুর্যে ধরা পড়লে কবিতা হয়ে ওঠে গান। সব কবিতাই গান হয় না। যে ভাষা অক্ষর-শব্দ-বাক্যের বাঁধন ছাড়িয়ে প্রচণ্ড বেগে সুরের দিকে ধাবিত হয়, একমাত্র সেই কাব্য-ভাষার পক্ষে গান হয়ে ওঠা সম্ভব। অর্থাৎ ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, কবিতা মাত্রই গান হতে পারে না। গান হওয়ার মত সুরের দিকে প্রধাবিত আবেগ-সম্ভূত ভাষার আধার যে কবিতা শুধু কেবল সেই কবিতারই আছে গান হওয়ার যোগ্যতা। বলা বাহুল্য আমরা যাকে সনেট বলি, বাঙলায় যার নাম আমরা দিয়েছি চতুর্দশপদী কবিতা, এক সময় তার পিতৃপুরুষ ছিল সংগীত:

In its first beginnings it was a lyrical poem, in the stricter sense of the term, being designed for a musical setting and sung to a musical accompaniment.

কিন্তু এর পর পরই এই গীতিকবিতাকে সনেটের আঙ্গিকে উত্তীর্ণ করা হয় ;

but it ceased to possess such uses when it became a refined poetic composition, possessing a weight and substance of reflection for which purely lyrical verse is inadequate.

ঐ refined poetic composition হল সনেট। কোন্ কোন্ নিয়মরীতির শাসন-শর্তে সে রূপ পেল ?

The poet conveys in it a certain idea grave enough to give matter of thought to the reader, but brief enough to be contained with full and perfect expression, in the compass of fourteen lines. He speaks in his own person, reveals his own emotions and takes the reader into confidence without reserve. *

বহিরাঙ্গের কলাকৌশলের শর্ত রক্ষার পর উল্লিখিত শর্তগুলো পালন করলে তবেই তা সনেট হবে। অর্থাৎ সনেট শুধু পংক্তিগত মিল রক্ষা করেই এবং চৌদ্দ লাইনের সংক্ষিপ্ত আকৃতিতে গঠিত হলেই হবে না তাকে এমন একটা ভাবনাকে শোষণ করে পুষ্ট হতে হবে যা grave enough to give matter of thought to the reader এবং ভাবনার সেই প্রকাশ হবে full and perfect. আর সনেটের কবি যিনি তিনি ব্যক্তিগত আবেগ প্রকাশ করবেন উত্তমপুরুষের কণ্ঠে এবং অনবগুণ্ঠিত থেকে পাঠককে নিয়ে যাবেন তাঁর ভাবনার হেরেমে। সনেট তাই গান নয়। আঙ্গিকের দিক থেকে গীতি-কবিতার ভাস্কর্য-শিল্পিত রূপ সনেট। কিন্তু তা হলেও সনেটের ভাষা গীত-লাবণ্যহীন নয়। যদিও প্রমথ চৌধুরী অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা একটি চিঠিতে বলেছেন :

* Introduction : The Sonnets of Milton : John . S. Smart :

"রবীন্দ্রনাথের Lyric মূলত: গীতধর্মী—তার flow অসাধারণ। সনেট হচ্ছে আমার মতে sculpture-ধর্মী—এর ভিতর উদ্দাম নেই ; যেটুকু গতি আছে তা সংহত ও সংযত ; সনেটের ভিতর এমন কোনো তোড় নেই যা পাঠকের মনকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে। সনেট প্রতিমাধর্মী। অবশ্য আমি এ-কথা বলতে চাইনে—আমার প্রতি সনেট একটি প্রতিমা। কিন্তু Dante প্রভৃতি বড় কবিদের গড় সনেট তাই। এবং এর সৌন্দর্য অনেকটা technique এর উপর নির্ভর করে। অবশ্য এর ভিতর যদি প্রাণ থাকে। সে প্রাণ অবশ্য সনেটের ভিতর অন্ত:শীলা ভাবে বয়। Emotion-কে লাগাম ছেড়ে দিলে সনেট গড়া যায় না। আমার এ মত গ্রাহ্য-কিনা তা অবশ্য বলতে পারো। একটি কথা কিন্তু ঠিক, সনেট গান নয়।

প্রমথ চৌধুরীর লেখা সাধারণত লজিকাল। Emotion-এর চেয়ে তিনি তাঁর লেখায় বরাবর reason এর দাম দিয়েছেন বেশী। কিন্তু উপরের ঐ লেখায় reason-এর চেয়ে তাঁর ব্যক্তিগত মতটা বেশী প্রকট হ'য়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথের যেটা zyric সেটা রবীন্দ্রনাথের 'গান' ঠিক নয় এবং রবীন্দ্রনাথের গানে emotion থাকলেও সে যে উচ্ছ্বাসময় নয় তা সকলেরই জানা। ঐ চিঠিতে দেখা যাচ্ছে প্রমথ চৌধুরী আরো বলেছেন :

কবিতার বস্তুকে আমরা আর্টের কোঠায় ফেলি। সনেটে এই আর্ট নামক গুণই প্রধান লক্ষ্য করবার জিনিস। রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি বড় কবিদের কবিতায় emotion হয়ত আর্টকে সঙ্গে সঙ্গে টেনে নিয়ে আছে। কিন্তু art অনেকটা বন্ধনের সামগ্রী।

কথা হল 'emotion-কে লাগাম ছেড়ে দিলে সনেট গড়া যায় না' এ-কথা ঠিক কিন্তু emotion-কে লাগাম ছেড়ে দিলে কবিতা লেখা যায় কি? আর 'প্রাণ অবশ্য সনেটের ভিতর অন্ত:শীলা ভাবে বয়' কথাটা মানলে flow কথাটাকে অস্বীকার করা যায় কি করে? প্রথমে তাহলে আমাদের এই জিজ্ঞাসায় জাগতে হয় যে 'প্রাণ' বস্তুটা কি? জড়ের সঙ্গে প্রাণীর পার্থক্য নিরূপণ করতে পারলেই আমরা বুঝতে পারব প্রাণ বস্তুটা কি। অর্থাৎ যা সজীব, সচল, জীবনময় তাই প্রাণের আধার। এবং যেখানে সচলতা আছে, যেখানে জীবন আছে, যেখানে প্রাণ আছে, সেখানে flow আসবেই। বস্তুত ভাস্কর-নির্মিত 'প্রতিমা'

জড় বটে কিন্তু তাকে আমরা আর্ট বলতাম না যদি না তার সৌন্দর্যে প্রাণ প্রতিষ্ঠিত হত। অন্যদিকে কবিতার emotion-টা একটা বড় জিনিস। এবং আবেগ মানেই উচ্ছ্বাস নয়। এবং আবেগ ও উচ্ছ্বাস শিল্পে সমার্থকও নয়। সুধীন দত্ত বলেছেন 'মুখর আবেগ উৰ্ধ্বশ্বাসে দৌড়ায় না, চলে বিরতিবহুল গতিতে।'

সে যা হোক আমার বক্তব্য হল কবিতা নামক সনেট যেমন একটা আর্ট, কবিতা নামক 'গান' তেমনি একটা আর্ট। এবং নজরুল ইসলাম যে গজলগুলো লিখেছেন তা ঐ আর্টের উৎকৃষ্ট উপমা। সনেটের কলাকৌশল যেমন আয়াসে আয়ত্ত করতে হয় ঐ গানের আর্টও তেমনি ঐ কষ্টের অপেক্ষা রাখে। সনেটের যেমন চৌদ্দ লাইনের পরিমাপ আছে গানের তেমনি সংক্ষিপ্ত, বিশেষ করে রেকর্ডকৃত, সময়ের পরিমাপ আছে।* যদিও দু'লাইনের একটি গানকে দু'ঘণ্টা ধরে গাওয়াও সম্ভব তবু গানের আকৃতি সনেটের মত খর্ব। এবং খর্ব বলে সনেটে যে সংযমের প্রয়োজন হয় সে সংযম গান রচনাতেও লাগে এবং বলা বাহুল্য গানে Emotion যেমন লাগামহীন নয় তেমনি 'প্রাণ'ও তার মধ্যে অন্তঃশীলা। এবং বলা যেতে পারে গানে 'আবেগ উৰ্ধ্বশ্বাসে দৌড়ায় না, চলে বিরতিবহুল গতিতে।'

এখন J. S. Smart-এর কথা মিলিয়ে দেখা যাক। সনেটের মৌল সত্তা গানেরও অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ কিনা। অর্থাৎ সনেট যেমন পাঠকের মনে ভাবনা জাগায় তেমনি গানও পাঠককে ভাবে ভাবিত করে কিনা। রবীন্দ্রনাথের গান যে চিন্তা জাগায় বিশ্ববাসী তা জানেন এবং যে কবি 'হারানো হিয়ার নিকুঞ্জ পথে, কুড়াই ঝরা ফুল একেলা আমি', লিখেছেন তিনিও পাঠকের ঐ ভাবনদীতে যে ঢেউ জাগাতে সক্ষম সে কথা বলা বাহুল্য।

সনেটের ভাবনাগত দিক থেকে গানের সঙ্গে যে তার সম্বন্ধ নিকট তম সেটাও লক্ষ্য করার বিষয়। উত্তমপুরুষের কণ্ঠে নিঃসঙ্গের যে সম্পর্ক

*নজরুলের অনেক গান আছে যেগুলো রেকর্ড-সময়ের পরিমাপে কুলোয় না। লক্ষ্য করা যায় সে কারণে কিছু কিছু গান দু'চার স্তবক বাদ দিয়ে গীত হয়। দীর্ঘ এ গান তাই বলে সংযমহীনতার স্বাক্ষর নয়।

সনেটের বিষয় গানেরও তাই। গানের কবি যেন নিজেকেই গান শোনায়। 'আমি' শব্দটি গানে প্রায়ই উহ্য থাকে না এবং মাঝে মাঝে কবি নিজেকেই 'কবি' ব'লে সম্বোধন করেন। বলা বাহুল্য বিদ্যাপতি চণ্ডিদাসে যে ভণিতা দেখি নজরুল ইসলাম 'বুলবুল'-এর গানে সে ভণিতার উত্তরাধিকার পেয়েছেন হাফেজ উমরের কাছ থেকে এবং এই জন্যই গানের কবিও সনেটের কবির মত speaks in his own person.

সনেট গান নয় ঠিক কিন্তু গানের গুণ না থাকলেও ঐ 'প্রাণ' কথাটিকে আমরা সনেটে আবিষ্কার করতে পারব না। অপরদিকে Emotion থাকলেও গানে পরিমিতির বন্ধন আছে, প্রমথ চৌধুরী যেটাকে আর্টের বন্ধন বলেছেন।

নজরুলের গান শুধু গান নয়, শুধু সুরেই তার প্রাণ প্রতিষ্ঠিত নয়, চিত্র সমৃদ্ধ তাঁর গান ছবির ঐশ্বর্যে দীপ্ত, রঙের ছোপে উজ্জ্বল, সে গান শুধু কানের কাছে তৃপ্তিকর নয়, চোখের কাছে মনোহার। নজরুলের সঙ্গীত গ্রন্থগুলোর যে কোনো জায়গা থেকে একটা গান তুলে দেখানো যায় যে তিনি এমনি ছবি কি ভাবে এঁকেছেন :

শুক্‌নো পাতার নূপুর পায়ে
নাচিছে ঘূর্ণিবায়।
জল-তরঙ্গে ঝিল্‌মিল্‌ ঝিল্‌মিল্‌
ঢেউ তুলে সে যায়॥

দীঘির বুকের শতদল দলি',
ঝরায়ে বকুল চাঁপার কলি,
চঞ্চল ঝরণার জল ছলছলি'
মাঠের পথে সে ধায়॥

বন-ফুল আভরণ খুলিয়া ফেলিয়া,
আলু-থালু এলোকেশ গগনে মেলিয়া,
পাগলিনী নেচে যায় হেলিয়া দুলিয়া
ধূলি-ধূসর কায়॥

ইরানী বালিকা যেন মরু-চারিণী
পল্লীর প্রান্তর-বন-মনোহারিণী
ছুটে আসে সহসা গৈরিক-বরণী
বালুকার উড়্‌নী গায় ॥

প্রকৃত বিষয়টি ঘূণিবায়ু। কিন্তু গানটি দেখলেই একটি নৃত্যরতা সুন্দরী মেয়ের ছবি চোখের সামনে ভেসে ওঠে। এ-গানটিতে বিশুদ্ধ চিত্রকলার সৌন্দর্য এবং বিশুদ্ধ ধ্বনিই কেবল শ্রুতিগ্রাহ্য এবং দৃষ্টিগ্রাহ্য। দৃষ্টি ও শ্রুতির সীমা ছাড়িয়ে এর বিষয়-শরীরে সূক্ষ্ম প্রগাঢ় কোন মহৎ ভাবনার প্রতিবিম্বন ঘটেনি। সংগীত যেহেতু বিশুদ্ধ আর্ট এবং সেই অর্থে চিত্রকলাও সুতরাং এর মধ্যে চিন্তার গভীরতা খুঁজতে যাওয়া বৃথা। এতে একটির পর একটি চিত্রকল্পের মধ্য দিয়ে এর যে ছবি ফুটে উঠেছে সুরের মধ্য দিয়ে তাকে আশ্চর্য কৌশলে প্রকাশ করা হয়েছে। যিনি চিত্রশিল্পী অথবা সংগীত-শিল্পী তিনি এটুকুতেই খুশি কিন্তু যিনি ভাবনাশীল তিনি আর একটু বেশী প্রত্যাশা করেন। অর্থাৎ তাঁর মতে শুধু গান এবং শুধু ছবি কবিতা নয় তারও অতিরিক্ত কোনো বিষয়। সনেটে ঐ ভাব থাকে, গভীর কোন-বক্তব্য, কবির জীবনদর্শন। এবং বলা বাহুল্য গভীব বক্তব্যহীন বিষয়ের উপর সাধারণত সনেট লিখিত হয় না। গান অমন কোন কঠিন শর্তের মুখাপেক্ষী নয়। কিন্তু বহু গান আছে যেগুলো তাদের গভীর বক্তব্য, সংবেদনশীল ভাবের জন্য সুপ্রসিদ্ধ। প্রসংগত আমরা যখন নজরুলের গানে শুনি 'কে দুরন্ত বাজাও ঝড়ের ব্যাকুল বাঁশী', 'আমার কোন্‌ কূলে আজ ভিড়ল তরী এ-কোন সোনার গাঁয়', 'এ নহে বিলাস বন্ধু ফুটেছি জলে কমল', 'মুসাফির মোছ এ আঁখিজল / ফিরে চল আপনারে নিয়া', তখন সুর ছাড়াও গভীর এক একটা ভাবে আমরা অন্দোলিত হই এবং কবির অভিজ্ঞতানিঃসৃত বাণীর অমৃতে আমাদের চিত্ত স্পন্দিত হতে থাকে। ফলত সনেটের যেমন আছে আঙ্গিকের কঠিন শাসন তেমনি গানের আছে মিউজিক্যাল সেটিংয়ের শাসন —অন্তত গানের বাণীটাকে নির্দিষ্ট পরিধির বৃত্তে আবর্তিত হতে হবে। সেই জন্যে মিল রক্ষায় সনেটেরই মতন গানকে ইচ্ছাধীন হবার উপায় নেই। কিন্তু শুধু ঐ টুকুই নয়, ক্ষমতাবান কবি সনেটের চেয়েও

কঠিন অনুশাসনের ভিতর রেখে গান সৃষ্টি করেন। নজরুলের দু'একটি গান উদ্ধৃত করে আঙ্গিক বিচার করলে ব্যাপারটা বোঝা যাবে:

ভুলি কেমনে আজো যে মনে—
বেদনা-সনে রহিল আঁকা।
আজো সজনী দিন রজনী
সে বিনে গণি তেমনি ফাঁকা ॥

আগে মন করলে চুরি
মর্মে শেষে হান্‌লে ছুরি,
এত শঠতা এত যে ব্যথা
তবু যেন তা' মধুতে মাখা ॥

চকোরী দেখ্‌লে চাঁদে
দূর হ'তে সই আজো কাঁদে,
আজো বাদলে ঝুলন ঝোলে
তেমনি জলে চলে বলাকা ॥

বকুলের তলায় দোদুল্
কাজ্‌লা মেয়ে কুড়োয় লো ফুল,
চলে নাগরী কাঁখে গাগরী
চরণ ভারি কোমর বাঁকা ॥

তরুরা রিক্ত পাতা
আস্‌ল লো তাই ফুল-বারতা,
ফুলেরা গ'লে ঝরেছে ব'লে
ভরেছে ফলে বিটপী-শাখা ॥

ডালে তোর হান্‌লে আঘাত
দিস্‌বে কবি ফুল-সওগাত,
ব্যথা-মুকুলে অলি না ছুঁলে
বনে কি দুলে ফুল-পতাকা ॥

মূলত গানটি বারো লাইনের হলেও এখানে তাকে ভেঙে চব্বিশ লাইন করা হয়েছে। এর আঙ্গিক নৈপুণ্যের বিচার করতে গেলে গানটিকে

বারো লাইনের কবিতা বলে ধরে নিতে হবে অর্থাৎ পংক্তিগুলো 'সাজাতে হবে এমনি করে :

ভুলি কেমনে আজো যে মনে বেদনা সনে রহিল আঁকা।
আজো সজনী দিন রজনী সে বিনে গণি তেমনি ফাঁকা ॥
আগে মন করলে চুরি, মর্মে শেষে হান্‌লে ছুরি
এত শঠতা এত যে ব্যথা তবু যেন তা মধুতে মাখা ॥*

অথবা তাকে এমনি ভাবে সাজানো যায় :

ভুলি কেমনে আজো যে মনে বেদনা সনে বহিল আঁকা।
আজো সজনী দিন বজনী সে বিনে গণি তেমনি ফাঁকা ॥

আগে মন কবলে চুবি
মর্মে শেষে হান্‌লে ছুবি

এত শঠতা এত যে ব্যথা তবু যেন তা মধুতে মাখা ॥

কিন্তু ছন্দেব ভাঁজ আলগা ক'বে কবিতাটিকে সাজালে কবিতাটির আকৃতি হবে এমনি :

ভুলি কেমনে
আজো যে মনে
বেদনা সনে
রহিল আঁকা।

আজো সজনী
দিন রজনী
সে বিনে গনি
তেমনি ফাঁকা ॥

আগে মন
করলে চুরি
মর্মে শেষে
হান্‌লে ছুরি।

* নজরুল-গীতিকা'তেও গানটিকে এমনিভাবে সাজানো হয়েছে।

এত শঠতা
এত যে ব্যথা
তবু যেন তা
মধুতে মাখা ।।

গানটিকে বিভিন্ন আঙ্গিকে প্রকাশ করা হলেও প্রকৃতপক্ষে এর স্বিরাচারী ছন্দের কোন পরিবর্তন হয়নি। সনেটের বেলাতেও ঐ ছন্দের পরিবর্তন হয় না। কিন্তু আঙ্গিকের পরিবর্তন হয় কি? মধুসূদনের একটি সনেটের উদাহবণ নেওয়া যাক :

কার সাথে তুলনিবে, লো স্থর-স্থন্দরি,
ও রূপের ছটা কবি এ ভব-মণ্ডলে?
আছে কি লো হেন খনি, যার গর্ভে ফলে
রতন তোমাব মত, কহ, সহচরি
গোধূলির? কি ফণিনী, যার স্থ-কবরী
সাজায় সে তোমা সম মণির উজ্জ্বলে?—
ক্ষণমাত্র দেখি তোমা নক্ষত্র-মণ্ডলে
কি হেতু? ভাল কি তোমা বাসে না শর্ব্বরী?
হেরি অপরূপ রূপ বুঝি ক্ষুণ্ন মনে
মানিনি রজনী রাণী, তেঁই অনাদরে
না দেয় শোভিতে তোমা সখীদল সনে,
যবে ফেলি করে তারা স্থহাস-অম্বরে।
কিন্তু কি অভাব তব, ওলো বরাঙ্গনে,—
ক্ষণমাত্র দেখি মুখ, চির আঁখি স্মরে।

পর্ব ভাগ করে সনেটটিকে কবিতাতেও রূপান্তরিত করা যায় যেমন :

কার সাথে তুলনিবে,
লো স্থর-স্থন্দরী,
ও রূপের ছটা কবি
এ ভব-মণ্ডলে?
আছে কি লো হেন খনি,
যার গর্ভে ফলে

রতন তোমার মত,
কহ, সহচরি
গোধূলির ? কি ফণিনী,
যার সু-কবরী
সাজায় সে তোমা সম
মণির উজ্জ্বলে ?—

উল্লিখিত রূপান্তরটা সম্পূর্ণ কষ্টকর। বস্তুত উপরের গানটিতে মাত্রাবৃত্ত স্বরবৃত্তের মিশ্রণ থাকাতে ওর আঙ্গিককে রদবদল করেও ওর মৌল সত্তার পরিবর্তন হয় না। কিন্তু সনেটগুলো অক্ষরবৃত্তে রচিত হয় বলে পর্ব ভাঙলে তার সৌন্দর্য বিনষ্ট হয়। 'বলাকা'য় রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘ পয়ারকে ভেঙে অভ্যন্তরীণ মিলে মিলে পর্বে পর্বে ভাগ করে দেখিয়েছিলেন যে চোদ্দ অথবা আঠারো অক্ষরের পংক্তি আসলে কতকগুলো ছন্দযতির অস্বীকার। কিন্তু 'বলাকা'র ছন্দকে চৌদ্দ অথবা আঠারো অক্ষরের পয়ারের পংক্তিতে উত্তীর্ণ করা যায় কি ? 'বলাকা' কবিতাটির প্রথম পংক্তিটিই আঠারো মাত্রার : 'সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি ঝিলমের স্রোতখানি বাঁকা।' কিন্তু তার পরবর্তী পংক্তিটি 'আঁধারে মলিন হ'ল, যেন খাপে ঢাকা' চৌদ্দ মাত্রার এবং তৃতীয় পংক্তিটি 'বাঁকা তলোয়ার' ছ'মাত্রার। তারপর চতুর্থ পংক্তিটি 'দিনের ভাঁটার শেষে রাত্রির জোয়ার' এবং পঞ্চম লাইনটি : 'এল তার ভেসে আসা তারা ফুল নিয়ে কালো জলে' যথাক্রমে চৌদ্দ ও আঠারো মাত্রার। অর্থাৎ এখানে কোনো নির্দিষ্ট সংখ্যার অক্ষরের অর্থাৎ অক্ষরবৃত্ত ব'লে মাত্রার অনুশাসন মানা হয়নি এবং প্রথম পংক্তি মাপ অনুযায়ী দ্বিতীয় ও তৃতীয় পংক্তিকে সংযুক্ত করলে অক্ষর কিংবা মাত্রা গিয়ে দাঁড়ায় কুড়ি। রবীন্দ্রনাথ ইচ্ছা করেই এটা করেছিলেন। কিন্তু অমনি ইচ্ছাকৃতভাবে মধুসূদনের পয়ার ভাঙা সম্ভব না। সম্ভব না এই জন্যে যে তার অন্তর্নিহিত মিল শব্দাক্ষরের সংগে শব্দাক্ষরের নয় ধ্বনির সংগে ধ্বনির। সুতরাং পর্বভাগে বিন্যস্ত ধ্বনির যতি ছাড়া মধুসূদনের পয়ার ভেঙে মুক্ত ছন্দে লেখা অসম্ভব। পংক্তি শেষের কয়েকটি আক্ষরিক মিল ছাড়া সনেটে ঐ ধ্বনির অনুশাসন থাকাতে মুক্তকের ঐ মিল সনেটে আনা সম্ভব নয় বলেই সনেটের আঙ্গিক কঠিন অনুশাসনে বন্দী। মনে রাখতে হবে সনেটে ঐ পংক্তিশেষের আক্ষরিক মিলটাই বড়

কথা নয়, ওর পর্বান্তর্গত সাংগিতিক ধ্বনির মিলটাই বড় কথা। ঐ ধ্বনি একটা ক্রমিক সংখ্যার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গে প্রবাহিত হতে হতে সনেটের প্রথম আট লাইনের পংক্তিতটে গিয়ে মিলিয়ে যায়। তারপর যেন একটা মোচড় খেয়ে পুনরায় যাত্রা শুরু করে ষষ্টকের তীর থেকে তার মধ্যস্থলে এবং মধ্যবিন্দু স্পর্শ করে তীর্থ সমাপনে আবার সে স্বভূমির দিকে পা বাড়ায়। ঢেউয়েব এই যাতায়াতটা একটা অনির্বাণ গতির মধ্যে অবস্থান ক'রে সে একটা অপ্রতিরোধ আবেগকে আকর্ষণ করে। যতক্ষণ সে ঐ আবেগ উৎসৃজনে অক্ষম হয় ততক্ষণ সে দৃশ্যমান আঙ্গিকের রুক্ষ সনেট হয় মাত্র কিন্তু মধুপর্ক কবিতা হয় না। সনেট যখন ঐ কবিতা হয় তখন তার সংগে সংগীতেব কোন পার্থক্য থাকে না। অর্থাৎ মৌল অর্থে সনেটও সংগীত।

এখন দেখা যাক গান সনেটেব মত কখনো কখনো একরৈখিক ভাবনার অনুসরণ কবে খ-মধ্যে ধাবিত হয় কিনা। এবং নজরুল ইসলাম অমনি গান বচনা করেছেন কি না। জ্যামিতির উপপাদ্যের মত প্রথম পংক্তিতে একটি জিজ্ঞাসা সৃষ্টি করে অংকের ফল বের করার মত বিভিন্ন উপমা অথবা কারণ দর্শে শেষ লাইনে সনেট তার ফল মেলায়।

বলা বাহুল্য পেত্রার্ক, মিল্টন এবং কীট্সের মত কেউ কেউ অষ্টক-ষষ্টকের আঙ্গিক মানলেও শেক্সপীয়ারের সনেটের আঙ্গিক অন্য রকম। তবু ভাবের জ্যামিতিক প্রশাসন শেক্সপীয়ারও মেনেছেন। কিন্তু তাই বলে সনেট যে কখনও স্তব-স্তোত্র-প্রর্থনা হয়নি তা নয়। এবং মিল্টন ত বটেই এমনকি বোদলেয়ার, মালার্মে ও কীট্সও ঐ স্তব রচনায় অংশ না নিয়ে পারেননি। বিষয়ের দিক থেকে যেমন একজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি অথবা ফুল-পাখী-চাঁদকে নিয়ে সনেট লেখা যায় তেমনি ঐ ব্যক্তি অথবা আল্লার প্রতি ভক্তি নিবেদন থেকে শুরু করে ফুল-পাখী-চাঁদ-তারাও গীতকারের হৃদয়-নৈবেদ্য থেকে বঞ্চিত হয় না। এবং এই জন্যে নজরুলের 'চাঁদের দেশের পথ ভোলা ফুল চন্দ্রমল্লিকা', 'ঘোমটা-পরা কাদের ঘরের বউ তুমি ভাই সন্ধ্যাতারা', 'নিশিদিন জপে খোদা দুনিয়া জাহান', 'সাহারাতে ফুটল রে রঙিন গুলে লালা', 'কালো মেয়ের পায়ের তলায়

দেখে যারে আলোর নাচন', বিষয়ের দিক থেকে স্তুতিমূলক সনেটের মতই ভাবোদ্দীপক কবিতা।

বস্তুত সনেট যেমন গাণিতিক সূত্র ধরে এগোয় গানকেও অমনি তার নিয়মিত কাঠামোর মধ্যে পরিক্রম করতে হয়। এবং রাগের মিশ্রণ নজরুল ইসলাম কখনো কখনো ঘটালেও সুরের গতি লক্ষ্য করে তাঁকে বাণীর অশ্ব ছোটাতে হয়েছে। এবং যে-কোন অনভিজ্ঞ সংগীত শ্রোতার পক্ষে বোঝা কঠিন নয় 'ভুলি কেমনে আজো যে মনে' গানটির সুর কোথায় গিয়ে বাঁক নিচ্ছে। এমনি আবৃত্তি করলে প্রথম দুটি লাইন (গ্রন্থে মুদ্রিত লাইন হিসেবে চারটি লাইন) মাত্রা-বৃত্তের টানাটানা বিলম্বিত লয়ে পড়তে হয় এবং তৃতীয় লাইনে যেয়ে হঠাৎ স্বরবৃত্তের চটুল নৃত্যে উচচারণে দ্রুতির সৃষ্টি হয়। পুনরায় চতুর্থ লাইনে সে উল্টে ফিরে যায় আরম্ভ বিন্দুব দিকে। সম্পূর্ণ একটা বৃত্ত ঘোবার পর সেই একই পথে আবর্তন না ক'রে একটা প্রশাখা পথে সে আবর্তিত হয়ে আবার স্বস্থানে ফিরে আসে। মাত্রা-বৃত্তের একটানা গতির মধ্যে স্বরবৃত্তের এ-বাধাটুকু ইচ্ছাপ্রসূত এবং এখানে নজরুল ইসলাম শুধু কবি নন, কারিগরও বটেন, যাঁকে সজাগ দৃষ্টি রেখে প্রতিটি বাঁক, কোণ এবং বৃত্তকে একই মাপে, একই স্পেসে, একই দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে নির্মাণ করে নিতে হযেছে, সে কোণ এবং নক্সা যেমন চোখের কাছে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়ার প্রয়োজন তেমনি গান বলে সুরের জন্য কানের কাছেও তার ঐ নিখুঁত পরিমাপ অত্যাবশ্যক। বলা বাহুল্য এখানে প্রতি পর্বশেষের আক্ষরিক এবং শব্দের ধ্বনিগত মিল ত বটেই, প্রতি বাঁকের মোচড়ে পংক্তি শেষের শব্দগত মিলের নিখাদ ধ্বনিও লক্ষ্যযোগ্য। বস্তুত সংগীতজ্ঞ হিসেবে তাঁর তালফেরতা জানা থাকাতে ছন্দ সহজ স্বাচ্ছন্দ্যে ধরা দিয়েছে। কিন্তু ঐ গানের সংযত কারিগরির নৈপুণ্য বোধ হয় শেষ কথা নয়। এটুকু ছাড়িয়ে এসে ওর অন্তর্গত অর্থের সাথে সাথে শব্দ ব্যবহারের দিকে তাকালে তাঁর অসাধারণ ক্ষমতা আমাদের চোখে পড়বে। আমি শেষের চারটি লাইন কবিত্ব শক্তির চূড়ান্ত নিদর্শন বলেই মনে করি। প্রেম সুন্দর, বেদনা ও আঘাতে প্রেমিকের হৃদয় ক্ষত-বিক্ষত হলেও সে ঐ সুন্দরের স্তব থেকে প্রত্যাবর্তন করে না বরং আঘাতের বিনিময়ে সে উপহার দেয়

সুন্দরকে। 'যা সত্য তাই সুন্দর' সেই সত্যসুন্দর সুখের পথ ধরে আসে না। শীতের হিমেল নিঃশ্বাসে গাছের পাতাঝরা দেখেই আমরা বুঝি যে এর পরবর্তী কালটা বসন্তের যখন ফুল ফুটবে। তেমনি ফল জন্মাবার সাথে সাথে ফুলের ঝরে যাওয়া দেখে আমরা বুঝি ফুল মৃত্যুকে বরণ করেই ফলেব আগমনের পথ তৈবী করল। অমনি ফুল-ভরা শাখায আঘাত করলেই তবে ফুল ঝবে এবং ফুলের জন্যেব কারণ ত আসব অন্বেষণে পতঙ্গের পুষ্পে-পুষ্পে বিচরণে রেণুব বিচ্ছুরণ। মুকুলে অলি না বসলে ফুলের পক্ষে গর্ভ ধারণ সম্ভব হত না এবং নতুন ফুলেরও জন্ম হত না। এই যে ফুলে-ফুলে বন ভবে যাচ্ছে সে ত অলির স্পর্শাঘাতেরই কারণে। তেমনি কবির ব্যথারূপ মুকুলে প্রেমের বেদনার আঘাত লাগে বলেই ত তার পক্ষে সৃষ্টি করা সম্ভব হয়। এই বিপুল সৃষ্টির উৎস সন্ধান কবলে আমাদের চোখে ঐ বেদনা-সুন্দরের রূপ ধরা পড়বে। কবির বক্তব্যের ঐ গূঢ়ার্থের সংগে সংগে এখানে কবির সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি এবং অলঙ্কার প্রয়োগের কৌশল চোখ এড়ায না। কাব্য-শিল্পেব ক্ষেত্রে এতগুলো বিষয়ের সমন্বয বিবল-দৃষ্ট। সংযম অভিজ্ঞতা প্রজ্ঞাদৃষ্টি শিল্প-সচেতনতা এবং বিজ্ঞানের জ্ঞান ভিন্ন এই ধরনের সৃষ্টি অসম্ভব। এবং আনন্দের কথা নজরুলে এই রকমের সৃষ্টি সামান্য নয়।

বহু গানে সুধী-শ্রোতার প্রত্যাশা-পিপাসিত চিত্তকে নজরুল তৃপ্ত করেছেন ছবি ও ভাবের অন্বয়ে। এখানে একটি গানের উদাহরণ দিয়েই পাঠককে বোঝানো সম্ভব যে কি অলৌকিক ক্ষমতা বলে নজরুল গানকে বসিয়ে দিয়েছেন মহৎ কবিতার সিংহাসনে। ছবি ও ভাবেব মিশোলে যে ফুল তিনি সৃষ্টি করেছেন সে শুধু সৌন্দর্য বিকিরণ কবে না সুগন্ধ, বিলোয় এবং তখন কবির এই অভিমানের কথা—"গন্ধ-ফুলেব জলসাতে তোর / গুণীর সভায় নেইক আদর"—সম্পূর্ণ মিথ্যা প্রমাণিত হয়:

রুমুঝুমু রুমুঝুমু কে এলে নূপুর-পায়।
ফুটিল শাখে মুকুল ও রাঙা চরণ-ঘায়॥

সে নাচে তটিনী জল টলমল টলমল,
বনের বেণী উতল ফুলদল মুরছায়॥

বিজরী জরীর আঁচল ঝলমল ঝলমল,
নামিল নভে বাদল ছলছল বেদনায় ॥

দুলিছে মেখলা-হার শ্যামলী মেঘমালার
উড়িছে অলক কা'র অলকার ঝরোকায় ॥

তালীবন থৈ তা থৈ করতালি হানে ঐ
কবি, তোর তমালী কই—শ্বসিছে পূবালী বায় ॥

নূপুর পায়ে যে এলো সে তো রাঙা-পাওয়ালী সুন্দরী এক নর্তকী— চোখেও কানেও প্রথম এই ছবিটাই ভেসে ওঠে। তারপর সে ছবির পর্দা সরে যায়, দ্বিতীয় পর্দায় ভেসে ওটে বাংলাদেশের বর্ষারাণীর ছবি, তারপর সে ছবিও মুছে যায়, তৃতীয় পর্দায় আলো-ছায়ার মত দুটি অর্থবহ কথা দুলতে থাকে একটি যৌবন অপরটি প্রেম। নরনারীর দেহে যৌবন এলে যেন পৃথিবী আরও সুন্দর মূর্তি ধারণ করে, তার মনে জাগে প্রিয়-পিপাসা — জাগে বিরহ-বেদনা—জাগে বিষাদ—উদাস করা পূবের হাওয়া যেন বলে : "কবি তোর তমালী কৈ ? তোর প্রিয়া কই ? তার পিউ কাঁহা" ?

দু' অক্ষর, তিন অক্ষর, চার অক্ষরের সহজ পরিচিত শব্দে তুলনাহীন উপমা চিত্রকল্পের মাধ্যমে গভীর সুন্দর ভাবটিকে প্রকাশ করা। কোন শব্দের আড়ম্বর, নেই, কান ধরে শব্দ টেনে এনে বসানোর জবরদস্তি নেই। প্রচণ্ড কিন্তু সংযত আবেগ বর্তমান অথচ উচ্ছ্বাস অশরীরী। শব্দ-ছন্দ-উপমা, ভাব ও কল্পনার এমন সুনিপুণ মিশ্রণ অভাবিত। শুধু বাংলা সাহিত্যেই নয়, বিশ্ব গীতি-কাব্যে এমন কবিতার সংখ্যা খুব বেশী নেই বলে আমার ধারণা।

ফলত অপূর্ববস্তুনির্মাণবাদীরা যে বলেন, সংগীত আবেগ-নিষ্কৃতি নয় আরকিটেকচার অব সাউণ্ডস অর্থাৎ ভাবের অভিব্যঞ্জনা না ঘটিয়ে কেবল শব্দের ইমারত দিয়ে সংগীত রচিত হয়—আমাদের বর্তমান আলোচনায় প্রাসংগিক বিষয় হিসাবে সে সম্বন্ধে কিছু বলে এ-প্রবন্ধের সমাপ্তি ঘটাবো। কবিতার কথা বাদ দিয়ে যে গান সে গান ধ্বনির ইমারত (architecture of sounds), শব্দের ইমারত (architecture of words) নয়, সে গানে আবেগ অথবা অনুভূতির সংশ্লেষ অত্যাবশ্যক বিষয় নয়। বস্তুত ঐ ইউরোপীয় মতানুযায়ী ধ্বনিই তার অপূর্ব বিন্যাসের দ্বারা শ্রোতার মনে

ভাব উদ্রেকে পারঙ্গম। ঐ মত অংশত আমরাও স্বীকার করি এবং লক্ষ্য করি যে গান অতএব নির্মাণকুশলতারই অবদান। কিন্তু বলেছি কথাটা অংশত সত্য হলেও সর্বাংশে, অন্তত আমাদের কাছে, সত্য নয়। সত্য নয় এই জন্যে যে, ভাবের বক্তব্যের এবং আবেগের গুরুত্ব ও গাম্ভীর্য বিনা গান যে মনোত্তীর্ণ হতে অক্ষম তাব অনেক উদাহবণ আধুনিক গানে মিলবে। আধুনিক গানে ঐ architecture of sounds-এব নৈপুণ্য দেখিযে কখনও কখনও সৌন্দর্য সৃষ্টির প্রয়াস লক্ষ্য কবা যায ; কিন্তু সে সৌন্দর্য গভীর চেতনাপ্রসূত না হওযায এবং কবিতার প্রাথমিক শর্ত পালনে অক্ষম হওয়ায় শেষ পর্যন্ত তা সদ্যোপাতী অম্বুবিম্ব।

অর্থাৎ আমাদেব ধাবণায হঠযোগী নয়, যোগীর ধ্যানই গান। যাতে থাকবে ধ্বনির অপূর্ব বিন্যাসেব সংগে সংহত আবেগ এবং ভাবনাব সংমিশ্রণ। নজরুল ইসলামেব গানে রিদম, মেলোডি আব হারমনির সংগে ঐ সংযত আবেগেব প্রকাশ লক্ষণীয। শিল্পের ঐ কঠিন অনুশাসনে তিনি অপর্ব সৌন্দর্য নির্মাণে সক্ষম বলে আমবা তাঁকে উচ্ছ্বাসপ্রবণ কবি বলি না, বলি মহত্তম কবি-শিল্পী।

আধুনিক গান ও নজরুল ইসলাম

যদি বলা যায় আধুনিক বাংলা গান একক নজরুলের দ্বারা প্রভাবিত, তা হলে সেটা মিথ্যা হয়ত হবে না। অবশ্য যে-সব হালকা গান অধিকাংশ ক্ষেত্রে গ্রামোফোন রেকর্ড, চলচ্চিত্র কিংবা বেতারের জন্য লেখা হয়, তার মধ্যে আচমকা দু' এক কলি রবীন্দ্র-সংগীতের দু'একটি পংক্তির সংগে যে সাদৃশ্য রচনা করে না, তা বলা কঠিন; কিন্তু আধুনিক গানের সুর-বৈচিত্র্যের সম্ভাবনার দিকটা সম্ভবত একক নজরুলের সৃষ্টি।

অতি সাম্প্রতিককালে বিদেশী সুরের যদৃচ্ছা ব্যবহার আধুনিক বাংলা গানে ব্যবহৃত হতে দেখা যাচ্ছে। আধুনিক সুরকারেরা পপ থেকে শুরু করে ইউরোপ-আমেরিকার যাবতীয় সুর বাংলা গানে অর্পণ করবার প্রয়াস পাচেছন—অন্তত সুরের ক্ষেত্রে অল্পবিস্তর সার্থকতাও যে তাঁরা লাভ করছেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। বিদেশী সুরকে বাংলা গানে প্রয়োগের এই কৌতূহল দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ও রবীন্দ্রনাথেরও ছিল। রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্য সংগীতের সুর তাঁর গানে অত্যন্ত কৃতিত্বের সংগে মিশিয়েছেন—পাশ্চাত্য সংগীতের আদল বদলে দিয়ে। অর্থাৎ বাংলা গানের মূল রূপকে তিনি পরিবর্তন না করে নিজস্ব সুরের গায়কী বৈশিষ্ট্যকে বজায় রেখেছেন অথচ পাশ্চাত্য সংগীতের রসও মিশিয়েছেন সূক্ষ্মভাবে। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ও কোন কোন গানে সার্থকভাবে পাশ্চাত্য সুর মিশিয়েছিলেন। তবু বিদেশী সুর বাংলা গানে প্রয়োগ করে মন-মাতানো গান নজরুলই বোধ হয় অধিকতর সার্থকভাবে সৃষ্টি করেছেন। তিনি নিজের ভাষার উচ্চারণকে বিকৃত করেননি—অথচ গানটিকে ঐ সুরের অনুরণনে চমৎকারভাবে গড়ে তুলেছেন। এই ধরনের গানের উদাহরণ হিসেবে নজরুলের 'শুকনো পাতার নূপুর পায়ে নাচিছে ঘূর্ণিবায়', 'মোমের পুতুল মমীর দেশের মেয়ে নেচে যায়', 'দূর দ্বীপ বাসিনী। চিনি তোমারে চিনি'

'রুম ঝুম ঝুম ঝুম রুম ঝুম ঝুম/খেজুর পাতার নূপুর বাজায়ে / কে যায়', গানগুলি স্মরণ করা যায়। এই গানগুলি যথাক্রমে তুর্কি, মিসরী, কিউবান ও আরবী সুরারোপিত। এর মধ্যে ভারতীয় সুর গোপনে গভীরে মিশ্রিত থাকলেও তা তেমন স্পষ্ট নয়। সুরের দিক থেকে নজরুল তার নজরুল-গীতির বিশিষ্ট গায়কী থেকেও একে মুক্তি দিয়েছেন— অন্য কিছুর জন্যে নয়, বাংলা গানের সম্ভাব্য মুক্তির জন্য—যাতে সে প্রাচীনতার বেড়া ডিঙিয়ে আধুনিকতার দিকে এগিয়ে যেতে পারে, বিশ্বসংগীত সংস্কৃতির অগ্রসরমান ধারার সংগে খাপ খাইয়ে চলতে পারে। বলা বাহুল্য যে, খুব বেশী বৈশিষ্ট্যের বেড়াজালে আটকাবার চেষ্টা করলে স্বচ্ছন্দে এগিয়ে চলার পা জড়ত্বের বাতে আক্রান্ত হয় এবং এ কথাও ধ্রুব সত্য ভোগ্যবস্তু যতই লোভনীয় হোক, বিরতিহীনভাবে সে সুন্দর খাদ্য হ'তে পারে না—অন্তত মানব-স্বভাবের কাছে। সুতরাং বাংলা গানে বৈচিত্র্যের উপস্থিতির প্রয়োজন ছিল। নজরুল ইসলাম সেই বিচিত্র পথের সন্ধান দিতে পেরেছিলেন। আজকের আধুনিক গান এমনি একজন পথপ্রদর্শকের হাতছানি না পেলে এগিয়ে চলার পথে অসুবিধার শিকলে আটকা পড়ত।

নজরুল আরও একটা কাজ করে আধুনিক গানকে সুরের জগতে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পথে চলতে সাহস যুগিয়েছিলেন। আর তা হ'ল বিদেশী সুরটির বৈশিষ্ট্য বিলুপ্ত না করে এবং সংগে সংগে স্বদেশীয় সুরের বিকৃতি না ঘটিয়ে উভয় সুরের মিলন সাধন করা। তাঁর এমনি ধরনের গানের মধ্যে আছে 'ও বাঁশের বাঁশীরে' 'মেঘলা নিশি ভোরে' প্রভৃতি লোক সংগীত। প্রথমটিতে আছে পল্লীগীতির সংগে 'আরবী সমুদ্রোপকূলের সুরের' মিশ্রণ, দ্বিতীয়টিতে আছে মুরীস মিউজিকের সংগে দেশীয় লোকগীতির বিমিশ্রণ। প্রসংগত বলা যায়, প্রখ্যাত গায়ক শচীন দেববর্মণের গাওয়া নজরুলের 'পদ্মার ঢেউরে' ও 'চোখ গেল পাখীরে' এই বিখ্যাত গান দুটিও দেশী বিদেশী সুরের মিশ্রণে অপূর্ব দু'টি সৃষ্টি। এছাড়া তিনি উপজাতীয়দের গানের সুরও তাঁর অমর বাণীতে সঞ্চার করে আধুনিক সুর-স্রষ্টাদের ও গীতিকারদের নতুন পথ দেখিয়েছেন।

আধুনিক গানের এই পথপ্রদর্শকের গৌরব একা নজরুলকে দেওয়ায় অনেকের কণ্ঠে আপত্তির সুর জাগতে পারে। প্রশ্ন হতে পারে, দিলীপকুমার, রাইচাঁদ বড়াল, হিমাংশু দত্ত প্রভৃতির কৃতিত্ব কি গৌণ হয়ে গেল। যায়নি। স্ব স্ব ক্ষেত্রে তাঁরা অনেকেই দেদীপ্যমান। কিন্তু বলে রাখা দরকার—নিজের সুরকে ধরে রাখার মত মজবুত বাণীর আধার এঁদের ছিল না। তাঁরা প্রায় সবাই অনেক ক্ষেত্রে অন্যের গানে সুরারোপ করেছেন কিংবা কখনও নিজের সুরধৃতির জন্য পাত্র রচনা করলেও সে পাত্র হয়নি কালের আঘাতে ভেঙে পড়ার মত কঠিন ধাতুর সৃষ্টি।

প্রকৃতপক্ষে মানব-মানবীর পার্থিব প্রেমের যে রূপায়ণ নজরুলের আধুনিক গানে মূর্তিলাভ করেছিল, সেই অনন্য রূপটি দ্বিতীয় কোন গীতকারের কিংবা কবির পক্ষে সৃষ্টি করা এ-পর্যন্ত সম্ভব হয়নি। এর একমাত্র কারণ প্রতিভা ও কবিত্ব শক্তির অভাব। নজরুল ইসলাম কেবল গান লেখেননি। তাঁর কবিতাকে পরিয়েছিলেন গানের ছদ্মবেশ—বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথ ও হাফিজের মত। সুর হয়ত সে কবিতাকে মহিমান্বিত করেছে—কিন্তু আসলে যে সে কবিতা গভীরভাবে সুর সেই শব্দটির অর্থ দান করেছে।

কেবল সুরের চাতুর্য দেখিয়ে জনচিত্ত জয় করতে চাইলে আজকের দিনে এসেও নজরুলকে নিয়ে চিন্তা করার প্রয়োজন পড়ত না। কিন্তু সম্পূর্ণ বিদেশী সুরে, নিজের বৈশিষ্ট্যের কথা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে যে গান তিনি লিখলেন, তার সেই গান জনপ্রিয়তা আজ পর্যন্ত কেন হারালো না, তাকি ভাববার নয়? কেন আজও দীপ্তি হারায় না 'শুকনো পাতার নূপুর পায়ে নাচিছে ঘূর্ণিবায়' কিংবা 'রুম ঝুম ঝুম ঝুম রুমঝুম ঝুম/খেজুর পাতার নূপুর বাজায়ে কে যায়।' এই বিদেশী সুর-সম্পৃক্ত গানগুলি? এত বাংলার কিংবা ভারতের মাটির সুর নয়। কিংবা তাঁর সৃষ্ট কোন নতুন সুর নয়। তবু তা কালের বর্ষায় ক্ষণস্থায়ী কালির মত কেন মুছে গেল না? তার মানে কি এই নয় যে বিদেশিনীর পোশাক তিনি এমন এক সুন্দরীকে পরিয়েছিলেন, যার রূপ শাড়ীর পরিবর্তে সালোয়ারে দীপ্তি

হারায় না। বস্তুত ঐ সব গানের কাব্যগুণই গানগুলির ভিতর-পৃথিবী থেকে এমন এক রূপকে বিচ্ছুরিত করে যা অলঙ্কারের দ্যুতিকেও হার মানায়। কবির-অভিজ্ঞতাজাত গভীর জীবনবোধই সেই রূপামৃতের উৎস। ঐ গানের একটিকে নিয়ে তার মর্মোদঘাটনের চেষ্টা করলেই বুঝতে পারব রহস্যটা কোনখানে। শেষোক্ত গানটির কথা ধরা যাক। সম্পূর্ণ গানটি এই :

রুম ঝুম্ ঝুম ঝুম রুম ঝুম্ ঝুম্
খেজুর পাতার নূপুর বাজায়ে—
কে যায়॥

ওড়না তাহার ঘূর্ণি হাওয়ার দোলে
কুসুম ছড়ায় পথের বালুকায়॥

তার ভুরুর ধনুক বেঁকে ওঠে
তনুর তলোয়ার,
সে যেতে যেতে ছড়ায় পথে
পাথর কুঁচির হার।
তার ডালিম ফুলের ডালি
ঐ গোলাপ গালের লালি
যেন ঈদের চাঁদ ও চায়॥

আরবী ঘোড়ার সওয়ার কোন বাদশাজাদা বুঝি
সাহারাতে ফেরে কোন্ মরীচিকায় খুঁজি।
কতো তরুণ মুসাফির পথ হারালো হায়,
কতো বনের হরিণ মরে তারি রূপ-তৃষায়॥

শ্রাবণ কল্পনার সাহায্যে যে ছবিটি ধরা হয়েছে, সে যেন অদেখা সুন্দরী নারী। হাওয়ায় মর্মরিত খেজুর পাতার শব্দ যেন তার পদ-নূপুরের-নিক্কণ। আসলে হাওয়া না নৃত্যরতা সুন্দরী মেয়ে এমনি একটি সন্দেহের আর্শিতে হাওয়ার পরিবর্তে সুন্দরী নারীর রূপই প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে। ঘূর্ণি হাওয়ায় উত্থিত বালুকা কোনো তন্বঙ্গীর ওড়নার সাদৃশ্য রচনা করে—যে পথের বালিতে কুসুম ছড়ায়। হাওয়ার আঘাতে ঝরে যাওয়া ফুলকে মনে হয় বালিকার ছড়িয়ে দেওয়া ফুল।

পরের স্তবকটিতে অশরীরী নারী ও হাওয়ার মধ্যের ব্যবধান ঘুচে যায়, নারীই শরীরী রূপ ধারণ করে জেগে ওঠে সুস্পষ্টভাবে, রক্তমাংসের শরীর নিয়ে। কবি তার রূপ বর্ণনা করলেন এইভাবে : নাচের সঙ্গে সঙ্গে কৃশাঙ্গীর তনু দেহ তীক্ষ্ণ বঙ্কিম আকার ধারণ করল, ধনুকের মত বেঁকে উঠল ভুরু। অথবা তন্বঙ্গীর দেহের তলোয়ার ভ্রূযুগল ধনুকের মত বেঁকে উঠল লক্ষ্যভেদের জন্য। পরবর্তী পংক্তিতেই আবার হাওয়ার অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়, যখন দেখতে পাই মেয়েটি পথ চলতে চলতে কুঁচি পাথরের হার ছড়াচ্ছে—হার মেয়েটি ছড়াচ্ছে, না হাওয়ার ধূলি কঙ্করময় পাথরের কুচি উৎক্ষিপ্ত হয়ে ছড়িয়ে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে, অভিমানী ক্ষুব্ধা প্রেমিকা গলার হার ছিঁড়তে ছিঁড়তে ছড়াতে ছড়াতে দৌড়ে চলে যাচ্ছে। পববর্তী স্তবকে কবি তাঁর 'স্বপনমরুচারিণী'র রূপ বর্ণনা করলেন এইভাবে: 'তার ডালিম ফুলের ডালি / ঐ গোলাপ গালেব লালি।' অন্ত্যানুপ্রাস এবং 'ল' অক্ষরের বৃত্তানুপ্রাসের ছন্দ-লালিত্যে এব রূপ কাব্যরসের ভাষায় উত্তীর্ণ হয়েছে ত বটেই, সেই সঙ্গে চরণ দু'টি প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষার আশ্চর্য উদাহরণ হয়ে উঠেছে।

মেয়েটির হাতে রক্ত-রাঙা ডালিম ফুল-ভর্তি ফুলের ডালি আছে—যে ডালি থেকে মেয়েটি ফুল ছড়াচ্ছিল—আর মেয়েটির গোলাপ-রাঙা গালের লাল সুষমা যেন ঐ ডালির মধ্যকার ডালিম ফুল। পটভূমি ছিল আরব মরুর মরূদ্যানের পথ কিন্তু ডালি হাতে যে মেয়ের রূপ আঁকা হল, সে বাংলার গ্রাম্য পথের দৃশ্যকেও উন্মোচন করল। মেয়েটির সুন্দর মুখের সংগে লাল ডালিম ফুল ও রক্ত-রাঙা গোলাপ কিংবা গোলাপী গোলাপের যে ছবি ফুটে ওঠে তা তুলনাহীন কিন্তু তারও পরে আরও একটি পংক্তিতে কবি মেয়েটির রূপকে বিস্ময়কর সৌন্দর্যে উত্তীর্ণ করেছেন। নিশ্চিহ্ন হাওয়ার স্থানে ফুটে উঠেছে মেয়েটির অনিন্দ্যসুন্দর দেহবল্লরী এবং তার এমন একটি সুদুর্লভ কটাক্ষ, যার তুলনা চলে ক্ষীণাঙ্গী স্বর্ণাভ-ঈদের চাঁদের সঙ্গে। কবি সাধারণ দিনে ওঠা প্রথম চাঁদের কথা না বলে ঈদের চাঁদ বললেন কেন? তার কারণ এর সংগে একটি বিশেষ খুশির আবেগ জড়ানো আছে। ঈদ মুসলমানের শ্রেষ্ঠতম পর্ব। উৎসবের আনন্দমাখা ঐ চাঁদ। একেই বলে অলঙ্কার।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন : 'অলঙ্কার জিনিসটাই চরমের প্রতিরূপ'। প্রিয়ার রূপকে ফুটিয়ে তুলতে কবি সেই চরম প্রকাশভঙ্গির আশ্রয় নিয়েছেন। এ যেন রসের সবটুকু নিংড়ে নেওয়া।

কিন্তু এতেই যেন আমরা পরম সন্তোষ লাভ না করি। কে যায়? এই প্রশ্নের উত্তর ঐ স্তবক পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। কবি প্রথমে বলছিলেন, যাচ্ছে কে, হাওয়া, না কোন সুন্দরী রূপসী? উৎপ্রেক্ষা পরিবর্তন করে কবি বললেন, বোধ হয় কোন বাদশাজাদা আরবী ঘোড়ায় চড়ে তার মরীচিকারূপিনী ছলনাময়ী প্রিয়াকে খুঁজে ফিরছে— কোন দিন পাওয়া যাবে না, তৃষ্ণা-জাগানিয়া যে প্রিয়াকে অথবা তার প্রেমকে—যার অদৃশ্য রূপ-মোহে কত তরুণ প্রেমিক ভ্রান্তির পথে জীবন উৎসর্গ করেছে। এখানে কাব্য অস্পষ্ট রহস্যালোকের মত সুন্দর হয়ে উঠেছে—যা কেবল বিরহী প্রেমিকের অথবা পরশ-পাথর রূপ রূপ-তৃষ্ণার্ত, রূপানুসন্ধানী শিল্পীর পক্ষেই অনুভব করা সম্ভব।

প্রসংগত উল্লেখযোগ্য, মরীচিকা যেমন মৃগতৃষ্ণাকে পরিতৃপ্ত না করে তাকে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করে এবং মৃত্যুর লালায়িত জিহ্বার দিকে আকর্ষণ করে, তেমনি প্রেমিক অথবা শিল্প-প্রেমিক জীবনকে নিঃশেষ করে ছলনাময়ী রূপের রহস্যময় আকর্ষণে। রূপকে ছুঁতে ব্যর্থ হয় বলে সে ফিরে আসে না, আরও একটু এগিয়ে গেলে পাবে বলে এগিয়ে যায় এবং অধরার ক্ষুধার্ত গালের মধ্যে সবশেষে প্রবেশ করে আবিষ্ট আরশোলার মত।

প্রকৃত শিল্পী না হলে বাস্তবলাঞ্ছিত শিল্পী-জীবনের এই জ্ঞানলাভ করা যায় না এবং তাকে রূপ দেয়া সম্ভব হয় না অমন অনিন্দ্যসুন্দর ভাষায়। এই ভাবনায় সমৃদ্ধ হয়ে আলোচ্য গানটি সৌন্দর্যের অপরূপ নিদর্শন হয়ে উঠেছে।

জীবনবোধের এই গভীর উৎসার অতি কুটিল কিন্তু সর্বাপেক্ষা স্বচ্ছ ভাষায়—রূপায়িত হয়ে ওঠে না আজকালকার কোন কবির গীতি-কবিতার ভাষায়। তাই আধুনিক গান হয় না—'ব্যথা-রাঙা হৃদয়-সরসীর রক্তশতদল।

নজরুল-মানস

'এক যে ছিল রাজা' বলে গল্প বললে একদিন তার শ্রোতার অভাব হত না, বরং সেই জমকালো পোশাকের রাজার চেহারার আদ্যোপান্ত বর্ণনা এবং তার আজগুবি বীরত্বের, ব্যক্তিত্বের কাহিনী শুনে রাত ভোর করে দেওয়ার শ্রোতার সংখ্যাই এককালে ছিল বেশী। পৃথিবীর বয়স বাড়বার সংগে সংগে এবং দুনিয়ার চেহারার পরিবর্তনের সাথে সাথে সেই সব কল্পনাশ্রয়ী কাহিনীর যেমন দাম কমে গেছে তেমনি পরীর গল্প শুনে ঘুম মাটি করার লোক আমাদের মধ্যে বিরল। সখের জিনিসের সংগে শিল্পের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হলেও মানুষ এখন জীবনধারণের উপযোগী বিষয়বস্তুকে চিত্তাকর্ষক করায় পক্ষপাতী। এই পথ ধরেই বোধ হয় সাহিত্যে বাস্তবতা কথাটা এসেছে এবং পরোক্ষের চেয়ে প্রত্যক্ষের প্রতি মানুষের ঝোঁক হয়েছে প্রবল। রাজারাণীর কথা সাহিত্যে আর নেই বললেই চলে, সেখানে জুড়ে বসেছে শ্রোতারই জীবনের ইতিহাস অথবা সত্যজীবনের কার্যকলাপ।

আধুনিক বাঙলা সাহিত্যের জনক মধুসূদন, বিদ্যাসাগরে সাধারণ মানুষের স্থান ছিল না, বঙ্কিমের কারবারও ছিল ঐতিহাসিক রাজ-রাজড়ার কাহিনী নিয়ে এবং 'বিষবৃক্ষে'র মত সামাজিক উপন্যাস লিখলেও তিনি জমিদারের আঙিনা ডিঙিয়ে আসতে পারেননি, এবং 'রাধারাণী' 'রজনী'তে তিনি জটিল সংসারমুক্ত জীবনের রোমান্টিক স্বপ্নকে এঁকেছেন, আর 'কপালকুণ্ডলা' ত বিশুদ্ধ রোমান্টিক কল্পনা; বঙ্কিমচন্দ্র কি তাঁর সমসাময়িক কালকে উপস্থাপন করতে পেরেছিলেন, দেখাতে পেরেছিলেন কি বাংলাদেশের লোককে কোথাও প্রকৃতপক্ষে? জানি সমসাময়িক কালের সমাজ চিত্রের বাস্তবতার কিছু গভীর চিত্র আছে দীনবন্ধু মিত্রে এবং তাঁর সমস্ত ক্রিয়াকাণ্ড এই মাটির মানুষকে নিয়ে। সেই প্রথম, সম্ভবত একজন আধুনিক লেখকের হাতে সমাজ

ধরা দিয়েছিলে তার সম্পূর্ণ চেহারা নিয়ে, তিনি রিয়্যালিজমকে ছুঁতে পেরেছিলেন। প্রজাপীড়নের বাস্তব ছবিকে চিত্রায়িত করে বাংলা সাহিত্যে জীবন্ত দুঃখের সংগে তিনি বাঙালী পাঠকের প্রথম পরিচয় ঘটিয়ে দিতে পেরেছিলেন বলে পরবর্তীকালে রবীন্দ্র-শরতের পক্ষে রাজ-বাজড়াব অতিরঞ্জিত কাহিনী থেকে মুক্তি পাওয়া সহজ হয়েছিল। এবং মাটির মানুষের আকাঙক্ষাবহুল বাস্তব জীবনের সংগে তাঁরাও আমাদের পরিচয় করিয়ে দিতে পেরেছিলেন। কিন্তু বৃটিশ শাসনে সৃষ্ট তিন শ্রেণীর জীবনের প্রথম দুটি ধাপের নীচে তাদের পবিচয় ছিল চাকর-মনিবের সাধারণ সম্পর্কের সংগে। সমাজ-সংস্কারের ভূমিকা ছাড়া শরৎচন্দ্রের কাছ থেকে আমরা আরও বেশী কিছু পেয়েছিলাম কিনা জানি না, কেননা মধ্যবিত্ত জীবনের সুখ-দুঃখের কাহিনী তার মধ্যে পেলেও আমরা সে জীবনের মৌল সমস্যা বেশী কিছু পেয়েছিলাম বলে মনে হয় না। চিরকালীন মানুষের মন নিযে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, ব্যক্তির মনান্তরালের উৎক্ষিপ্ত ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বাসনা-কামনাগুলোকে তিনি প্রহরীর মত সজাগ থেকে এঁকেছেন এবং দীনাতিদীনের প্রতি তার অসীম প্রতিভা করুণা করতে কুন্ঠিত হয়নি তবু অতিমর্ত্য জীবনের প্রতি তার দৃষ্টি ছিল পরোক্ষের এবং তাই তার রশ্মিতে আলোকিত হয়ে প্রত্যক্ষের কাছাকাছি এসেও সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত মানুষের সোচচার দুঃখের কথা ফুটিয়ে তুলতে পারেননি রক্তরঞ্জিত করে, তাকে ন'ড়ে চ'ড়ে বসার মত দিতে পারেননি প্রাণের স্পর্শ, যদিও সমাজের অধমতম মানুষ মেথরের প্রতি সহানুভূতি জানিয়ে তিনিই প্রথম লিখেছিলেন 'কে বলে তোমারে বন্ধু অস্পৃশ্য অশুচি।'

জীবনের কাজে লাগার ব্যাপারকে আসলে নজরুল ইসলামই প্রথম বাংলা সাহিত্যে মজবুত করে প্রতিষ্ঠিত করলেন। সমসাময়িক কালের মানুষেব কন্ঠ সেই প্রথম ধরা দিল লেখার মধ্যে, বলা অসংগত হবে না তার অসাধারণ জনপ্রিয়তার মূলে ছিল জীবনের কতকগুলি মৌলিক সমস্যার এবং কতকগুলো অচ্ছেদ্য দাবীর অবিকৃত প্রতিবিম্ব। নজরুল ইসলাম কালকে ধরতে পেরেছিলেন, সুতরাং যা কিছু দৃশ্য যা কিছু স্মৃতি বিজড়িত, যা কিছু ইচ্ছা-সম্পৃক্ত, সে কালের মানুষের, তারা

সব চেহারা না বদলে তার কলমে ফুটে উঠতে লাগল। পাঠক এতদিনে নিজের দেখা পেলেন তাঁর লেখায়—নিজের দুঃখের এবং ব্যথা-বেদনার ছবি এমন স্পষ্টভাবে এর আগে তাঁরা কারও লেখায় খুঁজে পাননি।

এ পাঠক বৃটিশ শাসনের রুষ্ট আঁখির নাগপাশে শুধু বাঁধা ছিল না যদিও প্রধানতঃ ভারতবর্ষ ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ব্যবস্থায় জীবন্মৃত ছিল তবু আত্মবিস্মৃতির তমসায় তলিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা হয়েছিল তার বেশী। সুতরাং এ-জাতির ত্রাণকর্তা হিসেবে যে দায়িত্ব তিনি কাঁধে নিয়েছিলেন সেটা সাধারণ মানুষের দায়িত্ব নয়। ভারতবাসীর সামনে তখন হাবুডুবু খাওয়ার মত অনেকগুলো নদী ছিল। কেবল বৃটিশ শাসন থেকে মুক্তি পেলেই যে মানুষ উদ্ধার পেত তা নয়। কেবল ধনতান্ত্রিক জীবন-ব্যবস্থা থেকে রেহাই পাওয়া ও বেঁচে যাওয়াও নয়. পরের মর্জির উপরে বেঁচে থাকা জীবনের মর্চে পড়া অবস্থারও রদবদলের প্রয়োজন ছিল একান্তভাবে দরকার। রেললাইনের মত এক ধরনের গতানুগতিক জীবনের যে কাঠামো তৈরী হয়েছিল আমাদের, তার সামনে পড়েছিল অসংখ্য সংস্কারের পর্বত। আত্মমুক্তির বাসনাকে পঙ্গু করে দেওয়ার জন্যে ধর্মীয় গোঁড়ামী, প্রগতির প্রতি অনাস্থা, কৌলিন্যের প্রতি মমত্ব, স্বাজাত্যাভিমান এবং সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা মানবজাতির অগ্রগামিতার বিরুদ্ধে দাঁড়াবার মত আশ্চর্য প্রতিবন্ধকতাসমূহ।

'বিদ্রোহী' কবিতায় যে নজরুল খোদার আরশ ছাড়িয়ে যাওয়ার স্পর্ধা দেখালেন তা মানুষের শক্তি সম্ভাবনাকে গোচরীভূত করার জন্য। নৈরাশ্যে একেবারে কুঁজো হয়ে যাওয়া মানুষের মনকে ঐ মন্ত্রছাড়া জাগিয়ে তোলার আর বোধ হয় কোন উপায় ছিল না।/ বলা বাহুল্য, নজরুলই বাঙলা ভাষায় প্রথম সৃষ্টি করলেন উদ্দেশ্যমূলক সাহিত্য। রাজনৈতিক সাহিত্য-রচনা করে এবং কবিতা লিখে যে সমাজ কাঠামো পাল্টানো যেতে পারে এ-খবর তিনিই প্রথম ঘোষণা করলেন সরবে।/ ফলত ধ্বংস করার মন্ত্র জোগালেও সৃষ্টি সম্ভাবনার মূলোচ্ছেদ করার প্ররোচনা দেননি তিনি। 'প্রলয়োল্লাসে' তাই তিনি বলেছিলেন:

> ধ্বংস দেখে ভয় কেন তোর? প্রলয় নূতন সৃজন-বেদন।
> আসছে নবীন—জীবন-হারা অসুন্দরে করতে ছেদন।

তাই সে এমন কেশে-বেশে
প্রলয় বয়েও আনছে হেসে'—
মধুর হেসে।
ভেঙে আবার গড়তে জানে সে চির-সুন্দর।
[প্রলয়োল্লাস . অগ্নিবীণা]

অর্থাৎ ভাঙা মানেই বিলুপ্ত করে দেওয়া নয়, নতুন করে জন্ম দেওয়ার ক্ষমতাহীন সৃষ্টিকেই ধ্বংস করে নতুন-সৃষ্টি-সম্ভাবনাকে স্থান করে দেওয়া। বস্তুতঃ ঐ একটা কবিতাতেই তিনি তাঁর মৌল উদ্দেশ্যকে ব্যক্ত করেননি। 'অগ্নি-বীণা', 'বিষের বাঁশী', 'জিঞ্জির' এবং 'সন্ধ্যায়' ঘুরে ফিরে ও কথাটা তিনি অনেক বার বলেছেন।

প্রসংগত, তিনি ফাঁকা আওয়াজে বিশ্বাসী ছিলেন না এবং প্রতারক দুনিয়ার সংগে বাস্তব পরিচয় থাকার জন্যে পরোক্ষ ফলের প্রতি তাঁর কোন বিশ্বাস ছিল না। তিনি বোধহয় জানতেন মানুষকে ঠকানোই মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি; তাই বিনয়ী কন্ঠের সুশোভন আওয়াজকে তিনি তাঁর জাগরণমূলক কবিতা থেকে বাদ দিয়েছিলেন। বস্তুত তাঁর অনেক কবিতাকে এমনিতে অমধুর ঠেকলেও তাঁর সত্যতার দীপ্তি অন্তত বঞ্চিতের কানে সুমধুর। এবং বলতে কি বাঙলা সাহিত্যে তিনিই প্রথম সাহিত্যিক এবং প্রথম কবি যিনি হা-ভাতেদের জন্যে অস্ত্র ধরেছিলেন। অভাবের তাড়নায় তিনি টের পেয়েছিলেন যে জগতের অধিকাংশ মানুষের পরিশ্রমের সারাংশ খেয়ে অল্প কয়েক জনের আরাম-আয়েশে দিন যায় এবং এই অসহ্য অপরাধকে চোখে দেখে তার প্রতিবাদ না করার মত ক্লীবত্ব আর কিছুতেই নেই। সুতরাং একা ভারতবাসীর নয় তাবৎ বিশ্ববাসীর বেদনা নিয়েই তাঁর সাহিত্য-জীবনের শুরু। বলা বাহুল্য কবি জগতের মানুষকে দুটি শ্রেণীতে ভাগ করে নিয়েছিলেন। অত্যাচারী আর অত্যাচারিত। তাঁর চোখে সাম্প্রদায়িকতা, জাতিভেদ শ্রেণীভেদ ইত্যাদি নারকীয় বিষয় বলে মনে হত এবং তাই মৌল কথার ফাঁকে ফাঁকে যাজক, পুরোহিত, মোল্লাদের তিনি কষে চাবুক মারতে দ্বিধাবোধ করেননি।

যে সমাজকে তিনি দেখেছিলেন সে সমাজকে যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দেখেননি তা নয়, প্রজাপালক জমীদারগৃহে জন্মালেও রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে সাধারণ ঘরের কাহিনী যে না ছিল তা নয় এবং বলাকার যুগে পৌঁছে পরিবর্তনশীল দুনিয়ার চেহারা তাঁকে নতুন করে জাগিয়ে তুলেছিল যে সে কথাও অবিসম্বাদিতভাবে সত্য। কিন্তু সনাতন প্রেমের প্রতি আস্থা থাকার ফলে তিনি সোজা আঙুলে ঘি না ওঠার প্রবচনকে আমল দেননি। আসলে রক্ত-মাংসের ক্ষুধাকে মূল্য দেওয়ার মত মানসিক গঠন রবীন্দ্রনাথের ছিল না। এবং তার কাছে আত্মার পিপাসা অমোঘ ছিল বলে তিনি ক্ষুধাতুর মানুষের দুঃখ-বেদনাকে সাহিত্যের গুলিস্তান মাড়াতে দেননি। তাদের জন্যে দুঃখ অনুভব করলেও সেই দুঃখ মোচনে সাহিত্যের খঞ্জর হাতে নেননি। এ-কথা বলার অর্থ এই যে, যে বৃটিশ শাসনে তিনি এবং নজরুল ইসলাম দু'জনে বাস করেছেন তার শাসন-শোষণ যেন তিনি দেখেও দেখেননি; এবং 'ভারততীর্থ' কবিতায় 'সেই হোমানলে হের আজি জ্বলে দুঃখের রক্তশিখা/হবে তা সহিতে মর্মে দহিতে আছে যা ভাগ্যে লিখা' লিখে তিনি প্রকারান্তরে তদানীন্তন ভারতবাসীর দুঃখের জন্য তার অদৃষ্টকে দায়ী করেছেন। কিন্তু আধুনিক মানুষ বোধ হয় পুরুষ্কারের প্রতি বেশী আস্থাশীল এবং সে জানে যে ঘরে বসে তসবী গুনলে তার কপাল খোলে না, আহার জোটাতে গেলে তার রাস্তায় নামতে হয় এবং মাথার ঘাম পায়ে না ফেললে তার পেটে ভাত যায় না। এ কথা বলা অসংগত যে রবীন্দ্রনাথ মানুষের কল্যাণ কামনা করেননি বরং মানুষকে তিনি মহৎ মানুষের বেদনা অনুভব করতে শিখিয়েছেন। কিন্তু, যেহেতু তিনি প্রকাশ্যভাবে সুন্দরের পূজারী এবং স্বপ্নচারী ছিলেন তাই বাস্তবের ছায়া মাড়াতে তাঁর সঙ্কোচ ছিল। জগতকে তিনি পুরোপুরি চিনেছিলেন কিন্তু জীবনের অমাবস্যায় নেমে তাঁকে পথ হাতড়াতে হয়নি ব'লে 'হা অন্ন হা অন্ন' করে বেঁচে থাকার সমস্যা ছিল তাঁর অজ্ঞাত, ফলে জীবনকে তিনি উর্ধ্বস্তর থেকে দেখেছিলেন শুধু, তার পথের পাঁকে নেমে পায়ে কাঁটা বেঁধার যন্ত্রণা তিনি টের পাননি। এই সব কারণে আধুনিক মানব-

চৈতন্যের সংগে তাঁর কল্প-চৈতন্যের পার্থক্যকে তিনি চেষ্টা করেও দূর করতে অপারগ ছিলেন।

বর্তমান বিশ্বমানবের চৈতন্যের সংগে নজরুল ইসলামের মানস-চৈতন্যের পুরোপুরি সামঞ্জস্য আছে কিনা সেটাও লক্ষণীয়। আধুনিক বিশ্ব-সাহিত্যিকদের চিন্তাধারা কোনো একটা খাতে প্রবাহিত নয়। রবীন্দ্রনাথের সংগে নজরুল ইসলামের যেখানে মিল সেটা রোমান্টিক কবিদের আশামগ্নতা। নজরুল ইসলামের কবিতায় আমরা যে জিনিসটার অভাব লক্ষ্য করি তা হ'ল বুদ্ধির প্রয়োগে অনীহা। যদিও কবিতা বুদ্ধির চেয়ে হৃদয়কে বেশী দাবি করে তবু আধুনিক কবিতা বলতে ঐ বুদ্ধির সহযোগে চিন্তার পরিশ্রুতিকেই আমরা বুঝি। জীবন জটিল, গ্রন্থিল হয়ে যাচেছ ক্রমে ক্রমে। কারণ কোন বিশেষ মতবাদে বিশ্বাস করে মানুষ স্থির হতে পারছে না। দার্শনিক মতবাদ যেমন পাল্টাচ্ছে তেমনি রাজনৈতিক, রাষ্ট্রনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং বৈজ্ঞানিক মতবাদও পাল্টে যাচ্ছে। সুতরাং মানুষ সহজ করে কোন কিছু ভাবতে গেলেই আর ভাবতে পারছে না। প্রথম মহাযুদ্ধের শুরু থেকে এই ভাবনার জটিলতা শুরু হলেও নজরুল ইসলামের কাব্যে তা ঠাঁই পায়নি। তা না পেলেও রাজনৈতিক হাওয়ায় তিনি তাঁর কবিতাকে প্রথম থেকে পুষ্ট করতে পেরেছিলেন এবং বলশেভিকবাদের তিনি পুরোপুরী সমর্থক না হলেও সাম্যবাদকে তিনি কবিতার কাজে লাগাতে পেরেছিলেন। যদিও রুশীয় সাম্যবাদ এবং তাঁর সাম্যবাদ সমার্থক নয় তবু যে জনগণের জন্যে মার্কসের মাথাব্যথা ছিল সেই জনগণের প্রতি তাঁরও দরদ ছিল অকৃত্রিম। এবং কেবল সর্বহারাদের জন্যে তিনি সমস্ত কবিতা না লিখলেও যে দু'চারিখানা বইতে তিনি তাদের কথা বলেছেন তা থেকেই অনুমান করা যায় যে যতটুকুই তিনি তাদের জন্যে লিখুন না কেন তা তাঁর হৃদয় নিঙড়ানো কথা। একথা বলার অর্থ এই যে তাঁর সমসাময়িক কালে অথবা তাঁর পরে সর্বহারাদের জন্যে আরও কয়েকজন কবিতা লিখলেও স্বচ্ছতায়, ঋজুতায় স্পষ্টতায় এবং সর্বোপরি তেজোস্ক্রিয় বোমার মত কার্যকারিতায় তাঁর কবিতাই আজও বেশী মারাত্মক।

রাজনৈতিক মতবাদে স্পষ্টত জীবন সঁপেননি নজরুল ইসলাম এবং কমরেড মুজফ্ফর আহমদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু হওয়ার ফলে গণচিত্তহারী কবিতা

লেখায় তাঁর পারদর্শিতা আকাশচুম্বন করলেও ঢোল পেটানো রাজনীতির ঝড়ে তাঁর শিল্পী-সত্তা উড়ে যায়নি। ওদিকে সম্পূর্ণ ধার্মিক মানুষ হওয়া সত্ত্বেও কোন বিশেষ ধর্মীয় মতবাদের বড়শীতে আটকে পড়া তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। এক কালে মুসলমান হিসাবে তিনি মুসলমানদের ঘুমভাঙানোর গান গেয়েছিলেন, অন্তরের তাগিদে। কিন্তু সেই সংগে বিশ্বমানবের দিকে পিঠ ফিরিয়ে দাঁড়াবার মত সংকীর্ণতা তাঁর অজ্ঞাত ছিল। এবং বললে ভুল হবে না তাঁর প্রিয় মুসলমান তাঁরাই যারা 'জালিমের দাঙ্গায়' শাহাদৎ বরণ করেন।

হয়ত মতবাদে বিশ্বাসী লোক তাঁর কবিতায় কোন স্থিতি স্থাপকতা খুঁজে পাবেন না, পাবেন না বিশেষ চারিত্র্য এবং তাঁকে বারো ঘাটের পানি খাওয়া মানুষ বলে কেউ কেউ গাল দেবেন। কিন্তু ভুললে চলবে না যে তিনি আজীবন অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়েছেন।

তিনি ইসলামী কবিতা ও গান লিখেছিলেন ব'লে অথবা প্রেমের কিংবা কালীর গান লিখেছিলেন ব'লে তাঁর চরিত্রে কালি পড়েছিল এমন মনে করা অসঙ্গত। সঙ্গত নয় এই জন্যে যে, যে সংস্কৃতির ভিতরে তাঁর জন্ম সেটাকে শঙ্কর জাতির সংস্কৃতি বললে ভুল হয় না। বিশেষ কোন মতবাদের খোলসে ঢুকে ঘাপটি মারার স্বভাব তাঁর নয় বলে তিনি মুসলমান হয়েও কীর্তন গান লিখতে পেরেছিলেন। তাছাড়া বাঙালীর যে ঐতিহ্য তাতে হিন্দু-মুসলমানের ঐতিহ্যের মিলন অস্বাভাবিক নয়। এবং হিন্দু-মুসলমান সংস্কৃতি কোরআন পুরাণ এবং রামায়ণ মহাভারত মিশ্রিত শরবতের মত শৈশব থেকে তিনি আকণ্ঠ পান করে তাঁর মনও মেধাকে পুষ্ট করেছিলেন। বাঙলা দেশের ইতিহাস ঘাটলে আমরা দেখতে পাব এদেশে মুসলমান নবাব আমলে হিন্দুদের আধিপত্য কম ছিল না এবং গৌড়ের মুসলমান বাদশারা হিন্দুদের প্রশ্রয়-দিতে কার্পণ্য করেননি। বলা বাহুল্য মুসলমান বাদশাহদের বদান্যতায় বাঙলা সাহিত্য বাঁচবার পথ পেয়েছিল এবং সেই উদার মতবাদের দরুণ পারস্য-আগত সুফী মুসলমানের সংগে এ-দেশের বৈষ্ণবদের এতটাই ভাব জমে উঠেছিল যে বাস্তবিক তাঁরা কোন্ ধর্মের লোক সেটা আর চেনা মুসকিল ছিল। যলত এ-দেশীয় বাউল সম্প্রদায়ের লোকদের

নিযে তাদের ধর্মের সম্বন্ধে অনেককে তর্ক কবতে দেখা যায। বাউলেবা নিজেদেবকে জাতি ধর্মের উর্ধ্বে বলে নিজেদেবকে মনে কবেন। নজরুল সবাসবি ঐ বাউল সম্প্রদায়েব লোক না হলেও ঐধরনেব বিশ্বমানবিক চৈতন্য তাব মধ্যে থাকাতে সংকীর্ণতাব চাপাকল থেকে নিজেকে তিনি মুক্ত বাখতে পেবেছিলেন এবং সত্যিকাব মুসলমান বলেই অস্পৃশ্য যেমন তাঁব আলিঙ্গন লাভ কবেছে তেমনি বিধর্মী পেযেছে তাঁব অপবিসীম বন্ধুত্ব।

'বাঁধনহারা'

কোনো জীবন স্মৃতি লেখেননি নজরুল ইসলাম, অরন্তঙ্গ ডায়রীও না। কিন্তু বড় জীবন্তভাবে আমরা তাঁর ব্যক্তিত্বকে উপভোগ করি তাঁর সমস্ত সাহিত্যকর্মে। জাত কবি তিনি, জাত ঔপন্যাসিক নন। তবু তাঁর কবিতার রসোপভোগের জন্য প্রয়োজন হবে তাঁর উপন্যাস পাঠের। যে-কথা তিনি অন্তরঙ্গ ডায়রীতে লিখতে পারতেন তা তিনি তাঁর চিঠিপত্রে, প্রবন্ধে, অভিভাষণ, প্রতিভাষণে এবং তাঁর গল্প উপন্যাসে কোন না কোন ভাবে বলেছেন। বলা বাহুল্য তাঁর 'বাঁধনহারা' যেন তাঁব জীবনালেখ্য এবং সে আলেখ্য অস্পষ্টভাবে নয়, স্পষ্টভাবে প্রতিবিম্বিত। অর্থাৎ আমরা এপর্যন্ত তাঁর প্রথম জীবন সম্বন্ধে যে সব কথা তাঁর ভক্তদের ও তাঁর বন্ধুদের লেখা তাঁর জীবন চরিতে পড়েছি 'বাঁধনহারা'র অনেক কথার সংগে কোথাও কোথাও তাদের আশ্চয সাদৃশ্য আছে। বস্তুত নজরুল-কাব্যে কবির যে জীবনদর্শন আমরা খুঁজে বের করার চেষ্টা করি তার কিছু সন্ধান তিনি এই 'বাঁধনহারা'য়—রেখে গেছেন। তাঁর ব্যক্তিগত চিন্তা-ভাবনা ত বটেই এমন-কি সমাজ, ব্যক্তি-ধর্ম এবং রাজনৈতিক চিন্তার স্পষ্ট ছাপও এতে প্রতিফলিত। কিসের জন্য তাঁর বিদ্রোহ, কেন বিদ্রোহী তিনি, তিনি আস্তিক অথবা নাস্তিক এই সবের বিশদ ব্যাখ্যা 'বাঁধনহারা'য় আছে বলে আমার বিশ্বাস। এখন বিশ্লেষণ করে আমাদের ধারণার স্বপক্ষে যুক্তি দেখানো যাক।

'বিদ্রোহী' ও 'ধূমকেতু' কবিতা দুটির টীকা হিসাবে আমরা 'বাঁধন-হারা'র এই কথাগুলোকে উপস্থাপন করে দেখাতে পারি যে স্রষ্টার প্রতি তাঁর বিক্ষোভ অভিমান ভিন্ন কিছু নয় :

বিদ্রোহটা ত অভিমান আর ক্রোধের রূপান্তর। ছেলে যদি রেগে বাপকে বাপ না বলে, বা মাকে মা না বলে তাহলে কি সত্যি সত্য তার পিতার পিতৃত্ব মাতার মাতৃত্ব মিথ্যা হয়ে যায়? যে ক্ষুব্ধ অভিমান তার বুকে জাগে, তার শেষ হলেই মায়ের ক্ষ্যাপা ছেলে ফের মায়ের কোলে কেঁদে লুটিয়ে পড়ে।

উপরের ঐ উদ্ধৃতিতে আমরা নজরুল ইসলামের জীবন-দর্শনের একটি বিশেষ দিকের উদ্‌ঘাটন লক্ষ্য করি। নজরুল-চরিত্র পরস্পর-বিরোধী আদর্শে পরিপূর্ণ বলে যাঁরা মনে করেন তাঁরা বুঝতে পারবেন ঈশ্বর শির উল্লংঘনকারী বিধাতার বুকে হাতুড়ীর আঘাতকারী বিদ্রোহী কেন 'শিরোপরি মোর খোদার আরশ' বলে খোদার প্রতি শ্রদ্ধায় অচলা ভক্তি দেখিয়েছিলেন। এবং 'ভাঙার গান'-এ বলেছিলেন 'হা হা হা পায়রে হাসি / ভগবান পরবে ফাঁসি? সর্বনাশী শিখায় এ হীন তথ্য কেরে?'

বিদ্রোহী লিখবার আগে নজরুল 'বাঁধনহারা' লিখেছিলেন। বিদ্রোহী' ছাপা হয়েছিল ১৩২৮ সালের মোসলেম ভারত-এর কার্তিক সংখ্যায় আর 'বাঁধনহারা' ১৩২৭ সালের বৈশাখ মাস থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছিল। সুতরাং 'বাঁধনহারা'র বক্তব্য নিঃসন্দেহে 'বিদ্রোহী' পূর্ব সময়ের। তবু সেই পূর্ব "বিদ্রোহী" লেখায় আমরা বিদ্রোহী কবির চেহারা চরিত্র সম্পূর্ণভাবে রূপায়িত হতে দেখছি :

আমি চাচ্ছিলাম আগুন শুধু আগুন—সারা বিশ্বের আকাশে বাতাসে বাইরে ভিতরে আগুন, আর তার মাঝে আমি দাঁড়াই আমারও বিশ্বগ্রাসী আগুন নিয়ে; আর দেখি কোন আগুনকে কোন আগুন গ্রাস করে নিতে পারে; আরো চাচ্ছিলাম মানুষের খুন। ইচ্ছা হয় সারা দুনিয়ার মানুষগুলোর ঘাড় মুচড়ে চোঁ চোঁ করে তাদের সমস্ত রক্ত শুষে নিই। তবে আমার কতক তৃষ্ণা মেটে। কেন মানুষের উপর শত্রুতা। কি দুষমনী করেছে তারা আমার? তা আমি বলতে পারব না। তবে তারা আমার দুষমন নয়, তবুও তাদের আমার রক্তপানের আকাঙ্ক্ষা। সবচেয়ে মজার কথা হচ্ছে এখানে যে এতটুকু দুঃখ দেখে সময় সময় আমার বুক সাহারার মত হাহা করে ওঠে। হৃদয়ের এই যে সম্পূর্ণ বিপরীত দুষমনী ভাব এর সূত্র কোথায়—হায়,

কেউ জানে না। মানুষকে আঘাত করে হত্যা করেই আনন্দ! আমার এ নিষ্ঠুর পাশবিক দুষমনী মানুষের ওপর নয়, মানুষের স্রষ্টার ওপর। এই সৃষ্টিকর্তা যিনিই হন, তাঁকে আমি কখনই ক্ষমা করতে পারব না—পারব না। আমাকে লক্ষ জীবন জাহান্নামে পুড়িয়ে আমায় কবজায় আনবার শক্তি ঐ অনন্ত অসীম শক্তিধারীর নেই। তাঁর সূর্য, তাঁর বিশ্বগ্রাস করবার মত ক্ষুদ্র শক্তি আমারও আছে। আমি তবে তাঁকে ভয় করব কেন?—আপনি আমায় শয়তান বলবেন, আমার এ ঔদ্ধত্য দেখে কানে আঙুল দেবেন জানি, ওহ, তাই হোক! বিশ্বের সব কিছু মিলে আমায় "শয়তান পিশাচ" বলে অভিহিত করুক, তবে না আমার খেদ মেটে, একটু সত্যিকার আনন্দ পাই।

[নূরুল হুদার পত্র : বাঁধনহারা]

প্রায় শব্দে শব্দে মিলে যায় এমন বক্তব্যই কি আমরা 'বিদ্রোহী' এবং 'ধূমকেতু' কবিতাতে লক্ষ্য করি না? নীচে 'বিদ্রোহী' ও 'ধূমকেতু' থেকে এর প্রামাণিক উদ্ধৃতি দেওয়া গেল :

১. আমি সৃষ্টিবৈরী মহাত্রাস
আমি মহা-প্রলয়ের দ্বাদশ রবির রাহুগ্রাস!
আমি কভু প্রশান্ত কভু অশান্ত দারুণ স্বেচ্ছাচারী
আমি অরুণ খুনের তরুণ আমি বিধির দর্পহারী।

[বিদ্রোহী : অগ্নিবীণা]

২. পঞ্জরে মম খর্পরে জ্বলে নিদারুণ সেই বৈশ্বানর,
শোন্‌রে মর, শোন অমর!—
সে যে তোদের ঐ বিশ্বপিতার চিতা!
এ চিতাগ্নিতে জগদীশ্বর পুড়ে ছাই হবে হে সৃষ্টি জান কিতা?
কি বল? কি বল? ফের বল ভাই আমি শয়তান-মিতা!
হো হো ভগবানে আমি পোড়াবো বলিয়া জ্বালায়েছি বুকে চিতা।

একটা দুর্নিবার আগুনে কবি যে আগে থেকেই পুড়ছেন সেটা আমরা বুঝতে পারি। কিন্তু কবিতা পাঠে যে নৈর্ব্যক্তিক চেতনা আমাদের ধমনীর রক্তে সাড়া জাগায়—যাতে আমরা একটা-দগ্ধ আহত

হৃদয়ের অভিজ্ঞতাকে স্পর্শ করতে পেরেছি ব'লে মনে ক'রতে পারি—ততটা তাপ ঐ গদ্যের বাঁশীতে সঞ্চরিত হয় না। কবিতার উদ্দেশ্যটা মূর্তিমান শরীর নিয়ে জেগে ওঠে আমাদের চোখে। কিন্তু নূরুল হুদা যেন 'বাঁধনহারা'য় সেই শরীরকে তখন পর্যন্ত না পেয়ে 'হায় কেউ জানেনা এর সূত্র' ব'লে ধাবমান লক্ষ্যের পথে বাধার সৃষ্টি করে। কিংবা পরম সত্যের অনুসন্ধানে ব্যাপৃত মন বুঝি অনুভূতির অলৌকিক নাশিকায আগেই বুঝে ফেলেছিল যে 'বিপরীত দুষমনী ভাব' হৃদয়সর্বস্ব মানুষের একমাত্র রূপ। যা হোক কবিতার নৈর্ব্যক্তিকতা এই গদ্যে না থাকাব কারণ এ-গদ্য ঐ কবিতার মত সত্যিকার শিল্পকর্ম নয়। ঐ গদ্যে ব্যক্তি ব্যক্তিতেই পর্যবসিত একটি সীমাবদ্ধ সত্তা, ব্যক্তির উর্ধ্বে নৈর্ব্যক্তিক সত্তা নয়! তাই নূরুল হুদার মধ্যে লেখক নজরুল স্বয়ং চরিত্ররূপে আত্মপ্রকাশ করেন।

কবিতায নজরুল-বিদ্রোহের কারণ বোঝা যায়। কিন্তু এ-গ্রন্থে সূত্র সঠিকভাবে নিরূপণ করা যায় না। কারণ বিদ্রোহ এখানে রাষ্ট্রিক নয় সামাজিকও নয়, নিতান্ত ব্যক্তিগত। সে ব্যক্তিগত ব্যাপার কি প্রেম? প্রত্যাখ্যান! অথবা কোন পারিবারিক সমস্যা পত্রোপন্যাসটিতে স্পষ্টভাবে এ-বিষয় কোন উল্লেখ নেই। অভাব আছে অনেক কিছুর। কিন্তু সে অভাব পাঠককে পূর্ণ তৃপ্তি পরিবেশনে সক্ষম নয়। নূরুল হুদার বিরহ-বেদনাটুকু বুঝি। কিন্তু তার অতখানি তীব্রতার কারণ বুঝি না। কোন এক অজ্ঞাত কারণবশতঃ সে প্রিয়াকে ছেড়েছিল--সে বিচেছদ মানসিক স্বপ্নের মধ্যে আবর্তিত হয়েছে। মিলনের বাস্তবে রূপায়িত হতে চেষ্টা করেনি। প্রিয়তমাকে পাওয়ার প্রয়াস উপন্যাসের কোথাও নেই।

নজরুলকে তাঁর কাব্যে সব সময় একজন বিদ্রোহী নায়কের ভূমিকায় কথা বলতে দেখা যায়। কিন্তু সে বিদ্রোহী বস্তুচারী যতটা স্বপ্নচারী তার চেয়ে বেশী। পাবার ব্যাকুলতা তার আছে কিন্তু প্রার্থিত বস্তুকে ভোগের সবল পিপাসা তার নেই।

নায়কের প্রেমিকা একজন নয়, দুজন। এবং সে সম্বন্ধে সে সচেতনও। কিন্তু কোন একজনকে সে বধূরূপে পেতে চাইল না। পেতে না চাইবার কারণ ঐ "বন্ধন ভয়।"

সৃষ্টির আদিম দিনে এরা সেই যে ঘর ছেড়ে বেরিয়েছে, আর তারা ঘর বাঁধল না। ঘর দেখলেই এরা বন্ধন-ভীতু চখা হরিণীর মতন চমকে ওঠে। এদের চপল চাওয়ায় সদাই তাই ধরা পড়বার বিজুলী গতি ভীতি নেচে বেড়াচ্ছে। এরা সদাই কান খাড়া করে আছে, কোথায় কোন গহন পারের বাঁশী যেন শুনছে আর শুনছে। যখন সবাই শোনে মিলনের আনন্দ রাগ, এরা তখন শোনে বিদায়-বাঁশীর করুণ গুঞ্জরণ। এরা চিরদিনই ঘর পেয়ে ঘরকে হারাবে আর যত পরকে ঘর করে নেবে। এরা বিশ্ব-মাতার বড় স্নেহের দুলাল, তাঁর বিকেলের মাঠের চারণ কবি যে এরা।

নজরুল-সাহিত্যে বিরহের যে একটা উদ্বেল কান্না বাঙ্ময় তারই কথা উপযুক্ত পত্রে বিধৃত।

ব্যক্তিজীবনে কাজী নজরুল ইসলাম সংসারী। তবু তাঁর জীবন বিশ্লেষণে দেখা যায় সাধারণ সংসারী মানুষের ভোগাশক্তি তাঁর নেই। দারা-পুত্র-পরিবার ছিল তাঁর। কিন্তু মনে রাখতে হবে এই উপন্যাস লেখার সময় নজরুল ইসলাম বিবাহিত ছিলেন না। অথচ কোনো নারীর প্রেমে যে তিনি পড়েছিলেন সেটাও আমরা না ভেবে পারি না। বলেছি প্রেমিকা আবার নায়কের একজন নয় দু'জন। কিন্তু নায়ক দু'জনের একজনকেও বধূ রূপে পেতে চাইল না।

ঐ দু'জন নারী কে? এমনি একটা জিজ্ঞাসা নজরুল পাঠকের মনে উদয় হতে পারে।

১৩২৭ সালে নার্গিস খানম কিংবা আশালতা সেনগুপ্তার সঙ্গে নজরুলের দেখা হয়নি। কুমিল্লায় গিয়েছিলেন নজরুল ১৩২৮ সালে। সেখান থেকে নবপরিণীতা বধূ নার্গিসকে ছেড়ে চলে আসেন এক অজ্ঞাত কারণে। কুমিল্লা থেকে আসার পর তাঁকে আমরা 'বিদ্রোহী' কবিতা লিখতে দেখি। বস্তুত তাঁর প্রথম বিবাহিত জীবনের পনেরো বছর পর তাঁর প্রথমা স্ত্রীকে তিনি লিখছেন :

আমার অন্তর্যামী জানেন, তোমার জন্যে আমার হৃদয়ে কি গভীর ক্ষত, কি অসীম বেদনা। কিন্তু সে বেদনার আগুনে আমিই পুড়েছি, তা দিয়ে তোমায় কোনদিন দগ্ধ করতে দিইনি। তুমি এই

আগুনের পরশমণি না দিলে আমি 'অগ্নি-বীণা' বাজাতে পারতুম না। আমি 'ধূমকেতু'র বিস্ময় নিয়ে উদিত হ'তে পারতুম না।

অসম্ভব না সম্ভোগের বস্তুকে হাতের মুঠোয় পেয়েও না পাওয়ার তীব্র জ্বালা আছে। সে প্রদাহ পরবর্তীকালের নজরুল-সাহিত্যে তেল জুগিয়েছিল, কিন্তু 'অগ্নি-বীণা' শুধু ঐ বিচ্ছেদের আগুনে জ্বলে ওঠেনি। আরও পূর্ব থেকে তিল তিল করে পুড়ছিলেন তিনি, হঠাৎ দমকা বাতাসের মত ঐ আঘাতটা যে ঐ আগুনকে শতমুখে বেড়ে উঠ্‌তে সাহায্য করেছিল। আগুন যে প্রণয়-ব্যর্থ নজরুলের পূর্ব-জীবনের গণ্ডিতে জেগেছিল তার সাক্ষাৎ পাই নূরুল হুদাকে লেখা মনুয়ারের চিঠিতে :

> তোর মধ্যে যে বিরাট শক্তি-সিংহ সুপ্ত রয়েছে, কেন তাকে এমন ক'রে এক অজানার ওপর অন্ধ অভিমানের ক্ষিপ্ততায় হত্যা করবি? সংসারে থেকে সংসারের বাঁধনকে উপেক্ষা করে এ আস্পর্ধার অট্টহাসি হেসে প্রকৃতির উপর প্রতিশোধ নেওয়া অসম্ভব। ফিরে আয় ভাই! ফিরে আয়! এ-ধ্বংসের বন্ধুর পথ হতে!—তোর প্রাণের 'অগ্নি-বীণা'য় এই যে আগুন ভরা দীপক রাগ-আলাপ, এযে তোকে পুড়িয়ে খাক ক'রে ছাড়বে ভাই।

অতএব ঐ আগুন নার্গিস খানমকে না পাওয়ার বেদনায় জাত নয় কেবল।

১৩২৭ সালের আগে নজরুল জীবনের কোন প্রেমের কাহিনী কেউ জানেন কিনা জানি না। কিন্তু সব সময় দেখেছি তাঁর উপন্যাসের নায়িকা দু'জন। (নার্গিস-প্রমীলা কি।) যেমন 'রিক্তের বেদনে' শহীদা এবং গুল, 'বাঁধনহারা'য় সোফিয়া এবং মাহবুবা, 'মৃত্যুক্ষুধা'য় মেজ-বৌ এবং রুবি।

'রিক্তের বেদন' এবং 'বাঁধনহারা' দুটোই ১৩২৭ সালে লেখা : প্রথমটা দিনলিপির মত করে, দ্বিতীয়টা পত্রাকারে। 'রিক্তের বেদন' ও 'বাঁধনহারা'র উভয় নায়কই সৈনিক। আর তাদের কথাসমূহ একান্তভাবে নজরুল ইসলামের। হাবিলদার কবির এবং ঐ সৈনিকের চরিত্র যে অভিন্ন নীচের উদ্ধৃতিসমূহ তা প্রমাণ করে :

> আঃ! এ-কি অভাবনীয় নতুন দৃশ্য দেখলুম আজ?...জননী—জন্ম

ভূমির মঙ্গলের জন্যে সে-কোন অদেখা দেশের আগুনে প্রাণ আহুতি দিতে—একি অগাধ অসীম উৎসাহ নিয়ে—ছুটেছে তরুণ বাঙালীরা—আমার ভাইরা!

[রিক্তের বেদন]

আসানসোলে ম্যাচ: খেলতে গিয়ে যেদিন একা একা প্রচণ্ড বংশদণ্ড দিয়ে প্রায় একশত ইংরেজকে খেদিয়ে দিয়েছিলি, সেই দিন বুঝেছিলাম তোর ঐ কোমল প্রাণের আড়ালে কত বড় আগ্নেয় পর্বত লুকিয়ে আছে, যেটা নিতান্ত উত্তেজিত না হলে অগ্ন্যুদগীরণ করে না।

[বাঁধনহারা]

কিংবা

যে মহাপ্রাণে, অদম্য উৎসাহ আর অসীম সাহসিকতা নিয়ে তরুণ যুবা, তোমরা, সবুজ বুকের তাজা খুন দিয়ে বীরের মত স্বদেশের কল্যাণ সাধন করতে দুর্নাম দূর করতে ছুটে গিয়েছ তা হেরেমের পুরস্ত্রী হলেও আমাদের মত অনেক শিক্ষিতা ভগিনীই বোঝেন, তাই অনেক অপরিচিতার অশ্রু তোমাদের জন্য ঝরছে।

[বাঁধনহারা]

নজরুলের জীবন উদ্দেশ্যহীন ছিল না। তিনি সৈনিক সেজে করাচী গিয়েছিলেন ইংরেজের হয়ে লড়াই করবার জন্য নয়, বন্দুক চালাতে শিখে সেই বন্দুক দিয়ে ইংরেজ তাড়াবার কায়দা শিখতে। কবিতা লেখাও শুরু করেছিলেন ঐ একই উদ্দেশ্যে। কিন্তু কবি তিনি শুধু স্বাধীনতা সংগ্রামের নন, তিনি, "বিশ্ব মাতার বড় স্নেহের 'দলাল, তার বিকেলের মাঠের চারণ কবি।" ফলে কঠিন চরিত্র বিপ্লবী-জীবন তাঁর একমাত্র পরিচয় নয় তার আরও একটা পরিচয় আছে। যেটা রাবিয়ার স্বামী রবিয়ল তার পত্রে উল্লেখ করেছেন:

তোর উপরটা লোহার মত হলেও ভিতরটা ফুলের চেয়েও নরম। তুই বাস্তবিক শুক্তি, উপরটা ঝিনুকের শক্ত খোসায় ঢাকা আর ভিতরে মানিক।

[বাঁধনহারা]

ফলত নজরুলের চেহারা চরিত্র স্বাস্থ্য চালচলন পোশাক পরিচ্ছদ পর্যন্ত আমরা 'বাঁধনহারা'য় দেখি। রাবেয়া লিখছে :

তুমি নাকি তখন স্কুলে যাওয়ার চেয়ে মিশন, সেবাশ্রম প্রভৃতিতে ঘুরে বেড়াতে। টো টো সন্ন্যাসী বা দরবেশ গোছের কিছু হবে বলে, মাথায় লম্বা চুল রেখেছিলে। গেরুয়া বসনও পরতে।

এবং নূরুল হুদা লিখছে :

আমি পুনা থেকে বেয়নেট যুদ্ধ পাশ করে এসেছি। এখন যদি তোমার আমি ঐ শক্ত শক্ত মাংসপেশীগুলো দেখাতে পারতাম।

নজরুলের এই সময়কার পোশাক পরিচ্ছদ কেমন ছিল ঠিক জানা যায় না। তার স্কুল জীবনের একটি ছবিতে তাঁকে ধুতি ফতুয়া পরা অবস্থায় দেখা যায়। সুতরাং ঐ পোশাক নয় সৈনিক-জীবনোত্তরকালে তাঁর ব্যবহৃত পোশাকের মধ্যেই 'বাঁধনহারা'র নায়ক-চরিত্রের মিল বেশী। নীচের এই উদ্ধৃতিগুলো তার প্রমাণ :

১. চওড়া মজবুত জোরালো তাঁর শরীর, বড়ো বড়ো লাল-ছিটে লাগা মদির তাঁর চোখ, মনোহর মুখশ্রী, লম্বা লম্বা ঝাঁকড়া চুল তাঁর প্রাণের স্ফূর্তির মতই অবাধ্য, গায়ে হলদে কিংবা কমলা রঙের পাঞ্জাবী এবং তার উপর কমলা এবং হলদে রঙের চাদর—

[নজরুল ইসলাম : বুদ্ধদেব বসু]

২. নজরুলের ঔদ্ধত্যের মাঝে একটা কবিতার সমারোহ ছিল, যেন চিত্তল বর্ণাঢ্য কবিতা। গায়ে হলদে পাঞ্জাবী, কাঁধে গেরুয়া উড়ুনী। কিংবা পাঞ্জাবী গেরুয়া, উড়ুনী হলদে। ···সব সময় উচ্চরোলে হাসছে, ফেটে পড়ছে উৎসাহের উজ্জ্বলতায়। বড় বড় টানা চোখ, মুখে সবল পৌরুষের সঙ্গে শীতল কমনীয়তা।

[কল্লোলযুগ : অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত]

নজরুল সাহিত্যের অংশমাত্র পড়ে তাঁকে বস্তুবাদী বলে মনে হলেও তিনি যে মূলত ভাববাদী সে পরিচয়ও আছে তার 'বাঁধনহারায়।* আর

* নজরুলের 'সর্বহারা' 'সাম্যবাদী' 'ফণী-মনসা' 'ভাঙার গান' 'সন্ধ্যা' কাব্যগ্রন্থগুলোর বিষয়বস্তু ছাড়া বস্তুচারী মনোভঙ্গি আর কোথাও প্রকাশ পেয়েছে বলে মনে হয় না। নজরুলের পোশাকের মধ্যেও নেই বাস্তবতার ছাপ।

তিনি তো লুকোবার চেষ্টাও করেননি কোন দিন তাঁর লেখায় ঈশ্বর ও শয়তানের অস্তিত্ব। যদিও তার আবর্তন যতটা ঈশ্বরকেন্দ্রিক ততটা শয়তানকেন্দ্রিক নয়। বস্তুত যেখানে শুভ আছে তাঁর পাশাপাশি অশুভও আছে, কিন্তু নজরুলের অশুভ এবং অমঙ্গলের পেছনে যে মনুষ্য নির্মিত সমাজ দায়ী এবং মানুষের সৃষ্টি ও মানুষের স্রষ্টা ঈশ্বর দায়ী 'বাঁধন-হারা'য় সে-কথার উল্লেখ করেছেন তিনি, বলেছেন, ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ তাঁর সেই জন্যে।

'ধূমকেতু' কবিতায় "আমি শয়তান মিতা/হো হো ভগবানে আমি পোড়াব বলিয়া জ্বালাযেছি বুকে চিতা" বলে তাঁর বিক্ষুব্ধ হৃদয়ের যে নরক-বহ্নিকে তিনি প্রকাশ করেছেন—তা তাঁর সাম্যবাদীর 'পাপ' কবিতার "অর্ধেক এর ভগবান আর অর্ধেক শয়তা '-এর সমার্থক নয়, কারণ 'কুলি মজুর'-এ তিনি পরিষ্কার উচ্চারণ করেছেন, 'ঊর্ধ্বে হাসিছে ভগবান, নীচে কাঁপিতেছে শযতান, কারণ 'ভাঙার গানে' তিনি ইতিমধ্যে ভগবানের বক্ষবিদীর্ণ করা ছেড়ে তার পক্ষে দাঁড়িয়েছেন :

হা হা হা পায় যে হাসি
ভগবান পরবে ফাঁসি?
সর্বনাশী শিখায় এ হীন তথ্য কে রে?

অর্থাৎ ঈশ্বরের সঙ্গে তাঁর এমন রক্ত সম্পর্ক যে তাব দোষ গুণের কথা বলার অধিকার তারই, অন্যের নয়। অন্যের নয় বলেই অন্যে যখন ভগবানকে অস্বীকার করতে চায় তখন তিনি সহ্য করতে পারেন না। আসলে ভগবান এবং সত্য তার কাছে দুটি পৃথক সত্তা নয়।

বলাবাহুল্য এ জন্যে বিস্মিত হওয়ার কারণ নেই, কেননা 'বাঁধনহারা'র সাহসিকতা তাঁর পত্রে নূরুল হুদার যে চরিত্র বিশ্লেষণ করেছেন সে ত সেই তাত্ত্বিক, বিদ্রোহী, সুফী নজরুল ইসলাম—যে ঘরে ধরা পড়তে চায় না, কারণ "কোথায় কোন গহন পারের বাঁশী যেন এরা শুনছে আর শুনছে।" সে পত্রে স্পষ্টই নজরুল ইসলাম তার জীবন রহস্যের রুদ্ধদ্বার খুলে পাঠককে তাঁকে বুঝবার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। সাহসিকা লিখেছেন :

এ ক্ষ্যাপার কোন্‌টা যে আনন্দ কোন্‌টা যে ব্যথা তাই যে চেনা দায়।···· এরাই পতঙ্গ এরাই আগুন। এরাই আগুন জ্বালে, এরাই পুড়ে মরে। নূরুকে স্রষ্টার বিদ্রোহী বলে তোর ভয় হয়েছে বা দুঃখ হয়েছে দেখে আমি ত আর হেসে বাঁচিনে লো!...মনসুর যখন বিশ্বের ভণ্ড মিথ্যুকদের মাথায় পা রেখে বলেছিল,— 'আনাল হক' আমিই সত্য সোঽহম্ তখন যে-সব বকধার্মিক তাকে মারবার জন্য হৈ-হৈ রৈ-রৈ করে ছুটেছিল, এ লোকগুলো যে তাদেরই বংশধর। এ মিথ্যা-ধার্মিকের দলই তো সেদিন ঐ মহর্ষি মনসুরের কথা, তার সত্য বুঝতে পারেনি, আজও পারবে না, আর পরেও পারবে না।

'বিদ্রোহী' লিখবার আগে যদি এ-লেখা হয়ে থাকে তাহলে স্পষ্টত আমরা দেখছি যে তাত্ত্বিক তিনি প্রথম যৌবন থেকেই। কিন্তু সে ত গেলো তার একদিক। তাঁর 'বাঁধনহারা' জীবনের পরিচয়ও কি তিনি তাঁর কবিতায় রাখেননি। পিতৃহীন হওয়াব পর কবি ঘর ছেড়েছিলেন। মাঝে মাঝে ঘরে ফিরে গেছেন তিনি। কিন্তু করাচী থেকে ফিরে আসার পব একটিবার মাত্র ঘরে ফিরেছিলেন, আর নয়। কেন ফেরেননি সে কারণ তাঁর জীবনী লেখকেরা খুঁজে বের করবেন। কিন্তু 'বাঁধনহারা'য় নূরুল হুদার চিঠিতে যেন একটা কিছুর আভাষ আছে :

> সংসারে আমার কেউ না থাকলেও রবিয়লদের বাড়ীর কথা মনে হলে মনে হয় যেন আমার ভাই-বোন মা সব আছে।

ভাবী লিখছে :

> তবে তুমি বলতে পার যে তোমার উদাসীন হবাব যথেষ্ট কারণ ছিল। তোমার বাপ মা সবাই মারা পড়লেন, সঙ্গে সঙ্গে দুনিয়ার সমস্ত স্নেহবন্ধনই কালের আঘাতে ছিন্ন হয়ে গেল।

নজরুল ইসলামের বাপ মরেছিলেন কিন্তু তাঁর মা 'বাঁধনহাবা' লেখা পর্যন্ত বেঁচেছিলেন। কিন্তু তাঁর মায়ের উপর যে তাঁর অভিমান ছিল সেটা বুঝি এই জন্যে জেলখানায় তাঁর মা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এলে তিনি দেখা করতে চাননি। * নিজের মায়ের স্নেহকে তিনি ছিঁড়তে

* বর্তমানে এই বিষয়টি নিযে বিতর্ক দেখা দিযেছে। কাবও কাবও মতে নজরুল তাঁর মাযেব সংগে সাক্ষাৎ কবেছিলেন কিন্তু মাযেব অনুবোধে উপবাস ভঙ্গ কবেননি।

চাইলেন বটে কিন্তু তাঁর স্নেহ-বুভুক্ষু মন স্নেহের স্পর্শ পেলেই তাঁর পক্ষ-পুটে দাঁড়াতে দ্বিধা করত না। ঘর অপেক্ষা পর এই জন্যে তাঁর আপন হয়েছে। মা হয়েছেন তাঁর বিরজাসুন্দরী, মিসেস এম. রহমান এবং মা হয়েছিলেন তাঁর 'বাঁধনহারা'র রবিয়লের মা। তাই ত রবিয়লের মাকে নুরুল হুদার কাছে এই বলে চিঠি লিখতে দেখি :

> নাই বা হলাম তোর গর্ভধারিণী জননী আমি তবু আমি কোন দিন তোকে অন্যের বলে স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি।

মোট কথা তাঁর রহস্যময় জীবন সম্পূর্ণ বোঝা না গেলেও কিছুটা আঁচ করা যায়। এটাও বোঝা যায় যে তিনি জীবন-রহস্য-সন্ধানী; আর যেহেতু জীবনকে তাঁর জানবার চেষ্টা ছিল তাই দুঃখকে তিনি জীবন-সৌন্দর্যের শত্রু বলে মনে করেও তাকেই আবার সত্য চিনবার উপায় বলে মনে করেছেন :

> দুঃখ কষ্টই ত আমার অপার্থিব চিরদিনের চাওয়া-পাওয়ার ধন। ও যে আমার অলঙ্কার! ...যদি দুঃখই না পাওয়া গেল জীবনে তবে সে জীবন যে বেনিমক বিস্বাদ! এই বেদনার আনন্দই আমাকে পাগল করলে, ঘরের বাহির করলে, বন্ধন-মুক্ত রিক্ত করে ছাড়লে। দুঃখও আমায় ছাড়বে না, আমিও তাকে ছাড়বো না। সে যে আমার বন্ধু...প্রাণ প্রিয়তম সখা...আমার ঝড়বাদলের মাঝখানে নিবিড় করে পাওয়া সাথী।

বস্তুত এইসব আমরা যত পড়ি ততই তাঁর কবিতার রহস্য আমাদের কাছে উন্মোচিত হতে থাকে। 'দোলন-চাঁপা' 'ছায়ানট'; 'অগ্নি-বীণা' 'সিন্ধু-হিন্দোল'-এর কবি 'বাঁধনহারা'য় প্রথম এমনভাবে ধরা দিলেন যে, হিন্দু-মুসলমানের মিলনের জন্য তাঁর প্রচেষ্টা, নারী-মুক্তির জন্য সংগ্রাম, সামাজিক কুসংস্কার অপনোদনের চেষ্টা আর তাঁর ব্যর্থ-প্রণয়ের কাহিনী সব কিছুই তাঁর কাব্য-বিশ্লেষণের চাবি হয়ে রইল। 'পূজারিণী'তে কেন যে তিনি :

> এরা দেবী এরা লোভী
> ইহাদের তরে নহে প্রেমিকার পূর্ণ পূজা
> পূজারীর পূর্ণ সমর্পণ

বলে নারীকে দুষছেন। আবার 'সাম্যবাদী'র নারীতে গিয়ে কেন যে তিনি নারী সম্বন্ধে এই সব উক্তি করছেন :

জ্ঞানের লক্ষ্মী, গানের লক্ষ্মী, শস্যলক্ষ্মী নারী।
সুষমা লক্ষ্মী নারীই ফিরেছে রূপে রূপে সঞ্চারী।

*　　　　*　　　　*

পুরুষ হৃদয়হীন।
মানুষ করিতে নারী দিল তারে আধেক হৃদয় ঋণ।

তার প্রকৃত তাৎপর্যের সন্ধান পাব আমরা 'বাঁধনহারা'য়। সন্ধান পাব তাঁর শতমুখী আদর্শে অবগাহনের উৎসের সন্ধান। যিনি ঘুমন্ত মুসলমানের পথের দিশারী হয়েও শ্যাম ও শ্যামার রূপ ও গুণকীর্তনে পরাঙমুখ নন,—সাম্যের গান গেয়েও অস্তিত্ব যাঁর ঈশ্বরে সমর্পিত, বহু বিরোধী আদর্শের মিনারে চড়ে যিনি গান করেন :

১　　　　গাহি সাম্যের গান
যেখানে আসিয়া এক হ'য়ে গেছে সব বাধা ব্যবধান
যেখানে মিশেছে হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলিম-ক্রিশ্চান।

২　প্রেমের নামে যে দিল রৌশন
যেথায় থাকুক সমান তাহার
খোদার মসজিদ মূরত-মন্দির
ঈসাই দেউল ইহুদখানায়।।

তারই নির্মাণোন্মুখ চেতনা নীচের এই উদ্ধৃতি সমূহে দ্রষ্টব্য। মানুষের কাছ থেকে আঘাত পেয়ে তিনি বলছেন :

ওহো তাই হোক। বিশ্বের সব কিছু মিলে আমায় শয়তান পিশাচ ব'লে অভিহিত করুক, তবে না আমার ক্লেদ মেটে।

কেন তিনি বিরহে তৃপ্ত :

পাওয়ার আনন্দের চাইতে তাই আমি না পাওয়ার আনন্দের অশান্তিকে কামনা ক'রে আসছি।

কোথায় সে পথের বঁধু যার বাঁশী নিরন্তর বিশ্বমানবের মনের বনে এমন ঘর-ছাড়া ডাক ডাকছে ?

নারী সম্বন্ধে উক্তি :

মেয়েদের আবার মন নিয়েই বেশীর ভাগ কারবার। স্নেহ-ভালবাসা-সোহাগ-যত্ন রাতদিন তাদের ঘিরে রয়েছে। সে কোন অনন্ত স্নেহময়ী মহানারীর স্নেহ-প্রপাত যেন এ নির্ঝর-ধারার উৎস। আমরা মা বোন স্ত্রী কন্যা বধূ হয়ে বাসনার মরুর আতপতপ্ত পুরুষ পথিকের পথে মরূদ্যান রূপে করছি তাদের গদ্যময়—জীবনকে স্নেহ-কবিতা সৌন্দর্য-মাধুর্যে মণ্ডিত করে তুলছি।

আমাদের নিজের ইচ্ছায় করবার বা ভাববার মত কিছুই যেন পয়দা হয়নি দুনিয়ায়। এর কারণ আমরা যে খালি রক্তমাংসের পিণ্ড। ভাত বেঁধে, ছেলে মানুষ করে আর পুরুষ দেবতাদের শ্রীচরণ সেবা করেই আমাদের কর্তব্যের দৌড় খতম।

আর শুধু পুরুষদেরই বা বলি কেন, আমাদের মেয়ে জাতটাও নেহাৎ ছোট হয়ে গেছে। এদের মন আবার হাজার কেসেমের বেখাপ্পা বেয়াড়া আচার-বিচারে ভরা।

সাম্প্রদায়িকতা সম্বন্ধে তাঁর ধারণা :

আমরা বড় বড় হিন্দু পরিবারের সঙ্গে মিশেছি। খুব বেশী করেই মিশেছি। কিন্তু কোথায় যেন কি ব্যবধান থেকে অনবরত একটা অশ্বস্তি কাঁটার মত বিঁধতে থাকে। আমরা তাঁদের বাড়ী গেলেই, তারা হন হন করেন আর আমরাও বেশী সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ি, এই বুঝি বা কোথায় কি ছোঁয়া গেল, আর অমনি সেটা অপবিত্র হয়ে গেল! পাশাপাশি থেকে এই যে আমাদের মধ্যে এতবড় ব্যবধান গরমিল, একি কম দুঃখের কথা। এই ছোঁয়াছুঁয়ির উপসর্গটা যদি কেউ হিন্দু সমাজ থেকে উঠিয়ে দিতে পারেন, তাহলেই হিন্দু-মুসলমানের একদিন মিল হয়ে যাবে।

ধর্মের ব্যাপারে তাঁর ঔদার্য :

প্রত্যেক ধর্মই সত্য—শাশ্বত সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং কোন ধর্মকে বিচার করতে গেলে তা এই মানুষের গড়া বাইরের বিধান শৃঙ্খলা দিয়ে কখনো বিচার করবে না।

নজরুল-কাব্যের প্রধানতম সুর যা তা শক্তির ; 'বাঁধনহারা'য় নায়কের জীবন-দর্শনে আছে সেই শক্তির প্রতি পক্ষপাতিত্বমূলক পৌরুষোক্তি :

> সিপাহীর দিল হবে শক্ত পাথর, বুক হবে পাহাড়ের মতন অটল, আর বাহু হবে অশনির মতো কঠোর। মরদের যদি মর্দামীই না রইল, তবে তো সে নি-মোরাদে। মানুষের এ-রকম মাদিয়ানা চাল দেখে মর্দানী আজকাল বাস্তবিকই লজ্জায় মুখ দেখাতে পারছে না।

উপন্যাসের শিল্পকর্মের বিচারে ফেলে আলোচনা করলে 'বাঁধনহারা' হয়ত বা উপন্যাস নয়। একে 'পত্রোপন্যাস' বলেছেন কেউ কেউ। কিন্তু নজরুলের কৃতিত্ব সেইখানে। প্রখর সমাজসচেতনতা এনে বাঙলা কবিতায় যেমন তিনি একটা বিশিষ্ট চরিত্র সৃষ্টি করলেন তেমনি দিন-লিপির কায়দায় লেখা 'রিক্তের বেদন' গল্প এবং পত্রাকারে লেখা 'বাঁধনহারা' সৃষ্টি করলেন নতুন আঙ্গিকে। প্রথম গদ্য রচনা 'বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী'তে নজরুলের যে ভাষা দেখা গেল তা তাঁর আগে তার পূর্বসুরীদের কারও রচনায় দেখতে পাইনি। বলার ধরনটা একটু দ্রুত। যা কিছু লিখেছেন সব যেন উত্তেজিত অবস্থায়। একেবারে যুগের চেহারা ছবি যেমন তাঁর কবিতার ভাষায় তেমনি তাঁর গদ্যের ভাষায়ও ফুটে উঠল। যা কিছু করতে হবে দ্রুত। মরণ একেবারে সামনে দাঁড়িয়ে, প্রাণ ওষ্ঠাগত, সুতরাং সর্বনাশের সামনে স্থির হয়ে চলা মানেই মৃত্যু।

নজরুল ইসলাম জীবনের কবি এবং জীবনের স্বাভাবিক লক্ষণ চঞ্চলতা।

প্রথম মহাযুদ্ধ স্বাধীনতা আন্দোলন, বিশ্বব্যাপী অনাহারী মানুষের সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, বিজ্ঞানের নতুন নতুন যন্ত্র সৃষ্টি এবং দ্রুত প্রসার, হঠাৎ ঘুম ভেঙে ওঠা জাতিদের দ্রুতগতিতে সামনের দিকে এগিয়ে চলা ইত্যাদি তাঁকে বাঙলা কবিতায় যেন একটা নতুন দিক উন্মোচনে সাহায্য করল ; প্রহেলিকার মত কোন এক অজ্ঞাত ক্ষুধা বিশাল মাথা তুলে বন্যার মত ছুটে আসছে আর তার থেকে প্রাণপণে ছুটে বাঁচবার চেষ্টা করছে মানুষেরা। ধীরে সুস্থে গল্প বলবার কথা

বলার সময় পর্যন্ত নেই। মানুষের মুখের ভাষাও যেন আপনা থেকে যন্ত্রের মত গতিশীল হয়ে উঠল। ঘরের ভাষার চেয়ে পথের ভাষার অধিকার তখন বাড়ল। নজরুল এই ভাষাটাকে তাঁর গদ্য রচনায় পর্যন্ত ফুটিয়ে তুললেন।

কোন কোন শিল্পী আছেন যুগের উত্তাপ থেকে যাঁরা গা বাঁচাতে পারেন। তেমন অন্তর্মুখী লেখক নজরুল ইসলাম নন। ফলে একজন নিঃসঙ্গ শিল্পীর ভাষার মত একক ব্যক্তির ভাষা নয়; বরং অনেকের, সমষ্টির ভাষা নজরুলের। তাই তাঁর ভাষা প্রাঞ্জল, স্পষ্ট, বেগবান; কিন্তু শিল্পসৌন্দর্যে নিশ্চয়ই দ্বিতীয় শ্রেণীর নয়। নজরুলের মধ্যে ক্রিটিক যে না ছিল তা নয়। ভাষা সম্বন্ধে তাঁর ধারণা ছিল স্পষ্ট। সজ্ঞান ছিলেন তিনি ভাষার ব্যাপারে। ইচ্ছা করলে যে নিজের লেখাকে মনো মত করে নেওয়ার তাঁর ক্ষমতা আছে মনোয়ারের চিঠিতে সে ইঙ্গিতও তিনি দিয়েছেন। নূরুল হুদা মনোয়ারের কাছে করাচী থেকে একটা পত্রে রাত্রিকালের ঝড়-বাদলের শেষে করাচীর প্রভাত-কালীন রূপের বর্ণনা করল এই ভাবে:

> কাল সমস্ত রাত্তির ধরে ঝড়-বৃষ্টির সঙ্গে খুব একটা দাপাদাপির পর এখানকার উলঙ্গ প্রকৃতিটা অরুণোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই দিব্যি শান্ত স্থির বেশে—যেন লক্ষ্মী মেয়েটির মত ভিজা চুলগুলি পিঠের উপর এলিয়ে দিয়ে রোদ্দুরের দিকে পিঠ করে বসে আছে। এই মেয়েই যে একটু আগে ভৈরবী মূর্তিতে সৃষ্টি ওলটপালট করার জোগাড় করেছিল, তা তার এখনকার এ সরল শান্ত মুখশ্রী দেখে কিছুতেই বোঝা যায় না। এখন সে দিব্যি তার আসমানী রং-এর ঢলঢলে চোখ দুটি গোলাবীনীল আকাশের পানে তুলে দিযে গম্ভীর উদাস চাহনীতে চেয়ে আছে।

মনুয়র তার উত্তরে ঐ একই দৃশ্যের বর্ণনা করতে লেখে:

> ঝরা থেমেছে। উলঙ্গ প্রকৃতির স্থানে স্থানে এখনও জলের রাশ থৈ থৈ করছে। দেখে বোধ হচ্ছে যেন একটি তরুণী সবেমাত্র স্নান ক'রে উঠেছে। আর তার ভেজা পাৎলা নীলাম্বরী শাড়ী ছাপিয়ে নিটোল উন্মুখ যৌবন ফুটে বেরিয়েছে।

তারপর মনুষর আবার লিখে জানাচ্ছে কী ধরনের ভাষা তার মনঃপূত এবং কি ধরনের ভাষা মনঃপূত নয় :

ও রকম "সতত সঞ্চরমান নব-জলধর পটল সংযোগে" বা "ক্ষিত্য-পত্যেজ পটাস্‌দুম্‌" ভাষা আমার একেবারেই মনঃপূত নয়। পড়তে যেন হাঁপানী আসে, আর কাছে অভিধান খুলে রাখতে হয়। অবিশ্যি, আমার মতে সকলের রায় দিতে হবে, তারও কোন মানে নাই। আমারও এ বিকট রচনাভঙ্গি নিশ্চয়ই অনেকেরই বিরক্তিজনক, এমনকি অনেকে একে ফাজ্লামী বা বাঁদরামী বলেও অভিহিত করতে পারেন। কিন্তু আমার এ হাল্‌কাভাবের কথা হাল্‌কা ভাষাতেই বলা উচিৎ বলে মনে করি।

প্রস্তুতি পর্বের যে মানসিকতা তার সুস্পষ্ট ছাপ উপরের ওই লেখায় আছে। কিন্তু লক্ষ্য করবার বিষয় ভালো মন্দের মাঝখানের দেয়ালটি তার পরিচিত। এবং এ বিষয়টিও অলক্ষণীয় নয় যে নতুন একটা কিছু সৃষ্টির অস্থিরতায় তিনি সতত ব্যগ্র। এই প্রসংগে নজরুলের গদ্য সাহিত্যের ভাষা সম্বন্ধে আলোচনা করা যায়। বাংলা সাহিত্যে প্রমথ চৌধুরী কথ্য ভাষাকে প্রথম সাহিত্যপদবাচ্য করে তোলেন। রবীন্দ্রনাথ প্রমথ চৌধুরীর দেখা-দেখি কথ্যভাষায় গদ্য রচনা করতে উৎসাহিত হন। কিন্তু বীরবলের গদ্যভাষার চাকচিক্যহীন বাস্তবতা রবীন্দ্রনাথে নেই। রবীন্দ্রনাথ গদ্যকে মাঝে মাঝে গদ্য কবিতার মত লালিত্যমধুর করে তুলেছেন। তাতে প্রসাদগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে, আবেগ প্রকাশের সমস্যা দূর হয়েছে এবং কখনও কখনও তাই গদ্যের সংহত কঠিন দীপ্তি সেখানে হারিয়ে গেছে।

ওই কাঠিন্য নজরুলেও নেই। নজরুলও কবিত্বটুকু ভুলতে পারেন না। সমস্ত রবীন্দ্রনাথ সমস্ত নজরুল সম্বন্ধে অমন উক্তি করলে মন্তব্য পার্শ্ব-প্রীতি হয়ে যাবে কিন্তু রবীন্দ্র-নজরুলের গদ্য উপমাবলয়ে আবর্তিত।

/ অবশ্য নজরুলের একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। তাঁর ভাষা না প্রমথ চৌধুরীর, না রবীন্দ্রনাথের, না' শরৎচন্দ্রের। বোঝা যায় সকলের রক্ত তাঁর রক্তে মিশে আছে তবু পৃথক তিনি তাঁর পৌরুষে, তাঁর উচ্চকিত কণ্ঠে, তাঁর ঘরোয়া মিশুক মেজাজে তাঁর স্বভাবের উচ্ছ্বাসে, তার সংস্কৃতিগত ঐতিহ্যধারার চেহারায়। /

রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র এবং প্রমথ চৌধুরী যে কথ্যভাষার 'আমদানি করলেন সে ভাষা বাঙলা দেশের হিন্দু সমাজের, নজরুলের ভাষা অনেক ক্ষেত্রে মুসলমান সমাজের ঘরের ভাষা। দু'একটি উদাহরণ স্পষ্ট করতে পারে বক্তব্যটি :

> আমার **ওজর** আপত্তির মানেই বোঝে না সে। আমি যতই তাকে মিনতি করে বারণ করি সে ততই হাসির ফোয়ারা ছুটিয়ে বলে, বাঃ রে আমি যা ভালবেসেছি তা তুমি বাসবে না কেন? হায়! **একি জুলুম**।
>
> [কুহিস্তান : রিক্তের বেদন]

> কেননা **হায়াত-মওতের** কোন ঠিক ঠিকানা নেই। এখন দিনরাত **খোদার** কাছে **মুনাজাত** করছি কখন তোকে আবার এ-যমের মুখ থেকে **সহি-সালামতে** ফিরিয়ে আনেন।
>
> [বাঁধনহারা]

অবশ্য কেবল আরবী ফার্সী মিশ্রিত মুসলমান সমাজের ভাষা তাঁর একমাত্র অবলম্বন ছিল না। সাধারণভাবে চালু বাংলা ভাষাও তাঁর লেখনীর অধিকাংশ অবয়ব আবৃত ক'রে আছে। যদিও পরিবেশ, পারিপার্শ্বিকতা, ঘটনা, সময় এবং অবস্থা দেখে তারই পরিপ্রেক্ষিতে তিনি তাঁর মত করেই একটা ভাষা গড়ে নিয়েছিলেন। এবং যেখানে তাঁর ভাষায় আদৌ আরবী ফার্সী শব্দের চিহ্ন নেই সেখানেও এ সব তৎসম তদ্ভব এবং দেশী শব্দগুলো তাঁকে তাঁর পূর্বসূরীদের দলে ভিড়িয়ে তাকে অচিন করে তুলতে পারেনি। একটা বীর্যবান প্রাণশক্তি, একটা পৌরুষদৃপ্ত মেজাজ তাঁর গদ্যকে চুম্বক-শক্তি দান করেছে। 'বাঁধনহারা'য় সেই অনন্য ভাষা-শিল্পী নজরুল সুদীপ্ত।

নজরুল দর্পণে নজরুল

কবি নজরুল ইসলামকে পুরোপুরি বুঝতে গেলে তাঁর সমগ্র গদ্য সাহিত্যটা অভিনিবেশ সহকারে পড়তে হবে। তাঁর গল্প উপন্যাস পত্রোপন্যাস, প্রবন্ধ, অভিভাষণ, নাটক, চিঠিপত্র, গ্রন্থ-ভূমিকা, সম্পাদকীয় ইত্যাদি সবকিছুই। আর এগুলো পড়েই আমরা ধীরে ধীরে উন্মোচন করতে পারব—তাঁর মানসিক গতি-প্রকৃতি, তাঁর চিন্তার রূপরেখা, আমরা বুঝতে পারব তিনি চিন্তা করে লিখেছেন না চিন্তার পূর্বে লিখেছেন, তাঁর লেখা কবিতা শক্তিমান কবির স্বতস্ফূর্ত কল্পনার প্রাণময়তা, না চিন্তাহীন গেঁয়ো কবিয়ালের অনর্গলতা, তাঁর দার্শনিক অনুভূতি ছিল, না ছিল না, তিনি সামাজিক অর্থে বোহেমিয়ান ছিলেন কি না। জীবনে তিনি শৃঙ্খলা স্বীকার করতেন কি না, এবং তার চিন্তার মধ্যে কোন সামঞ্জস্য অথবা তাঁর বিশ্বাসে কোন দৃঢ়তা ছিল কি না। নজরুলের মধ্যে দ্বন্দ্ব ছিল, পরস্পরবিরোধী চিন্তার বিশৃঙ্খলা ছিল, চেতনার অভাব ছিল—এই সমস্ত অভিযোগের উত্তর সম্ভবত নজরুলের গদ্য সাহিত্য পড়লে আমরা পেতে পারি।

আমরা লক্ষ্য করেছি নজরুলের কাব্য-বিচার করতে গিয়ে অনেক লেখকই নজরুলের অতি পরিচিত একটি কবিতার অতিরিক্ত জিহ্বাপিষ্ট কয়েকটি চরণের উল্লেখ করেন

বন্ধু গো, আর বলিতে পারি না বড় বিষজ্বালা এই বুকে,
দেখিয়া শুনিয়া ক্ষেপিয়া গিয়াছি তাই লিখি যাহা কই মুখে।

রক্ত ঝরাতে পারি না ত একা
তাই লিখে যাই এ রক্ত-লেখা।

বড় কথা বড় ভাব আসে নাক মাথায় বন্ধু বড় দুখে
অমর কাব্য তোমরা লিখিও বন্ধু যাহারা আছ সুখে।

এবং বলেন: দেশোদ্ধারই ছিল কবির একমাত্র কাম্য। তাই তিনি 'অমর' কবিতা লিখবার চেষ্টা করেননি। তাঁর কবিতা সাময়িক প্রয়োজন মিটিয়ে নিঃশেষিত। কবি নজরুল-সম্বন্ধে এইসব উক্তি যে কত হালকা হৃদয়ের উচচারণ সেগুলোও জানবার জন্যে তাঁর গদ্য সাহিত্য পড়ার প্রয়োজন।

নিজে তিনি কোনদিন টীকা-টিপ্পনী দিয়ে তাঁর কাব্যের ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেননি। তবু ঐ 'কৈফিয়ৎ' কবিতাটা যে তাঁর কাব্য-সম্পর্কে একমাত্র কৈফিয়ৎ নয় সেটা তাঁর কিছু গভীর কবিতা, গান, বিশেষ করে তাঁর গদ্য লেখাগুলো পড়ে জানা যায়। একটা ছোট্ট প্রবন্ধে তাঁর সেই বিশাল মানসভূমির পরিচয় তুলে ধরা সম্ভব না, কিন্তু তাঁব কিছু কিছু গদ্যের উদ্ধৃতি তুলে দেখানো যেতে পারে আর যে দোষই তাঁকে দেওয়া যাক, তাঁকে কিছুতেই দিক্‌ভ্রান্ত, উচ্ছৃঙখল কিংবা শিশু বলা চলে না।

বর্তমান লেখায় আমি ইবরাহিম খাঁর কাছে তাঁর সারবান চিঠিটির কথা উল্লেখ করব না; কিংবা ডক্টর কাজী মোতাহার হোসেনের কাছে লেখা চিঠির কথাও না; অথবা তাঁর পরিণত বয়সের অভিভাষণ কিংবা প্রতিভাষণের কথারও উল্লেখ করব না। আমি এখানে তাঁর পূর্ণ যৌবনের পূর্ববর্তীকালের দু' একটি রচনা থেকে দু' একটি বাক্য উদ্ধার করে দেখাব যে, দেশের জন্যে, জাতির জন্যে তাঁর সুগঠিত চিন্তা ছিল, মানুষের জীবন সম্বন্ধে তাঁর গভীর ভাবনা ছিল, জগৎ ও জীবনের সমস্যা নিয়ে ভাবতেন তিনি।

'নজরুল-রচনাবলী'র সম্পাদক রচনাবলীর ১ম খণ্ডের গ্রন্থ পরিচয়ে দেখিয়েছেন নজরুলের 'ব্যথার দান' গল্প গ্রন্থটি ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মুতাবিক ১৩২৯ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন মাসে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

> ব্যথার দান গল্পটি ১৩২৬ মাঘের 'হেনা' ১৩২৬ কার্তিকের এবং 'অতৃপ্ত কামনা' ১৩২৭ শ্রাবণের 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-পত্রিকা'য় প্রকাশিত হইয়াছিল।
>
> 'বাদল বরিষণে' ১৩২৭ শ্রাবণের 'মোসলেম ভারতে' এবং 'ঘুমের ঘোরে' ১৩২৬ ফাল্গুন-চৈত্রের 'নুর'-এ বাহির হইয়াছিল।

১৩০৬ সালে নজরুলের জন্ম হয়েছিল এই হিসেবে দেখা যায় ঐ লেখাগুলো কবির ২১।২২ বছরের রচনা। অর্থাৎ সাধারণত কবির যে বয়সটাকে অত্যধিক চাঞ্চল্যের এবং স্ফূর্তির ও প্রাণোল্লাসের বয়স হিসেবে মনে করা হয়, এবং যে সময়ে তিনি 'বিদ্রোহী' ও 'প্রলয়োল্লাস'ও লেখেননি, সেই সময়কার রচনা ঐগুলো তাঁর। আমাদের উদ্ধৃতি ও আলোচনা বর্তমান নিবন্ধে সেই 'ব্যথার দান' গল্প সংকলনটিতে সীমাবদ্ধ থাকবে। 'হেনা' গল্পের একস্থানে আছে :

আরে ধোৎ, সবাই মরব; আমি মরব, তইও মরবি! এত বড় একটা নিছক সত্যি একট স্বাভাবিক জিনিস নিয়ে কান্না কিসের?

উদ্ধৃতির এই কথাগুলো লেখক গল্পের বর্ণনা হিসেবেই শুধু ব্যবহার করেননি। এর পিছনে তাঁর একটা বিশেষ ভাবনা আছে, সুনির্মিত বিশ্বাসের একটা পটভূমি আছে, এটা তাঁর জীবন-বোধের একটা স্পষ্ট উচ্চারণ। এই দার্শনিক মনোভঙ্গিটিই তাঁর পরবর্তী সময়ে লিখিত "কামাল পাশা" কবিতাতে কাব্যাকারে প্রকাশিত হতে দেখি। ('কামাল পাশা' ১৩২৮ কার্তিকের 'মোসলেম ভারতে' প্রকাশিত হইয়াছিল। গ্রন্থ পরিচয়: নজরুল রচনাবলী : ১ম খণ্ড)।

মৃত্যু এরা জয় করেছে, কান্না কিসের?
আব-জম্-জম্ আনলে এরা,
আপনি পিয়ে কল্‌সী বিষের!
কে মরেছে? কান্না কিসের?

এবং—

মরলো যে সে মরেই গেছে,
বাঁচলো যারা রইল বেঁচে!
এই ত জানি সোজা হিসাব? দুঃখ কি আর আঃ!
মরায় দেখে ডরায় এরা ভয় কি মরায় বাঃ!

মৃত্যু যে স্বাভাবিক, এবং সেটাকে যে সহজভাবে গ্রহণ করা উচিত কবির বক্তব্য তাই। কিন্তু কবির এই বক্তব্যের পিছনে একটা দার্শনিক যুক্তি আছে। সে যুক্তিটা হ'ল এই যে, মানুষ মাত্রই মরণশীল; সেই অনিবার্য মৃত্যুর হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার উপায় যখন কারো

নেই তখন তা নিয়ে বিমর্ষ হওয়ার কোন যৌক্তিকতা নেই। ' 'হেনা' গল্পে এই কথাটাকেই বিশ্লেষণ ক'রে তিনি বলেছেন যে 'আমিও মরব, তুইও মরবি।' তার মানে সকলে যেখানে মরে সেখানে তোমার এবং আমার মৃত্যুর বাধা দেওয়ার উপায় নেই। এই সহজ সত্যটুকু মানলেই মানুষ মৃত্যুকে উপেক্ষা করতে পারে।

উপরের ঐ কথাগুলোর মধ্যে কবির জীবন-দর্শনের আর একটি দিক উন্মোচিত হয়। জীবনকে তিনি ভালবাসেন বলে মৃত্যু তাঁর কাছে উপেক্ষণীয় বিষয় ছাড়া কিছু না। পৌরুষের এই শক্তি চেতনা কবির প্রথম দিক্‌কার কাব্যের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ। যুদ্ধের ময়দানে জীবন-মরণের লড়াইটা ত সংগ্রাম-মুখর জগতেরই একটি রূপক চিত্র। প্রতি মুহূর্তে মানুষ মরছে বলে মৃত্যুর কাছে সে পরাজয় মানবে না—মৃত্যুকে স্বাভাবিক মনে করে জীবনের প্রতি তার শ্রদ্ধা নিবেদন করবে। মৃত্যুর প্রতি এই উপেক্ষার মনোভাব তিনি 'প্রলয়োল্লাস' 'ধূমকেতু' ইত্যাদি কবিতাতেও ব্যক্ত করেছেন :

১. ধ্বংস দেখে ভয় কেন তোর? প্রলয় নূতন সৃজন বেদন।
আসছে নবীন জীবনহারা অসুন্দরে করতে ছেদন।

২. তার নিযুত নরকে ফুঁ দিয়ে নিভাই মৃত্যুর মুখে থুথু দিই—

'প্রলয়োল্লাস' ও 'ধূমকেতু' কবিতার ঐ পংক্তি কটি কবির জীবন-বন্দনা।

আত্মোপলব্ধির এ-দিকটা বাদ নিয়ে কবির চিন্তাধারার আরও দু' একটি দিক তাঁর ঐ গদ্য রচনা থেকে তুলে ধরা যাক :

১. মানুষ এত ছোট হল কি করে? তাদের মাথার ওপর অমন উদার অসীম নীল আকাশ, আর তারই নীচে মানুষ কি সঙ্কীর্ণ, কি ছোট।

২. আমার এক ফাজিল বন্ধু বলছেন,—"কি নিমকিন চেহারা!"—আহা, কি উপমার ছিরি! কে নাকি বলেছিল,—"ষাঁড়টা দেখতে যেন কাৎলা মাছ!"

৩. কি শৃঙ্খলা এই বৃটিশ জাতিটার কাজে-কর্মে, কায়দা-কানুনে তাই তারা আজ এত বড়!......মোটামুটি বলতে গেলে তাদের এই

দুনিয়া-জোড়া রাজত্বটা একটা মস্ত বড় ঘড়ি, আর সেটা খুবই ঠিক চ'লছে, কেননা তার সেকেণ্ডের কাঁটা থেকে ঘণ্টার কাঁটা পর্যন্ত সব তাতে বড্ডো কড়া বাঁধাবাঁধি একটা নিয়ম। সেটা আবার রোজই অয়েল্ড হচ্ছে, তার কোথায় একটু জং ধবে না।

এমনি একটা বিরাট কঠিন শৃঙ্খলা মস্ত বাঁধাবাঁধি আমাদেব খুবই দবকাব। আমাদেব এই 'বেঁড়ে' জাতটাকে এমনি খুব পিঠ-মোড়া ক'রে বেধে দোবস্ত না করলে এর ভবিষ্যতে আব উঠে দাঁড়াবার কোন ভবসা নেই। দেশের সবাই মোড়ল হলে কি তাব কাজ চলে।

৪. লোহার শিকল ছিন্ন করবাব ক্ষমতা আমাব আছে, কিন্তু ফুলেব শিকল দ'লে যাবাব মত নির্মম শক্তি তো আমাব নেই।—(দাবাব কথা)

৫. দুনিযায যত বকম আনন্দ আছে, তাব মধ্যে এই বিচ্ছেদের ব্যথাটাই হচ্ছে সবচেযে বেশী আনন্দময

৬. আমার কান্না দেখে সে ব'ললে যে, ইরানের পাগলা কবিদের দেওয়ান পড়ে পড়ে আমিও পাগল হযে গিযেছি।

৭. যাকে ভিতরে অন্তরের অন্তরে পেয়েছি, তাকে খামখা বাইরের পাওয়া পেতে এত বাড়াবাড়ি কেন?

১নং উদ্ধৃতি অনুযায়ী দেখা যায় নজরুল মানুষেব নীচতা, সঙ্কীর্ণতাকে দোষারোপ করছেন; তাঁর লেখায় সমস্ত জীবন মানুষেব এই নীচতা ও সঙ্কীর্ণতার বিরুদ্ধে বিরুদ্ধতা করেছেন, ওগুলোকে কখনো স্বীকাব করেননি। তাঁর ভাবনার এই দিকটায় তাঁকে কোনদিন আমরা পরাজয় মানতে দেখি না।

২নং উদ্ধৃতিতে আমরা দেখছি উপমার যথার্থতা সম্বন্ধে কবির স্পষ্ট ধারণা ছিল। 'ষাঁড়টা দেখতে যেন কাৎলা মাছ' এই উপমা নির্দোষ উপমা নয় সেটা দেখিয়ে কবি অন্তত এটুকু আমাদের জানিয়ে দিলেন যে কাব্যকলার একটা সূক্ষ্ম দিক সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ সচেতন। নজরুলের এই কথাটা ঠিক আমরা এজরা পাউণ্ডকেও বলতে দেখি:

Use either no ornament or good ornament.
—(Language : Literary Essays of Ezra Pound)

আমরা নজরুল ইসলামের কবিতায় কখনো ঐ bad ornament লক্ষ্য করি না তাঁর ঐ শিক্ষিত মানসিক সচেতনতার ফলে।

এবার ৩নং উদ্ধৃতির আলোচনা করা যাক। এই উদ্ধৃতিতে নজরুল একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখ করেছেন। ভারতবর্ষ বৃটিশের অধীনে ছিল তাকে তিনি মক্ত করার জন্য সংগ্রাম করেছেন। কিন্তু তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি যে 'বৃটিশ জাতির কাজে-কর্মে শৃঙ্খলা আছে।' এই একটি উক্তি এই প্রমাণ করে যে নজরুল ইসলাম কাকে শৃঙ্খলা বলে তা পুরোপুরি জানতেন। এবং যিনি 'শৃঙ্খলা'কে জানতেন তিনি 'অনিয়ম উচ্ছৃঙখল' হবেন এটা অন্তত আমি বিশ্বাস করি না। অন্তত ৪নং উদ্ধৃতিতে তাঁর উক্তি দেখে আমার দৃঢ়বিশ্বাস হয় যে তাঁর মনের মধ্যে যথেষ্ট শৃঙ্খলা ছিল, তার চিন্তাধারাতেও শৃঙ্খলা ছিল। তা না থাকলে কেন তিনি বলবেন: "এমনি একটা বিরাট কঠিন শৃঙ্খলা মস্ত বাঁধাবাঁধি আমাদের খুবই দরকার।" বস্তুত ঐ শৃঙ্খলা ছিল বলেই ত তাঁর কবিতায় ছন্দ-পতন হয়নি তাঁর গান হয়েছে সংযমের অবিশ্বাস্য উদাহরণ। এবং ঐ শৃঙ্খলা ছিল বলে লেখক হিসেবে তাঁর সংক্ষিপ্ত লেখক জীবনের পরিসরে তাঁর সৃষ্টিকর্ম হয়েছে বিস্ময়করভাবে প্রচুর।

এবার তাঁর ঐ ৫নং উক্তির কথা আলোচনা করা যাক্। নজরুলের সমগ্র কাব্য পড়ে দেখা যায় জীবনে তিনি যদি কোথাও পরাজয় মেনে থাকেন তবে প্রেমের কাছে তিনি পরাজয় বরণ করেছেন। হঠাৎ মনে হতে পারে যে এত বড় যে পুরুষ—তিনি প্রেমের কাছে নতি স্বীকার করলেন। কিন্তু বলা বাহুল্য প্রেমের কাছে একমাত্র পৌরুষই পরাজয় মানে। প্রেমের কাছে যে পরাজয় মানে না সে পুরুষতা নয় সে বর্বরতা। নজরুল মনুষ্যত্বের পূজারী, বর্বরতার নন। অতএব 'হে মোর রাণী! তোমার কাছে হার মানি আজ শেষে' বলার অর্থ এই নয় যে তিনি তাঁর পৌরুষকে বলি দিয়েছেন, এর মানে হ'ল এই যে সুন্দরকে তিনি স্বীকার করে নিয়েছেন। তিনি কবি, সুন্দরই তার একমাত্র প্রার্থিত বিষয়। মনে রাখতে হবে নজরুল ইসলাম সেই সুন্দরের কাছে অবনমিত যে সুন্দর সত্যের প্রতিবিম্ব; ঐ সত্য সুন্দর ও প্রেমকে বাঁচাবার জন্যই তাঁর শিকল ভাঙার গান।

৫ ও ৭নং উক্তিতে কবির প্রেম সম্পর্কিত একটি বিশেষ জীবন-উন্মীলিত। উল্লিখিত উদ্ধৃতি দুটি পড়লে রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতার কথা মনে পড়ে :

নাই নাই কিছু নাই বৃথা অন্বেষণ
নীলিমা লইতে চাই আকাশ ছাঁকিয়া।
কাছে গেলে রূপ কোথা করে পলায়ন,
দেহ শুধু হাতে আসে শ্রান্ত করে হিয়া।
প্রভাতে মলিন মুখে ফিরে যাই গেহে
হৃদয়ের ধন কভু ধরা যায় দেহে ?

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধির সঙ্গে মিল থাকলেও নজরুলের ঐ উপলব্ধি একা রবীন্দ্রনাথ থেকে নজরুলে সঞ্চারিত হয়নি। কেন একা রবীন্দ্রনাথ থেকে নজরুলে ঐ বোধ অনুভূতিব চুম্বকে ধরা পড়েনি ৬নং উদ্ধৃতি পড়েই তা আমরা জানতে পারি। ইরানের সুফী কবি হাফিজ প্রমুখের দিওয়ানের সান্নিধ্যে এসেছিলেন নজরুল করাচীতে। ইরান ও ভারতের সুফীদের চিন্তাধারায় রবীন্দ্রনাথ সংক্রমিত ছিলেন, নজরুল ইসলামও ঐ একই চিন্তাধারায় বরাবর সংক্রমিত থাকাতে প্রেম সম্পার্কত উভয়ের জীবন-দর্শনের গভীর সাদৃশ্য আছে।

যা হোক আমি মোটামুটি বোধ হয় দেখাতে পেরেছি যে নজরুল তাঁর চিন্তাধারা থেকে এবং তাঁর আদর্শ থেকে কখনো ঠিক সরে অন্য পথে যাননি, তাঁর প্রথম জীবনের বিশ্বাস আর শেষ জীবনের বিশ্বাস দু'রকমের নয় ; কবিতার বিশুদ্ধতার ব্যাপারে তিনি সচেতন ছিলেন, তাঁর আবেগ ছিল বুদ্ধিশাসিত এবং তাঁর ভবিষ্যত শিল্পজীবন ছিল শৃঙ্খলিত চিন্তায় পরিকল্পিত। অগভীর কখনো ছিলেন না তিনি, কাব্য-চেতনায় স্থূলতার ফাঁসীতে তিনি আত্মহত্যা করেননি। তাঁর সমস্ত গদ্য রচনার দর্পণে অন্তত এ-সত্যটুকু আমাদের চোখে ধরা পড়বে।

নজরুল বিদ্রোহী কি?

সম্প্রতি দু' একজন সমালোচক প্রশ্ন তুলেছেন, নজরুলকে সত্যিই বিদ্রোহী বলা যায় কি না? আর বিপ্লবী? সে ত তাঁকে বলাই যায় না। অত্যন্ত অর্থবোধক এই প্রশ্ন দু'টি। কেননা 'বিদ্রোহী' এই শিরোপা নজরুলের নামের সংগে এমনভাবে সংযুক্ত হয়ে গেছে যে, যদি প্রমাণ করা যায় যে, নজরুল 'বিদ্রোহী' নন, তাহলে ভাবপ্রবণ বাঙালী যে চিন্তাহীন আবেগে সাঁতরাতে ভালবাসে সেটাই আর একবার সত্য হবে।

কোন কোন সমালোচক ঐ সংস্কারে আঘাত করার জন্য ঐ প্রশ্ন তুলে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে, 'বিদ্রোহী' অথবা 'বিপ্লবী'র সংজ্ঞা অনুযায়ী কিছুতেই নজরুল ইসলামকে 'বিদ্রোহী' কিম্বা 'বিপ্লবী' বলা চলে না। এর কারণ স্বরূপ তাঁরা দেখিয়েছেন যে, পুরনো আদর্শকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে নিজের নিয়মের শৃঙ্খলিত আদর্শ কিম্বা কোন দর্শন তিনি আমাদের দিতে ব্যর্থ হয়েছেন। এ-কথা ঠিক, আমরা সেই সব মহাপুরুষের আদর্শকে বৈপ্লবিক বলে গ্রহণ করি, যাঁরা পুরনো রীতিকে অস্বীকার করে নতুন আদর্শের জন্ম দিয়েছেন। এই-ভাবে হজরত মুহম্মদ (দঃ), কার্ল মার্কস প্রভৃতি সত্যিকার অর্থে বিদ্রোহী এবং বিপ্লবী। কারণ বিশ্বের ইতিহাসে তাঁরা নতুন আদর্শের স্রষ্টা। পৃথিবীতে সে হিসেবে সক্রেটিস, কাণ্ট, হেগেল, রুশো, ভলেটয়ার এঁরা প্রত্যেকেই বিদ্রোহী এবং বিপ্লবী। এঁদের কেউ দর্শনে, কেউ রাজনীতিতে কিম্বা কেউ সমাজনীতিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছেন।

এখন দেখা যাক, কবি, সাহিত্যিক ও শিল্পীদের ঐ শ্রেণীর ধর্মগুরু, দার্শনিক গুরুদের শ্রেণীতে ফেলা যায় কি না। সাধারণত ধর্মনেতা অথবা রাজনৈতিক নেতারা সমাজ সংস্কারের যে ভূমিকা গ্রহণ করেন, ঠিক অনুরূপ ভূমিকা শিল্পী, কবি ও সাহিত্যিকরা গ্রহণ না করতে পারেন, কিন্তু সামাজিক মানুষ হিসেবে তাঁদের চিন্তাধারা, বিশেষ করে যাঁরা বড়দরের শিল্পী, কবি ও সাহিত্যিক, যাঁরা কেবলমাত্র প্রেমের

কবিতা ও গান লেখেন না—অনেক সময় ধর্মনেতা, দার্শনিক রাজনী-তিক ও সমাজ-সংস্কারের ভূমিকা পালন করেন কিনা। কোনো উপদেশ বর্ষণ না করলেও তাঁদের চিন্তার ভিতরে ঐ সব বিষয়ের বীজ খুঁজে পাওয়া যায়। হয়ত বা দেখা যায় অঙ্কুরিত সেই বীজের বৃক্ষাকৃতি। এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে আমরা রবীন্দ্রনাথকেও একজন বিপ্লবী কবি হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি। কেননা তাঁর নিজের সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার বলিষ্ঠ ভূমিকা তাঁর সাহিত্যাদর্শের মধ্যে আছে। সুতরাং সব বড় লেখকদেরই সাহিত্যে রাজনীতিক গুরুর ঐ বিপ্লবের আদর্শ বিদ্যমান। সে আদর্শ টলস্টয়, ডস্টয়েভস্কি, চেখভ, তুর্গেনিভ, রমা রলাঁ, হুইটম্যান, মিলটন এমন কি মাইকেলে পর্যন্ত খুঁজে পেতে বিলম্ব হয় না।

শিল্পী-সাহিত্যিক-কবিদের বিদ্রোহ ও বিপ্লবের আর একটা দিক হল টেকনিক ও আঙ্গিকের ক্ষেত্রে নতুন নিয়ম, নতুন রীতি নতুন সুর ও রেখার পরিবর্তন। প্রচলিত রাষ্ট্রীয় অথবা সামাজিক রীতি নীতি উল্টে ফেলার সংগে সংগে ভাষা ও আংগিকের ক্ষেত্রেও বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনাও বিদ্রোহী লেখকের প্রথম এবং প্রধান কাজ। এই দিক থেকে দেখলেও বলা যায়, পৃথিবীর প্রথম শ্রেণীর সব শিল্পী, কবি ও সাহিত্যিক বিদ্রোহী তথা বিপ্লবী। এখানে বলে রাখা দরকার যে, বিদ্রোহ এবং বিপ্লব সমার্থক নয়। জেলখানার ডাকাত কয়েদী বিদ্রোহী হতে পারে কিন্তু সে বিপ্লবী হতে পারে না। রাজ্যের শাসনকে অমান্য করে বিদ্রোহী হওয়া যায় কিন্তু বিপ্লবী হওয়া যায় না। বিপ্লবী কখনও উচ্ছৃঙ্খল নয়। প্রচলিত নিয়মকে সে অস্বীকার করে কিন্তু সে আবিষ্কার করে নিজের নিয়ম এবং শুধু আবিষ্কার করে না, স্বসৃষ্ট নিয়মকে প্রতিষ্ঠিত করে। কিন্তু 'বিদ্রোহ' ও 'বিপ্লব' সমার্থক শব্দ না হলেও একে অপরের পরিপূরক। বিপ্লবীর প্রথম ভূমিকাই অবশ্য-ম্ভাবীভাবে বিদ্রোহীর। কেননা বিদ্রোহ ঘোষণা করেই তাঁকে পুরাণো নিয়ম ভেঙে বেরিয়ে আসতে হয়।

কবির যে বিপ্লবী এবং বিদ্রোহী নজরুল ইসলাম প্রিন্সিপাল ইব্রাহিম খাঁর কাছে লেখা একটি চিঠিতে তার আভাস দিয়েছিলেন। বলেছিলেন যে,

তিনি হাফিজ ও রুমীকে তাঁর চেয়েও বড় বিদ্রোহী মনে করেন। রুমী ও হাফিজকে নিজের চেয়েও বড় বিদ্রোহী কেন বলেছিলেন নজরুল ইসলাম? তার কারণ তখনকার কুসংস্কারাচছন্ন পারসী-সমাজের ধর্মীয় গোঁড়ামীর বিরুদ্ধে তাঁরা বিদ্রোহ করেছিলেন। ধর্মের আদর্শকে সবচেয়ে বড় আদর্শ বলে না ভেবে তাঁরা মানুষের হৃদয়টাকে সবচেয়ে বড় বলে মনে করেছিলেন। এই উদার মানসিক আদর্শের পথ ধরে পারস্যের আর একজন বড় কবি খৈয়াম বিশ্ব সাহিত্যের ইতিহাসে বিস্ময়কর জন-প্রিয়তা অর্জন করেছেন। সত্যের পথানুসন্ধানী এই কবি সম্পূর্ণ নাস্তিক না হওয়া সত্ত্বেও আল্লার কাছে কৈফিয়ৎ তলব করেছেন এবং সোজা-সুজি ঈশ্বরের অন্যায়ের প্রতি ইঙ্গিত করে বলেছেন: 'মানুষের হীন-চেতা/তুমিই করেছ হেথা/তোমারই সৃজিত যত কালফণীদল/আনন্দনন্দনে আনে তীব্র হলাহল। এবং ঐ মুক্তচিন্তার অধিকারী হিসেবে ঐ ত্রয়ী কবি গীর্জা, মন্দির, মসজিদের মধ্যে কোনো বিভেদ লক্ষ্য করেননি। বস্তুত নজরুল ইসলাম তাঁর প্রথম বিদ্রোহের পাঠ এইসব মহৎ কবিদের কাছ থেকেই গ্রহণ করেছিলেন। যে-জন্যে তাঁর পক্ষে বলা সম্ভব হয়েছিল: গাহি সাম্যের গান/যেখানে আসিয়া এক হয়ে গেছে সব বাধা ব্যবধান। যেখানে মিশেছে হিন্দু বৌদ্ধ মুসলিম ক্রীশ্চান।' বলা সম্ভব হয়েছিল: 'বন্ধু বলিনি ঝুট। এইখানে এসে লুটাইয়া পড়ে সকল রাজমুকুট। এই হৃদয়ই সে নীলাচল কাশী মথুরা বৃন্দাবন/বুদ্ধ গয়া এ, জেরুজালেম এ, মদীনা কাবাভবন/মসজিদ এই, মন্দির এই, গীর্জা এই হৃদয়।' অর্থাৎ সবার উপরে হৃদয়, সবার উপরে মানুষ। এই অভিনব চিন্তাধারাই বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এক বৈপ্লবিক আদর্শের উদ্ভাবন। এই আদর্শ ও দর্শন মানুষকে ধর্মাধর্ম নির্বিশেষে, গোষ্ঠী শ্রেণী, জাতি ও ধর্ম নির্বিশেষে শ্রদ্ধা করার আদর্শ এবং এটাকে একদিক থেকে সুস্পষ্ট সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় আদর্শ বলে মনে করলেও বিশেষ ভুল করা হবে না। প্রকৃতপক্ষে বাঙলা সাহিত্য ও বাংলাদেশের সমাজে এটাই প্রথম বিপ্লবের বীজ এবং বিপ্লবের মহীরূহ। কেন বিপ্লব? বিপ্লব এই জন্যে যে, এই আদর্শের উপর ভিত্তি করেই সত্যিকার রেনেসাঁ আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। নজরুল আমাদের হিন্দু ও মুসলমান সমাজকে

সহিষ্ণুতার শিক্ষা দেন, পরস্পরের প্রতি পরস্পরের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ার শিক্ষা দেন এবং সমন্বিত সংস্কৃতির রূপ-রেখা তৈরী করে নতুন সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সৃষ্টির পথ বাতলে দেন। কথায় কথায় তাঁর কবিতায় প্রতীক হিসাবে ব্যবহার করতে শুরু করেন বিষ্ণুপুরাণ, গীতা রামায়ণ ও মহাভারতকে এবং অন্য দিকে ইসলামের ইতিহাস ও মুসলিম পুরাণকে। কখনও মুসলিম আদর্শের শরীরে পোশাক পরান হিন্দুপুরাণের, কখনও হিন্দু আদর্শের মাথায় পরিয়ে দেন মুসলিম পুরাণের তাজ। এইভাবে বাক্যে, শব্দে, স্তবকে তিনি অবিরাম বিভিন্ন রঙের কাপড় কেটে জোড়া লাগাবার এক অদ্ভুত সাধনায় মাতেন এবং যে সাধনা ব্যর্থ হতে দেখে ক্ষুব্ধ কণ্ঠে গেয়ে ওঠেন 'হিন্দু না ওরা মুসলিম ওই জিজ্ঞাসে কোন জন? কাণ্ডারী বল ডুবিছে মানুষ সন্তান মোর মার।' এই ভূমিকাটিকে নজরুলের বৈপ্লবিক ভূমিকা না বললে তার প্রতি ভীষণ রকম অন্যায় করা হবে।

একথা ঠিক যে, নজরুল বাঙলায় বাঙালী মুসলমান সমাজে রেনেসাঁ এনেছিলেন। একথা ঠিক যে, তিনি শ্যামাভক্ত রামপ্রসাদের গানের নবজন্ম দান করেছিলেন এবং এইভাবে তিনি কোনো একটা আদর্শকে চূড়ান্ত বলে মেনে না নেওয়ায় ঐ সব বিভিন্ন ধর্মীয় অথবা রাষ্ট্রনীতির আদর্শে বিশ্বাসীরা নজরুলের মধ্যে কোনো শৃঙ্খলা খুঁজে পান না এবং সেই জন্যেই তাকে বিপ্লবী মনে করা তাঁদের পক্ষে সম্ভবও হয় না। কিন্তু একথা তাঁদের মনে রাখা উচিত যে, ঐসব আদর্শের কোনা একটা ডগমায় বিশ্বাসী হলেই তিনি আর বিপ্লবী থাকতেন না, বিদ্রোহী ত নয়ই। শুধুমাত্র মুসলিম আদর্শে বিশ্বাসী হলে তাঁকে বলা হত বিপ্লবী হজরত মুহম্মদের অনুসারক, শুধুমাত্র মার্কসকে মানলে তাঁকে বলা হত বিপ্লবী মার্কসের অনুধাবক। এঁদের কাউকে না মেনে তিনি যে বাঙলাদেশের সমাজ, সংস্কৃতিতে ও সাহিত্যে ভিন্ন ধর্ম ও সংস্কৃতিকে প্রীতির বাঁধনে বাঁধবার নতুন আদর্শ সৃষ্টি করলেন, সেখানেই ত তাঁর বৈপ্লবিক চিন্তাধারার বিজয় এবং সে জন্যেই ত তিনি একাধারে বিদ্রোহী এবং বিপ্লবী। আজকের দিনে একথা অবিসম্বাদিতভাবে সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে যে, সমন্বয়বাদী ঐ দর্শনই একমাত্র জাতীয় উন্নতিকে ত্বরান্বিত করতে সমর্থ।

আলোচনা করা যাক নজরুল তাঁর সাহিত্যে ও কাব্যে আঙ্গিক-গত দিক থেকে কোনো পরিবর্তন আনতে পেরেছিলেন কি না—যেমনটি পেরেছিলেন মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ? খুব স্পষ্ট ভাষায় বলে দেওয়া যায়, হ্যাঁ, পেরেছিলেন। প্রথমত ভাষার ওজস্বিতা সৃষ্টি করে, দ্বিতীয়ত বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের মুখের বুলিতে মিশ্রিত অসংখ্য আরবী-ফারসী শব্দকে সাহিত্যের মর্যাদায় উন্নীত করে, তৃতীয়ত হিন্দু পুরাণাশ্রিত কাহিনী' নাম ও নামবাচক বিশেষ্যকে রূপকে প্রতীকে প্রকাশ করে, চতুর্থত ফারসী ও তৎসম-তদ্ভব শব্দ দ্বারা যৌগিক শব্দ সৃষ্টি করে, পঞ্চমত মুসলিম ও হিন্দু পুরাণের চিত্র ও চিত্রকল্প উপমা ও উৎপ্রেক্ষার যৌগিকসমাহার ঘটিয়ে, ষষ্ঠত লঘু স্বরবৃত্তের মধ্যে গাম্ভীর্য ফুটিয়ে, সপ্তমত ফার্সীছন্দের সূক্ষ্মধ্বনিকে বাংলা ছন্দে রূপান্তরিত করে এবং অষ্টমত 'মুক্তক মাত্রাবৃত্ত' রচনা করে।

শুধু এই নয়—নজরুল বাংলা সংগীত জগতেও বিপ্লব এনেছিলেন। হাফিজের গজলের কবিতা কাঠামোই শুধু নয়, হিন্দুস্থানী সংগীতের আত্মাকে তিনি বাংলাগানের শরীরে স্রষ্টার শক্তিতে প্রবিষ্ট করিয়েছিলেন। বাংলা গানে গজল, কাওয়ালী খেয়াল ও ঠুংরীর তিনি বিদ্রোহী এবং বিপ্লবী স্রষ্টা এবং বলা বাহুল্য তুরস্ক, মধ্যপ্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সুরের মিশ্রণে আধুনিক মার্চ সংগীত ও সংগীতেরও প্রবর্তক।

তবু প্রশ্ন থেকে যায় সব শ্রেষ্ঠ শিল্পী, সাহিত্যিক এবং কবি যদি 'বিদ্রোহী' হন, তবে একা নজরুলকে কেন 'বিদ্রোহী'র মুকুট পরান? সম্ভবত এর কারণ এই যে, বাঙলা সাহিত্যের হাজার বছরের ইতিহাসে পবিত্র ক্রোধের একক স্রষ্টা তিনি এবং একই সঙ্গে বজ্র ও বেণুকে বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ করার শ্রেষ্ঠতম ঘটক।

অন্যদিকে বিদ্রোহী ইরানী কবিদের কাছে থেকে স্বাধীন চিন্তার দীক্ষা নিলেও রাজনৈতিক চেতনায় তিনি তাঁদের সগোত্রের নন। অন্তত প্রত্যক্ষভাবে প্রকাশ্যে কোনো ইরানী কবিকে নিপীড়িত মানুষের মুক্তির জন্যে রাজবিদ্রোহ করতে দেখা যায় না। ফেরদৌসীর রৌপ্য মুদ্রা ছুঁড়ে ফেলে যাওয়া রাজনৈতিক চেতনার বিদ্রোহ ছিল না। সে রকম বিদ্রোহ আমরা হাফিজ ও রুমীকেও করতে দেখি না। বরং দেখি

শিরাজের শাসনকর্তা শাহ সুজার সময়ে হাফিজ—"গর্ মুসলমানী আজ আনস্তকে হাফিজ দার্ দ্ওয়ায় আগর আজ পেয় ইমরোজ বুয়দ ফরদায়ে। (অর্থ : হাফিজের যে ধর্ম ইহাই যদি মুসলমান ধর্ম হয়, হায়, তাহা হইলে কবে আজকার দিন শেষ হইয়া কল্য আসিবে"। এই দু'পংক্তি কবিতা লেখার পর শঙ্কিত হয়ে মওলানা জায়নুদ্দীন আবুবকর তায়া-বাদির শরণাপন্ন হন এবং তাঁর পরামর্শক্রমে রাজার ক্রোধ থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য রচনা করেন—"ইঁ হদিসম চে খোশ আমদ্কে সহরগাহ্মি গোফ্ত্/বর দরে ময়কদয়ে বা দফ ও নেয় তরসায়ে (অর্থ একজন খ্রীষ্টধর্মী যখন এক সরাই-এর দ্বারে বসিয়া তাম্বুরা এবং বাঁশী লইয়া এই গান গাহিতেছিল, তখন সেই প্রাতঃকালে আমার কাছে সে গান কেমন মজার শুনাইতেছিল)। বলাবাহুল্য রাজার সংগে আপোষের এই মনোভাব নজরুলের ছিল না। নজরুল ইসলাম সমাজ বিপ্লবে রবীন্দ্রনাথের পথও অনুসরণ করেননি। কারণ রবীন্দ্রনাথ জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের পরে ঘৃণাভরে নাইট উপাধি ত্যাগ করলেও এবং সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে পরোক্ষ ঘৃণা প্রকাশ করলেও তিনি প্রকাশ্য রাজ-বিদ্রোহের ভূমিকা কখনও গ্রহণ করেননি এবং শোষক শ্রেণীর হাত থেকে সর্বহারা শ্রেণীর অর্থনৈতিক মুক্তির পথও তিনি বাতলে দেননি। তাঁর কবিতায় আমরা ঠিক এই ধরনের বক্তব্য পাই না—"প্রার্থনা করি, যারা কেড়ে খায় তেত্রিশ কোটি মুখের গ্রাস/যেন লেখা হয় আমার রক্তলেখায় তাদের সর্বনাশ।" কিন্তু "তুমি শুয়ে রবে তেতালার পরে আমরা রহিব নীচে/অথচ তোমারে দেবতা বলিব সে ভরসা আজ মিছে।...তারি পদরজ অঞ্জলি করি মাথায় লইব তুলি/সকলের সাথে পথে নামি যাব পায়ে লাগিয়াছে ধূলি"। বাংলা সাহিত্যে নজরুলের ভূমিকা যোদ্ধার, সংগ্রামীর, বীরের, উৎপীড়ক রাজার উৎখাতকারী রাজ-বিদ্রোহীর ও শিল্প-বিপ্লবীর। এদিক থেকে তাঁর সগোত্রের লেখক ও কবি গোর্কি, মায়াকোভস্কি, নাজিম হিকমত কিংবা হয়ত কিছুটা রোমান্টিক বায়রন ও শেলী এবং গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গিতে সামঞ্জস্য থাকার জন্যে কিয়দংশে হুইটম্যান।

মোসাহেব সমালোচক ও নজরুল ইসলাম

নজরুল ইসলামের কাব্য সমালোচনার উর্ধ্বে নিশ্চয় নয়। কিন্তু সমালোচনার উদ্দেশ্য যেখানে কবিকে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা সেখানে প্রতিবাদের কণ্ঠও সোচ্চার হতে বাধ্য।

নজরুল ইসলাম good poet না great poet এই বিতর্ক অনেক দিনের। কিন্তু নজরুল ইসলাম good poet না great poet এই বিতর্কটি কে প্রথম তুলল! রবীন্দ্রনাথ নজরুল ইসলামকে "বসন্ত" নাটিকাটি উৎসর্গ করাতে রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ পার্শ্বচর ভক্তরা আপত্তি তুলেছিলেন। তাঁরা নজরুল ইসলামকে কবি বলে স্বীকার করতে চাননি। রবীন্দ্রনাথ তাঁদের উপেক্ষা করে নজরুল ইসলামকে কবি বলে স্বীকৃতি দেন। কিন্তু পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত এই অভিমানী আহত পণ্ডিতের দল তাতে নিরস্ত হন না। সপ্তরথী মিলে যেমন অভিমন্যুকে আক্রমণ করেছিল এঁরা তেমনি নজরুল ইসলামের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ আক্রমণ শুরু করেন। এখানে বলে রাখা ভাল যে এই রবীন্দ্র-ভক্তরা ছিলেন বাংলা সাহিত্যের এক একজন বিশাল দিক্‌পাল। সুতরাং এঁদের কথার গুরুত্ব যে কারও উপর প্রভাব বিস্তার করবে না এমন হতেই পারে না। ছাত্রের চরিত্রে ও চিন্তায় যতই মৌলিকত্ব থাক শিক্ষকের চিন্তা ও আদর্শের প্রভাব তাদের উপর কিছু না কিছু পড়েই। এই পণ্ডিতগোষ্ঠীর শিষ্য ও প্রশিষ্যদের মধ্যেও তার অনিবার্য প্রভাব পড়েছিল। তাই দেখা যায় "কবিতার" 'ক' সম্বন্ধে অজ্ঞাত ব্যক্তিরাও নজরুলকে অ-কবি বলে চিহ্নিত করতে আদৌ লজ্জাবোধ করেন না।

কিন্তু বলছিলাম good ও great এর বিতর্কটি কে প্রথমে তুললেন। বুদ্ধদেব বসু "কবিতা"র নজরুল সংখ্যার সম্পাদকীয়তে লেখেন—"নজরুল মহাকবি নন সত্যকার কবি।" এই "সত্যকার কবি" কথাটি good poet এ পরিণত হয়।

মোসাহেব সমালোচক ও নজরুল ইসলাম

বাংলাদেশের কিছু বুর্জোয়া কবিদের কথাটা খুব মনে ধরে এবং নানা-ভাবে তাঁরা নজরুলের মহত্ত্বকে অস্বীকার করতে চান। আজকাল যে সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন লেখাকে আমরা প্রগতিশীল চিন্তার বাহন বলি নজরুল "সর্বহারা", "ভাঙার গান", "সাম্যবাদী", 'সন্ধ্যা' "ফণী-মনসা" প্রভৃতি গ্রন্থে সেই দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় রাখার জন্যেই আভিজাত্যগর্বী লেখকদের চোখে সেদিন তিনি বড় কবিদের আসন পাননি। যে মতাদর্শ, চিন্তাধারা, জীবনদর্শনের জন্যে নজরুল ইসলাম বিশেষ করে জনপ্রিয় সমালোচকরা সেদিকটাকে নজরুলের দুর্বলতা এবং কবি হিসেবে ক্ষুদ্রতার পরিচয়বহ বলে অভিহিত করেন। যেমন বুদ্ধদেব বসু কালের পুতুলে লেখেন :

> সাম্যবাদী সর্বহারার কবি হিসেবে মহাকাল তাঁকে মনে রাখবে কিনা জানি না ; কিন্তু কালের কন্ঠে তিনি গানের মালা পরিয়েছেন। সে মালা ক্ষুদ্র কিন্তু অক্ষয়।

বলাবাহুল্য নজরুলের গানের মালাটি অক্ষয় যেমন সত তেমনি সত্য মালাটি অনেক বড়। আর প্রসঙ্গের কথা হল নজরুল বাঙালীর কাছে যে জন্যে প্রথম প্রসিদ্ধি লাভ করেন তা গান লেখার জন্যে নয়— "শাত-ইল-আরব", "খেয়াপারের তরণী", "কোরবানী", "মোহররম" "বিদ্রোহী" ও "কামাল পাশা" লেখার জন্য। বিদগ্ধ সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার প্রথমে গান লেখার জন্যে নজরুলকে অভিনন্দন জানাননি, জানিয়ে ছিলেন "খেয়াপারের তরণী" ও "কোরবানী" লেখার জন্যে অভিবাদন। তাহ'লে গান লেখাটাকে এত বড় করে কেন দেখা হল।

অবশ্য সত্য নজরুল ইসলাম মুক্তার মত পংক্তি দিয়ে অনেক অবিশ্বাস্য রকমের সুন্দর গান লিখেছেন। আমি বলব অনেক মাঝারী ধরনের কবি, অনেক ক্ষুদে কবি চেষ্টা করলে অমন গান বেশী না হলেও দু'একটি লিখতে পারেন। বাংলা সাহিত্যে তার উদাহরণও আছে। খোঁজ করলে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, অতুলপ্রসাদ সেন, রজনীকান্ত সেন-এর এমনকি গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার, অজয় ভট্টাচার্য কিংবা প্রণব রায় অথবা তুলসী লাহিড়ীর গানের মধ্যে তেমন দু'একটি গান পাওয়া যাবে। কিন্তু তাঁদের কারও ক্ষমতা ছিল না একটা "বিদ্রোহী" একটা "কামাল পাশা" একটা "ধূমকেতু," "রণভেরী," "ঝড়" কিংবা

"ফাতেহা-ই-দোয়াজ দহমে"র মত কবিতা রচনা করা। কেননা এইসব কবিতাগুলো কোনো বানিয়ে তোলা বস্তু নয়—এগুলো হচ্ছে একটা প্রচণ্ড আবেগের সৃষ্টি যে আবেগের তীব্রতা ভিন্ন কোনো মহৎ সৃষ্টি সম্ভব হয় না।

একজন নামকরা ইংরেজ সমালোচক বলছেন আঙটির উপর নকশা আঁকা এক ধরনের আর্ট এবং পাহাড় কুঁদে মূর্তি বানানোও এক ধরনের শিল্প। কিন্তু পাহাড় কুঁদে বড় বড় মূর্তি বড় বড় শিল্পীরাই নির্মাণ করেন, ক্ষুদে শিল্পীরাই ঐ আঙটির উপর চমৎকার নক্‌শা আঁকেন।

সংগীতের লেখক হিসেবে নজরুল ইসলামের অসামান্য কৃতিত্ব সত্ত্বেও সেখানে তিনি যে কাজ করেছেন তা ঐ ক্ষুদে শিল্পীর—যদিও বৈচিত্র্যের জন্যে, বিশালতার জন্যে এবং বিচিত্র ভাব ও সুরের সম্মিলনে পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য মানব-জীবনের প্রতিটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনুভূতিকে চমৎকার ভাবে রূপদানের জন্য সেখানেও তিনি ক্ষুদ্রত্বের সীমা ডিঙিয়েছেন চিত্রকল্প, উপমা ও রূপকের অসাধারণ উপস্থাপনার জন্যে তিনি বিরাটত্ব লাভ করেছেন। তবু আমার মনে হয়—"অগ্নি-বীণা" "সিন্ধু-হিন্দোল", "জিঞ্জির" ও "সাম্যবাদী"র কবির চেয়ে এই সংগীতস্রষ্টা বড় নয়। এখনও "অগ্নি-বীণা"র কবিতা পড়লে, এখনও "ফাতেহা-ই-দোয়াজ দহম", "ঝড়", "মুক্ত-পিঞ্জর", "পূজারিণী" পড়লে যে অসামান্য ভাষা ও ছন্দস্রষ্টার সংগে আমাদের সাক্ষাৎ লাভ ঘটে তার স্থান good poet-দের চেয়ে অনেক বেশী উঁচুতে। এই সব কবিতায় ছন্দের যে জটিলতা, শব্দ ব্যঞ্জনার যে গাম্ভীর্য, বাক্যের যে দমফাটা বিশাল ঢেউ আমরা লক্ষ্য করি বাংলা সাহিত্যে নকল ক'রে তার একটি লাইন কেউ লিখতে পারেননি। তবু নজরুল ইসলাম এখনও great poet নন এখনও good poet.

প্রতি বছর তাহ'লে এই good poet-এর জন্মদিবস পালন কেন? উপেক্ষাজনক ব্যাপার হলেও এখন একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করতে চাই। আপনারা জানেন আজহারউদ্দীন খান নামে পশ্চিমবঙ্গের একজন লেখক ১৯৫৪ সালে "বাংলা সাহিত্যে নজরুল" বলে একটি পূর্ণাঙ্গ নজরুল আলোচনা লেখেন। এই ভদ্রলোক আমাকে পর পর তিনটি চিঠি দেন। এই প্রসঙ্গে সেই পত্রগুলির অংশবিশেষ উদ্ধার করব।

মোসাহেব সমালোচক ও নজরুল ইসলাম

প্রথম পত্র :

নজরুল একাডেমী পত্রিকার গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ ১৩৮০ সংখ্যা পেয়েছি। আপনারা নজরুল একাডেমী গঠন করে "নজরুল-চর্চা" যে অব্যাহত রেখেছেন তা অভিনন্দনযোগ্য। এ-ধার'র বছরে কবিকে একবার স্মরণ করা হয়—তারপর সব চুপচাপ। আপনারা কবিকে নিয়ে যে-রকম আলোচনা শুরু করেছেন তার কিছুই এধারে হয় না। আপনার প্রেরিত একটি সংখ্যায় আপনাদের লেখনীর পরিচয় পেয়ে বিস্মিত হয়েছি।

দ্বিতীয় পত্র :

নজরুল-চর্চার যে একটি একাডেমী গড়ে উঠেছে তার নিদর্শন আপনাদের প্রতিষ্ঠান। নজরুল অনুরাগীদের মধ্যে আপনারা একটি যোগ্য ও শ্রেষ্ঠ কাজ সম্পাদন করেছেন। তবে অতিরিক্ত, নজরুল-প্রীতি ভাল নয়। নজরুল মহাকবি নন—রবীন্দ্রনাথের সগোত্র ও সমজাতীয় কবি তিনি নন। তিনি good poet মাত্র। নজরুলের থেকে বড়ো কবি আমাদের সাহিত্যে আছেন।

লক্ষ্য করুন আজহারউদ্দীন খান বুদ্ধদেব বসুর মত বলেছেন—"তিনি মহাকবি নন' good poet মাত্র। কিন্তু বুদ্ধদেব বসুর কন্ঠ-স্বর এই চিঠিতে শুধু নয় তাঁর নিজের লেখা "বাংলা সাহিত্যে নজরুলে"ও ফুটে উঠেছে। তিনি বুদ্ধদেব বসুর "নজরুল ইসলাম" প্রবন্ধ থেকে--লাইনের উপর লাইন মেরে দিয়েছেন, দু'একটি শব্দ পরিবর্তন করে। এখানে তার কয়েকটি উদাহরণ দেখাব।

বুদ্ধদেব বসু লিখছেন :

নজরুল সম্বন্ধে বিশেষভাবে বলবার কথা এইটেই যে তিনি একই সঙ্গে লোকপ্রিয় কবি এবং ভালো কবি—এ-ধরনের কবি হবার বিপদ এই যে জোর আওয়াজ হ'তে থাকলেই মনটা খুশি হয়, সে- আওয়াজ যে অনেক সময় ফাঁকা আওয়াজ মাত্র সে খেয়াল একেবারেই থাকে না।

আজহারউদ্দীন খান লিখছেন

নজরুল একাধারে জনপ্রিয় ও প্রতিভাবান কবি। এ ধরনের প্রতি-ভার যেমন একটা সহজাত সৌভাগ্য আছে তেমনি আছে একটা

দুর্ভাগ্যের দিক। প্রচুব হাততালি ও বিপুল জনপ্রিয়তা ' প্রতিভাবান কবিকে কি-ভাবে নষ্ট করে দেয় তার প্রমাণ নজরুল ইসলাম।

বুদ্ধদেব বসু লিখছেন :

গানেব ক্ষেত্রে নজরুল নিজেকে সবচেয়ে সার্থকভাবে দান করেছেন।

আজহারউদ্দীন খান লিখছেন :

নজরুলের কবিতা জনপ্রিয়তা আনলেও কবি-প্রতিভার মহত্তম এবং মধুবতম বিকাশ তাঁব গানে।

বুদ্ধদেব বসু লিখছেন ;

আরো বেশী গান যে অনিন্দ্য হয়নি, তার কারণ নজরুলের দুরতিক্রম্য রুচির দোষ।—গীত-রচয়িতার অন্য সমস্ত গুণ তাঁর ছিল—শুধু যদি এই দোষ না থাকতো, শুধু যদি রুচি নিখুঁত হ'ত তাহ'লে তাঁর মধ্যে একজন মহৎ গীতিকারকে আমরা বরণ করতে পারতাম।

আজহারউদ্দীন খান লিখছেন :

নজরুলের কবিতার মতো সব গান সাহিত্য পদবাচ্য নয়। কেননা রুচি নিখুঁত না থাকাব জন্যে কবিতার মতো অনেক গান অনেক স্থলে খোঁড়া হয়ে গেছে, অসংযম ও আতিশয্যের চাপে সূক্ষ্ম পরিমিতি বোধের অভাব দেখা গেছে।

বুদ্ধদেব বসু বলছেন :

নজরুলের সমস্ত গানের মধ্যে যে-গুলি ভালো সে-গুলি সযত্নে বাছাই ক'রে নিয়ে একটি বই বের করলে সেটাই হবে নজরুল-প্রতিভার শ্রেষ্ঠ পরিচয়।

আজহারউদ্দীন খান বলেন :

যে গান ও কবিতাগুলি সুন্দর সে-গুলিকে বহন করে যদি একখানা বই প্রকাশ করা যায়—তাহ'লে সে-বইয়ের মধ্যে যে-কবিকে আমরা পাব সে-কবির মন হবে সংবেদনশীল ; রুচি হবে নিখুঁত।

মোসাহেব সমালোচক ও নজরুল ইসলাম

বুদ্ধদেব বসু লিখছেন :

> বিশ্বাস, উচ্ছ্বাস, উদ্দীপনা এ-সমস্ত জিনিসকে যাঁরা রোমান্টিক ব'লে এক পাশে সরিয়ে রাখেন, তাঁদের পক্ষে সাহিত্যচর্চা নিতান্ত অবৈধ।

আজহারউদ্দীনখান বলেন :

> বিশ্বাস-উচ্ছ্বাস উদ্দীপনা—এসব জিনিসকে যাঁরা নিছক রোমান্টিক আখ্যায় ভূষিত করেন তাঁদের পক্ষে কোনো কবির কাব্য বিচার করা উচিত নয়।

এই আজহারউদ্দীন খান। যাঁর কণ্ঠটিকে ঠিক একটি মোসাহেবের কণ্ঠ বলা যায়। এবং বলা বাহুল্য এই মোসাহেব সমালোচকেরা নজরুলকে good poet বানিয়েছেন। "বাংলা সাহিত্যে নজরুল" গ্রন্থটির ৫ম সংস্করণ পর্যন্ত ছাপা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী ধারী ছাত্ররা তা পাঠ করেছেন এবং হাজার হাজার ছাত্র এই মোসাহেব কণ্ঠে উচ্চারিত প্রচার-পত্র পাঠ করে শিখেছেন নজরুল great poet নন good poet।

নজরুল-প্রতিভা ধূমকেতুর মত আকস্মিক নয়

নজরুল ইসলাম 'ধূমকেতু' নামে একটি কবিতা লিখেছিলেন। এর ১নং আভিধানিক অর্থ সপুচ্ছ জ্যোতিষ্ক বিশেষ। ২ নং অর্থ অগ্নি। ৩ নং অর্থ ধূমাভ তারকাভেদ, উৎপাত বিশেষ, কেতুগ্রহ। ৪ নং অর্থ সূর্য। ৫ নং ধ্বংস-বিধায়ী। শাস্ত্রমতে "ধূমকেতু" হ'ল অমঙ্গলের স্মারক। জ্যোতির্বিদরা বলেন যে, প্রতিরাত্রেই এই পুচ্ছধারী নক্ষত্রটিকে আকাশে দেখা যায় না—ডিম্বাকার বৃত্তে এটা সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে এবং দশ কিম্বা দ্বাদশ বৎসর পর রাত্রির আকাশে দেখা দেয়। এবং যে বৎসর ধূমকেতুর উদয় হয় সে বৎসর পৃথিবীতে যুদ্ধ, মন্বন্তর, মহামারী প্রভৃতি ধ্বংসের প্লাবন নেমে আসে। প্রকৃতির শান্ত সমুদ্রে হঠাৎ যেন ঝড়ের তাণ্ডব লীলা শুরু হয়। ঝড়ের ঘূর্ণাবর্তে সমস্ত পৃথিবী লণ্ডভণ্ড হয়ে যায়।

সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশের শোষণ ও শাসনকে ধ্বংস করার জন্য, বুর্জোয়া শোষক গোষ্ঠীকে উৎখাত করার জন্য, সামাজিক অনাচার বর্ণ-বৈষম্য, শ্রেণীভেদ, গোঁড়ামী এবং অপ্রগতিশীল স্থবির অনগ্রসর প্রাচীন পূজারী চিন্তাধারাকে বিলুপ্ত করার জন্য বিপ্লব ও বিদ্রোহের নিশানবরদার নজরুল ইসলাম প্রতীক হিসেবে ঐ "ধূমকেতু" নামটি গ্রহণ করেছিলেন। কবিতাটির প্রথম দু'টি পংক্তি এমনি :

আমি যুগে যুগে আসি, আসিয়াছি পুনঃ মহাবিপ্লব হেতু
এই স্রষ্টার শনি মহাকাল ধূমকেতু।

কিন্তু এখানে আরও একটি কথা বলে রাখা দরকার। ধর্মশাস্ত্র বলে : পৃথিবীতে যখনই কোনো অনাচার ও অত্যাচার দেখা দেয় তখনই আল্লাহ্‌র তরফ থেকে মানবজাতিকে পাশবিক উৎপীড়নের হাত থেকে উদ্ধার করার জন্যে একজন উদ্ধারকারী মহামানব প্রেরিত হন। একথা কোরানে আছে—এ কথা গীতাতেও আছে। সুতরাং—যুগে যুগে অত্যাচারীকে উৎখাত করার জন্যে যে বিপ্লবী মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়

তিনি শুধু ধ্বংসের জন্যে ধ্বংস করতে আবির্ভূত হন না, তিনি সৃষ্টির জন্য মঙ্গলের জন্য 'উৎপীড়িতের ক্রন্দন রোল'কে অপনোদন কবার জন্যে আবির্ভূত হন।

এই দার্শনিক উপলব্ধিকে প্রেক্ষাপটে রেখে প্রতীকাখে নজরুল ইসলাম তাই 'ধূমকেতু' নাম গ্রহণ করেন। কিন্তু বাংলা সাহিত্যে নজরুল-প্রতিভা বিচাবে 'ধূমকেতু' প্রতীকটিকে অন্য অর্থেও গ্রহণ কবা হযেছে। তা হল 'ধূমকেতু' প্রথমত সূর্য নয এবং আকাশে তার অবস্থান স্বল্পকালীন। অর্থাৎ নজরুল-প্রতিভা একটি সাময়িক উচ্ছ্বাস মাত্র, যাব আবিভাব কাল-বৈশাখীর মত প্রচণ্ড হলেও নিতান্ত ক্ষণস্থায়ী। এই সমালোচনা শুনতে শুনতে অভিমানী নজরুল বেদনাতিক্ত সুবে এক সময লিখেছিলেন :

> কাব্যেব নীল স্বচ্ছ গগনে অকল্যাণেব হেতু
> একদা শারদ নিশীথে সহসা উঠেছিনু ধূমকেতু।
> যে উদার নভ-অঙ্গনে লীলা কবে শত রবি চাঁদ,
> কেন জেগেছিল সে সভায় মোর আলো দানিবার সাধ!
> কোটি জ্যোতিষ্ক গ্রহ তারকার যেথা অনন্ত ভিড়
> ছুটে এনু সেথা উৎপাত-শনি ধনুর্মুক্ত তীর।
> বিস্ময়ে ভয়ে চঞ্চল হয়ে উঠিল দিগঙ্গনা,
> হংসসারির মালিকা ফেলিয়া পলাইল উন্মনা।
> হুজুগের ধূলি-অন্ধ-আকাশ ললাটে তিলক-রেখা
> আঁকিল আমার অশুভ ধূম্র-মলিন অগ্নি-লেখা।
> ত্রিপুণ্ড্রধারী রুদ্রের রোষ-বহ্নিতে জনমিযা
> ভয়ান জ্যোতির্নাগশিশু-সম আসিলাম বাহিরিয়া।
> আমার ফণার মণি করিলাম উল্কাপিণ্ড তুলি'
> মহাকাল-করে জ্বালাময বিষকেতন উঠিল দুলি।'
> সেদিন আমার প্রণতি জানাতে এল কত নরনারী,
> বান্ধিয়াছিল আমারে ভাবিয়া সাগ্নিক নভোচারী।
> আজ মনে নাই সে গগনে কবে উঠেছিল ধূমকেতু,
> ক্ষণিক আতস বাজি সম এসেছিল কৌতুক হেতু।

অর্থাৎ কল্যাণের জন্যে এসেছিল যে অকল্যাণের প্রতীক "ধূমকেতু" হল তার শিরোপ কিন্তু সাহিত্যের বিচারে নজরুলের আবির্ভাব 'ধূমকেতু'র মত বিস্ময়কর আকস্মিকতাও নয়, আতসবাজির মত ক্ষণকালের ভেলিকও নয় :

অনেক সমালোচককে লিখতে দেখি নজরুল ইসলাম নেপোলিয়নের মত 'আসিলেন দেখিলেন জয় করিলেন'। এত অল্প সময়ে এতটা খ্যাতি বাংলা-সাহিত্যে আর কারও ভাগ্যে জোটেনি। ইংরেজী সাহিত্যে তাঁরই মত আর একটি উদাহরণ বায়রন। সে-কথা মিথ্যা নয়, 'মোসলেম ভারতে' নজরুলের কবিতা প্রকাশের সংগে সংগে বিদ্যুৎবেগে তাঁর খ্যাতি সমগ্র বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়ে। এতটা কলা-কৌশল অঙ্গে জড়িয়ে এমন শক্তিমস্ত ভাষার ছন্দে কাব্যে আত্মপ্রকাশ করা কিছুটা বিস্ময়কর ব্যাপার বৈকি! মনে হয় এর জন্যে যেন নজরুলের কোনো সাধনা ছিল না, কোনো অধ্যবসায় ছিল না, কোনো শিক্ষা ছিল না। হঠাৎ যেন সরস্বতী তাঁর জিহ্বায় ভর করল আর তিনি যা লিখলেন তা অসামান্য কাব্যে মূর্ত হয়ে উঠল। কিন্তু বলা প্রয়োজন ব্যাপারটা অতিদৈব আদৌ নয়। অসামান্য প্রতিভাবান কবি নজরুল ইসলাম নিঃসন্দেহে কিন্তু তারও একটি প্রস্তুতির পর্ব ছিল। মাত্র এক দিনেই ক্র্যাফটস-ম্যানশিপের অনবদ্য নৈপুণ্যের চিহ্ন নিয়ে এই সকল স্তবক সৃষ্টি হয়নি :

হাঁকো হাইদর,
নাই নাই ডর,
ঐ ভাই তোর ঘুর-চর্খীর সম খুন খেয়ে ঘুর খায়।
'ঝুটা দৈত্যেরে
নাশি,' সত্যেরে
দিবি জয়টিকা তোরা, ভয় নাই ওরে ভয় নাই হত্যায় :
ওরে আয়!
মোরা খুন-জোশী বীর, কস্তুশী লেখা আমাদের খুনে নাই।
দিয়ে সত্য ও ন্যায়ে, বাদশাহী, মোরা জালিমের খুন খাই।

কিংবা

'কুত্-আমারা'র রক্তে ভরিয়া
দজ্‌লা এনেছে লোহুর দরিয়া ;
উগারি' সে খুন তোমাতে দজলা নাচে ভৈরব 'মস্তানী'র
ত্রস্তা-নীর
গর্জে রক্ত-গঙ্গা ফোরাত,—"শান্তি দিয়েছি গোস্তাখীর।"
দজলা-ফোরাত-বাহিনী শাতিল। পূত যুগে যুগে তোমার তীর।

অথবা

ওরে হত্যা নয় আজ 'সত্য-গ্রহ' শক্তির উদ্বোধন।
এতো নহে লোহু তরবারের
ঘাতক জালিম জোরবারের।
কোরবানের জোরজানের
খুন এ যে এতে গোর্দা ঢের রে, এ ত্যাগে-'বুদ্ধ'-মন।
এতে মা রাখে পুত্র পণ।
তাই জননী হাজেরা বেটারে পরালো বলির পূত বসন।
ওরে হত্যা নয় আজ 'সত্য-গ্রহ' শক্তির উদ্‌বোধন।

শুধু জোর বক্তব্যের ব্যাপার নয়, এর ছন্দ, এর ভাষা, এর উপমা, এর চিত্রকল্প, ধ্বনির ঐশ্বর্য একমাত্র একজন শ্রেষ্ঠ কবির লেখনীতেই সম্ভব। কিন্তু একজন একুশ বছরের যুবক কি ক'রে সেই শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করলেন। বাংলা-সাহিত্যে ইতিপূর্বে এই ধরনের ভাষা, ছন্দ, আঙ্গিকও লক্ষ্য করা যায়নি। এই ঐন্দ্রজালিক ব্যাপারটা সাধিত হল কি করে? এই আঙ্গিক ও ভাষার মধ্যে এই ছন্দের মধ্যে আমরা ত রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল কাউকে পাই না। এই যাদুর উৎস কোথায়।

মনে রাখতে হবে বাংলা ভাষা চর্চার সংগে সংগে অতি বাল্যকাল থেকে নজরুল ইসলাম আরবী ও ফারসী ভাষারও চর্চা করে আসছিলেন এবং সেই সংগে সংগীত। এই সংগীতের শিক্ষা ভিন্ন কোনো কাব্যের ছন্দই স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিখুঁত হয়ে ওঠে না। নজরুল ইসলাম যখন লেটোর দলে গান করেছেন তখন ঢোল করতালের সংগে নেচে নেচে গান গেয়েছেন—গলায় হারমোনিয়াম বেঁধে গান গেয়েছেন এবং কবির লড়ায়ে মুখে মুখে ছন্দে ছন্দে পদ্য রচনা করেছেন, আবার লিখেছেনও

১৬—

দেশী-বিদেশী ভাষা মিলিয়ে পদ্য-ছড়া-গান। একই সংগে কবিতা লেখা এবং গান শেখা তাঁর সমান্তরালভাবে চলেছিল। স্কুলে পড়ার সময় এক ভালো সংগীত শিক্ষকের সংগে তাঁর পরিচয় হয়েছিল, তারপর করাচীতে গিয়ে একদিকে তিনি অর্গান বাজানো এবং উচচাঙ্গ সঙ্গীত শিক্ষা করেন, অন্যদিকে হাফিজ ওমর সাদী ও রুমীকে পাঠ করেন। বাংলা ছন্দের সংগে ফার্সী ছন্দও শেখা হয় তাঁর এবং তা শিক্ষিত গায়কের কান নিয়ে।

প্রথম দিকের নজরুলের লেখা পদ্য ও কবিতা খুবই কাঁচা ও দুর্বল ছন্দে লিখিত। এ ধরনের অনেক কবিতা তিনি লিখেছেন যাব অনেকগুলো আজ হারিয়ে গেছে। দু'চারটি যা এখানে ওখানে ছাপা হয়েছে সে-গুলোই প্রমাণ কবে যে এক কৌতূহলী কাব্যপ্রাণ আগ্রহশীল তরুণের তপস্যা ধীরে ধীরে একটা পরিণতির দিকে এগিযে যাচ্ছিল। কী পরিমাণ সাধনা যে একজন শ্রেষ্ঠ কবিকে তৈরী করে তা দেখার জন্যে তার প্রথম দিক্‌কার একটি কবিতা তুলে তারই পাশে তাঁব একটি পরিণত কবিতার স্তবকের বিচার করা যায়। নজরুলের প্রথম দিককার একটি কবিতার কয়েকটি পংক্তি এমনি। কবিতাটি 'মাসিক সওগাত'-এ প্রকাশিত হয়েছিল। নাম 'কবিতার সমাধি'।

পরিশ্রমে গলদ ঘর্ম, সারা নিশি জেগে'
ভাবশিরে মুহুর্মুহু লাঠ্যাঘাতি রেগে'
সে কি লেখা লেখিলাম মহা মহাপদ্য,
অক্ষর একুন করি যোজিলাম চৌদ্দ।

এরই পাশে কবির 'মোহররম' কবিতার কয়েকটি চরণ উদ্ধার করা যাক:

গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদে কচি মেয়ে ফাতিমা,
"আম্মা গো, পানি দাও, ফেটে গেল ছাতি, মা।"
নিয়ে তৃষা সাহারার দুনিয়ার হাহাকার
কারবালা-প্রান্তরে কাঁদে বাছা আহা কার।
দুই হাত কাটা তবু শের-নর আব্বাস,
পানি আনে মুখে, হাঁকে দুশমনও 'সাব্বাস্'।

ড্রিম্ ড্রিম্ বাজে ঘন দুন্দুভি দামামা,
হাঁকে বীর, "শির দেগা, নেহি দেগা আমামা"।

এই ছন্দের গুরুগম্ভীর আওয়াজের স্বতঃস্ফূর্ত গতি দেখে মনে হয় মাত্র দু'একটি বছরের ব্যবধানে কবি কী ভাবে এতটা পরিপক্ক হলেন। তার মধ্যে আশ্চর্য হবার ব্যাপার নিশ্চয়ই আছে কিন্তু আমার ধারণা একটি জটিল কাজে হাত দিয়ে কবি ঐ কৌশলটাকে পাকাপোক্ত করেছিলেন। আর তা হ'ল হাফেজের কতকগুলো দেওয়ানের অনুবাদ করা এবং কতকগুলো আরবী ছন্দের অনুকরণে বাংলা পদ্য রচনা করা।

হাফেজের দেওয়ান অনুবাদ করতে গিয়ে নজরুল কতকগুলিতে ফারসীর ছন্দ মাত্রা ধ্বনি তাল লয় বজায় রাখার চেষ্টা করেন। যেমন :

'আলাইয়্যা আইযোহাস্ সাকী আদির কা-সা ওয়ানা বিলহা।'

একে নজরুল বাংলা করলেন এইভাবে :

হাঁ, এয় সাকী শরাব ভর্ লাও বোলাও পেয়ালী চালাও হর্ দম্।

এখন অতি সহজেই প্রমাণ করা যাবে এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করার জন্যই তিনি 'বিদ্রোহী' কবিতায় এই ধরনের পংক্তি রচনায় সাফল্য অর্জন করেছেন :

আমি চির-দুরন্ত দুর্মদ,
আমি দুর্দম মম প্রাণের পেয়ালা হর্দম হ্যায় হর্দম ভরপুর মদ।

নজরুলের 'বিদ্রোহী'র ছন্দ আর হাফেজের 'দিওয়ানে'র ছন্দ অবশ্যই এক নয়। কিন্তু দিওয়ানের সঙ্গীত যে নজরুলের হৃদয়বীণাকে অনুরণিত করেছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই।

এখানে আরও একটি প্রসঙ্গের উত্থাপন করব। তা হ'ল কবিতা লেখার জন্য অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হয় এবং প্রয়োজন হয় বিভিন্ন ধরনের উপাদান। মানুষ যেমন প্রকৃতিকে দেখে শিক্ষা গ্রহণ করে তেমনি গ্রন্থ পাঠে শিক্ষালাভ করে। নজরুল ইসলাম গভীর মনোযোগ সহকারে হিন্দু মুসলমানের ধর্মশাস্ত্র যেমন তেমনি কাব্য পুরাণ ও পুঁথি পাঠ করেছিলেন। কাহিনীর সেই উপাদানগুলো রূপক, প্রতীক, উপমায়, উৎপ্রেক্ষার রূপে তিনি কাজে লাগাতে লাগলেন। বাংলা ভাষার যা কিছু ঐতিহ্য, বিদ্যাপতি

চণ্ডীদাস-রামপ্রসাদ থেকে শুরু করে ঈশ্বরগুপ্ত, রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল যেমন তেমনি বাঙালী মুসলমানী ভাষায় লিখিত পুঁথি সাহিত্যের ঐতিহ্য সমানভাবে তাঁর মগজের কোটায় আশ্রয় নেয় এবং পরবর্তীকাল সে-সমস্তই প্রবল নির্ঝরের মত তাঁর লেখনী দিয়ে বেরিয়ে আসে। সুতরাং বলা যায় নজরুল ইসলাম হঠাৎ ভূঁইফোঁড়ের মত বেরিয়ে আসেননি। আর সেই সঙ্গে এও খুব উচ্চকণ্ঠে বলা যায় যে আতসবাজির মত ক্ষণকালের জন্যও তাঁর কাব্যসৃষ্টি নয়। কেননা যে মহৎ মানবিক ভাবনায় তাঁর কবিতার প্রতিটি পংক্তি পুষ্ট, যে অমর ঐতিহ্যের সারাৎ-সারে তাঁর রসোজ্জ্বল কবিতার পংক্তি নির্মিত তার আকস্মিক বিনাশের সম্ভাবনা নেই। অর্থাৎ তিনি আকাশের সাধারণ 'ধূমকেতু' নন প্রতি নিশাবসানের সূর্য—লাঞ্ছিত, অবহেলিত, উৎপীড়িতদের উদ্ধারকারী যুগ প্রার্থিত মহাপুরুষ, যুগাতিক্রমী মহাকবি।

নজরুল ইসলাম ও হাফিজ

মধুসূদনের কাব্য-আলোচনা প্রসঙ্গে যেমন হোমর-দান্তে-ওবিদ-পেত্রার্ক-তাস্‌সো-মিলটনের কথা এসে পড়ে, রবীন্দ্রনাথের কাব্য আলোচনায় যেমন টেনিসন, সুইনবার্ণ, ব্রাউনিং, শেলীর প্রসঙ্গ আসে, বুদ্ধদেব, জীবনানন্দ, সুধীন্দ্রনাথ, বিষ্ণুদের কাব্য প্রসঙ্গে যেমন যথাক্রমে লরেন্স, বোদলেয়ার, মালার্মে, পো, লোরকা, রিলকে, ইয়েটস, কীট্‌স ও এলিয়ট প্রমুখের নাম মনে পড়ে তেমনি নজরুলের কাব্য আলোচনা প্রসঙ্গে অপরিহার্য ভাবে কয়েকজন পারসী কবির কথা মনে আসে। এঁরা হলেন রুমী, জামী, আত্তার, সাদী, ওমর ও হাফিজ। বর্তমান প্রবন্ধ নজরুলের সঙ্গে হাফিজের সম্পর্ক নিয়ে এবং তাঁর কাব্যে হাফিজের প্রভাব নিয়ে।

রুমী, জামী, আত্তার, সাদী, ওমর ও হাফিজের মধ্যে নজরুলের উপর কার প্রভাব সবচেয়ে বেশী পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ ছাড়া সে-কথা বলা না গেলেও হাফিজ ও ওমর যে ঐ কবিদের মধ্যে নজরুলের সবচেয়ে প্রিয় ছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। বর্তমান প্রবন্ধ নজরুল-হাফিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে, বাকী দুজনের কথা এখানে অপরিহার্য প্রয়োজন ছাড়া উল্লেখ করতে বিরত থাকব।

মুজফ্‌ফর আহমদ তাঁর "কাজী নজরুল ইসলাম : স্মৃতিকথা"য় লিখেছেন যে, নজরুল কলকাতায় বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-সমিতির অফিসে তাঁর সঙ্গে থাকাকালীন একদিন কৌতূহল বশে তিনি তাঁর গাঁটরী-বোচকা দেখতে গিয়ে লেপ-তোষকের সঙ্গে যেসব বই দেখেছিলেন তার মধ্যে ছিল "ইরানের মহাকবি হাফিজের দিওয়ানের একখানা খুব বড় সংস্করণ। তাতে মূল পার্সির প্রতিছত্রের নীচে উর্দু তরজমা ছিল।" আমরা নজরুল-জীবনীতে দেখতে পাই, করাচী থাকা কালীন হাবিলদার নজরুল ইসলাম প্রমথ চৌধুরীর সবুজপত্রে হাফিজের ছোট্ট একটি কবিতার অনুবাদ পাঠান যেটা সম্পাদকের অনুমোদন না পাওয়াতে পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের বশেষ প্রচেষ্টায় প্রবাসীতে ছাপা হয়। কবিতাটির অনুবাদ এমনি :

নাই বা পেল নাগাল, শুধু সৌরভেরই আশে
অবুঝ, সবুজ দূর্বা যেমন যুঁই কুঁড়িটির পাশে
বসেই আছে, তেমনি বিভোর থাকরে প্রিয়ার আশায়—
তার অলকের একটু সুবাস পশ্‌বে তোর এ নাসায়।
বয়স শেষে একটিবারও প্রিয়ার হিয়ার পরশ
জাগাবে রে তোরও প্রাণে অমনি অবুঝ হরষ।

পরবর্তীকালে 'রুবাইয়াত-ই-হাফিজে'র অনুবাদের ভূমিকায় নজরুল বলেছেন :

> আমি তখন স্কুল পালিয়ে যুদ্ধে গেছি। সে আজ ইংরেজি ১৯১৭ সালের কথা। সেইখানে প্রথম আমার হাফিজের সাথে পরিচয় হয়। আমাদের বাঙ্গালী পল্টনে একজন পাঞ্জাবী মৌলবী সাহেব থাকতেন। একদিন তিনি 'দীওয়ান-ই-হাফিজ' থেকে কতকগুলি কবিতা আবৃত্তি করে শোনান। শুনে আমি এমনি মুগ্ধ হয়ে যাই যে, সেইদিন থেকেই তার কাছে ফার্সী ভাষা শিখতে আরম্ভ করি।

হাফিজের সংগে এইভাবে নজরুলের পরিচয় হয় এবং নজরুল গভীরভাবে হাফিজের কাব্য-মদিরায় আসক্ত হয়ে পড়েন। প্রথমে তিনি হাফিজের গজল অনুবাদ করতে শুরু করেন এবং তাঁর অনূদিত হাফিজের দীওয়ানগুলো যথাক্রমে "মোসলেম ভারত", "প্রবাসী" ও "বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য" পত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকে। বলাবাহুল্য "নজরুল-রচনাবলী"তে প্রকাশিত ১ থেকে ৬ সংখ্যক গজলগুলি "মোসলেম ভারতে" এবং ৭ ও ৮ সংখ্যক গজল দুটি "প্রবাসী" ও "বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা"য় ছাপা হয়। ৯ সংখ্যক গজলটি ছাপা হয়েছিল "নির্ঝর" নামক নজরুলের একটি অপ্রচারিত গ্রন্থে। "রুবাইয়াত-ই-হাফিজে"র মুখবন্ধে নজরুল লিখছেন :

> বৎসর কয়েক পরে হাফিজের দীওয়ান অনুবাদ করতে আরম্ভ করি। অবশ্য তাঁর রুবাইয়াৎ নয়—তাঁর গজল। বিভিন্ন মাসিক পত্রিকায় তা প্রকাশিতও হয়েছিল। ত্রিশ-পঁয়ত্রিশটি গজল অনুবাদের পর আর আমার ধৈর্যে কুলোল না, এবং ঐখানেই ওর ইতি হয়ে গেল।

এই ত্রিশ-পঁয়ত্রিশটি নজরুল-অনূদিত গজলের মধ্যে আবদুল কাদির সম্পাদিত "নজরুল-রচনাবলী" কিম্বা "নজরুল--রচনা-সম্ভার"-এ আমরা গোটা কয়েক মাত্র গজলের সাক্ষাৎ পাই। এই প্রসংগে নজরুলের "পূবের হাওয়া" গ্রন্থের "বাদল প্রাতের শারাব' কবিতাটির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। যার প্রথম লাইনটি হল—"বাদলা কালো স্নিগ্ধা আমার কান্তা এলো রিমঝিমিয়ে'। 'মোসলেম ভারতে' প্রকাশিত কবিতাটির শিরনিম্নে টীকা ছিল—"হাফিজের ছন্দ ও ভাব অবলম্বনে"। "পূবের হাওয়া" গ্রন্থে এটিকে "নিকটে" শিরোনামে মুদ্রিত করা হয়। 'নজরুল রচনাবলী'তে প্রকাশিত এই কবিতাটির শিরোনাম অবশ্য 'বাদল প্রাতের শারাব' রাখা হয়েছে এবং এর ভণিতায় 'হাফিজ'-এর স্থানে 'কাজী' ব্যবহৃত হয়েছে। —যেমন: "খামখা তুমি মরছ কাজী শুষ্ক তোমার শাস্ত্র ঘেঁটে।" জনাব ইজাবউদ্দীন আহমদের সৌজন্যে পাওয়া ওস্তাদ মোহাম্মদ হোসেন খসরু-কৃত এই গজলটির একটি স্বরলিপি "নজরুল একাডেমী পত্রিকা"র ১৩৭৬ সালের হেমন্ত সংখ্যায় ছাপা হয়েছে। গজলটির শেষ লাইনে সেখানে সামান্য পাঠান্তর দেখা গেল। অর্থাৎ "মুক্তি পাবে মদ্‌খোরের এই আলকিমিয়ার পাত্র চেটে"র 'মদখোরের' স্থানে একাডেমী পত্রিকায় ছাপানো হয়েছে 'হারামখোরের'। নজরুলের প্রথম অনুবাদে এই শেষোক্ত শব্দটিই ছিল কিনা জানিনা, আবদুল কাদির সাহেবও নজরুল-রচনাবলীর ১ম খণ্ডের গ্রন্থ-পরিচয়ে তার উল্লেখ করেননি।

এর পরে হাফিজের একটি গজল "য়ুসোফে গুম্ গশতা বাজ্ আয়েদ্ ব-কিন্‌আন্ গম্‌মখোর"-এর ভাব-ছায়া অবলম্বনে নজরুল 'বোধন' নামে একটি স্বদেশী সংগীত লেখেন। নজরুলের "বিষের বাঁশী" কাব্য--গ্রন্থে এটি মুদ্রিত হয়েছে। এবং এখানে এর প্রথম লাইনটি আছে এমনি: "দুঃখ কি ভাই হারানো সুদিন ভারতে আবার আসিবে ফিরে"। "মোসলেম ভারতে" প্রথমে পংক্তিটি 'দুঃখ কি ভাই হারানো য়ুসোফ কিনানে আবার আসিবে ফিরে" ছিল— গ্রন্থবদ্ধ হওয়ার সময় এটি পরিবর্তিত হয়। আবদুল কাদির সাহেব গ্রন্থ-পরিচয়ে এ ব্যাপারে বিশদ করে কিছু বলেননি।

আবদুল কাদির সম্পাদিত "নজরুল-রচনা-সম্ভার"-এর দ্বিতীয় সংস্করণে আমরা হাফিজের "জুল্‌ফে আ-শাফতা ও খুয়ে কর্দা ও খান্দানে লবে মস্ত"-এর ভাবাবলম্বনে লেখা আর একটি গজল দেখতে পাই। এটি 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা'র ১৩২৭ সালের বৈশাখ সংখ্যায় ছাপা হয়েছিল। এর অনুবাদ : "কোঁকড়া অলক মুর্ছেছিল ঘাম-ভেজা লাল গাল ছুঁয়ে"—এমনি। এ-ছাড়া "নজরুল-গীতিকা"য় প্রকাশিত "দীওয়ান-ই-হাফিজ" গীতির প্রথম গজল—"আরও নূতন নূতনতর শোনাও গীতি গানেওয়ালা" নিম্নে প্রদত্ত পাদটিকা মোতাবেক হাফিজ-এব বিখ্যাত গজল "মোতরেবে খোশনওযা বগো তাজা ব-তাজা নৌ-বনৌ"-এর ভাবানুবাদ। "দীওয়ান-ই-হাফিজ" গীতির অন্য বাকি ৭টি গজলেব নীচে অমনি টিকা-পরিচয় নেই। কিন্তু ঐ সব গজলের ভণিতায় "হাফিজ" শব্দটি ব্যবহৃত হযেছে। আবদুল কাদির সম্পাদিত "নজরুল-রচনাবলী" ৩য় খণ্ডের গ্রন্থ পরিচিতিতে এদের উৎসমূলের কোনো পরিচয় পাওয়া যায় না। কিন্তু এর ভাব সম্পদ দেখে এগুলোব মূলও হাফিজের গজল বলে মনে করি। গজলগুলির ১ম পংক্তি যথাক্রমে এমন : 'আমবা' পানের নেশায় পাগল, লাল শারাবে ভর গেলাস', 'ভোরের হাওযা ধীরে ধীরে বলো গো সেই হরিণীরে', 'আজ সুদিনেব আসুল উষা, নাই অভাব আজ নাই অভাব,' 'আসল যখন ফুলের ফাগুন, গুলবাগে ফুল চায় বিদায়', 'ঐ লুকায় রবি লাজে মুখ হেরি মম প্রিয়ার', 'দোষ দিও না প্রবীণ জ্ঞানী হেরি খারাব শারাব-খোর' এবং 'চাঁদের মতন রূপ পেল রূপ তোমার রৌশন রূপ-বিভায়'। এগুলোকে হাফিজের গজলের ভাবানু-বাদ ধরে নিলে (এবং সম্ভবত সেটাই সত্য বলে মনে হয়) গোটা বিশেকের মত দীওয়ানের সন্ধান আমরা পাচ্ছি। বাকীগুলো হয়ত বা পত্র-পত্রিকাতে ছড়িয়ে আছে।

"দীওয়ান-ই-হাফিজ"-এর পরে নজরুলের দ্বিতীয় অপূর্ব কীর্তি "রুবাইয়াত-ই-হাফিজ"-এর অনুবাদ। নজরুলের প্রিয়তম পুত্র চার বছরের "বুলবুলে"র মৃত্যু-শিয়রে ব'সে নজরুল এই রুবাইয়াৎ অনুবাদ করেন। নজরুল লিখেছেন—"বাবা বুলবুল, তোমার মৃত্যু-শিয়রে বসে 'বুলবুল-ই-সিরাজ হাফিজে'র রুবাইয়াতের অনুবাদ আরম্ভ করি। যেদিন

অনুবাদ শেষ করে উঠ্‌লাম, সেদিন তুমি আমার কাননের বুলবুলি—উড়ে গেছ।" ১৩৩৭ সালে "রুবাইয়াত-ই-হাফিজ" প্রকাশিত হয়। অর্থাৎ দীওয়ানসমূহের অনুবাদের বছর ৮-১০ পরে তিনি 'রুবাই'-গুলো অনুবাদ করেন। এর থেকেই বোঝা যায় যে, দীর্ঘদিন ধরে হাফিজ নজরুলের মানসলোকে মাধুর্যের মদিরা বিলিয়ে তাঁকে সম্মোহিত করে রেখেছিলেন। "নজরুল-কাব্য" বিশ্লেষণে হাফিজের কাব্যের প্রভাবের গুরুত্ব তাই অনেকখানি।

এখন দেখা যাক হাফিজ-সংক্রমিত নজরুলের কোন্ কোন্ অংশে হাফিজ-রামধনুর রঙ লেগেছে। বিভিন্ন স্থানে গদ্যে পদ্যে উল্লেখ-প্রসংগ, ইত্যাদিতে উদাহরণ হিসাবে নজরুল হাফিজের নাম ব্যবহার করেছেন। যেমন গদ্যে :

১। শত শত সাদি, হাফিজ, খৈয়াম, রুমি, জামী, শমসি-তবরেজ এই শিরাজবাগে—এই বুলবুলিস্তানে জন্মগ্রহণ করুক।—[মুসলিম সংস্কৃতির চর্চা : নজরুল-রচনা-সম্ভার]

২। আমার 'বিদ্রোহী' পড়ে যারা আমার উপর বিদ্রোহী হয়ে ওঠেন, তাঁরা যে হাফিজ রুমিকে শ্রদ্ধা করেন—এ-ও আমার মনে হয় না। [ইবরাহিম খাঁর কাছে লেখা চিঠি : নজরুল-রচনা-সম্ভার]

এবং পদ্যে :

১। হাফিজ উমর শিরাজ পালায়ে লেখে রুবাই [নওরোজ : জিঞ্জীর]

২। এল কি আল-বিরুনী হাফিজ খৈয়াম কায়েস গাজ্জালী [খোশ আমদেদ : জিঞ্জীর]

৩। দাও সেই রুমী সাদি হাফিজ [গুলবাগিচা ৭৮ নং গজল]

প্রসংগসূত্রে হাফেজের কাব্যোদ্ধৃতি :

বমে সাজ্জাদা রঙ্গিন্ কুন্ গরৎ পীরে মাগাঁ গোয়েদ।
কে সালেক বেখবর না বুদ্ জেরাহোরসমে মঞ্জেল হা।
[শালেক : রিক্তের বেদন]

এখানে ওখানে ছিটিয়ে থাকা হাফেজের উদ্ধৃতি হয়ত নজরুলের গদ্যে আরও পাওয়া যেতে পারে।

হাফেজের কাব্যের সংগে নজরুল-কাব্যের চেহারা-আদল-রঙ ও আকারগত সাদৃশ্য দেখা যায় কিনা? বহু পুরনো কাল থেকে ইরানী কবিরা গীতি-কবিতায় কতকগুলো প্রথাসিদ্ধ চিত্রকল্প, প্রতীক ও উপমার ব্যবহার করে থাকেন। সেগুলো হ'ল সুরা, সাকী, পেয়ালা, গোলাপ, নার্গিস, বুলবুলি, দিলরুবা, প্রদীপ ও পতঙ্গ। এর ব্যবহার হাফিজের কবিতাতেও অসংখ্যবার লক্ষণীয়। আশ্চর্যের ব্যাপার প্রয়োগ কৌশলের অভিনবত্বের জন্য পৌনঃপুনিক ব্যবহারেও এদের ঔজ্জ্বল্য কমে না। প্রত্যেকবারই নতুন নতুন অর্থের প্রসাধন যেন এদের রূপকে অবক্ষয়ের হাত থেকে রক্ষা করে। প্রথমে নজরুল-কৃত হাফিজের কাব্যানুবাদ ও কাব্য-ভাবানুবাদের মধ্যে কয়েকটি প্রয়োগ-দৃষ্টান্ত :

১। হ্যাঁ, এয্ সাকী, শারাব ভরলাও, বোলাও, পেয়ালী চালাও হরদম্।
[দীওয়ান-ই-হাফিজ : গজল-১]

২। জানাও ফর্মান্ জ্বলবে আর না নিববে জানটার মোমটা ক্ষীণ।

জামশেদের দরবারের সাকী! বাড়ুক পরমাই মদ্য পিও।
তোমার হস্তে এ মদের ভাড় মোর পরলো নাই ভাই যদ্যপিও।
[দীওয়ান-ই-হাফিজ : গজল-২]

৩। শারাব-সভায় কুঞ্জে আজ বুলবুলি বাঃ বোল্ বিলায়—
লাও প্রভাতের মদের ভাঁড়, মস্তানা সব জল্দি আয়।
[গজল-৩]

৪। আয়েশ্-সুখের আমন্ত্রণ আজ, শারাব দিয়ে পাত্র ভরা
[রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ : ২নং]

৫। ফুল-বাগিচায় বুলবুলি উঠল গেয়ে,—হায়রে বেকুব
[রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ : ৩নং গান]

৬। গোলাব-ফুলী গাল গো তাহার

[রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ : ১৭নং গান]

৭। নার্গিসেরা দল নিয়ে তার পাত্র রচে সুরের আশায়

[রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ : ২৪নং গান]

৮। প্রাণের রূপের পিলসুজে যে দেয় গো ব্যথার প্রদীপ জ্বালি

[রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ : ২৮নং গান]

৯। পেয়ালা, শারাব, দিল দরদী, দিলরুবা নাত, বেরিয়ে চলো।

[রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ : ৩৫নং গান]

এই সুরা, সাকী, পেয়ালা, বুলবুলি, গোলাব, নার্গিস, পানশালা, দিলরুবা, প্রদীপ-পতঙ্গ নজরুল-কাব্যের শরীরে সৌন্দর্য-প্রসাধনের কাজে যে কত সাহায্য করেছে তাব গুটি কয়েক প্রমাণ :

১। কণ্টক-বনে আশ্বাস এনে গুল্-বাগের,

সাকীরে "জা'মে"র দিলে তাগিদ!

* * *

শয়তান আজ ভেশ্‌তে বিলায় শরাব-জাম,

* * *

তৃষ্ণাতুরের হিস্‌সা আছে ও পিয়ালাতে—

দিয়া ভোগ কর, বীর, দেদার

[ঈদ মোবারক : জিঞ্জীর]

২। যেতে নারে সেই হুর পরীর

শরাব সাকীর গুলিস্তাঁয়--

* * *

হেথা কোলে নিয়ে দিল্‌রুবা

শারাবী গজল গাহে যুবা।

[আয় বেহেস্তে কে যাবি আয় : জিঞ্জীর]

৩। অধরে দর-কষাকষি—নাই হিসাব।

হেম-কপোল লাল গোলাব।

* *

শারাব সাকী ও রঙে রূপে
আতর লোবান ধুনা ধূপে
সয়লাব সব যায় ডুবে
[নওরোজ : জিঞ্জীর]

৪। বন্ধু গো সাকী আনিয়াছ নাকি বরষার সওগাত—
[বার্ষিক সওগাত : জিঞ্জীর]

৫। নবমী চাঁদের 'সসারে' ও কে গো চাঁদনী-শিরাজী ঢালি
বধূর অধরে ধরিয়া কহিছে তহুরা পিও লো আলি।
*   *   *
আনমনা সাকী, অমনি আমারো হৃদয়-পিয়ালা কোণে
কলঙ্ক-ফুল আনমনে সখি লিখো মুছো খনে খনে।
[চাঁদনী রাতে ; সিন্ধু-হিন্দোল]

৬। আজ লাল পানি পিয়ে দেখি সব কিছু চুর
*   *   *
এ-যে শারাবের মত নেশা
এ-পোড়া মনয় মেশা
[ফাল্গুনী : সিন্ধু-হিন্দোল]

৭। দ্রাক্ষা-বুকে রহিলে গোপন তুমি শিরীন শরাব.
পেয়ালায় নাহি এলে।
[অ-নামিকা : সিন্ধু-হিন্দোল]

৮। বারুণী সাকীরে কহ, 'আনো সখি সুরার পেয়ালা ;
আনন্দে নাচিয়া ওঠো দুখের নেশায় বীর, ভোল সব জ্বালা।
[সিন্ধু : সিন্ধু-হিন্দোল]

৯। তিন ভাগ গ্রাসিয়াছ এক ভাগ বাকী !
সুরা নাই পাত্র হাতে কাঁপিতেছে সাকী !
[সিন্ধু : সিন্ধু-হিন্দোল]

১০। বুলবুলি নিরব নার্গিস বনে
ঝরা বনগোলাপের বিলাপ শোনে ॥

[১ম : বুলবুল ২য়]

১১। আমি চির-দুরন্ত দুর্মদ,
আমি দুর্দম ; মম প্রাণের পেয়ালা হর্দম হ্যায় হর্দম ভরপুর মদ।

[বিদ্রোহী : অগ্নি-বীণা]

১২। কুনাল কি পড়ল ধরা পিযুষ ভরা ঐ চাঁদোমুখে
কাঁদিছে নার্গিসেব ফুল লাল-কপোলের কমল বাগানে ॥

[বুলবুল]

১৩। করুণ কেন অরুণ আঁখি দাও গো সাকী দাও শারাব

[বুলবুল]

১৪। পুড়ে মবার ভয় না রাখে পতঙ্গ আগুনে ধায়—

[জুলফিকার]

এমনিভাবে দেখানো যায় নজরুলের অসংখ্য কবিতা ও গানে পারস্য কাব্য-রীতির প্রথাগত প্রতীক প্রয়োগের ঐতিহ্যকে হাফেজের মত নজরুল বাঙলা কাব্যের শরীরে উজ্জ্বল নতুন পোশাকের মত পরিয়ে দিয়েছেন—সম্ভবতঃ তাঁর ভাষায়, 'তাকে আরও খুবসুরাত' দেখাবে বলে।

শব্দ ব্যবহারে ঐ আকৃতিগত সাদৃশ্যের সঙ্গে এখন দেখা যেতে পারে হাফিজের কাব্যে ব্যবহৃত অথবা নির্মিত উপমা চিত্রকল্প নজরুল কাব্যে প্রবিষ্ট হয়েছে কিনা। এই সৌসাদৃশ্য মনে হয় অতি সহজে চোখে পড়ার মত—সে যেমন পানশালার পরিবেশ, জলসার পরিবেশ ও সাকী কর্তৃক মদ্য বিতরণের পরিবেশ তেমনি সাকীর মাধ্যমে ভাবাবেগ প্রকাশের ভঙ্গিমা। লক্ষ্য করবার বিষয় 'দ্রাক্ষা কিংবা আঙ্গুর' ইত্যাদি শব্দগুলো নজরুল যে ব্যবহার করছেন তাতে বাঙালীয়ানার চেয়ে ইরানীয়ানার মৌজ ফুটেছে বেশী এবং হাফিজের মত পাশাপাশি সাকী,

শিরাজী, গজল, বুলবুলী, আঙুরের রস, সাকীর অধর, পেয়ালা' প্রভৃতির সম্মিলিত ব্যবহারে পুনঃ পুনঃ হাফিজের কাব্যে ব্যবহৃত চিত্রকল্পগুলিই আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়। হাফিজের দু'একটি চিত্রকল্পের নমুনা তুলে পাশাপাশি নজরুল-কাব্যে ব্যবহৃত ঐ ধরনের দু'একটি চিত্রকল্প দেখালেই খুব সহজেই ব্যাপারটা বুঝতে পারা যাবে। হাফিজের 'শিরীন ঠোঁট' কিম্বা অধর হাফিজের পান পেয়ালা ও তার পরিবহনকারীর কতগুলো চিত্রকল্পের পাশে নজরুলের ঐ শ্রেণীর চিত্রকল্প।

হাফিজ	নজরুল
১। হ্যাঁ, এয় সাকী, শরাব ভর লাও, বোলাও পেয়ালী চালাও হরদম।	১। করুণ কেন অরুণ আঁখি দাওগো সাকী দাও শারাব।
২। শরাব-সভায় কুঞ্জে আজ বুলবুলি বাঃ বোল বিলায় লাও প্রভাতের মদের ভাঁড় মস্তানা সব জলদি আয়।	২। শাস্ত্র-শকুন জ্ঞান-মজুর যেতে নারে সেই হুর পরীর শরাব সাকীর গুলীস্তাঁয় আয় বেহেশতে কে যাবি আয়॥
৩। গাল ত নয় ও মিষ্টি শর্বৎ ঢালছে পান্নার শিরিন ঠোঁটটি	৩। ঠোঁটে ঠোঁটে আজ মিঠি শরবৎ ঢাল্ উপুড়
৪। আরো নূতন নূতনতর সোনাও গীতি গানেওয়ালা আরো তাজা শারাব ঢালো, কর কর হৃদয় আলা	৪। ভুল ভাঙায়ো না সাকী, ঢালো শারাব-পিয়ালা। মতলব কহিব পিছে, নেশা ধরুক চোখেবালা।
৫। কি স্বাদ পেলে জীবন মধুর শারাব যদি না হয় সাথী স্মরণে তাঁর আরো তাজা আনো শারাব ভর-পিয়ালা॥	৫। আনো সাকী শিরাজী আনো আঁখি-পিয়ালায় অধীর করো মোরে নয়ন মদিরায়॥

নজরুলের গানগুলোয় যে-সব চুলের উপমা কিম্বা চিত্রকল্প দেখি সে-গুলোও অনেক সময় হাফিজের কবিতার চিত্রকল্পগুলির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। হাফিজের গজল ও রুবাইয়ে নারীর কেশকে ভিন্ন ভিন্ন উপমায়—চিত্রকল্পে অপূর্ব সুন্দর উপায়ে ব্যবহার করা হয়েছে। কয়েকটি নিদর্শন :

গজলে চুল :

১। কসম্ তার ভাই ভোরের বায় ভায় অলক্‌গুচ্ছের যে বাস কান্তার
বহুৎ দিল খুন করলে কুন্তল কপোল-চুম্বী চপল ফাঁদ-দার।
[গজল-১ : ন: র ১]

২। তোমার কেশপাশ, আমার দিল্‌বাস— জম্‌বে জোট সেই এক জাগায়
আরজুএই ক্ষীণ্ মিট্‌বে কোন্ দিন ? আর না বিচ্ছেদ,— দেক লাগায়।
[গজল–২ : ন: র-১ম]

৩। মন ময়ূরীর লাগি বিরহী ভুজগী ফেঁসেছিল ভালো কেশ-জালে,
কেন খুলে দিয়ে বেণী 'বিচ্ছেদ-ফণী' ছেড়ে দিলে প্রিয়া শেষ-কালে ॥
তব এলোচুলে বায়ু গেল বুলে মম আলো নিভে গেল আঁধিয়ারে
ঐ কালোকেশে আমি ভালো'বেসে শেষে দেশে দেশে ফিরি কাঁদিয়া রে ॥

রুবাইয়ে চুল :

১। জড়িয়ে গেল ভীরু হৃদয়
তোমার আকুল অলক-দামে
সন্ধ্যা-কালো কেশে বাঁধা-
দেখ্‌ছি-ওরে ছাড়ানো দায়।
[রুবাইয়াত-ই-হাফিজ : ১১]

২। তোমার আকুল অলক-হানে
গভীর ছায়া রবির করে।

* * *

ও কস্তুরী-কালো কেশের
নিশান ওড়ায় সন্ধ্যারাণী

[রুবাইয়াত-ই-হাফিজ : ৮]

তোমার বেণীর শৃঙ্খলে গো
নিত্য আমি বন্দী যেন ?—

[রুবাইয়াত-ই-হাফিজ : ১৫]

ঠিক একই ভাবে কিছুটা হাফিজী ঢঙ্গে নজরুল এই কেশের চিত্র-কল্পকে রূপময় করে তুলেছেন বাংলা কাব্যে। কয়েকটি নমুনা :—

১। বনের ছায়া গভীর ভালবেসে
আঁধার মাথায় দিগবধূদের কেশে।

[নজরুল-গীতিকা : ৮৬]

২। দুলিছে মেখলা-হার
শ্যামলী মেঘ-মালার
উড়িছে অলক কার
অলকার ঝরোকায় ॥

[বুলবুল : ২৭]

৩। বনান্তে বাঁধা পল দেয়া—
কেয়া-বেণীর বন্ধে।

[বুলবুল : ১১]

৪। পথ হারিয়ে কেঁদে ফিরি, "আর বাঁচিনে।
কোথায় প্রিয় কোথায় নিরুদ্দেশ" ?
কেউ আসে না, শুধু মুখে ঝাপ্টা মারে
নিশীথ-মেঘের আকুল চাঁচর কেশ।

[নজরুল-গীতিকা : ৮০]

৫। মেঘ-বেণীতে বেঁধে বিজলী-জরীন ফিতা
গাহিব দুলে দুলে শাওন গীতি কবিতা

[বনগীতি : ৪]

৬। কালো কেশে আলো মেখে
খেলিছে মেঘ দামিনী॥

[বনগীতি : ৬]

৭। তোমাব কেশের গন্ধে কখন
লুকায়ে আসিল লোভী মোর মন।

[বনগীতি : ৮]

৮। মুখে চাঁদের মায়া—
কেশে তমাল ছায়া—
এলোচুলে দুলে দুলে
নেচে চলে হাওয়া নটী—।

[গুল-বাগিচা : ৫৬]

এমনিভাবে নজরুল-কাব্যে, চোখের, ঠোঁটের, কেশের, চিত্রকল্প দেখে হাফিজকে স্মরণ না ক'রে উপায় থাকে না। এখানে নারীর অশ্রুসজল চোখের একটি হাফিজী-চিত্রকল্পের সংগে একটি নজরুলী চিত্রকল্পের অপূর্ব মিল দেখানো যাক। রুবাইয়াত-ই-হাফিজ-এর-৪৪ নং রুবাইটির দ্বিতীয় তৃতীয় পংক্তি এমনি :

অশ্রু-মণির হার গেঁথেছি
নয়ন-পাতার ঝালর-সুতায়।

নজরুলের "বুলবুল" গীতি-কাব্য গ্রন্থের ৯ নং গানটির প্রথম স্তবকটি এমনি :

এত জল ও কাজল-চোখে
পাষাণী আনলে বল কে।
টলমল জল মোতির মালা
দুলিছে ঝালর পলকে॥

এমনিভাবে গবেষকরা নজরুল-কাব্যে বহু হাফিজী চিত্রকল্পের সন্ধান পাবেন বলে আশা করি। এখন অন্য প্রসংগে যাওয়া যাক।

নজরুল ইসলাম হাফিজের ৩০।৩৫টি দীওয়ান ও সম্পূর্ণ রুবাইয়াত অনুবাদ করেছিলেন। এই অনুবাদ কখনও সম্পূর্ণ ছন্দ অনুসরণে এবং

কখনও ভাব অনুসরণ করে। এই দু'ধরনের অনুবাদে নজরুল অভূতপূর্ব সাফল্য যে অর্জন করেছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই।

অনেক আগে থেকেই বাঙালী কবিরা হাফিজের কবিতার সংগে অনুবাদের মাধ্যমে বাঙালী পাঠকের পরিচয় ঘটিয়েছিলেন। মোঘল আমলে এবং বাঙলায় সুলতানী আমলে ফারসী রাষ্ট্রভাষা থাকাতে অভিজাত হিন্দু মুসলমান সমাজে পারশ্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি হাফিজ সুপরিচিত ছিলেন—এমন কি পাঠ্য কেতাবের হিসাবেও। মধ্যযুগের মুসলমান কবিদের লেখায় যে সব পারসী কবিদের প্রভাব পড়েছিল হাফিজও তাঁদের একজন। কিন্তু সে সময়কার বাঙালী কোনো কবির দ্বারা হাফিজ অনূদিত হয়েছিলেন বলে আমার জানা নেই। আমরা দেখতে পাই ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধের ষাটের দশকে কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার [১৮৩৭-১৯০৬] সাদী ও হাফিজের কবিতার অনুবাদ করেছেন। কৃষ্ণচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ 'সদ্ভাব শতকে'র অধিকাংশ কবিতাই সাদী-হাফিজের কাব্যের ভাবানুবাদ। কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার মূলতঃ হাফিজের দীওয়ান থেকেই তাঁর কাব্যের আগুন সংগ্রহ করেছিলন। তখনকার দিনের প্রচলিত বাঙলা পয়ারেই তিনি দীওয়ানের ভাবানুবাদ করেন। এখানে তার একটি নমুনা দেওয়া যেতে পারে :

জীবিতেশ মম দুখ কবে হবে শেষ ?
করুণা করিয়া নাথ কহ সবিশেষ।
আগত বিরহ গত মিলন সময়
আবার কি বিনিময় হবে প্রেমময় ?
বিচ্ছেদের বিচ্ছেদের আশায় আশায়
জীবনের খেলা বুঝি শেষ হয়ে যায়।
কি করি কাহারে বলি মনের বেদন
কে আছে মিলন সহ করে সংমিলন।
বিরহ বারিধি নীরে জীবনের তরী
ডুবিল ডুবিল আহা। প্রাণে মরি মরি।
কেঁদোনা হাফেজ বলো কি ফল রোদনে?
কমল কোথায় আছে কন্টক বিহনে ?

কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার ফারসী পণ্ডিত ছিলেন। শ্রী সুকুমার সেন তাঁর "বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে বলেছেন: 'সংবাদ প্রভাকরের লেখক কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার সংস্কৃত জানিতেন, ফারসী আরো ভালো করিয়া জানিতেন।' কিন্তু এই ফারসী জানা পণ্ডিত কবির ভাবানুবাদে হাফিজের মেজাজের কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। কৃষ্ণচন্দ্রের যৌবনে বাঙলা কাব্যের পয়ারে মধুসূদন যে পরিবর্তন এনেছিলেন সেই বলিষ্ঠ কাব্যের স্বর কিংবা সুর কোনটাই কৃষ্ণচন্দ্রের প্রাচীন-পদ্ধতিতে-শিকড়-আঁটা হৃদয়কে উদ্বোধিত করতে পারেনি। ফলে সমসাময়িক যুগের ভাষার আধুনিকতা থেকে পিছিয়ে পড়াতে কাব্যের ভাবানুবাদেও তিনি যথেষ্ট গতির সৃষ্টি করতে পারেননি। হাফিজের কবিতার তিনি অর্থ বুঝেছিলেন কিন্তু তাঁর আত্মার সন্ধান পাননি। এই আত্মিক মিলন না ঘটাতেই তিনি হাফিজকে অর্জন করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন।

এই ব্যর্থতার করুণ দুর্ভাগ্য সত্যেন্দ্রনাথ দত্তেরও। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তও হাফিজের দু' একটি দীওয়ান এবং গোটা আটেক রুবাইয়াত অনুবাদ করেছিলেন। ক্ষমতাবান অনুবাদক সত্যেনদত্তেরও মেজাজে হাফিজী মেজাজ খাপ খায়নি এবং সম্ভবত মূল ফারসী কাব্যের সংগে সত্যেন দত্তের তেমন ঘনিষ্ঠ পরিচয়ও ছিল না; তা না হলে যিনি নিজের কবিতায় ফারসী কাব্যের ঐতিহ্যের প্রশ্রয় দিয়েছেন, উপমা চিত্রকল্পের রঙ লাগিয়ে এবং আরবী ফারসী শব্দের সুতো বুনে, তাঁর অনুবাদে কেন দুলে উঠলো না ইরানী কবির 'শারাব সাকীর গুলিস্তান'। এখানে সত্যেন দত্ত কর্তৃক হাফিজের রুবাই-এর একটি অনুবাদ তুলে তার পাশে ঐ একই রুবাই-এর নজরুল-কৃত অনুবাদ রেখে দেখা যাক যে নজরুল কীভাবে হাফিজী মেজাজ ধরতে সক্ষম হয়েছিলেন। সত্যেনদত্তের অনুবাদ:

নদীতীরে যেয়ো মদিরা পাত্র সাথে লয়ে, যদি পারো,
প্যানপেনে যত কুনোদের ছেড়ে দূরে থেকো, ভাল আরো
এমন সাধের জীবন মোদের দিন দশ বই নয়,—
তাজা বুকে হাসি মুখে থাকা ওগো তাই তো উচিৎ হয়।

[তীর্থ সলিল]

নজরুলের অনুবাদ :

> সোরাই ভরা রঙীন শারাব নিয়ে চল নদীর তটে।
> নিরভিমান প্রাণে বসো অনুরাগের ছায়া বটে।
> সবারই এই জীবন যখন সেরেফ দুটো দিনের রে ভাই,
> লুট করে নাও হাসির মধু খুশীর শরাব ভরো ঘটে।।

সত্যেন দত্তের অনুবাদটি ছ'মাত্রার মাত্রাবৃত্ত ছন্দে, নজরুলের অনুবাদ চারমাত্রার স্বরবৃত্তে। সত্যেন দত্তের চার পর্বের পংক্তির শেষ পর্বটি অপূর্ণ মাত্রার, নজরুলের পংক্তির সবগুলি পর্বই পূর্ণ। মিলের দিক থেকেও নজরুলের রুবাইটি মূলানুসারী। এখানে প্রথম পংক্তির সংগে দ্বিতীয় ও চতুর্থ পংক্তির মিল আছে, তৃতীয় পংক্তিতে মিল নেই। তৃতীয় পংক্তির অমিলের জন্য মিলের যে শূন্যতার সৃষ্টি হয় অর্থাৎ ফাঁক সৃষ্টি হয় চতুর্থ পংক্তিতে এসে সেই ফাঁকের ঝাঁকুনীটি একটি বিশেষ দোল সৃষ্টি করে। রুবাই-এর এই টেক্‌নিকটি ছন্দ-দোলার একটি অনিন্দ্য আবেশ সৃষ্টি করে। এই আবেশের মেজাজটি সত্যেন দত্ত লক্ষ্য করেননি কিংবা করলেও তা অনুসরণ করার প্রয়োজন বোধ করেননি। নজরুলের এ দিকে দৃকপাত করার কারণ ফারসীর সংগে তাঁর অন্তরঙ্গ পরিচয়। "রুবাইয়াত-এ-হাফিজে"র ভূমিকায় নজরুল বলেছেন :

> আমি অরিজিন্যাল (মূল) ফার্সী হতেই এর অনুবাদ করেছি। আমার কাছে যে কয়টি ফার্সী দেওয়ান হাফিজ আছে তার প্রায় সব কয়টাতেই পঁচাত্তরটি রুবাই দেখতে পাই।

নজরুল ইসলাম মূল ফারসী থেকে রুবাই তো অনুবাদ করেই ছিলেন উপরন্তু বিভিন্ন জনের সম্পাদিত দীওয়ান পড়ে তার আঙ্গিকের খুঁটিনাটি ব্যাপারে জ্ঞান লাভ করেছিলেন। রুবাইগুলোর অনুবাদে মেজাজ. আনার ব্যাপারে তাঁর নিজের কবিতার মত তিনি মাঝে মাঝে প্রচলিত আরবী ফারসী শব্দ ব্যবহার করেছেন। এ ব্যাপারে তাঁর সুবিধা হল এই যে —ঐ সব আরবী, ফারসী শব্দ আগে থেকেই বাঙলার মৌখিক ভাষায় চালু হয়ে যেয়ে ব্যবহারযোগ্য মসৃণতা লাভ করেছিল। সুতরাং বেখাপ্পা বিদেশী ভাষা হয়ে নয় বরং বাংলা হয়েই তাঁর অনুবাদে এক বিশেষ মেজাজের স্বাদ বয়ে এনেছে। উপরের অনুবাদটির 'সোরাই', 'শারাব'

'সেরেফ', 'খুশি' এই সব শব্দ আমাদের ঘরোয়া ভাষায় আমরা হর হামেশা ব্যবহার করি। সুতরাং অনুবাদের সংগে সংগে এ গুলিই কবির উদ্দেশ্যকেও সফল করেছে।

মনে রাখতে হবে স্বরবৃত্তের চটুলতায় একটা স্ফূর্তির আমেজ পাওয়া যায়। এর ধ্বনি সৃষ্টি করে একটা আনন্দিত পরিবেশ। হাফেজের কবিতার যে ভাব, ঐ স্ফূর্তিময় মেজাজী পরিবেশ ভিন্ন তার যথাযথ রূপায়ণ অসম্ভব। নজরুল বলেছেন :

> তাঁর (হাফিজের) দর্শন আর ওমর খাইয়ামের দর্শন প্রায় এক। এঁরা সকলেই আনন্দ-বিলাসী। ভোগের আনন্দকেই এঁরা জীবনের চরম আনন্দ বলে স্বীকার করেছেন।

এই আনন্দ-বিলাসের মাঝখানে হাসির মেঘের ফাঁকে বিষাদ-অরুণের করুণ আলো মাঝে মাঝে বিচ্ছুরিত হলেও সে আনন্দরসেই জীবন ভরিয়ে দেয়। কাব্য রসের ব্যাপার। এই রস সৃষ্টি করে নজরুল রুবাই-অনুবাদে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

রুবাই–এর মত দীওয়ান অনুবাদেও নজরুলের কৃতিত্ব অসাধারণ। ফারসী ছন্দের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা ছন্দের উপর অনেকখানি দখল না থাকলে এই ধরনের যাদুকরী কৃতিত্ব প্রদর্শন সম্ভব হয় না। এই দীওয়ান অনুবাদের ব্যাপারেও তিনি পূর্ববর্তীদের পিছনে ফেলে এসেছেন। সত্যেন দত্তকেও হাফিজের একটি গজল অনুবাদ করতে দেখা যায়। গজলটি হল :

> প্রিয়া যবে পাশে, হস্তে পেয়ালা, গোলাপের মালা গলে :—
> কেবা সুলতান? তখন আমার গোলাম সে পদতলে।
> বলে দাও বাতি না জ্বালায় আজি আমোদের নাহি সীমা,
> আজ প্রেয়সীর মুখচন্দ্রের আনন্দ-পূর্ণিমা।
> আমাদের দলে সরাব যা চলে তাহে কারো নাহি রোষ।
> তবে ফুলময়ী! তুমি না থাকিলে পরশিতে পারে দোষ।
> আমাদের এই প্রেমিক সমাজে আতর ব্যাভার—নাই,
> প্রিয়ার কেশের সুরভিতে মোরা মগন সর্বদাই।
> শরের মুরলী শুনি আমি ওগো সমস্ত কান ভরি,

আঁখি ভরি দেখি সুরাব পেয়ালা—তব রূপ সুন্দরী।
শর্করা মিঠা আমারে বল না, প্রিয়া! আমি তাহা জানি,
তবু সবচেয়ে ভালবাসি ওই মধুর অধরখানি।
অখ্যাতি হবে? অখ্যাতিতেই ভরে গেছে মোর নাম,
নাম যাবে? যাক নামই আমাব সব লজ্জাব ধাম;
মত্ত, মাতাল, ব্যসনী আমি গো, আমি কটাক্ষ-বীব,
একা আমি নই, আমারি মতন অনেকেই নগরীব।
মোল্লাব কাছে মোর বিরুদ্ধে করিয়ো না অনুযোগ,
তাঁব আছে হায় আমারি মতন সুরা-মত্ততা রোগ!
প্রিয়ারে ছাড়িয়া থেকো না হাফেজ! ছেড় না পেয়ালা লাল,
এ যে গোলাপের চামেলীর দিন—এযে উৎসব কাল।

[তীর্থ-সলিল]

এটি হাফেজের গজলের ভাবানুবাদ। কিন্তু অনুবাদের গন্ধ এর থেকে সম্পূর্ণ উধাও হয়নি। ওদিকে রবীন্দ্র সৃষ্ট বাঙলা মাত্রাবৃত্তের লাবণ্যও মিশেছে এর সংগে। তাই সুমিষ্ট কবিতা হিসেবে এই ভাবসমৃদ্ধ গজলটি ভালো না লেগে পারেনি। বলতে কি এর মধ্যে হাফিজী মেজাজও খানিকটা আশ্রয় পেয়েছে। কিন্তু এই ধরনের গজলগুলো নজরুলের হাতে অন্যরূপ লাভ করেছে। "নজরুল-রচনাবলী" (১ম খণ্ড) ও "নজরুল-রচনা-সম্ভার" (২য় সংস্করণ) এ প্রকাশিত হাফিজের প্রথম ছয়টি গজল মূল ফারসীর ছন্দানুকরণে অনূদিত। মূলের সংগে ভাবসংগতি বজায় রেখে এই ধরনের অনুবাদের পরীক্ষা বাংলায় ইতিপূর্বে দু' একটি হয়ত হয়ে থাকবে কিন্তু নজরুলের অনুবাদ যে এক পরমশক্তির স্বাক্ষর তাতে কোন সন্দেহ নেই। আমার মনে হয় একই সঙ্গে কাব্য-প্রতিভা ও সঙ্গীত-প্রতিভার অপূর্ব সমন্বয় না ঘটলে এ ধরনের সৃষ্টি সম্ভব নয়। এগুলি যেমন নজরুলের অনুবাদ তেমনি নজরুলের সৃষ্টিও। এই অনুবাদের পরিশ্রমে নজরুলের লাভ হয়েছিল এই যে—উত্তর কালে তিনি বাঙলায় প্রচলিত মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্ত ছন্দে নতুন ধ্বনি সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন। এবং অভূতপূর্ব বলিষ্ঠতা দান করতে পেরেছিলেন। প্রথম গজলটি 'হ্যাঁ, এয় সাকী, শরাব ভর লাও, বোলাও পেয়ালী চালাও হরদম।' হাফিজের

'আলাইয়্যা আইয়োহাস্ সাকী আদির কা-সা ওয়ানা বিল্‌হা।' এই ছন্দানুসরণে অনুবাদ। মূল টেক্‌নিক বাদ দিয়ে সত্যেন দত্তের মত মুক্ত অনুবাদের ঐ সরল পথ গ্রহণ করলে নজরুলের পরিশ্রম অনেক কম হ'ত নিঃসন্দেহে; কিন্তু মূল পারসী গজলের আত্মার নৃত্যধ্বনিটির সুরার স্বাদ থেকে আমরা বঞ্চিত হতাম। এই গজলটির ৫ম স্তবক; "অন্ধকার রাত ঊর্মি সংঘাত ঘূর্ণাবর্তও তুমুল গর্জে/বেলায় বাস্ যার বুঝতে ছাই তার পথের ক্লেশ মোর সমুন্দর যে।"র প্রথম পংক্তিটিতে যে গম্ভীর ব্যঞ্জনা ফুটে উঠেছে সেই ধ্বনি-গাম্ভীর্য আমরা পরবর্তীকালে নজরুলের অনেক কবিতায় দেখতে পাই। শুধু ঐ একটি গজলেরই ছন্দ নয়। অন্য গজলগুলির পারসী ছন্দ নজরুলের বহু বিখ্যাত কবিতার বহু লাইনকে আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়—যেগুলি রবীন্দ্র-সৃষ্ট মাত্রাবৃত্ত অথবা স্বরবৃত্ত কোনটাই নয়। কারণ হাফিজের গজলের এই ছন্দের মাতাল উন্মাদনাই আমরা 'বিদ্রোহী', 'কামাল পাশা', 'প্রলয়োল্লাস' 'খেয়াপারের তরণী', 'মোহররম', 'ফাতেহাই-দোয়াজ দহম' প্রভৃতি কবিতায় লক্ষ্য করি। হাফিজের গজলের ছন্দের এই প্রাণশক্তিতে বলীয়ান হয়ে নজরুলের "অগ্নি-বীণা" ঝঙ্কৃত হয়ে ওঠে, 'বিষের বাঁশী'তে ফুঁসে ওঠে ঝড়ের তাণ্ডব নৃত্য। দু'চারটি উদাহরণ:

১। আমি চির দুরন্ত দুর্মদ
আমি দুর্দম মম প্রাণের পিয়ালা হর্দম হ্যায়হর্দম ভরপুর মদ।

২। যাত্রীরা রাত্তিরে হ'তে এল খেয়া পার,
বজ্রেরি তূর্যে এ গর্জেছে কে আবার?
প্রলয়েরি আহ্বান ধ্বনিল কে বিষাণে?
ঝঞ্ঝা ও ঘন দেয়া স্বনিল রে ঈশানে।

৩। দ্বাদশ রবির বহ্নি-জ্বালা ভয়াল তাহার নয়ন কটায়—
দিগন্তরের কাঁদন লুটায় পিঙ্গল তার ত্রস্ত জটায়।

৪। আজ জাহান্নামের বহ্নি-সিন্ধু নিবে গেছে ক্ষরি' জল,
যত ফিরদৌসের নার্গিস্ লালা ফেলে আঁসু পরিমল।

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে নজরুল তাঁর ঐ গজল অনুবাদে খানিকটা স্বতঃস্ফূর্ত অনুপ্রাস সৃষ্টি করেছেন। এই অনুপ্রাসের সারিতে একটি ছন্দের তোড়ের সৃষ্টি হয়েছে এবং মূলভাব, আবেগ ও মেজাজের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে একটা বলিষ্ঠ গতির জন্ম দিয়েছে। যদিও আমার মতে মূল ছন্দানুসরণ করতে গিয়ে নজরুল যে-সব আরবী ফারসী শব্দের আশ্রয় নিয়েছেন তা বাংলার বাক্-রীতিকে ভেঙে ত দিয়েছেই উপরন্তু স্বৈরাচারী বলেব প্রয়োগে তার রূপকেও আহত করেছে। 'এ সব তঞ্চট ঝক্কি ঝনঝাট ছোড় দে তারপর পিয়াব-খোঁজ নিস্'—এসব চরণের বেখাপ্পিত শব্দগুলি ছন্দের খাতিরে কিম্বা মেজাজের-আবহাওয়া সৃষ্টির প্রয়াসে প্রযুক্ত হলেও নিশ্চয়ই কাব্য-সৌন্দর্যকে বিনষ্ট করেছে। কিন্তু প্রত্যেক নতুন সৃষ্টির শুরুতে বিপ্লবেব প্রথম উদ্ভবে এমনি বিনষ্টির কিছু ক্ষতি মেনে নিতে হয়। নজরুল এই দুঃসাহসিক অভিযান চালিয়েছিলেন বলেই আমরা শুধু "অগ্নি-বীণা", "বিষের 'বাশী" পাইনি আমবা পেয়েছি এমন গজল : ১ "বাগিচায় বুলবুলি তুই ফুলশাখাতে দিসনে আজি দোল।" ২, "আমারে চোখ ইশারায় ডাক্ দিলে হায় কে-গো দরদী" কিম্বা ৩. "আসল যখন ফুলেব ফাগুন গুল্‌বাগে ফুল চায় বিদায়"।

অবশ্য ঐ ধবনের পরীক্ষা-নিরীক্ষার আর একটা ব্যাখ্যা হয়ত এই হতে পারে যে হাফিজের 'drunkard language' কে প্রকাশ করতে গিয়েই তাঁকে ব্যাকরণের বাইরে পা ফেলতে হযেছিল।

বলা বাহুল্য নজরুল ইসলামেব ছন্দের মূলানুসন্ধান করতে গেলে বাংলা ও সংস্কৃত ছন্দের সঙ্গে আরবী ও ফারসী ছন্দেব সূত্রানুসন্ধানে নামতে হবে।, নজরুল তার কবিতায় অনুপ্রাস সৃষ্টির ও ছন্দ-মিলের যে অসামান্য কৃতিত্ব দেখিয়েছেন তারও মূলে আছে ফারসী-কাব্যের অপরূপ মিল বৈচিত্র্য।, কবি আবদুল কাদির ফারসী গজলের অনুবাদ করতে গিয়ে নজরুল যে ফারসী ছন্দের বিচিত্র কারু-কার্যের সন্ধান পেয়েছিলেন তা আবিষ্কার করেছেন। কিন্তু তার পূর্ণ বিশ্লেষণে নামতে আজ পর্যন্ত তিনি তেমন চেষ্টা করেননি। এ সম্বন্ধে তাঁর কাছ থেকে আমরা পূর্ণ আলোচনা পাওয়ার আশা করি।

পারসীর এই গজলগুলো প্রধানত তারযন্ত্র সহকারে গাওয়া হয়। এর ধ্বনির মূল উৎস হ'ল এর সুর। সুর-সাধক নজরুল এই সুরের আত্মার সংগে অতি সহজে পরিচিত হয়েছিলেন। তা না হ'লে ঐ দুরূহ 'আঙ্গিক অনুকরণ করা যে কোন কবির পক্ষে দুঃসাধ্য। বাঙলা কাব্যে সনেট যেমন মাইকেলের দান তেমনি গজল নজরুল ইসলামের দান। দুঃখের বিষয় বাঙলা ভাষায় অনেকে সনেটের টেক্‌নিক আয়ত্ত করতে পারলেও ঐ গজলের আঙ্গিক আর কেউ আয়ত্ত করতে পারলেন না।

হাফিজের ঐ musical rhythm অনুবাদে তুলে ধরা কঠিন বলে ফিটজিরাল্ড বলেছিলেন: Whose best is untranslatable because he is the best musician of words. এই অসম্ভবকে একমাত্র নজরুল সম্ভব করতে পেরেছিলেন কেননা তিনি ছিলেন গীতি-সম্রাট।

হাফিজ ও নজরুলের গজলের টেক্‌নিক প্রসংগে তাই এখানে দু'চার কথা বলা যেতে পারে। কয়েকটি বিবর্তনের স্তর অতিক্রম করে হাফিজে এসে পারসী গজলের বর্তমান সুরম্য শিল্পরূপ সৃষ্ট হয়। তরুণ হাফিজ প্রাথমিক পর্যায়ে শেখ সাদীকে অনুকরণ করতে থাকেন। এ. জে. আররেরির মতে সাদীতে এসে পারসী গজল একটা শুদ্ধ আঙ্গিক লাভ করেছিল। সেই উন্নত আঙ্গিককে অতিক্রম করে নতুন পর্যায়ে পৌঁছুতে গিয়ে হাফিজ বিথোভেনের মত সমস্যায় পড়েন। সুরের কম্পোজিশনে প্রথম পর্যায়ে বিথোভেনকে পরিণত হেন্দেলের অনুকরণ করতে হয়। অনুরূপভাবে হাফিজকেও সুপরিণত সাদীকে প্রাথমিক পর্যায়ে অনুকরণ করা ছাড়া অন্য উপায় ছিল না। খুবই স্বাভাবিক সিরাজের কাব্য জগতের নায়ক-রূপকুমার সাদীর কবিতায় হাফিজের মুগ্ধ হওয়া। কিন্তু খুব বেশী দিন লাগেনি হাফিজকে সেই সুরভিত কেশের মায়াবী জাল থেকে উদ্ধার পেতে এবং তারপর হাফিজ সৃষ্টি করলেন গজলের এমন এক সুকান্ত বাগিচা যার গোলাপ আর বুলবুল মানুষের সাংসারিক জীবনকে মুহূর্তে বিস্মৃতির গর্ভে বিলীন করে দিতে পারে।

প্রথম পর্যায়ে হাফিজের গজলে থাকত একটি মাত্র বিষয়। সেই বিষয়ের কুঁড়িটাকে প্রস্ফুটিত ক'রেই হত গজলটি সমাপ্ত। পররর্তীকালে

একই গজলের মধ্যে তিনি আরও দু'তিনটি বিষয়কে প্রবিষ্ট করিয়ে তাদের মধ্যে একটি পরোক্ষ সংযোগের সাঁকো সৃষ্টি করতেন। যে-জন্যে হাফিজের পরবর্তীকালের গজল জটিল থেকে জটিলতর রূপ ধারণ করতে থাকে। এই ধরনের আঙ্গিক-কুশলতার কিছু স্বাক্ষর নজরুলের গজলেও দেখা যায়। "নজরুল-গীতিকা"র 'দীওয়ান-ই-হাফিজ' গীতি বিভাগে নজরুলের যে-কটি-গজল আছে তার সব কটিই পুরোপুরি হাফিজের গজলের ভাবানুবাদ নয়। তবু এখানে তিনি হাফিজের মূল গজলের আঙ্গিককে অদ্ভুত কৌশলে অনুসরণ করেছেন বলে আমার ধারণা। "নজরুল গীতিকা"র ৯ নং এবং "দীওয়ান-ই হাফিজ গীতি"র ১ম গজলটিতে নজরুল "মান্দ-কাহারবা" সুর প্রয়োগ করেছেন। টীকায় লেখা আছে: "মোতরেবে খোশনওয়া বগো তাজা ব তাজা নৌ বনৌ'-শীর্ষক বিখ্যাত গজলের ভাবানুবাদ। এই গজলটি ছাড়া বাকী ৭টি গজলের আর কোনো পরিচয়—"নজরুল-গীতিকা"য় দেওয়া হয়নি। কিন্তু এগুলি যেহেতু 'দীওয়ান-ই-হাফিজ গীতি' এবং যেহেতু এর তখল্লুস অর্থাৎ ভণিতায় হাফিজের নাম ব্যবহৃত অতএব এগুলোতেও হাফিজকে যে অনুসরণ করা হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই—যে কথা পূর্বে বলেছি। যদিও এই গানগুলোর সুর নজরুলের নিজস্ব এবং এর অনুবাদের কৃতিত্বও তাঁর তবু হাফিজের "গজল" বলেই এর আঙ্গিক আলোচিত হতে পারে। বলা বাহুল্য নজরুল কর্তৃক হাফিজের এই গজলগুলিই তাঁর শ্রেষ্ঠতম অনুবাদ—বলা যেতে পাবে আধ্যাত্মিক অনুবাদ।

১ম 'হাফিজ গীতি'-টার মোট পংক্তি সংখ্যা বারো। এটিকে দুই দুই লাইনে মোট ছ'ভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রত্যেক দু'লাইন গাওয়ার পর পরই অস্থায়ী অন্তরাতে ফিরে আসতে হবে। সে-জন্যেই এর ১ম লাইনের সঙ্গে ২য়, ৪র্থ, ৬ষ্ঠ, ৮ম, ১০ম, ও ১২শ লাইনের অন্ত্যমিল আছে। গানের জন্যে এই ধরনের মিলের প্রয়োজন। কিন্তু সাধারণ বাংলা গানের যে অস্থায়ী, অন্তরা, আভোগ, সঞ্চারী এই চারটি ভাগ থাকে। এখানে সেইভাবে স্তবক বিন্যস্ত নয়। এই গজলগুলি গাওয়ার ভঙ্গি কেমন হবে তার একটু আভাস ওস্তাদ মুহম্মদ হোসেন খসরু কর্তৃক প্রস্তুত স্বরলিপিতে দেখতে পাই। তিনি 'বাদলা কালো স্নিগ্ধ আমার

কান্তা এল রিমঝিমিয়ে'র একটি স্বরলিপি করেন। যদিও এই গজলটি মূলত কবিতার আঙ্গিকে লেখা কিন্তু এর অন্তর্বর্তী ছন্দ স্পন্দন একে সংগীতের পর্যায়ে উন্নীত করেছে এবং এর মিল প্রাগুক্ত গজলটির মত না হলেও মুহম্মদ হোসেন খসরু একে সংগীতের আঙ্গিক দিতে চেষ্টা করেছেন। কেননা মূলে এটি হাফিজের গজল এবং সেই মত এর ভণিতাও আছে। গজলটির প্রথম তিনটি লাইনের স্বরলিপি দেওয়ার পর তিনি ৪র্থ, ৬ষ্ঠ, ৮ম, ১০ম প্রভৃতি লাইনের পর অস্থায়ী অন্তরাতে ফিরে যেতে নির্দেশ দিয়েছেন। অর্থাৎ এই ধরনের গজলে,—যে আঙ্গিকে নজরুলের "বাগিচায় বুলবুলি তুই ফুল শাখাতে" ও "আমারে চোখ ইশারায় ডাক দিলে হায়" ইত্যাদি গজল লেখা, একমাত্র মস্ত করা সুর প্রথম দু' লাইনেই বিধৃত থাকে এবং ফিরে ফিরে তাই বিভিন্ন সুরের রূপে-রঙে প্রকাশ পায়। 'হাফিজ-গীতি'র সব গজলই কিন্তু অনুরূপ নহে। দু'একটা গজলে নজরুল কাওয়ালীর আঙ্গিক প্রবেশ করিয়েছেন। এখানে একটা শেয়র-এর অংশ আছে। "নজরুল-গীতিকা"র ১১নং, ১৫নং এবং ১৬নং গানে এই শেয়রের উপস্থিতি লক্ষ করি। এই আঙ্গিক পরিবর্তনে মূল গজলের বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে গিয়ে সাঁকো নির্মাণের পদ্ধতিতে ফিরে আসার কৌশল মূল হাফিজে হয়ত আছে। ১৫ নং গজলে দেখছি যে, ২য়, ৬ষ্ঠ, ৮ম লাইন ১ম লাইনের পায়ে পা রেখে চলছে। তারপর মাঝখানে সে ১ম লাইনের পথ ছেড়ে আরও ৫ লাইন অন্য পথ ঘুরে এসে ১৪শ লাইনে এসে ১ম লাইনের সংগ নিল। এই শেয়রের ফাঁকটুকু যেন বিশদ বিবরণের জন্যে সৃষ্টি করা। চলতে চলতে কথা বলতে গিয়ে শ্রোতার কানে সবটুকু যাচ্ছে না ভেবে শ্রোতাকে থামিয়ে তার কানের কাছে মুখ এনে এ যেন ভালো ক'রে বুঝিয়ে বলা। কিন্তু মনে হয় না কবি প্রসংগান্তরে চলে গিয়েছেন। কিন্তু প্রতীকের ভোল পালটানো একটা রীতি হাফিজে দেখা যায়। ১১ নং গজলটির ("ভোরের হাওয়া ধীরে ধীরে ব'লো গো সেই হরিণীরে") প্রথম চরণে প্রিয়ার প্রতীক 'হরিণী,' তৃতীয় পংক্তিতে 'মিষ্টি চিনির পসারিণী,' ৫ম লাইনে 'গোলাব' ৮ম লাইনে 'চপল পাখী' ১২শ লাইনে 'রূপের' ফুল' হ'য়ে প্রকাশ পেয়েছে। বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে যাওয়ার তেমন কোন লক্ষণ এখানে দেখা যায় না। কিন্তু ১০ নং গজলটি (নজরুল-কৃত

ভাবানুবাদ) একটু কুয়াশাচ্ছন্ন ! আনুক্রমিক যুক্তির সিঁড়ি বেয়ে পংক্তির পর পংক্তি উঠে আসে না কিংবা নেমে যায় না এখানে। যেমন:

আমরা পানের নেশার পাগল লাল শারাবে ভর্ গেলাস।
পান-বেহুঁশে আয় রেখে ঐ সাকীর বিলোল আঁখির পাশ ॥
চাঁদ-পিয়ালায় রবির কিরণ ঢালার মত শারাব ঢাল,
ছায় না যেন দিনের আনন কস্তুরী কেশ খোপার ফাঁস্ ॥
শারাব খানাব সদর ঘরে বসো খানিক ধর্মাধিপ—
এই আনন্দ ধারায় নেয়ে নাও ধুয়ে সব পাপের রাশ ॥
মোমের বাতির মত, সুফী, কেঁদে গলাও আপনাকে।
এই বিষাদ এই ব্যথার পারে দাও আনন্দ ভর্ আকাশ ॥
নূতন দিনের বঁধু যদি আসে তোমার খোস নসীব।
যৌতুক তাই দিও লিখে হাফিজের এই প্রেম বিলাস ॥

এখানে ১ম পংক্তির সংগে দ্বিতীয়, তৃতীয় চতুর্থ পংক্তির সংগে পঞ্চম, ষষ্ঠ, ৭ম, ৮ম ও ৯ম, ১০ম পংক্তির পরস্পর নির্ভর বক্তব্যের চেয়ে দুরান্বয়ে অর্থের কিছু সাদৃশ্য বোঝা যায়। 'আমরা পানের নেশার পাগল' কেন, কবি তা বললেন না, কিংবা পানোন্মত্তকে—'সাকীর আঁখির-পাশে' রাখতে বলার কারণ দেখালেন না। বললেন, রবির কিরণের-মত-চাঁদের পেয়ালায় শারাব ঢালো, যাতে কস্তুরী কেশ খোঁপার ফাঁসে দিনের আনন ঢেকে না যায়। এর পরে ধর্মগুরুকে শরাবখানার বৈঠকখানায় বসতে উপদেশ দিলেন মদ্যপানের আনন্দ-ধারায়-রাশিকৃত পাপ ধুয়ে ফেলতে। কিন্তু তারপর সুফীকে কেন মোমের-মত-কেঁদে আপনাকে গলাতে বলেন সেটা বোঝা গেল না, কেনইবা বিষাদ ও ব্যথার অন্তরালে আনন্দময় আকাশের প্রকাশ চাইলেন তারও কারণ দর্শালেন না। আপাতদৃষ্টিতে এই অসংলগ্নতা চোখ এড়াবার নয়। শারাব রূপ আনন্দামৃত পান করলে যদি পাপ মুছে যায় তো তাকে আবার সাথে সাথে কাঁদতে বলার উপদেশ কেন? এই আপাতঃ অসংলগ্নতা নজরুলের কয়েকটি গজলে দেখতে পাওয়া যায়। প্রসংগত 'করুণ কেন অরুণ আঁখি' গজলটির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এখানে বৈপরীত্যের মধ্যে আছে একটা অন্তর্গূঢ় মিলন-সেতু। আলো অন্ধকারকে এখানে লালকালো সুতোর মত পরস্পরের

বুকফুঁড়ে বুনে তোলা হয়েছে এবং সবশেষে এক রহস্যময় ইঙ্গিতের সাগরে চালিয়ে দেওয়া হয়েছে তাকে প্রণয়িনী নদীর মত। এখানে কবি কি আনন্দ-বিলাসী না বিষাদ-বিলাসী সেটাই বুঝতে পারা যায় না। পাঠক কিংবা শ্রোতা কোন এক অজানাকে পাওয়ার তৃপ্তিতে রোমাঞ্চিত —কিন্তু তাকে ধরতে গেলেই সে স্বপ্নের নায়িকার মত অদৃশ্য হয়ে যায়। গজলের এই সংযত কাঠামোয় প্রযুক্ত প্রত্যক্ষ অসংলগ্নতার প্রথম প্রকাশ ঘটেছিল প্রকাণ্ড শরীর 'বিদ্রোহী' কবিতায়। নিঃসন্দেহে ভাবোন্মাদনার অপরূপ প্রকাশ এ কবিতা। কিন্তু তার মধ্যে যে হাফিজী কৌতুক ছিল তাতে সন্দেহ নেই। পাঠকের কিংবা সমালোচকের ঐ কবিতার ব্যাখ্যা করে মন্তব্য প্রদানের প্রয়াস লক্ষ্য করে কবি নজরুল তার এক গজলে বলেছিলেন : 'কাঁটা' নিকুঞ্জে কবি/এঁকে যা সুখের ছবি / নিজে-তুই গোপন রবি,তোরই আঁখির সলীলে।' ঐ অশ্রুর সলীলকে চাপা দিতেই কি হাফিজ ও নজরুলের আনন্দবিলাস ?

প্রায় শব্দে শব্দে উপমায়-উপমায় চিত্রকল্পে আঙ্গিক-বিন্যাসে এমনি সাদৃশ্য খুঁজে পেলেও আসলে হাফিজকে নজরুল নতুন পাত্রে পুরনো মদের মত ব্যবহার করেছেন। এই কাজটা করার সময় নজরুল কাবিগরের মত সাধনা করেছেন। কখনো সম্পূর্ণ হাফিজ কখনো ওমর ও হাফিজ, কখনো রুমি, ওমর-হাফিজ সেই সংগে আবার বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসকে এক পাত্রে ঢেলে মিশ্রণের কাজে কেমিষ্টের মত পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। কখনো হাফিজকে ব্যবহার করেছেন গোলাপের মতো আর কখনো ব্যবহার করেছেন গোলাপের আতরের মত। কখনও তা দৃশ্য রূপে, কখনো অদৃশ্য রূপে, কখন পুষ্পঅলঙ্কারে সাজিয়ে আর কখনো আঙুরের রসের মত পান করিয়ে স্বাস্থ্যের লাবণ্যে রূপবতী করে।

(২)

যা হোক এবার বহিরাঙ্গ ছেড়ে ভাবের দিকটায় হাফিজের সংগে নজরুলের সমমর্মিতার কথা আলোচনা করা যাক। নজরুল নিজে হাফিজের কবিতার পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন :

> হাফিজকে আমরা—কাব্য-রস-পিপাসুর দল—কবি বলেই সম্মান করি, কবি রূপেই দেখি। তিনি হয়ত বা সুফী দরবেশও ছিলেন।

তাঁর কবিতাতেও সে আভাস পাওয়া যায় সত্য। শুনেছি আমাদের দেশেও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন প্রভৃতি হাফিজের কবিতা উপাসনা মন্দিরে আবৃত্তি করতেন। তবু তাঁর কবিতা শুধু কবিতাই। তাঁর দর্শন আর ওমর খৈয়ামের দর্শন এক হয়েও ভিন্ন।

এঁরা সকলেই আনন্দবিলাসী। ভোগের আনন্দকেই এঁরা জীবনে চরম আনন্দ বলে স্বীকার করেছেন। ইরানের অধিকাংশ কবি যে শরাব-সাকী নিয়ে দিন কাটাতেন, এ-ত মিথ্যা নয়।

তবে এও মিথ্যা নয় যে, মদিরাকে এঁরা জীবনে না হোক কাব্যে প্রেমের আনন্দের প্রতীক রূপেই গ্রহণ করেছিলেন।

হাফিজ এক জায়গায় বলছেন—"কাল আমার গুরু মস্‌জিদ ছেড়ে পানশালার দিকে যাচ্ছেন দেখলাম, ওগো তোমরা বল—আমি এখন কোন পথ গ্রহণ করি।" অর্থাৎ তিনি বলতে চান—পানশালা প্রেমোন্মত্তের মন্দির, সেইখানেই সত্যকে পাওয়া যায়।

এঁরা সর্বদা নিজেদেরকে "চিন্‌দান্" বা স্বাধীন চিন্তাকারী, ব্যভিচারী ব'লে সম্বোধন করতেন। —হাফিজের কাব্যের একটি সুর—"কায়শ বেখবর, আজ ফসলে গুল ও তরকে সরাব"—(ওরে মূঢ়! এমন ফুলের ফসলের দিন—আর তুই কিনা শারাব ত্যাগ করে চ'লে আছিস।)

আনন্দবিলাসী স্বাধীন চিন্তাকারী এই হাফিজের কিঞ্চিৎ পরিচয় এখন দেওয়া যেতে পারে। কবি হিসেবে হাফিজের মর্যাদা কেমন? ফিট্‌জিরাল্ড বলেছেন : To be sure their Roses & Nightingles are repeated enough ; but Hafiz and old Omar Khayyam ring like true metal. হাফেজ তাঁর স্বদেশে কিন্তু ওমরের চেয়ে বেশী জনপ্রিয়। যদিও ওমরের দর্শনের ছায়াপাত ঘটেছে হাফিজে তবু আনন্দবাদী ওমর হাফিজের আধ্যাত্মিকতার রাস্তায় কিছুটা ভিন্ন পথে এগিয়ে গেছেন। যুক্তিবাদী ওমর থেকে ভাববাদী হাফিজ দূরে সরে যাওয়াতে পাশ্চাত্ত্য সমালোচক ও কবিদের মতে হাফিজ অধিকতর প্রাচ্য এবং পারসিক।

কিন্তু ঐ ভাবে কবি-পরিচিতি দিয়ে সবাই খুশি হতে পাবেন না। তাই পারস্যের সবচেয়ে বড় কবি কে—এই প্রশ্নে সমালোচকের কাছ থেকে জবাব এসেছে এই ভাবে : that the greatest poet of Persian language since the coming of Islam to the present time (each one in his special variety) are the six following—Firdause, Khayyam, Ansari, Rumi, Sadi, Hafiz.

কিন্তু এই ছ'জনের মধ্যে কে সর্বাপেক্ষা বড়? সমালোচকের জবাব : Without any doubt or hesitaion that man is Khawja shams-al Haqq wal-Milla wal. Din Muhammad-Hafiz-i Shiraji.

ভাব ও চিন্তার অথবা সুদূরপ্রসারী কল্পনাব জন্যে রুমী ও ওমরের উপরে হাফিজের স্থান নয়। বিশ্লেষণ কবলে দেখা যায় ওমবেব চিন্তার প্রভাব হাফিজে অনেকখানি বর্তমান। ওমব বলেন :

প্রেমেব আলোয যে দিল রৌশন
যেথায় থাকুক সমান তাহার।
খোদাব মস্‌জিদ, মূরত-মন্দির,
ঈসাই-দেউল ইহুদ-খানায ॥

[নজরুল কৃত ভাবানুবাদ : নজরুল-গীতিকা]

হাফিজ বলেন :

হউক মস্‌জিদ হউক মন্দিব, প্রেমের গতি সবখানেই,
গাইছে একই প্রেমের গীতি কেউ সজাগ কেউ নেশায ভোর।

[নজরুল গীতিকা : নজরুল কৃত ভাবানুবাদ]

চিন্তার সাযুজ্য রুমীতেও পাওয়া যায় :

Cross and Christians from end to end,
I surveyed ; He was not on the Cross.
I went to the idol-temple, to the ancient pagoda :
No trace was visible there.
I went to the mountains of Herat and Candahar ;
I looked : He was not in that hili-and-dale.
I gazed into my own heart ;
There I saw Him, He was nowhere else.

বলার ভঙ্গিটাই ভিন্ন কেবল, নইলে এঁদের মধ্যে চিন্তার মোটামুটি একটা ঐক্য খুঁজে পাওয়া যায়। তাহল হাফিজের শ্রেষ্ঠত্ব কোথায়? হাফেজের শ্রেষ্ঠত্ব আঙ্গিকের ঐশ্বর্যে, ভাষার মাধুর্যে, দৃষ্টি-নিহতকারী

চিত্রকল্পের রূপ-লাবণ্যে। তার ভাষা যেমন অলঙ্কারপূর্ণ বেগময়, তেমনি সঙ্গীতময়—যে কোনো যুগের চোখে আধুনিক।

দার্শনিকদের ব্যাখ্যায়—ঐ কবির ভিতর চিন্তার সাযুজ্য থাকলেও ওমরের হতাশার সঙ্গে হাফিজের ও রুমীর মিল নেই। ত্রয়োদশ শতাব্দীর বিখ্যাত পারসিক দার্শনিক ওয়াহিদ মাহমুদের দার্শনিক মতবাদে হাফিজ নাকি বিশ্বাসী ছিলেন। ওয়াহিদের সম্প্রদায়টি কোনো নিষ্ঠুর নির্যাতনের সম্মুখীন হয়ে শাহ আব্বাসের হাতে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। ওয়াহিদ মাহমুদ সে-কালের অদ্বৈতবাদকে অস্বীকার করে বলেন যে আদি সত্য এক নয়, বহু। লাইবনিযের বহু পূর্বেই তিনি ঘোষণা করেন যে বিশ্বপ্রকৃতি তার পরিভাষায় আফরাদ বলে কথিত কতকগুলি মৌলিক বা সরল অণুকণিকার যৌগিক রূপ—এ-সব অণুকণিকা অনন্তকাল ধরে রয়েছে এবং এরা জীবন্ত। এই মৌলিক এককগুলি একপ্রকার খাদ্য গ্রহণ করে অনবরত নিম্নতর থেকে উচ্চতর পর্যায়ে উন্নত হচ্ছে; এবং বিশ্ব-প্রকৃতির কানুন হলো এই মৌলিক বস্তু সমূহকে ক্রমোন্নতির পটে পরিপূর্ণতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। তাঁর সৃষ্টি-পর্যায়ের প্রত্যেক অধ্যায় হলো আট হাজার বৎসর। আবার এ রকম আট অধ্যায়ের পর বিশ্বপ্রকৃতি ভেঙে চুরে যাবে এবং তার ধ্বংসাবশেষ থেকে আবার নূতন বিশ্বপ্রকৃতি জন্ম লাভ করবে।

একটা বিশেষ স্তরে পৌঁছে নজরুল ঐ ধরনের চিন্তায় মগ্ন হয়েছিলেন কিনা—সেটা অনুসন্ধানের ব্যাপার। এই প্রবন্ধে তা নিয়ে বিশদ আলোচনা করার পরিসর কম বলে আপাততঃ বিরত থাকলাম। শুধু পাঠককে এটুকু জানান যেতে পারে—বহুত্ববাদের সুড়ঙ্গ দিয়ে নজরুল পরম সত্যে পৌঁছুবার চেষ্টা করছিলেন এবং তাঁর ঐ পারসিক কবিগুরু এ বিষয়ে যে তাঁকে পথ দেখিয়েছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই।

কিশোর বয়স থেকেই নজরুলের মধ্যে একটি বৈরাগ্য-ধর্মী সুফী মানসিকতার স্ফুরণ লক্ষ করা যায়। একদিকে ভারতীয় বেদান্ত দর্শন অন্যদিকে পারশী সুফী-দর্শনের একটি বেণীবদ্ধরূপ নজরুলে পুষ্টি লাভ করতে থাকে। নজরুলের একাংশের শরীরে ঐ সুফী ভাবের রক্ত সঞ্চার করে হাফিজের মরমী চেতনা যা নজরুলের গানে এবং পরবর্তীকালে নতুন চাঁদের কোন কোন কবিতায় এক ইঙ্গিতময় রূপ-লোকের সৃষ্টি করেছে।

ভায়োলেন্সের ভায়োলিন্

"ঝড় সঙ্গে বহে যেন কাকলী লহরী!"

—মধুসূদন

এক সময় নজরুল তাঁর "আমার কৈফিয়ৎ" কবিতায় লিখেছিলেন— "ভায়োলেন্সের ভায়োলিন নাকি আমি বিপ্লবী মন তুষি।" ইংরেজী "violence" শব্দটির অর্থ সংসদের ইংরেজী-বাংলা অভিধান করেছে: বৎপরোনাস্তি জোবালতা, তীব্রতা বা উগ্রতা; প্রচণ্ডতা; হিংস্রতা। এবং "violin"-এর অর্থ করেছে: বেহালা জাতীয় যন্ত্রবিশেষ। সুতরাং শব্দ দু'টির আভিধানিক অর্থ দাঁড়ায়: উগ্রতা, প্রচণ্ডতা বা হিংস্রতার বেহালা। অর্থাৎ যে বেহালা কিংবা বীণা তার সুরের মধ্য দিয়ে তীব্রতা, উগ্রতা, প্রচণ্ডতা বা হিংস্রতাকে প্রকাশ করে।

এখানে শব্দ দু'টির ব্যবহার অত্যন্ত কাব্যিক। কেননা "ভায়োলেন্স" শব্দটা স্নিগ্ধতার বিপরীত অর্থ জ্ঞাপন করে বলে কাব্যগত শব্দ—যেমন: শিশির, ফুল, দূর্বা, পাখীর মধুর গান, কোমলতা, মিষ্টতা, মাধুর্য, লাবণ্য,—এদের বিরুদ্ধাচারণ করে। কিন্তু "ভায়োলিন" শব্দটা সংগীত সুতরাং মাধুর্যের সংগে মিশ্রিত বলে 'ভায়োলেন্সের ভায়োলিন' একত্রে একটা রূপকের প্রতীক হয়ে ওঠে। অর্থটা প্রত্যক্ষকে আড়াল করে পরোক্ষের ইঙ্গিত গ্রহণ করায় অমধুর না হয়ে সেটা সুমধুর হ'ল। শব্দটির সাহিত্য-অর্থ: বিপ্লবের বীণা। যাকে আরও এক ধাপ এগিয়ে কাব্যিক অর্থে "অগ্নি-বীণা" কিংবা "বিষের বাঁশী" বললে সঠিক অনুবাদ কিংবা ভাবানুবাদ বলা যেতে পারে।

সংগীতের সব রাগিনীই কিন্তু স্নিগ্ধরূপ প্রকাশ করে না। ধরা যাক—ভৈরবী একটি রাগিনী। এর সময় দিবা ১ম ও ২য় প্রহর, ঠাট কোমল রি গ ধ নি। দিনের প্রথম প্রহরে যখন সমস্ত কিছুর মধ্যে একটা শান্ত, নিরীহ, নম্র কোমল ভাব ব্যক্ত হয় এর সময় তখন। এ আমাদের

করুণ সুরে স্নিগ্ধ করে মুগ্ধ করে বিষণ্ণ করে। কিন্তু দীপক রাগ ঠিক এর বিপরীত। গ্রীষ্মকালে মধ্যাহ্ন এর সময়। অর্থাৎ সূর্য যখন মধ্যগগনে থাকে এবং সবচেয়ে প্রখর তীব্র তাপ বিকিরণ করে। "দীপক" শব্দের আভিধানিক অর্থ দীপ্তিজনক, প্রজ্বলনকারী, উত্তেজক; এবং সুরের মধ্যেও সে সেই উগ্র, ঝাঁঝালো উত্তাপ ঢেলে আত্মপ্রকাশ করে। দু'টি রাগ যে দু'রকম অর্থ জ্ঞাপন করে কবিদের ঐ দু'টি শব্দ ব্যবহারে তার সুস্পষ্ট প্রমাণ আছে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন: 'ঐ অশ্রুসজল ভৈরবী আর গেয়ো না।' এখানে ভাব প্রকাশ পাচেছ বিরহজনিত দুঃখের, মৃত্যুজনিত শোকের, আঘাতজনিত বেদনার। এবং এইভাবে সে ছড়াচেছ করুণ মধুর বিষাদ। অপরপক্ষে নজরুল একস্থানে লিখেছেন: 'নট-মল্লার দীপক-রাগে/জ্বলুক তড়িত-বহ্নি আগে/ভেরীর রন্ধ্রে মেঘ-মন্দ্রে জাগাও বাণী জাগ্রত নব।' এখানে ভাব প্রকাশ হচেছ হতাশাজনিত আক্রোশের, আঘাতজনিত ক্রোধের, শৃঙ্খলজনিত ভাঙনের, নিদ্রাজনিত জাগরণের। এবং এইভাবে সে ছড়াচ্ছে উগ্রতীব্র আগুন।

কবিতাতেও যেমন করুণ রস আছে, বাৎসল্য রস আছে তেমনি আছে বীররস, রৌদ্র রস। অতএব "ভায়োলেন্স" কাব্যের বিশেষণ হতে পারে না তা নয়।

নজরুল ইসলামকে যাঁরা "ভায়োলেন্সের ভায়োলিন" বলেছিলেন তাঁরা কবির বিদ্রোহী রূপকল্পটিকেই প্রকারান্তরে সঠিক শব্দবিন্যাসে প্রকাশ করেছেন। রবীন্দ্রনাথও বলেছিলেন: "অরুগ্ন, বলিষ্ঠ হিংস্র নগ্ন বর্বরতা—তার অনবদ্য ভাবমূর্তি রয়েছে কাজীর কবিতায় ও গানে।" এখানে রবীন্দ্রনাথও ঐ violence শব্দটি প্রায় আভিধানিক অর্থে ব্যবহার করেছেন।

বলাবাহুল্য বাংলা-সাহিত্যে নজরুল ইসলামই একমাত্র ভায়োলেন্সের ভায়োলিন—আমরা যাঁর লেখায় বজ্রের বাঁশী শুনেছি।

এই ভায়োলিনের স্বরূপ কেমন নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় তাঁর অনবদ্য ভাষায় তার কিছুটা ছবি ধরবার প্রয়াস পেয়েছেন এইভাবে:

আজ যদি ধরিত্রীর খেয়ালে হঠাৎ শুকিয়ে যায় নায়েগ্রার জলপ্রপাত,

কোনো ফটোগ্রাফের ছবি থেকে আর বোঝানো যাবে না, সেই প্রচণ্ড প্রবাহের জীবন্ত গতিবেগ কি বিস্ময়কর ছিল...

আজ বাঙলাদেশের চোখের সামনে যাঁদের কবি বলে জানি, গায়ক বলে জানি, সুরকার বলে জানি, তাঁদের জীবনের গতি ও ধারা থেকে বোঝা যাবে না, কবি নজরুল ইসলাম কি ছিল...

প্রচণ্ড বন্যার মত, লেলিহান অগ্নিশিখার মত, পরাধীন জাতির তিমির-ঘন-অন্ধকারে, জাতির ভাগ্যবিধাতা নজরুলকে সম্পূর্ণ এক স্বতন্ত্র ছাঁচে গড়ে পাঠিয়েছিলেন।

এই ভায়োলিনের স্বরূপ অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত এঁকেছেন এইভাবে ;

নজরুলের জন্ম জ্যৈষ্ঠ মাসে। বাংলা-সাহিত্যেও তাঁর আবির্ভাব জৈষ্ঠ্যের রুদ্ররুক্ষ আতাম্র আকাশে রক্তিমবর্ণ ঝড়ের মত। কজ্জলবর্ণ ঝড় নয়, রক্তিমবর্ণ ঝড়। সে যে-মেঘ নিয়ে এসেছিল তা কালো ঠাণ্ডা মেঘ নয়, লাল প্রতপ্ত মেঘ। সে ঝড়ে শুধু শক্তি আর বেগ নয়, নয় শুধু মুক্তিবন্ধ উদার উদ্দামতা, তাতে ছিল একটা বর্ণাঢ্য সমারোহ, দহন-দীপ্তির দুঃসহ সৌন্দর্য। সঙ্গে করে সে বৃষ্টিধারা নিয়ে আসেনি, নিয়ে এসেছে বিচিত্রবর্ণা বিদ্যুৎশিখা। ঝড় যে এত মনোহর হতে পাবে, এত ছন্দময়, ক্রন্দন যে এত গীতসুধান্বিত, তা নজরুলকে দেখবার আগে কে ভাবতে পেরেছিল? নজরুল ভয়ঙ্করের বেশে এক সুন্দরের আবির্ভাব।

এখানে "ভয়ঙ্কর সুন্দর" বিশেষণ "violin of violence"-এর সমার্থক প্রায়। violence=ভয়ঙ্কর, violin=সুন্দর। violence+violin=ভয়ঙ্কর+সুন্দর

এখন দেখতে হবে সুরের ভিতর থেকে ঐ ভয়ঙ্কর কিভাবে ব্যক্ত হয়েছে এবং নজরুলের কবিতায় ভায়োলেন্স কিভাবে চিত্রিত হয়েছে কিংবা কি-রূপ পরিগ্রহ করেছে এবং প্রকৃত ভায়োলেন্স সংগে নজরুলে কাব্য-স্বরূপের মিল কতখানি এবং কেন সমালোচক তাঁর কবিতাকে "ভায়োলেন্সের ভায়োলিন" বিশেষণে ভূষিত করল।

বস্তুতঃ ঐ শব্দ দু'টি কবিতা লেখার খাতিরে সম্ভবভ নজরুলের সৃষ্টি। অনুপ্রাসপ্রিয় কবি নিজেকে ঐ দু'টি শব্দের সংযুক্তিতে রূপ

দিয়েছেন। ভাষাটা তাঁর নিজের যদিও বক্তব্যটি সমালোচকের। কেননা সমালোচকের 'কৈফিয়ৎ' দিতে গিয়ে কবিকে সমালোচকের বক্তব্য তুলে ধরতে হয়েছে।

যা হোক্ আমরা 'ভায়োলেন্স' শব্দটা এক্ষেত্রে সমালোচক প্রদত্ত শব্দ হিসেবেই গ্রহণ করব।

বৃটিশের রাজত্বকালে সরকারের বিরুদ্ধাচারণকারীকে বিপ্লবী বলা হ'ত— যদিও যে-কোন প্রতিষ্ঠিত সরকারের আইন অমান্যকারী বিদ্রোহীকে বিপ্লবী বলা হয় তবু এক্ষেত্রে কাল নিরূপণের জন্য বিশেষভাবে বৃটিশ রাজত্বের কথা উল্লেখ করা হ'ল।

বাংলা-সাহিত্যে নজরুলের আবির্ভাব বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে। তৃতীয় দশকে পূর্ণরূপে আত্মপ্রকাশ। চতুর্থ দশকে পূর্ণ আত্মপ্রতিষ্ঠা। পঞ্চম দশকের দ্বিতীয় বর্ষের শেষার্ধে সম্পূর্ণ বিলুপ্তি। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ হয়ে এই সময়ে বাংলাদেশেও একদল সন্ত্রাসবাদী সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে দেশ থেকে ইংরেজ তাড়াবার পরিকল্পনা করছিলেন। ক্ষুদিরাম, বারীন ঘোষ প্রমুখ পূর্বসূরী বিপ্লবীদের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে তাঁরা মরণপণ যুদ্ধে নেমেছিলেন। তাঁরা বুঝেই নিয়েছিলেন আপোষের মনোভাব নিয়ে ইংরেজের কাছ থেকে বড় কিছু আদায় করা সম্ভব হবে না। স্বাধীনতা আসবে একমাত্র রক্তগঙ্গার জাহাজ চড়ে। ঠিক এই মনোভাবটি চরমরূপে আত্মপ্রকাশ করে নজরুলের কবিতায়। নজরুল লিখলেন :

> রক্তাম্বর পর মা এবার
> জ্বলে পুড়ে যাক শ্বেত বসন;
> দেখি ঐ করে সাজে মা কেমন
> বাজে তরবারি ঝনন্ ঝন্।

দেবী বাণীর অর্থাৎ সরস্বতীর পোশাক হ'ল শুভ্র। কবি সেই শুভ্র পোশাক পরিবর্তন করে তাকে রক্তস্নাত লাল বস্ত্র পরিধান করতে বলছেন এবং দেবীর হাতের বীণা ফেলে সে-হাতে শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রামের হাতিয়ার তরবারি ধারণ করতে বলার মধ্যেই তাঁর আকুল আবেদন। স্নিগ্ধতা, কোমলতা বিসর্জন দিয়ে দেবীর যে মূর্তি সংহারকের সেই মূর্তিতে

আত্ম-প্রকাশ করতেই তাঁর এই অনুরোধ। এখানে কবির ভাব-কল্পনা দেশ এবং দেবীকে সংমিশ্রিত একক শরীরে গ্রহণ করেছে। ঐ দেশ আবার দে[illegible]ত গণশক্তি।

সাধারণতঃ কাব্য বলতে আমরা একটা সূক্ষ্মভাবব্যঞ্জক করুণ, কোমল, স্নিগ্ধ, বাৎসল্য রসের কথা চিন্তা করি এবং বীণাপানি সরস্বতীকেও তেমনি লাবণ্যময়ী সুচারুশিল্পের দেবী-প্রতিমা হিসেবে দেখি যিনি কাব্য ও সংগীতের মাধুর্য দিয়ে মানুষের দুঃখ, কষ্ট, শোক-তাপ হরণ করেন। কিন্তু সংগীতের ঐ করুণমাধুর্যের কোন আবেদন নেই অসুরের কাছে। কারণ অসুর-দানবের কথা হ'ল : "দাস যারা গান গায়/ভীরু হৃদয়ের ভিখারী পিপাসা গানেই মেটাতে চায়।" সুতরাং তাকে আঘাত করতে হবে যুদ্ধাস্ত্র দিয়ে। যেমন মহিষাসুরকে দেবী দুর্গা আঘাত করেছিলেন শূল দিয়ে।

সুতরাং আর শুভ্রবসনধারিণী বিদ্যা ও শিল্পের অধিষ্ঠাত্রী বীণাপাণি সারদা দেবীরূপে নয়, কমলবাসিনী রূপে নয়, উগ্রা ভীমা চণ্ডীরূপিণী এলোকেশী রণচণ্ডী কালিকারূপে আবির্ভূত হও হে দেবী এবং

এলোকেশে তব দুলুক ঝঞ্ঝা
কাল-বৈশাখী ভীম তুফান,
চরণ আঘাতে উদ্গারে যেন
আহত বিশ্ব রক্ত--বান।
নিঃশ্বাসে তব পেঁজা-তুলো সম
উড়ে যাক মাগো এই ভুবন,
অসুরে নাশিতে হউক বিষ্ণু
চক্র মা তোর হেম কাঁকন।
টুঁটি টিপে মারো অত্যাচারে মা,
গল-হার হোক নীল ফাঁসী,
নয়নে তোমার ধূমকেতু-জ্বালা
উঠুক সরোষে উদ্ভাসি'।

*   *   *

মেখলা ছিঁড়িয়া চাবুক কর মা,
সে চাবুক কর নভ-তড়িৎ,

জালিমের বুক বেয়ে খুন ঝরে
লালে লাল হোক শ্বেত হরিৎ।
নিদ্রিত শিবে লাথি মার আজ,
ভাঙো মা ভোলার ভাঙ-নেশা,
পিয়াও এবার অ-শিব গরল
নীলের সঙ্গে লাল মেশা।
দেখা মা এবার দনুজ-দলনী
অশিব নাশিনী চণ্ডীরূপ ;
দেখাও মা ঐ কল্যাণ করই
আনিতে পারে কি বিনাশ-স্তূপ।

লক্ষ্য করবার বিষয় ভাষা ক্রমেই তীব্র থেকে তীব্রতম রূপ ধারণ করছে এবং তন্দ্রা, নিদ্রা, অলসতাকে প্রবল ঝাঁকুনী দিয়ে লণ্ডভণ্ড করে দিচ্ছে। কাব্যভাষাটিকে সামান্য ব্যাখ্যা সহকারে গদ্যভাষায় রূপান্তরিত করলে কেমন হয় দেখা যাক :

সংগ্রামরতা দেবী,

তোমার এলোকেশে ভয়ঙ্কর কাল-বৈশাখীর ঝড়-ঝঞ্ঝা দুলে উঠুক, তোমার যুদ্ধরত পায়ের আঘাতে আহত বিশ্ব রক্ত-বন্যা উদ্‌গীরণ করুক ; এই পৃথিবী তোমার যুদ্ধ-উত্তেজনায় প্রবাহিত নিঃশ্বাসের ঝড়ে পেজা তুলোর মত উড়ে যাক—অসুরকে ধ্বংস করতে তোমার হাতের সোনার কাঁকন বিষ্ণুচক্রে রূপান্তরিত হোক। অত্যাচারের টুঁটি টিপে হত্যা কর তুমি, ফাঁসির নীল দাগ তোমার গলার হার হোক এবং তোমার চোখে সক্রোধে ধূমকেতুর জ্বালা ধক্‌ধক করে জ্বলে উঠুক।
মা, তোমার মেখলা অর্থাৎ কটিভূষণ ছিঁড়ে চাবুক তৈরী করো, সে চাবুক আকাশের বিদ্যুতের মত দীপ্তিমান হয় যেন এবং তার তীব্র আঘাতে জালিমের বুক থেকে রক্ত ঝরে পৃথিবী লাল হয়ে যাক, তার সবুজ সুন্দর মূর্তি রক্তাক্ত হয়ে যাক। ঘুমন্ত শিবকে অর্থাৎ মানুষের শুভজ্ঞানকে তুমি লাথি মেরে জাগিয়ে দাও, ভোলানাথ শিব ভাঙের নেশায় যে আত্মহারা হয়েছে সেই ভাঙের নেশা তুমি ছুটিয়ে দাও। মা, একদা তুমি অত্যাচারী দানবদের দলন করেছিলে, ধ্বংস করেছিলে।

তোমার সেই অমঙ্গলনাশকারী অশুভবিধ্বংসী চণ্ডীরূপ ধারণ কর; যে-হাত তোমার কল্যাণের জন্যে নিয়োজিত থাকে সে যে ধ্বংসযজ্ঞেও সমানভাবে পারদর্শী সেটা একবার দেখিয়ে দাও।

ভাষার ভিতর দিয়ে এই রকম প্রচণ্ড ক্রোধকে প্রকাশ করলেও এই ভাষা কিন্তু ছন্দ হারায়নি। শুধু ছন্দ হারায়নি নয় ছন্দ এখানে ধ্বনির সুষম বন্টনে হয়ে উঠেছে সংগীত। সংগ্রামের ভাষা বক্তৃতার নিকরুণ কর্কশতাকে ডুবিয়ে কাব্যের মহাগানে উত্তীর্ণ হয়েছে। ভায়োলেন্সের বাণী হয়েছে ভায়োলিনের গান।

প্রথম শব্দটিকে ছাড়িয়ে দ্বিতীয় শব্দটি, প্রথম পংক্তি ছাড়িয়ে দ্বিতীয় পংক্তিটি, প্রথম বাক্যটি ছাড়িয়ে দ্বিতীয় বাক্যটি আরও জোরালো, আরও তীব্র, আরও মারাত্মক তীক্ষ্ণ ধারালো রূপ ধারণ করেছে এবং অস্ত্রাঘাতের মত প্রতিটি ছন্দস্পন্দিত বাক্য চামড়া কেটে, শিরাধমনী ছিঁড়ে, মাংস ভেদ করে অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করে সত্তার সমুদ্রে জোয়ারের তরঙ্গ তুলছে।

যেমন প্রতীকী এর ভাষা, তেমনি এর আকাশস্পর্শী কল্পনা; যেমন এর উপমা, তেমনি এর চিত্রকল্প; যেমন এর রূপ তেমনি এর রঙ; যেমন এর ভাব তেমনি এর ছন্দ। সুতরাং এর কাব্যরস শুধু রুদ্র-প্রচণ্ড নয়, সুন্দর-প্রচণ্ড।

নজরুলের violence-কে ধ্বংসের সমার্থক হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। এখন দেখতে হবে এই ধ্বংসের প্রতীক হিসেরে নজরুল কি কি শব্দকে বেছে নিয়েছেন। ১. শিব—যিনি বিভিন্ন নামে নজরুল কাব্যে প্রকাশ পেয়েছেন। যথা: নটরাজ, ধূর্জটি, ঈশান, ব্যোমকেশ, পিনাক-পাণি, শঙ্কর, উমানাথ, ত্র্যম্বক, চন্দ্রচূড়, ভোলা, স্বয়ম্ভু, রুদ্র, মহেশ্বর, ভৈরব, মহেশ, নীলকন্ঠ, মৃত্যুঞ্জয়। ২. শ্যামা—যিনি বিভিন্ন নামে নজরুল-কাব্যে প্রকাশ পেয়েছেন। যথা: শিবানী, ভৈরবী, কালী, মহাকালী, চণ্ডী, দুর্গা, শঙ্করী, তারা, দশ-মহাবিদ্যা, দশপ্রহরণধারিণী, দনুজ-দলনী, উমা, গৌরী। ৩. নাগ—বিভিন্নভাবে এই নাগ অর্থাৎ সর্পকে ব্যবহার করেছেন। যথা: ফণী, কালফণী, নাগ, কালনাগ, মহা-নাগ, বাসুকী, কেউটে, কাল-কেউটে, অজগর, তক্ষক। ৪. ঝড়—এর বিভিন্ন রূপ: তুফান, সাইক্লোন, কাল-বৈশাখী, প্রভঞ্জন, ঝঞ্ঝা। ৫. ইস্রাফিল,—ইস্রাফিলের শিঙ্গা ৬. ভূমিকম্প।

৭. ঈশান-বিষাণ। ৮. অগ্নি—সমার্থক শব্দ :—বহ্নি, হুতাশন, অনল, বাড়বানল, দাবানল। ৯. বিষ—সমার্থ শব্দ গরল, জহর। ১০. হায়দরী হাঁক। ১১. জুলফিকার।

এ-ছাড়া কবি দুর্ভিক্ষ, মারী, মহামারী, কালাপাহাড়, বিশ্বামিত্র, দুর্বাশার অভিশাপ, চেঙ্গিস, গজনী মামুদ ধ্বংস প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করেছেন। সবচেয়ে বেশী যে শব্দটা ধ্বংসের প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করেছেন সেটা প্রলয়েশ শিবের। পুরাণের ব্যাখ্যা অনুযায়ী শিব ধ্বংসের প্রতীক। সৃষ্টি, স্থিতি, লয়ের তিন দেবতা ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব। বিষ্ণু পুরাণ বলছে:

> সেই অনাদি ভগবান একমাত্র অদ্বিতীয় হইলেও তিনি সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় বিধান করেন বলিয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব রূপে সংস্থিত হইয়া থাকেন।

শিব হলেন এই ধ্বংসের প্রতীক।

এর পরে শ্যামা। সাকার রূপে ইনি স্ত্রী রূপে রূপায়িত হলেও তান্ত্রিক মতে ইনি বিশ্বসৃষ্টির মূলাধার। সাধারণতঃ ইনি শিবের পত্নী শিবানী রূপে পরিচিতা হলেও স্বয়ং শিবের স্রষ্টা ইনি পরম ব্রহ্মা। এখানে আমরা সেই পরম বিশ্বরূপের ব্যাখ্যা করব না। তবে শাস্ত্রানুযায়ী সমস্ত দেবতারা মিলেও যখন দৈত্য দমনে ব্যর্থ হয় তখন ইনি আসেন দেবতা রক্ষার্থে এবং দৈত্য নিধন করেন। যে-মূর্তিতে ইনি দৈত্য নিধন করেন সে মূর্তি শ্রীদুর্গার এবং ভয়ঙ্করী চণ্ডী অথবা কণ্ঠে নরমুণ্ডধারিণী কালীর। নজরুল এই ধ্বংসের প্রতীক হিসেবে এই ছিন্নমস্তা চণ্ডী রণদা সর্বনাশীকে ব্যবহার করেছেন।

তৃতীয় ধ্বংসের প্রতীক হিসেবে কবি ব্যবহার করেছেন মুসলিম পুরাণের ইস্রাফিলকে। রোজকেয়ামতের পূর্বে ইনি শিঙ্গাতে ফুঁ দিলে প্রলয় শুরু হবে। অন্যান্য শব্দগুলোর ব্যাখ্যার বিশেষ প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। এখন দেখা যাক শব্দগুলো কবির ভায়োলেন্সকে রূপায়িত করতে কতখানি সাহায্য করেছে এবং ভায়োলেন্সকে কেমনভাবে রূপায়িত করেছে।

পূর্বোদ্ধৃত "রক্তাম্বরধারিণী মা" কবিতাটিতে 'দনুজ-দলনী চণ্ডী'র ধ্বংস মূর্তিকে দেখানো হয়েছে।

এখন নটরাজ রুদ্রের ব্যবহার দেখানো যাক:

ভায়োলেন্সের ভায়োলিন্

১. মহাপ্রলয়ের আমি নটরাজ, আমি সাইক্লোন, আমি ধ্বংস

২. আমি ধূর্জটি আমি এলোকেশে ঝড় অকাল বৈশাখীর

৩. আমি ঈশান-বিষাণে হুঙ্কার

৪. আমি পিনাক-পাণির ডমরু ত্রিশূল

৫. আসছে এবার অনাগত প্রলয়-নেশার নৃত্য পাগল,
সিন্ধুপারের সিংহ-দ্বারে ধমক হেনে ভাঙ্‌ল আগল।
মৃত্যু-গহন অন্ধকূপে
মহাকালের চণ্ডরূপে
ধূম্র-ধূপে
বজ্রশিখার মশাল জ্বেলে আসছে ভয়ঙ্কর।
ওরে ঐ হাসছে ভয়ঙ্কর।

ঝামর তাহার কেশের দোলায় ঝাপটা মেরে গগন দুলায়,
সর্বনাশী জ্বালা-মুখী ধূমকেতু তার চামর ঢুলায়!

দ্বাদশ রবির বহ্নি-জ্বালা ভয়াল তাহার নয়ন-কটায়,
দিগন্তের কাঁদন লুটায় পিঙ্গল তার ত্রস্ত জটায়!
বিন্দু তাহার নয়ন-জলে
সপ্ত মহাসিন্ধু দোলে
কপোল তলে।
বিশ্ব-মায়ের আসন তারি বিপুল বাহুর পর
হাঁকে ঐ জয়প্রলয়ঙ্কর!"

["প্রলয়োল্লাস" কবিতায় কুয়াশাশরীরী যে প্রতীকের ব্যববহার করা হয়েছে তা রুদ্র মহাদেবের। এই সমস্ত শব্দ তারই রুদ্র-রূপের ইঙ্গিতবাহক: 'মহাকালের চণ্ডরূপ, ভয়ঙ্কর, 'প্রলয় নেশার নৃত্য পাগল' 'ঝামর কেশ' 'ভয়াল নয়ন কটা' 'পিঙ্গল ত্রস্ত জটা' 'জয়-প্রলয়ঙ্কর।']

৬. হৈ হৈ রব
ঐ ভৈরব

হাঁকে,
গুরু গরগব বোলে ভেরী তুরী,
'হর হর হর
করি চীৎকার ছোটে সুরাসুর সেনা হন-হন
*   *   *
বাজে মৃত সুরাসুর পাঁজরে ঝাঁঝর ঝম্ ঝম্,
নাচে ধূর্জটি সাথে প্রমথ ববম্ বম্ বম্।
লাল লালে লাল ওড়ে ঈশানে নিশান যুদ্ধের
ওঠে ওঙ্কার
রণ ডঙ্কার
নাদে ওম্ ওম্ মহাশঙ্খ বিষাণ রুদ্রের।
ছোটে রক্ত-ফোয়ারা বহ্নির বান রে!
*   *   *
স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল, মাতাল রক্ত-সুরায়;
ত্রস্ত-বিধাতা,
মস্ত পাগল পিনাক-পাণি স-ত্রিশূল প্রলয়-হস্ত ঘুরায়।
ক্ষিপ্ত সবাই রক্ত-সুরায়!

৭. তুই প্রলয়ঙ্কর ধূমকেতু,
তুই উগ্র ক্ষিপ্ত তেজ—মরীচিকা, ন'স অমরার ঘুম-সেতু,
তুই ভৈরব-ভয় ধূমকেতু!

[এখানে দেখানো হয়েছে প্রলয়ের যে দেবতা ভয়ঙ্কর ভৈরব অর্থাৎ শিব, ধূমকেতু তারও ভয় স্বরূপ।]

*   *   *

ক্ষ্যাপা মহেশের বিক্ষিপ্ত পিনাক দেবরাজ-দম্ভোলি
লোকে বলে মোরে, শুনে হাসি আর নাচি বম্-বম্ বলি।

[লোকে আমাকে ক্ষ্যাপা মহেশের বিক্ষিপ্ত পিনাক অর্থাৎ শিবধনু কিংবা ত্রিশূল বলে মনে করে। ঐ কথা শুনে আমার হাসি পায়। কারণ 'এই শিখায় আমার নিযুত ত্রিশূল'। অর্থাৎ শিবের হাতে আছে

একটি ত্রিশূল আর আমার হাতে আছে নিযুত, দশলক্ষ (one million) ত্রিশূল আর সেগুলো সব 'ছড়ানো রয়েছে'—ঐ দেখ 'কত যায় গড়াগড়ি'। অর্থাৎ এতই সামান্য ঐ ত্রিশূল যে সেগুলো অবহেলিত দ্রব্যের মত গড়াগড়ি যেয়ে থাকে। ওগুলো আমার কাছে উপেক্ষণীয় ব্যাপার অথচ লোকে আমাকে সেই 'ত্রিশূল' বলে। শুনে সত্যিই হাসি পায় আমার। ওরা জানে না 'মম ধূমকুণ্ডলী করেছে শিবের ত্রি-নয়ন ঘন ঘোলাটে।']

৮. দ্যাখ কেঁপেছে আরশ আস্‌মানে,
মন-খুনী কি রে রাশ মানে?
ত্রাস প্রাণে? তবে রাস্তা নে।
প্রলয়-বিষাণ 'কিয়ামতে' তবে বাজবে কোন বোধন?
সে কি সৃষ্টিসংশোধন?
ওরে তাথিয়া তাথিয়া নাচে ভৈরব বাজে ডম্বরু শোন্।
ওরে হত্যা নয় আজ 'সত্য-গ্রহ' শক্তির উদ্‌বোধন।

এখন ধ্বংসের চিত্রকল্প ফুটে উঠেছে এমন কতকগুলো স্তবক এখানে উদ্ধার করে পূর্বোল্লিখিত ধ্বংসের প্রতীক শব্দগুলোকে রেখা দ্বারা চিহ্নিত করা যাক।

১. আমি পরশুরামের কঠোর কুঠার,
নিঃক্ষত্রিয় করিব বিশ্ব আনিব শান্তি শান্ত উদার।
আমি হল বলরাম স্কন্ধে
আমি উপাড়ি ফেলিব অধীন বিশ্ব অবহেলে নব-সৃষ্টির মহানন্দে।

[এখানে বলা প্রয়োজন নজরুল ধ্বংসের জন্যে শুধু ধ্বংস করেননি তাঁর ধ্বংস নতুন সৃষ্টির জন্যে। এর ইঙ্গিত শুধু 'ধ্বংস দেখে ভয় কেন তোর? প্রলয় নূতন সৃজন বেদন' এর মতন একটি পংক্তিতে সীমাবদ্ধ নয় আরও অনেক কবিতায় উন্মোচিত। উপরের স্তবকটি সুস্পষ্টভাবে শান্তির সপক্ষে কথা বলছে এবং 'নব-সৃষ্টির মহানন্দে'ই যে তার এই ধ্বংসাত্মক অভিযান তা ছন্দের প্রতি স্পন্দনে প্রসৃত হচ্ছে। 'রক্তাম্বর-ধারিণী মা'র শেষ লাইনটিও অনুরূপ দার্শনিক উপলব্ধিকে সপ্রমাণ করে: 'ধ্বংসের বুকে হাসুক মা তোর সৃষ্টির নব পূর্ণিমা'।]

২. ফিরে এল আজ সেই মহররম মাহিনা,
ত্যাগ চাই মর্সিয়া ক্রন্দন চাহিনা।
উষ্ণীষ কোরানের হাতে তেগ্ আরবীর,
দুনিয়াতে নত নয় মুসলিম কারো শির,
তবে শোন ঐ শোন বাজে কোথা দামামা,
শমশের হাতে নাও বাঁধো শিরে আমামা।
বেজেছে নাকাড়া হাঁকে নকীবের তূর্য,
হুঁশিয়ার ইসলাম ডুবে তব সূর্য।
জাগো, ওঠো মুসলিম, হাঁকো হায়দরী হাঁক,
শহীদের দিনে সব লালে লাল হয়ে যাক্।
নওশার সাজ নাও খুন-খচা আস্তীন,
ময়দানে লুটাতে রে লাশ এই খাস্ দিন।

৩. আয় রে আমাব বাঁধন-ভাঙার তীব্র সুখ
জড়িয়ে হাতে কাল-কেউটে গোখরো নাগের পীত-চাবুক।

* * *

অগ্নি-ফণি। বিষ-রসানো জিহবা দিয়ে দিস্ চুমা
পাহাড়-ভাঙা জাপটানী তোব—ভাবিস্ সোহাগ-সুখ-ছোঁওয়া।
মৃত্যুও যে সইতে নারে তোর সোহাগের মৃত্যু-টান

৪. ঝড়—ঝড়—ঝড় আমি—আমি ঝড়—
শন্—শন্—শনশন শন্—কড় কড় কড়—
কোলাহল কল্লোলের হিল্লোলে হিন্দোল—
দুরন্ত-দোলায় চড়ি'—'দোল্ দে দোল'
উল্লাসে হাঁকিয়া বলি, তালি দিয়া মেঘে
উন্মাদ উন্মাদ ঘোর তুফানিরা বেগে।
উড়ে সুখ--নীড়, পরে ছায়া-তরু, পড়ে, ভিত্তি রাজপ্রাসাদের,
তুফান-তুরগ মোর উরগেন্দ্র-বেগে ধায়।
আমি ছুটি অশান্ত-লোকের
প্রশান্ত-সাগর-শোষা উষ্ণশ্বাস টানি।
লোকে লোকে পড়ে যায় প্রলয়ের ত্রস্ত কানাকানি।

ভায়োলেন্সের ভায়োলিন্

—আমার ধমকে নুয়ে যায়
বনস্পতি মহামহীরুহ; শাল্মলী, পুন্নাগ, দেওদার
ধরি যবে তার
ঝাপটি পল্লব-ঝুঁটি, শাখা-শির ধরে দিই নাড়া ;
গুমরি' কাঁদিয়া ওঠে প্রণতা বনানী,
চড়চড় করে ওঠে পাহাড়ের খাড়া শির-দাঁড়া ।

* * *

দারুণ দাপটে মম জেগে ওঠে অগ্নিস্রাব-জ্বলন্ত-প্রলাপ
ভূমিকম্প জবজর থরথর ধরিত্রীর মুখে ।
বাসুকী-মন্দার সম মন্থনে মন্থনে মম সিন্ধু-তট ভরে
ফেনা-থুকে ।

৫. নাচে ঐ কাল-বোশেখী
কাটাবি কাল বসে কি ?
দে বে দেখি ভীম কারার ঐ ভিত্তি নাড়ি' ।

৬, মাব্ হাঁক্ হৈদরী হাঁক
কাঁধে নে দুন্দুভি ঢাক
ডাক্ ওরে ডাক্
মৃত্যুকে ডাক্ জীবন পানে ।

৭. হাঁকো হাইদর
নাই নাই ডর,
ঐ ভাই তোর যুব-চর্বীর সম খুন খেয়ে ঘুর্ খায় ।
ঝুটা দৈত্যেরে
নাশি সত্যেরে
দিবি জয়টীকা তোরা, ভয় নাই ওরে ভয় নাই হত্যায় ।

৮. আমি বিশ্বামিত্র শিষ্য
আমি দাবানল আমি দাহন করিব বিশ্ব ।

৯. আমি হোম-শিখা আমি আগ্নিক জমদগ্নি'
আমি যজ্ঞ, আমি পুরোহিত, আমি অগ্নি ।

আমি বসুধা-বক্ষে আগ্নেয়াদ্রি, বাড়ববহ্নি কালানল,'
আমি পাতালে মাতাল অগ্নি-পাথার-কলরোল-কল-কোলাহল।

১০. আয় রে আবার আমার চির-তিক্তপ্রাণ!
গাইবি আবার কণ্ঠ-ছেঁড়া বিষ-অভিশাপ সিক্ত গান।

১১. কোথা চেঙ্গিস গজনী মামুদ কোথায় কালাপাহাড়
ভেঙে ফেল ঐ ভজনালয়ের যত তালা দেওয়া দ্বার
খোদার ঘরে কে কপাট লাগায় কে দেয় সেখানে তালা
সব দ্বার এর খোলা রবে চালা হাতুড়ী শাবল চালা।

১২. দলে দলে তারা খুঁজে বেড়ায় ভূমিকম্পের ঘর কোথায়।

১৩. জন্মিয়াই হেরিনু, মোরে ঘিরি' ক্ষতির অক্ষৌহিণী সেনা
প্রণমি বন্দিল—"প্রভু! তব সাথে আমাদের যুগে যুগে চেনা,
মোরা তব আজ্ঞাবহ দাস—
প্রলয় তুফান বন্যা, মড়ক দুর্ভিক্ষ মহামারী সর্বনাশ।"

আবেগের দাবানল দিয়ে যে এইসব পংক্তিগুলো কিংবা স্তবকগুলোর শরীর নির্মাণ করা হয়েছে তাতে নিশ্চয়ই কোন সন্দেহ থাকবার কারণ নেই।

ধ্বংসের এই রূপ নজরুলের কাব্যে শুধু নয় তাঁর গদ্যসাহিত্যেও রূপ পেয়েছে। এখানে তাঁর গদ্য থেকে কয়েকটি ধ্বংসের রূপকল্প উদ্ধার করা গেল:

১. এস আমার শনির শাপদৃপ্ত ভাইরা! আমরা জয়নাদ করব অমঙ্গল আর অভিশাপের। সদ্য পুত্রহীনা জননী আর স্বামীহারা সদ্য বিধবা সৃষ্টি-কাঁদানো ক্রন্দন আমাদের মাধবী উৎসবের গান, মৃত্যু কাতর মুখের যন্ত্রণা আমাদের হাসি...ঐ শ্মশান-মশান-চারিণী চণ্ডী আমাদের বীণাবাদিনী। মহামারী মারীভয় ধ্বংস আমাদের উল্লাস। রক্ত আমাদের তিলক, রৌদ্র আমাদের করুণা।... ...সান্ধ্য-শ্মশান আর গোরস্থান আমাদের সান্ধ্য-সম্মিলনী, আলেয়া আমাদের সান্ধ্য-প্রদীপ, মড়া-কান্না আর পেঁচক শিবাদিরব আমাদের মঙ্গল হুলুধ্বনি।

......সর্বনাশ আমাদের স্নেহ, বজ্র-মা'র আমাদের আলিঙ্গন। উল্কা আমাদের মালা-খসা ফুল, সাইক্লোন আমাদের প্রিয়ার এলোকেশ। সূর্যকুণ্ড আমাদের স্নানাগার, অনন্ত নরক-কুঞ্জ।

[আমরা লক্ষ্মীছাড়ার দল]

২. এস আমার অগ্নি-নাগ-নাগিনীর দল। তোমাদের পলকহারা রক্ত-চাওয়ার যাদুতে হিংস্র পশুর রক্ত হিম করে ফেলি, তোমাদের বিপুল নিঃশ্বাসের ভীম আকর্ষণে টেনে আন ঐ পশুগুলোকে আমাদের অগ্নি-অজগরের বিপুল মুখগহবরে।......তোমাদের বিষ-জরজর পুচ্ছকে চাবুক করে হানো-মারো এই নিখিল-বাসীর বুকে মুখে। বিষের রক্তজ্বালায় তারা মোচড় খেয়ে খেয়ে একবার শেষ আর্তনাদ করে উঠুক। খসে খসে পড়ুক তাদের রক্ত-মাংস-অস্থি তোমাদের বিষ-তিক্ত চাবুকের আঘাতে আঘাতে। গর্জন কর, গর্জন কর আমার হলাহল শিখ ভুজগ শিশুর দল।......পাতালপুরের নিদ্রিত অগ্নিসিন্ধুতে ফুঁ দাও-ফুঁ দিয়ে জ্বালাও তাকে। আসুক নিখিল অগ্নিগিরির বিশ্বধ্বংসী অগ্নি-স্রাব, ভস্মস্তূপে পরিণত হোক এ অরাজক বিশ্ব।

[তূর্যড়ী বাঁশীর ডাক]

৩. জাগো জনশক্তি! হে আমার অবহেলিত পদপিষ্ট কৃষক, আমার মুটেমজুর ভাই। তোমার হাতের এ-লাঙল আজ বলরাম স্কন্ধে হলের মত ক্ষিপ্ততেজে গগনের মাঝে উৎক্ষিপ্ত হয়ে উঠুক, এই অত্যাচারীর বিশ্ব উপড়ে ফেলুক—উলটে ফেলুক। আন তোমার হাতুড়ী, ভাঙ ঐ উৎপীড়কের প্রাসাদ—ধুলায় লুটাও অর্থ-পিশাচ বল-দর্পীর শির। ছোড়ো হাতুড়ী, চালাও লাঙল, উচ্চে তুলে ধর তোমার বুকের রক্ত মাখা লালে-লাল ঝাণ্ডা!......নামিয়ে নিয়ে এস ঝুঁটি ধরে ঐ অর্থ-পিশাচ যক্ষগুলোকে। তোমাদের পিতৃপুরুষের রক্ত-মাংস-অস্থি দিয়ে ঐ যক্ষের দেউল গড়া, তোমাদের গৃহলক্ষ্মীর চোখের জল আর দুধের ছেলের হৃৎপিণ্ড নিঙড়ে তাদের ঐ লাবণ্য ঐ কান্তি। তোমাদের অভিশাপতিক্ত মারি-বিষ-জ্বালা লাগিয়ে তাদের সেই কান্তি, সে-লাবণ্য জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দাও।

বাংলা-সাহিত্যে এই ভায়োলেন্সের রূপ নজরুলের পূর্বে আর কারও সাহিত্যে দেখা দিয়েছিল কি না। মধ্যযুগে ঘনরাম রচিত ধর্মমঙ্গল কাব্যে রচিত চণ্ডীর রণরঙ্গিনী মূর্তির সাক্ষাৎ পাই :

অভয়া বলেন বাছা ভয় ত্যজ দূর।
দানব-দলনী মোরে জানে সুরাসুর ॥
বধেছি নিশুম্ভ, শুম্ভ জম্বের নন্দন।
রক্তবীজ চণ্ডমুণ্ড ধূম্রলোচন ॥
অপর বধেছি কত দুস্তর দানব।
কোন্ ছার মূঢ়মতি মামুদা মানব ॥
সাহসে সমরে শীঘ্র সাজ সীমন্তিনী।
তমি রণে উপলক্ষ, যুঝিব আপনি ॥

* * *

হেনকালে নানামূর্তি উরিলা-রঙ্গিনী।
খড়্গিনী শূলিনী কেহ গদিনী চক্রিণী ॥
শঙ্খিনী চাপিনী ঘোরা নৃমুণ্ডমালিনী।
কেহ ভীমা ভয়ঙ্করী ভৈরবী ভীষণা।
কালী কপালিনী কেহ করালবদনা ॥
বাম হাতে অসি কারো ডাহিনী খর্পর
বিপরীত ডাক ডাকে ডাগর ডাগর
ঘোর মূর্তি ভয়ঙ্করী ঘূর্ণিত লোচনা।

অনুরূপভাবে দেখানো যায় ভারতচন্দ্র তাঁর 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যে কালীর রণচণ্ডী মূর্তি এঁকেছেন। ভারতচন্দ্রের কালী—

লোল জিহ্বা রক্তধারা মুখের দুপাশে
ত্রিনয়ন অর্ধচন্দ্র ললাটে বিলাসে।

এবং শিবের মূর্তি এঁকেছেন—

লক্ লক্ ফণী জটা বিরাজ, তক্ তক্ তক্ রজনী রাজ
ধক্ ধক্ ধক্ দহন সাজ, বিমল চপল গাজিয়া।
ঢুলু ঢুলু ঢুলু নয়ন লোল, হুলু হুলু হুলু যোগিনী বোল
কুলু কুলু কুলু ডাকিনী রোল প্রমদ প্রমথ সজ্জিয়া।

এবং

মহারুদ্ররূপে, মহাদেব সাজে, ভভম্ভম ভভম্ভম
শিঙ্গা ঘোর বাজে
লটাপট জটাজুট সংঘট্ট গঙ্গা, ছলছল টলটল
কলকল তরঙ্গী ॥

ধ্বক্ ধ্বক্ ধ্বক্ ধ্বক্ জ্বলে বহ্নি ভালে, ববম্বম ববম্বম
মহাশব্দ গালে
অদূরে মহারুদ্র ডাকে গভীরে আয়রে আয় দক্ষ
দেরে সতীরে ॥

রামপ্রসাদের একটি গানে শিব-রূপের বর্ণনা ;

হব ফিরে মাতিয়া শঙ্কর ফিরে মাতিয়া
শিঙ্গা করিছে ভভ ভম ভম ভো ভো ভো ববম ববম
বব বম বব বম গাল বাজিয়া ।
মগন হইয়া প্রমথ নাথ, খেটক ডমরু লইয়া হাত
কোটি কোটি দানব সাথ শ্মশানে ফিরিছে গাহিয়া
কটিতটে কিবা বাঘের ছাল, গলায় দুলিছে
হাড়ের মালা
নাগ যজ্ঞোপবীত ভাল, গরজে গর্ব মানিয়া ।

* * * *

শব আভরণ গলায় শেষে দেবের দেব যোগিয়া ।
বৃষভ চলিছে খিমিকি খিমিকি
বাজায়ে ডমরু ডিমিকি ডিমিকি
ধরত তাল দ্রিম্কি দ্রিম্কি, হরিগুণে হর নাচিয়া,
বদন ইন্দু, ঢল ঢল ঢল, শিরে দ্রবময়ী করে টল টল
লহরী উঠিল কল কল কল জটাজুট মাঝে থাকিয়া ।

রামপ্রসাদের গানে দুটি কালি রূপের বর্ণনা :

১. কুঞ্জর বরগতি আসব আবেশ
লোলিত বসনা গলিত কেশ

সুর নরশঙ্কা করে হেরি বেশ
হুঙ্কার রবে রে দনুজদলনী
*　　*　　*　　*
বামে অসিমুণ্ড দক্ষিণে বরাভয়
খণ্ড খণ্ড করে রথ গজ হয়,
জয় জয় ডাকিছে সঙ্গিনী ।।

২.　মা ! কত নাচ গো রণে!
নিরুপম বেশ বিগলিত কেশ
বিবসনা হরহৃদে কত নাচ গো রণে ।
সত্য-হত-দিতি-তনয়-মস্তক-হারলম্বিত
সুজঘনে কত রঞ্জিত কটিতটে
নর-কর-নিকর কুণপ শিশু শ্রবণে ।।

এ-গুলো শাস্ত্রোক্ত দেব-দেবীর রূপ বর্ণনা মাত্র রূপক কিংবা প্রতীক হিসেবে এর ব্যবহার নয়। শাস্ত্রের খাঁচা থেকে উদ্ধার করে ধর্মার্চনার জন্যে নয় কাব্যের রূপকল্পের প্রয়োজনে উপচার হিসেবে শিব ও চণ্ডীকে প্রথম ব্যবহার করলেন মধুসূদন তাঁর কাব্যে :

১.　সিংহনাদে শূরসিংহ আরোহিলা রথে ;
বাজিল রাক্ষস-বাদ্য, নাদিল গম্ভীরে
রাক্ষস ; পশিলা পুরে রক্ষ অনিকিনী
রণবিজয়িনী ভীমা, চামুণ্ডা যেমতি
রক্তবীজে নাশি দেবী, তাণ্ডব উল্লাসে,
অট্টহাসি রক্তাধরে, ফিরিলা নিনাদি,
রক্তস্রোতে আর্দ্র দেহ।

[সপ্তম সর্গ : মেঘনাদবধ কাব্য]

২.　সে ভৈরব রবে রুষি, রক্ষ অনিকিনী
নিনাদিলা বীরমদে, নিনাদেন যথা
দানবদলনী দুর্গা দানব নিনাদে ।
পূরিল কনক-লঙ্কা গম্ভীর নির্ঘোষে।

[ঐ : ঐ]

৩. সাজিল দানব-বালা, হৈমবতী যথা—
নাসিতে মহিষাসুরে ঘোরতর রণে,
কিম্বা শুম্ভ নিশুম্ভ, উন্মাদ বীর মদে।

[তৃতীয় সর্গ : মেঘনাদবধ কাব্য]

'কিন্তু যথার্থ ভায়োলেন্সের রূপ আঁকার জন্যে এ-ব্যবহার নয়। এখন দেখা যাক রবীন্দ্র-সাহিত্যে আমরা শিব ও কালীকে ভায়োলেন্সের প্রতীক হিসেবে কোথাও পেয়েছি কি না। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'পাগল' প্রবন্ধে 'শিব'কে এইভাবে এঁকেছেন :

১. ভোলানাথ, যিনি আমাদের শাস্ত্রে আনন্দময়, তিনি সকল দেবতার মধ্যে এমনি খাপছাড়া। সেই পাগল দিগম্বরকে আমি আজিকার এই ধৌত নীলাকাশের রৌদ্র-প্লাবনের মধ্যে দেখিতেছি। এই নিবিড় মধ্যাহ্নের হৃৎপিণ্ডের মধ্যে তাহার ডিমি ডিমি ডমরু বাজিতেছে। ...

ভোলানাথ, আমি জানি, তুমি অদ্ভুত। জীবনে ক্ষণে ক্ষণে অদ্ভুত রূপেই তুমি তোমার ভিক্ষার ঝুলি লইয়া দাঁড়াইয়াছ। একেবারে হিসাবকিতাব নাস্তানাবুদ করিয়া দিয়াছ।......
আমাদের প্রতিদিনের একরঙা তুচ্ছতার মধ্যে হঠাৎ ভয়ংকর তাহার জ্বলজ্জটাকলাপ লইয়া দেখা দেয়। তখন কত সুখ মিলনের জাল লণ্ডভণ্ড, কত হৃদয়ের সম্বন্ধ ছারখার হইয়া যায়। হে রুদ্র, তোমার ললাটের যে ধ্বকধ্বক অগ্নিশিখার স্ফুলিঙ্গমাত্র অন্ধকারে গৃহের প্রদীপ জ্বলিয়া উঠে সেই শিখাতেই লোকালয়ের সহস্রের হাহা ধ্বনিতে নিশীথ রাত্রে গৃহদাহ উপস্থিত হয়। হায় শম্ভু, তোমার নৃত্যে, তোমার দক্ষিণ ও বাম পদক্ষেপে সংসারে মহাপুণ্য ও মহাপাপ উৎক্ষিপ্ত হইয়া উঠে। সংসারের উপরে প্রতিদিনের জড়হস্তক্ষেপে যে একটা সামান্যতার একটানা আচরণ পড়িয়া যায়, ভাল-মন্দ দুয়েরই প্রবল আঘাতে তুমি তাহাকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিতে থাক ও প্রাণের প্রবাহকে অপ্রত্যাশিতের উত্তেজনায় ক্রমাগত তরঙ্গিত করিয়া শক্তির নব নব লীলা ও সৃষ্টির নব নব মূর্তি প্রকাশ করিয়া তোল। পাগল, তোমার এই রুদ্র আনন্দে যোগ দিতে আমার ভীত হৃদয় যেন পরাঙ্মুখ না হয়।

সংহারের রক্ত আকাশের মাঝখানে তোমার রবিকরোদ্দীপ্ত তৃতীয় নেত্র যেন ধ্রুব জ্যোতিতে আমার অন্তরের অন্তরকে উদ্ভাসিত করিয়া তোলে। নৃত্য করো, হে উন্মাদ, নৃত্য করো। সেই নৃত্যের ঘূর্ণবেগে আকাশের লক্ষ কোটি যোজনব্যাপী উজ্জ্বলিত নীহারিকা যখন ভ্রাম্যমাণ হইতে থাকিবে তখন আমার বক্ষের মধ্যে ভয়ের আক্ষেপে যেন এই রুদ্রসংগীতের তাল কাটিয়া না যায়। হে মৃত্যুঞ্জয়, আমাদের সমস্ত ভালো এবং সমস্ত মন্দের মধ্যে তোমারই জয় হউক।

২. হে ভৈরব হে রুদ্র বৈশাখ,
ধূলায় ধূসর রুক্ষ উড্ডীন পিঙ্গল জটাজাল,
তপঃক্লিষ্ট তপ্ততনু, মুখে তুলি ভীষণ ভয়াল
কারে দাও ডাক—
ছায়ামূর্তি যত অনুচর
দগ্ধতাম্র দিগন্তের কোন ছিদ্র হতে ছুটে আসে।
কী ভীষ্ম অদৃশ্য নৃত্যে মাতি উঠে মধ্যাহ্ন আকাশে
নিঃশব্দ প্রখর
ছায়ামূর্তি তব অনুচর॥

৩. শিকল দেবীর ওই যে পূজাবেদি
চিরকাল কি রইবে খাড়া?
পাগলামি তুই আয়রে দুয়ার ভেদি।
ঝড়ের মাতন বিজয়-কেতন নেড়ে
অট্টহাস্যে আকাশখানা ফেড়ে
ভোলানাথের ঝোলাঝুলি ঝেড়ে
ভুলগুলো সব আনরে বাছা-বাছা।
আয় প্রমত্ত, আয় রে আমার কাঁচা॥
[সবুজের অভিযান : বলাকা]

[সম্পূর্ণ মরণ মিলন কবিতাটিতে 'মরণ' রূপ 'শিব'কে রূপক হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। এখানে একটি স্তবক মাত্র উদ্ধার করা গেল। এখানে ভারতচন্দ্র-বর্ণিত শিবের রূপ বর্ণনার সাদৃশ্য দৃষ্টি এড়ায় না।]

ভায়োলেন্সের ভায়োলিন্

যবে বিবাহে চলিলা বিলোচন
ওগো মরণ হে মোর মরণ,
তাঁর কতমত ছিল আয়োজন,
ছিল কত শত উপকরণ।
তাঁর লট্পট করে বাঘছাল
তাঁর বৃষ রহি রহি গরজে
তাঁর বেষ্টন করি জটাজাল
যত ভুজঙ্গদল তরজে।
তাঁর ববম্ ববম্ বাজে গাল,
দোলে গলায় কপোলাভরণ,
তাঁর বিষাণে ফুকারি ওঠে তান
ওগো মরণ হে মোর মরণ ॥

[মরণ-মিলন : উৎসর্গ]

ঠিক ভায়োলেন্সের হুবহু প্রতিকল্প হিসেবে শিবকে ব্যবহার না করলেও চির-নতুনের পূজারী রবীন্দ্রনাথ প্রাত্যহিকের কালিমালিপ্ত পুরাতনকে সরিয়ে নতুনকে যেখানে আবিষ্কার করতে চেয়েছেন, সেখানে শিবকে নতুনের প্রতীক হিসাবে মাঝে মাঝে ব্যবহার করেছেন। উপরোদ্ধৃত স্তবক-গুলিতে যেমন তার ইঙ্গিত পাওয়া যায়, তেমনি মুমূর্ষু আত্মার উদ্বোধনে নিম্নোক্ত প্রার্থনায় তা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে :

যদি স্বপনে মিটায়ে সব সাধ
আমি শুয়ে থাকি সুখ স্বপনে
যদি হৃদয়ে জড়ায়ে অবসাদ
থাকি আধো জাগরূক নয়নে,
তবে শঙ্খে তোমার তুলো নাদ
করি প্রলয়শ্বাস ভরণ
আমি ছুটিয়া আসিব ওগো নাথ,
ওগো মরণ, হে মোর মরণ ॥

শিব রবীন্দ্রনাথে এমনি মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ ঝলকের মত তাঁর কাব্যের আকাশ জুড়ে ঝলকে উঠলেও সে থেকে গেছে নতুনের যৌবনের জীবন ও

আনন্দের প্রতীক হিসেবে ঠিক বিপ্লবের নয়। কিন্তু রবীন্দ্র-কাব্যে চামুণ্ডারূপিনী চণ্ডীর ব্যবহার অতি দুর্লভ।

যদিও ভায়োলেন্স রবীন্দ্র-কাব্যে একেবারে দুর্লভ নয় এবং যেখানে তাঁর কবিতায় এবং গদ্য কবিতায় রৌদ্ররসের প্রকাশ ঘটেছে সেখানে ভায়োলেন্স নগ্নিকার রূপ পরিগ্রহ না করলেও তাকে অন্তত: উন্মোচিত আননে প্রকাশ হ'তে দেখেছি।

প্রথম 'ভাঙার গান' রবীন্দ্রনাথই 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গে' গেয়েছিলেন—'ভাঙ-ভাঙ-ভাঙ কারা আঘাতে আঘাত কর। ওরে আজ কী গান গেয়েছে পাখী, এয়েছে রবির কর।' নব আলোকে উদ্ভাসিত এই আত্মা বিশ্বানুভূতির আনন্দে চীৎকাব করে উঠলেও এতে ক্রোধের চিহ্ন নেই, নেই কোনো রাজনৈতিক চেতনা। তাই একে violence বলা চলে না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যখন বলেন :

হে নির্ভীক দুঃখ অভিহত।
ওরে ভাই কার নিন্দা কর তুমি
মাথা কর নত ?
এ আমার এ তোমাব পাপ।
বিধাতার বক্ষে এই তাপ—
বহু যুগ হ'তে জমি বায়ুকোণে আজিকে ঘনায়।
ভীরুর ভীরুতাপুঞ্জ,
প্রবলের উদ্ধত অন্যায়,
লোভীর নিষ্ঠুর লোভ,
বঞ্চিতের নিত্য চিত্তক্ষোভ,
জাতি অভিমান
মানবের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার বহু অসম্মান
বিধাতার বক্ষ আজি বিদীরিয়া
ঝটিকার দীর্ঘশ্বাসে
জলস্থলে বেড়ায় ফিরিয়া।
ভাঙিয়া পড়ুক ঝড় জাগুক তুফান
নিঃশেষ হইয়া যাক

নিখিলের যত বজ্রবাণ
রাখ নিন্দাবাণী রাখ আপন সাধুত্ব অভিমান
শুধু একমনে হও পার
এ প্রলয় পারাবার
নূতন সৃষ্টির উপকূলে
নূতন বিজয়ধ্বজা তুলে ।।

তখন তার ক্রোধকম্পিত কণ্ঠে ধ্বংসের রুদ্রসংগীত বেজে ওঠে। এই রুষ্ট বলবান হৃদয়ের উচচারণ ভৈরবের করুণ আবেশ থেকে যেসব জায়গায় দীপকের বহ্নিতে জ্বলে উঠেছে তারই কয়েকটি উদাহরণ নীচে তুলে দিলাম :

১. অন্যদিকে তোমার জলহীন ফলহীন আতঙ্কপাণ্ডুর মরুক্ষেত্রে
পরিকীর্ণ পশুকঙ্কালের মধ্যে মরীচিকার প্রেতনৃত্য।
বৈশাখে দেখেছি বিদ্যুৎচঞ্চুবিদ্ধ দিগন্তকে ছিনিয়ে নিতে এল
কালো শ্যেনপাখীর মতো তোমার ঝড়—
সমস্ত আকাশটা ডেকে উঠল যেন কেশর ফোলা সিংহ ;
তার লেজের ঝাপটে ডালপালা আলুথালু করে
হতাশ বনস্পতি ধূলায় পড়ল উবুড় হয়ে ;
হাওয়ার মুখে ছুটল ভাঙা কুঁড়ের চাল
শিকল ছেঁড়া কয়েদী-ডাকাতের মতো।

[পৃথিবী : পত্রপুট]

[প্রকৃতির দুটি রূপকে পাশাপাশি দেখিয়েছেন কবি। একটি কোমল স্নিগ্ধতার, অপরটি হিংস্র অকরুণতার। একটি সৃষ্টি মহিমায় সমুজ্জ্বল, অপরটি ন্যুব্জ সৃষ্টির প্রাচীনতায় প্রলয় ক্ষিপ্ততায় ভয়ঙ্কর। এই দার্শনিক উপলব্ধিটি নজরুলের মধ্যে প্রথমাবধি অটল বিশ্বাসের মত ধ্রুব—সে কথা পূর্বে বলেছি।]

২. হায় ছায়াবৃতা,
কালো ঘোমটার নীচে
অপরিচিতি ছিল তোমার মানব রূপ
উপেক্ষার আবিল দৃষ্টিতে।

এল ওরা লোহার হাতকড়ি নিয়ে,
নখ যাদের তীক্ষ্ণ তোমার নেকড়ের চেয়ে,
এল মানুষ ধরার দল
গর্বে যারা অন্ধ তোমার সূর্যহারা অরণ্যের চেয়ে।
সভ্যের বর্বর লোভ
নগ্ন করল আপন নির্লজ্জ অমানুষতা।
তোমার ভাষাহীন ক্রন্দনে বাষ্পাকুল অরণ্যপথে
পঙ্কিল হল ধূলি তোমার রক্তে অশ্রুতে মিশে,
দস্যু-পায়েব কাঁটা-মারা জুতোর তলায়
বীভৎস কাদার পিণ্ড
চিরচিহ্ন দিয়ে গেল তোমার অপমানিত ইতিহাসে ॥

[সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এমন প্রচণ্ড ঘৃণার ভাষা রবীন্দ্র-সাহিত্যে দুর্লভ বললে অত্যুক্তি করা হয় না। এবং এখানে রবীন্দ্রনাথ বিপ্লবী হিসেবে চিহ্নিত না হ'লে তাব সমর্থক হিসেবে দাঁড়িয়ে আছেন। অন্যায়ের প্রতি চিরকাল রুষ্ট ঋষি-হৃদয় রবীন্দ্রনাথের পক্ষে তাই—আশীর্বাদের এমন ভাষা উচ্চারণ করা সম্ভব হয়েছিল ;

আয় চলে আয় রে ধূমকেতু
আঁধারে বাঁধ অগ্নিসেতু
দুর্দিনের এই দুর্গশিরে
উড়িয়ে দে তোর বিজয় কেতন
অলক্ষণের তিলক রেখা
রাতের ভালে হোক না লেখা
জাগিয়ে দে রে চমক মেরে
আছে যারা অর্ধ চেতন ॥]

বলা বাহুল্য যে ক্রোধ রবীন্দ্রনাথে ছিল অস্ফুট কোরক, নজরুলে তাই হ'ল প্রস্ফুটিত পুষ্প। রবীন্দ্রনাথে যে ভাব ফুঁসে উঠ্‌তে চাচ্ছিল, নজরুলে তাই ফেটে পড়ল। রবীন্দ্রনাথের ক্রোধ পূর্ব-ভায়োলেন্সের নজরুলের পূর্ণ ভায়োলেন্সের তথা সার্থক বিপ্লবের।

ভায়োলেন্সের ভায়োলিন্

নজরুলোত্তর যুগে ভায়োলেন্স অত তীব্রভাবে অমন খরতীক্ষ্ণতায়, অমন পাশবপ্রচণ্ডতায়, অমন নাগিনীহিংস্রতায় আর কোন কবির কাব্যে মূর্ত হয়ে ওঠেনি—যদিও বাঙলা-সাহিত্যে বিপ্লবী কবির জন্ম হয়েছে নজরুলের পরে। কিন্তু তুলনামূলক বিচারে দেখা যাবে নজরুলের আগুন ধারণ করবার মত সুবৃহৎ হৃদয়-চুল্লী তাঁদের ছিল না। ·এই অংশে আমরা সে কথাই বলব।

এই তুলনায় বিচার্য বিষয়গুলি হবে—১. কল্পশক্তি, কল্পনা প্রতিভা ২. চিত্রকল্প নির্মাণে শ্রেষ্ঠত্ব ৩. উপমা প্রয়োগের অপূর্বতা ৪. প্রতীক ব্যবহারের চতুরতা ৫. আবহ-সৃষ্টির দক্ষতা।

এখানে আমরা রাজনৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ এবং বিশেষ রাজনৈতিক দর্শনের আদর্শে বিশ্বাসী দু'জন বিপ্লবী কবির ভায়োলেন্স ধর্মীয় কবিতার সঙ্গে নজরুলের কবিতা পাশাপাশি রেখে তুলনামূলক আলোচনায় অবতীর্ণ হব। এই কবিদের একজন সুভাষ মুখোপাধ্যায় অন্যজন সুকান্ত ভট্টাচার্য। এদের দু'জনেই যে সত্যকার ভয়োলেন্স ধর্মীয় কবিতা লিখেছিলেন তার গুটিকয়েক প্রমাণ :

১. স্ট্রাইক। স্ট্রাইক। যেখানেই থাকি, ময়দানে হবো সকলে সামিল আজকে
স্ট্রাইক। স্ট্রাইক। একবার লাখো হাত এক হোক, দেখে নেব পশুরাজকে।
স্ট্রাইক। স্ট্রাইক। দোকানে কপাট, দপ্তরে চাবি, ট্রামবাসে চাকা বন্ধ
স্ট্রাইক। স্টাইক। বিজলীর চোখ গেলে দাও, করো চৌরঙ্গীকে অন্ধ।
স্ট্রাইক। স্ট্রাইক। ডাক-তার ভাই। টেলিফোন বোন, ভয় নেই, পাশে আমরা
স্ট্রাইক। স্ট্রাইক। দুঃশাসনের পাঁজর খসাবো, গা থেকে খুলবো চামড়া।
[উনত্রিশে জুলাই]

২. একা নই, আছে সঙ্গে পাথুরে পেশী হাজার
হাতে হাতে বাঁধা, চড়া গলা, পায়ে জোর কদম,
দু'চোখে সূর্য ক্রমেই প্রখর ; ভেঙেছে ভ্রম
শত্রুর টুঁটি ছিঁড়বে এবারে নখের ধার।

রুখবে কে আজ ? চলে বেপরোয়া ক্ষ্যাপা জোয়ার
হাতের মুঠোয় বজ্র, আমরা মিছিলে হাঁটি।

জমিজমা নেই, উপবাস পেশা, কেযার কার ?
অগ্নিগর্ভ ভাষা আমাদের গানের ঘাটি।

[স্ফুলিংগ]

৩. শতাব্দী লাঞ্ছিত আর্তের কান্না
প্রতি নিঃশ্বাসে আনে লজ্জা :
মৃত্যুর ভয়ে ভীরু বসে থাকা, আর না—
পরো পরো যুদ্ধের সজ্জা।
প্রিয, ফুল খেলবার দিন নয়, অদ্য
এসে গেছে ধ্বংসের বার্তা,
দুর্যোগে পথ হয হোক দুর্বোধ্য
চিনে নেবে যৌবন আত্মা ॥

[সে দিনের কবিতা]

৪. রক্তের ধার রক্তে শুধবো
কসম ভাই
ব্রেথওয়েটের গোয়ালিযরের
জবাব চাই।
লাখো লাখো হাত এক হলে বলো
পরোয়া কাকে ?
আমাদের দাবী কে রোখে, কে রোখে
লাল ঝাণ্ডাকে ?

[উজ্জীবন]

৫ দিন এসে গেছে ভাইরে
রক্তের দামে রক্তের ধার
শুধবার।
দিন এসে গেছে ভাই রে
বিদেশী রাজের প্রাণ-ভোমরাকে
নখে নখে টিপে মারবার।

[অগ্নিকোণ

সুভাষের রাজনৈতিক চেতনাসমৃদ্ধ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে লেখা ভিন্ন ভিন্ন কবিতার ভাষার মন্ত্রদীপ্ত বেশ কয়েকটি স্তবক দিলাম। এখানে ভাঙার মন্ত্র আছে সত্যি কিন্তু আবেগজ্বলন্ত ক্রোধ ঠিক নেই। তীব্রতা কিংবা প্রচণ্ডতা না থাকলে তাকে সঠিকভাবে ভায়োলেন্স বলা চলে না। এখানে নেই সেই অগ্নিগর্ভ শব্দ, সেই বজ্র-গর্ভ ভাষা। অধিকাংশ ক্ষেত্রে চটুল স্বরবৃত্ত ছন্দ ব্যবহার করাতে বক্তব্যের ধার ও ভার দুটোই হারিয়ে গেছে। বাগ্মিতার সিরিয়াসনেস হাল্কা কল্পনায় গেছে ভেসে। অবাক করে দেওয়ার মত তেমন কোন উপমা নেই, নেই কোন চিত্রকল্প। যা আছে তা যে-কোন সাধারণ কবির পক্ষে লেখা কঠিন নয়। 'বেপরোয়া ক্ষ্যাপা জোয়ার', 'হাতের মুঠোয় বজ্র', 'অগ্নিগর্ভ ভাষা', 'বজ্রমুঠি', 'বজ্রকন্ঠ', 'বজ্রদাঁতে', 'প্রাণ-ভোমরা' খুব সুপরিচিত ভাষা ও শব্দ নয় —কি ? তারপর 'বিজলীর চোখ গেলে দাও', 'বেত্রাহত অন্ধকার শিহরায় ভয়ে' এ-গুলো বিস্ময়কর উপমা, চিত্রকল্প কি ? আর এখানে কোথায় সেই নজরুলের উপমার নক্ষত্রখচিত আশ্চর্য আকাশ? কোথায় সেই পুরাণ প্রতীকে দুলে ওঠা ঝড়লন্ঠনের রঙধনু। কোথায় -মনি অকল্পনীয় উপমা চিত্রকল্প :

> ঝড়—ঝড়—ঝড় আমি-আমি ঝড়—
> ঝড় ঝড় ঝড়
> বজ্রবায়ু দন্তে দন্তে ঘর্ষি চলি ক্রোধে।
> ধূলিরক্ত বাহু মম বিন্ধ্যাচল সম রবি-রশ্মি-পথ রোধে।
> ঝঞ্ঝনা ঝাপটে মম
> ভীত কূর্ম সম
> সহসা সৃষ্টির খোলে নিয়তি লুকায়।

উপমা চিত্রকল্পের দুর্লভ সংমিশ্রণ আর তারই মধ্যে নিজের দার্শনিক উপলব্ধির তুলনাহীন বিমিশ্রণ সুধী পাঠককে বিমুগ্ধ করবে। 'ভীত কূর্ম সম সহসা সৃষ্টির খোলে নিয়তি লুকায়' যে কী অসাধারণ উপমা তথা চিত্রকল্প বাক্যটির বিশ্লেষণে তা অনুধাবন করা সম্ভব হবে। কচ্ছপ যেমন ভয় পেয়ে নিজের খোলসের মধ্যে শুঁড় গুটিয়ে নিয়ে আত্মগোপন করে তেমনি নিয়তি সৃষ্টির খোলসে আত্মগোপন করে। কার ভয়ে ?

ঝড়ের ভয়ে। ঝড় কি ? ঝড় বিপ্লব। এখানে নিয়তিবাদের উপর কর্ম-বাদের জয় ঘোষণা করা হচ্ছে। মৃত্যুর উপর জীবনের নিশান ওড়ান হচ্ছে। এখানে নিয়তি শুধু দৈব রূপে নয় মৃত্যু ও ধ্বংসের সমার্থক শব্দ রূপে ব্যবহৃত। অর্থাৎ কবি একসঙ্গে তিনটি অর্থকে আমাদের সামনে তুলে ধরলেন : ১. 'প্রলয়ের লাল ঝাণ্ডা' হাতে যে 'নবীন পরুষ পুরুষ' আসছে অর্থাৎ নব-যুগ চেতনায় উদ্বুদ্ধ যে যুবশক্তি আসছে সে 'কণ্টক-অশঙ্ক' 'ক্রন্দন-জয়ী' পুরুষ, যে ভাগ্যকে স্বীকার করে না। ২. 'জীবনানন্দ' পুরুষের কাছে 'মৃত্যু জীবনের শেষ নহে নহে /অনন্তকাল ধরি অনন্ত জীবন-প্রবাহ বহে।' তাই এই কবিতাটির একস্থানে কবি বলছেন—'আমি বলি, প্রাণানন্দে পিয়ে নে রে বীর, জীবন-রসনা দিয়া প্রাণ ভরে মৃত্যু-ঘন ক্ষীর।' ৩, 'ভেঙে আবার গড়তে জানে সে চির-সুন্দর'—তাঁর প্রত্যক্ষ লক্ষ্য ধ্বংস হলেও পরোক্ষ ইচ্ছা নতুন সৃষ্টির।

কল্পনার সূক্ষ্ম গভীরতার সঙ্গে এখানে মিশেছে কল্পনার শক্তি-বিশালতা। কচ্ছপের শক্ত খোলসটাকে সৃষ্টির গর্ভাধাররূপে কল্পনা করা নিশ্চয়ই সাধারণ ব্যাপার নয়।—আর এত শুধু উপমা নয় এ হচ্ছে গভীর জীবনবোধ।

এখানে সমস্ত কবিতাটির উদ্ধার প্রবন্ধের শরীর ভারী করে তুলবে বলে তার ব্যাখ্যার লোভ সম্বরণ করলাম। কিন্তু 'ঝড়ে'র হিংস্র ভীষণ যে রূপ 'ঝড়' কবিতাটিতে ফুটে উঠেছে একমাত্র মহাকবিদের কাব্যে তার কদাচিৎ দর্শন মিলবে। কয়েকটি পংক্তি উদ্ধার করলাম :

১. পশ্চাতে দুলিছে মোর অনন্ত আঁধার চির রাত্রি-যবনিকা।

২, ভীমা উগ্রচণ্ডা ফেলে উল্কারূপী অগ্নি-অশ্রু সহিতে না পারি' মম তাপ।

৩. আমি যেন সাপুড়িয়া, মারি মন্ত্র মার—
ঢেউ-এর মোচড়ে তাই মহাসিন্ধু মুখে
জল-নাগ নাগিনীরা আছাড়ি পিছাড়ি মরে ধুঁকে।

প্রথমটাতে ঝড়ের তাণ্ডবলীলায় যে ঘোর ধ্বংস দেখা দেয় গাঢ় গভীর অন্ধকারের

শেষহীন অন্ধকারের এবং কখনও প্রভাত-আলোয় মুছে যাবে না। এমন রাত্রির কালোর সংগে তার সাদৃশ্য রচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয়টিতে দেখানো হয়েছে এমন যে ধ্বংসকারী প্রকৃতির চণ্ড শক্তি সেও তার চেয়ে প্রবল শক্তিমান ঝড়ের তাপ সইতে না পেরে কাঁদতে শুরু করেছে, চোখ দিয়ে তার অশ্রু পড়ছে। কিন্তু সে পরাজয়ের অপমানের মধ্যে জ্বালা আছে বলে তার চোখ দিয়ে যে অশ্রু ঝরছে সে অশ্রু পানি নয়—অগ্নি এবং সেই ফোঁটা ফোঁটা অশ্রুঅগ্নির আকৃতি উল্কার মত। প্রথম উদ্ধৃতির পংক্তিতে পিছনে দুলতে থাকা কৃষ্ণকায় পর্দার ছবিটা যেমন অতুলনীয় তেমনি আকাশে ছুটে যাওয়া উল্কার ছবিটি অশ্রুর মধ্যে ধৃতির কল্পনাটি তুলনাহীন।

তৃতীয় চিত্রকল্পটি তথা উৎপ্রেক্ষাটি আরও রমণীয় মোহনীয় অদ্ভুত অপূর্ব। এখানে 'আমি' ঝড়, 'মহাসিন্ধু' সাপ এবং মহাসিন্ধুতরঙ্গ সমূহও যেন সর্পরূপে কল্পিত। তারি সংগে আবার সমুদ্রজলবাসী নাগ-নাগিনী একটি জটিল রূপকল্পের সৃষ্টি করেছে। চিত্রকল্পটির ব্যাখ্যা একটু ছড়িয়ে বর্ণনা করা যাক। সমুদ্র-জলে টাইফুন অথবা সাইক্লোনের কিংবা হারিকেনের সৃষ্টি হলে ঢেউগুলো যেন দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে আঘাতপ্রাপ্ত সাপের মত মোচড়াতে থাকে। মাতাল ঢেউগুলো ক্ষিপ্ত ঝড়ের আঘাতে পরস্পরের গায়ে আছড়ে পড়ে। কবির বর্ণনায় এখানে গোটা সমুদ্রটা একটা রাক্ষসমূর্তি ধারণ করেছে এবং সেই রাক্ষস গরুড়ের চঞ্চুধৃত নাগ-নাগিনীরা মৃত্যু যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করছে—ঐ নাগ-নাগিনীর মত ঢেউগুলো যেন বাঁচার প্রাণপণ চেষ্টায় আছাড় খাচ্ছে। সাপুড়ের শক্তিশালী মন্ত্রের আঘাতে মুমূর্ষু সাপ যেমন মৃত্যুর কবল থেকে সমস্ত শক্তি দিয়ে বাঁচবার চেষ্টা করে ঢেউগুলো তেমনি 'আছাড়ি পিছাড়ি' খায়।

চিত্রকল্পটির এই জটিলতার কারণ এর পশ্চাৎপটে আছে একটি পৌরাণিক উপাখ্যানের অস্পষ্ট ইঙ্গিত। মহাভারতের আদিপর্বে জন্মেজয়ের সর্পযজ্ঞটি এর কিছু ভূমি দিয়েছে। এখানে বলা অসঙ্গত হবে না যে সমুদ্রমন্থনে দেবতারা বাসুকীকে দড়িরূপে ব্যবহার করেছিলেন। যে জন্য এ কবিতার একস্থানে আছে 'বাসুকী মন্দার সম মন্থনে মন্থনে মম সিন্ধুতট ভরে ফেনা থুকে।' এখানে এ ঘটনাটির সমাপ্তি টেনে আমরা পূর্ব কথায় ফিরে যাচ্ছি।

মৃগয়ায় গিয়ে হরিণের পশ্চাদ্ধাবনকারী তৃষ্ণার্ত রাজা, পরীক্ষিত মৌনব্রতধারী এক ঋষির কাছে পানীয় প্রার্থনা করে ব্যর্থ হলে ক্রোধান্ধ রাজা ধ্যানস্থ ঋষির কণ্ঠে একটি মৃত সাপ জড়িয়ে দেন। ব্রাহ্মণপুত্র শৃঙ্গীবাম জনকের এ-হেন অপমানে রাজাকে 'তক্ষকে দংশিবে' বলে অভিশাপ দেন। ফলে তক্ষক কর্তৃক পরীক্ষিত দংশিত হন ও মৃত্যুবরণ করেন। পরীক্ষিতের পুত্র জন্মেজয় পিতার মন্ত্রিগণের কাছে তাঁর এই দুঃখজনক মৃত্যুর কথা শুনে সর্পকুল ধ্বংস করার প্রতিজ্ঞা করেন এবং সেই জন্যে সর্পধ্বংস যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। এই যজ্ঞে 'বিপ্রগণ বেদমন্ত্রে অনল জ্বালিল। / লইয়া নাগের নাম যজ্ঞাহুতি দিল।" এবং—

পর্বত প্রমাণ অগ্নি দেখি লাগে ভয়।
মন্ত্রবলে আসি কুণ্ডে পড়ি ভস্ম হয়॥
আকাশে থাকিয়া যেন মেঘে বৃষ্টি করে।
বৃষ্টিধারাবৎ পড়ে অগ্নির উপরে॥
হাহাকার শব্দ হইল নগরে নগরে।
প্রলয় সমুদ্র শব্দে কান্দে উচ্চৈঃস্বরে।
আপন ইচ্ছায় উঠে আকাশ উপরে।
নানাবর্ণ নাগ পড়ে কুণ্ডের ভিতরে॥

*　　*　　*

মস্তকে লাঙ্গুল ফিরে জিহবা লড়বড়ি।
কাতর হইয়া কেহ যায় গড়াগড়ি॥

এই আখ্যায়িকার পটভূমিতে নজরুলের চিত্রকল্পটি অবশ্যই সুস্পষ্ট হবে। নজরুলের 'মন্ত্রনার' শব্দটি "বিপ্রগণের বেদমন্ত্র" থেকে এসেছে। অর্থটিকে আরও সুস্পষ্ট করলে দেখানো যায় "ঝড়" কবিতার দ্বিতীয় স্তরে মহাভারতের "জন্মেজয়ের সর্পযজ্ঞ' কাহিনীটি কি ভাবে প্রতীক হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে :

নাহি জানি কোন্ ফণি-মনসার হলাহল লোকে
কোন বিষ-দীপ জ্বালা সবুজ আলোকে
নাগ-মাতা কদ্রু-গর্ভে জন্মেছি সহস্র ফণা নাগ,
ভীষণ তক্ষক শিশু। কোথা হয় নাগ-নাশীজন্মেজয়-যাগ—

উচচারিছে আকর্ষণ-মন্ত্র কোন্ গুণী
জন্মান্তর-পার হ'তে ছুটে চলি আমি সেই মৃত্যু-ডাক শুনি।
মন্ত্র-তেজে পাংশু হয়ে ওঠে মোর হিংসা-বিষ-ক্রোধ-কৃষ্ণ প্রাণ,
আমার তুরীয় গতি—সে যে ঐ অনাদ-উদয হ'তে
হিংসা-সর্প-যজ্ঞ-মন্ত্র-টান।
ছুটে চলি অনন্ত তরুক ঝড়—
শন্—শন্—শনশন শন্—
সহসা কে তুমি এলে হে মর্ত্ত্য-ইন্দ্রানী মাতা,
তব ঐ ধূলি-আস্তবণ
বিছায়ে আমার তরে জাতকেব জন্মান্তব হতে?
লুকানু ও অঞ্চল-আড়ালে, দাঁড়ালে আড়াল হয়ে মোব মৃত্যু-পথে।
ব্যর্থ হল অঞ্চল-আড়াল; বহ্নি আকর্ষণ
মন্ত্র-তেজে ব্যাকুল ভীষণ
রক্তে রক্তে বাজে মোর—শনশন শন।
শন্—শন্—ঐ শুন দূর।
দূরান্তর হতে মাগো ডাকে মোরে অগ্নি-ঋষি বিষ-হবি সুব।

এই 'সর্প-যজ্ঞ-মন্ত্র'-এব কথা এই জন্যে বিশ্বাস কবতে হয যে বিজ্ঞান-বিশ্বাসে ঐ চিত্রকল্পটি অর্থহীন হযে দাঁড়ায। এই উপাখ্যানই যে এই চিত্রকল্পের পটভূমি তার আরও কারণ এ-দেশীয ওঝা সম্প্রদায় সাধারণ বিশ্বাস হিসাবে মন্ত্রবলে সাপকে এনে সর্পদষ্ট মানুষেব শরীর থেকে বিষ চোষায়। কিন্তু মন্ত্রের সাহায্যে সাপকে মাবে না। যদিও এমন গ্রাম্য বিশ্বাস আছে আপনার উদ্গীবিত বিষ আপনি শোষণ করে সাপ মৃত্যু বরণ করে। সুতরাং বিশ্বাস করতেই হয এবং সেটাই সঠিক ব্যাখ্যা "অগ্নি ঋষি বিষ হরি সুর" সেই সাপুড়ীয়া, আর ঐ 'মন্ত্র মার' তারই 'মন্ত্র-তেজ'।

যা হোক নজরুলের ভায়োলেন্সেব স্বরূপ প্রকাশক এইসব চিত্রাবলীর আলোচনায় ফিরে আসার পূর্বে এখানে সুকান্তের কাব্যেব কযেকটি অংশ তুলে তার আত্মা ও শরীরেব স্বরূপ বিশ্লেষণ করা যাক:

১. বন্ধু, তোমার ছাড়ো উদ্বেগ, সুতীক্ষ্ণ কর চিত্ত,
বাংলার মাটি দুর্জয় ঘাঁটি বুঝে নিক দুর্বৃত্ত।

মূঢ় শত্রুকে হানো স্রোত রুখে, তন্দ্রাকে কর ছিন্ন,
একাগ্র দেশে শত্রুরা এসে হয়ে যাক নিশ্চিহ্ন।
[উদ্যোগ : পূর্বাভাস]

২. দূর পূর্বাকাশে,
বিহ্বল বিষাণ উঠে বেজে
মরণের শিরায় শিরায়।
মুমূর্ষ বিবর্ণ যত রক্তহীন প্রাণ
বিস্ফারিত হিংস্র বেদনায়।
অসংখ্য স্পন্দনে চলে মৃত্যু অভিযান
লৌহের দুয়ারে পড়ে কুটিল আঘাত,
উত্তপ্ত মাটিতে ঝরে বর্ণহীন শোণিত প্রপাত।
সুপ্তোত্থিত পিরামিড দুঃসহ জ্বালায়
পৈশাচিক ক্রূর হাসি হেসে
বিস্তীর্ণ অরণ্য মাঝে কুঠার চালায়।
কালো মৃত্যু ফিরে যায় এসে।
[পূর্বাভাস : পূর্বাভাস]

৩. রোমের বিপ্লবী হৃৎস্পন্দনে ধ্বনিত
মুক্তির সশস্ত্র ফৌজ আসে অগণিত
দু'চোখে সংহার-স্বপ্ন, বুকে তীব্র ঘৃণা,
শত্রুকে বিধ্বস্ত করা যেতে পারে কিনা
রাইফেলে মুখে এই সংক্ষিপ্ত জিজ্ঞাসা।
যদিও উদ্বেগ মনে, তবু দীপ্ত আশা
পথে পথে জনতার রক্তাক্ত উত্থান,
বিস্ফোরণে বিস্ফোরণে ডেকে ওঠে বান।
[রোম : ১৯৩৩]

৪. উঠুক তুফান মাটিতে পাহাড়ে
জ্বলুক আগুন গরীবের হাড়ে
কোটি করাঘাত পৌঁছোক দ্বারে
ভীরুরা যাক।

খ্যাতির মুখেতে পদাঘাত করি,
গড়ি, আমরা যে বিদ্রোহ গড়ি,
ছিঁড়ি দুহাতের শৃঙ্খল দড়ি,
মৃত্যুপণ।

৫. দৃঢ় সত্যের দিতে হবে খাঁটি দাম,
হে স্বদেশ, ফের সেই কথা জানলাম।
জানে নাতো কেউ পৃথিবী উঠছে কেঁপে
ধরেছে মিথ্যা সত্যের টুঁটি চেপে,
কখনো কেউ কি ভূমিকম্পের আগে
হাতে শাঁখ নেয়, হঠাৎ সবাই জাগে?
যারা আজ এত মিথ্যার দায়ভাগী,
আজকে তাদের ঘৃণার কামান দাগি।
[বিক্ষোভ : ঘুম নেই]

৬. আজ আর বিমূঢ় আস্ফালন নয়,
দিগন্তে প্রত্যাসন্ন সর্বনাশের ঝড়;
আজকের নৈঃশব্দ হোক যুদ্ধারম্ভের স্বীকৃতি।
দু' হাতে বাজাও প্রতিশোধের উন্মত্ত দামামা,
প্রার্থনা করো :
হে জীবন, হে যুগ-সন্ধিক্ষণের চেতনা—
আজকে শক্তি দাও, যুগ যুগ বাঞ্ছিত দুর্দমনীয় শক্তি,
প্রাণে আর মনে দাও শীতের শেষের
তুষার গলানো উত্তাপ।
টুকরো টুকরো ক'রে ছেঁড়ো তোমার
অন্যায় আর ভীরুতার কলঙ্কিত কাহিনী।
শোষক আর শাসকের নিষ্ঠুর একতার বিরুদ্ধে
একত্রিত হোক আমাদের সংহতি।
তা যদি না হয়, মাথার উপরে ভয়ংকর
বিপদ নামুক, ঝড়ে বন্যায় ভাঙুক ঘর;
[বোধন : ছাড়পত্র]

একটু বেশী করে উদ্ধৃতি দিলাম। সেই সব স্থানগুলো বেছে নেওয়া হ'ল যেখানে আবেগ-ক্রুদ্ধ সুকান্ত উদ্যতমুষ্টি সৈনিক—রণক্ষেত্রের মাঝখানের সৈনিক। সুকান্ত প্রতীকের জন্যে কদাচিৎ পুরাণের সিন্দুকে হাত দিয়েছেন। কোথাও শিব ও কালীকে, অথবা কোনো কালাপাহাড়কে তাঁর কাব্যে দেখা যায় না। রাম-রাবণ-বিভীষণ, অহল্যা এমনি সামান্য কয়টি নাম তাঁর কবিতায় বিরল ব্যবহৃত হ'লেও তাদের ধ্বংসের প্রতীকে তিনি ব্যবহার করেননি। তাঁর কাব্যে এসেছে বিদ্রোহের প্রতীক হিসেবে রোমের বিপ্লবী দাস জাগরণের ইতিহাস, এসেছে আধুনিক বিশ্ব-ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ বিপ্লবের ইতিহাস এবং এসেছেন লেনিনেব মত ইতিহাসপুরুষ। নজরুলের মত তিনি বলেননি—'আমি শনি, আমি ধূমকেতু জ্বালা বিষধর কালফণী/আমি ছিন্নমস্তা চণ্ডী আমি রণদা সর্বনাশী!' বলেছেন 'বিপ্লব স্পন্দিত বুকে, মনে হয় আমিই লেনিন।' লেনিন বিপ্লবী হ'লেও তিনি সৃষ্টির প্রতীক, ধ্বংসের নন; স্বাভাবিকভাবে তাই এসব কবিতায় ধ্বংসের রূপ ফোটে না। অর্থাৎ শব্দচিত্রকল্পে, বাক্যবাক প্রতিমায় এবং ধ্বনিপ্রতিমায় নজরুলের কাব্যে উদগত ধ্বংসরূপ এদের কাব্যে সৃষ্টি হয়নি।

সুকান্ত পুরাণ-প্রতীক গ্রহণ না করে প্রাত্যহিক জীবনের অঙ্গন থেকে প্রতীকের রসদ সংগ্রহ করেছেন। তাঁর 'দেশলাইয়ের কাঠি' 'সিগারেট' এমনি দুটি কবিতা কবির অমনঃপুত সমাজ ব্যবস্থাকে, শোষক-সমাজকে ধ্বংস করার প্রতীক।

এই সব কবিতা, কবিতা-স্তবক তাদের গর্ভে সংগ্রামের বাণী বহন করলেও বিস্ফোরক ভাষা ও শব্দের, ছন্দ ও রূপের, আবেগ ও চিত্রকল্পে ঠিক ধ্বংসের বিভীষিকার মত ভয়ঙ্কর রূপ পরিগ্রহ করেনি। সুকান্ত যখন সতেজে বলেন :

তা যদি না হয় মাথার উপরে ভয়ঙ্কর
বিপদ নামুক ঝড়ে বন্যায় ভাঙুক ঘর।

তখন তা এমনকি রবীন্দ্রনাথের ক্রুদ্ধ কন্ঠকে :

ভাঙিয়া পড়ুক ঝড় জাগুক তুফান
নিঃশেষ হইয়া যাক
নিখিলের যত বজ্রবান

ছাপিয়ে উঠতে পারে না। (লক্ষ্যণীয় সুকান্তের উপর্যুক্ত বাণীচিত্রটি হুবহু রবীন্দ্রনাথের কপি।) সুতরাং এতে অসাধারণ নতুনত্ব নেই। যাদুকরের জামেয়ারের পকেট থেকে অবিরাম বেরিয়ে আসা পাখীর মত নজরুলের উপমা-চিত্রকল্প সুভাষ ও সুকান্তে একান্ত দুর্লভ।

নজরুলের কল্পনার জগৎ; ত্রি-ভুবন অর্থাৎ স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড অর্থাৎ আকাশ জগৎ, গ্রহ-উপগ্রহ, সূর্য-নক্ষত্রের জগৎ, হিন্দু-পুরাণ ও মুসলিম-পুরাণ, বিশ্ব-ইতিহাস, মুসলিম ইতিহাসের জগৎ, হিন্দু, মুসলিম ও খৃষ্টান ধর্মের জগৎ, বাঙলার বিস্মৃত পুঁথি ও লোক-সাহিত্যের জগৎ, বৈষ্ণব-কাব্য জগৎ, প্রাণী জগৎ ও জড় জগৎ, জল জগৎ ও স্থল জগৎ ত্রি-কালদর্শী ঋষির চোখের মত তাঁর কল্পনার দর্পণে ধরা পড়ে ত্রিভুবন নিমেষে। 'বিদ্রোহী' কবিতার একটি স্তবক আমার কথা সপ্রমাণ করবে:

আমি উত্থান আমি পতন
আমি অচেতন চিতে চেতন
আমি বিশ্বতোরণে বৈজয়ন্তী মানববিজয়কেতন।
ছুটি ঝড়ের মতন করতালি দিয়া
স্বর্গ-মর্ত্য করতলে,
তাজি বোররাক্ আর উচ্চৈঃশ্রবা বাহন আমার
হিম্মত হ্রেষা হেঁকে চলে।
আমি বসুধাবক্ষে আগ্নেয়াদ্রি, বাড়ববহ্নি, কালানল,
আমি পাতালে মাতাল অগ্নি-পাথার কলরোল-কল-কোলাহল।
আমি তড়িতে চড়িয়া উড়ে চলি জোর তুড়ি দিয়া, দিয়া লম্ফ,
আমি ত্রাস সঞ্চারি ভুবনে সহসা সঞ্চারি ভূমিকম্প।
ধরি বাসুকির ফণা জাপটি—
ধরি স্বর্গীয় দূত জিব্রাইলের আগুনের পাখা সাপটি।'
আমি দেব শিশু, আমি চঞ্চল,
আমি ধৃষ্ট, আমি দাঁত দিয়া ছিঁড়ি বিশ্বমায়ের অঞ্চল।

আমার মন্তব্যের সারবত্তা এই স্তবকটি বিশ্লেষণ করলে বোঝা যাবে। এখানে আছে মুসলিম পুরাণের 'বোররাক' ও স্বর্গীয় দূত 'জিব্রাইল', হিন্দু-পরাণের 'উচ্চৈঃশ্রবা,' 'বাসুকী', এখানে আছে 'স্বর্গ' 'মর্ত্য' 'পাতাল'

(স্বর্গ-মর্ত্য করতলে', 'আমি পাতালে মাতাল') অর্থাৎ ত্রিভুবন। এর কোন একটি ছবি ক্ষুদ্র আধারে ধরার মত নয়, কোন একটি ছবি ক্ষুদ্র ক্যানভাসে মানায় না। এখানে নরত্ব আরোপিত বিদ্রোহীর দৈহিক আকৃতিও মহাকাব্যের দানবতুল্য। একবার কল্পনা করুন স্বর্গ ও মর্ত্যের মত দুটি বিশ্বকে দু'হাতে নিয়ে উল্লাসে হাততালি দিতে দিতে ঝড়ের মত যে ছুটছে সে কি মহাভারতের 'ঘটোৎকচ' কিংবা রামায়ণের 'সুগ্রীব' অপেক্ষাও বলশালী নয়! নজরুলের এই কল্পনাশক্তিই নজরুল-কাব্যের প্রাণ-শক্তি; নজরুলের এই কল্পনা-শক্তিই নজরুল-কাব্যে গতিশক্তি। বীণার তার টান খেতে খেতে যে পরম চড়ায় উত্তীর্ণ হয় সেখানে থেকেই এর সুর স্ফুরিত। তাই এ এত ঝাঁঝালো, এত তীব্র, এত প্রচণ্ড!

রুবাইয়াত-ই-ওমর খৈয়ামের অনুবাদক নজরুল

'রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজে'র মুখবন্ধে নজরুল যেমন বলেছেন যে ১৯১৭ সালে বাঙালী পল্টনে একজন পাঞ্জাবী মৌলবীর মারফৎ হাফিজের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়, ওমরেব উপর লিখিত তাঁর নিবন্ধটিতে তিনি তেমন জানাননি ওমরেব সঙ্গে তাঁর কখন পরিচয় হয়েছিল। নজরুলের উপর লিখিত এ-পর্যন্ত কোনো গ্রন্থে ঐ তথ্যটি আজও অনুদ্ঘাটিত রয়ে গেছে। মুজফফর আহমদ তাঁর "কাজী নজরুল ইসলাম: স্মৃতিকথা" গ্রন্থে বলেছেন "নজরুল হয়তো কবি শ্রী কান্তিচন্দ্র ঘোষেব দ্বারাই প্রভাবিত হয়েছিল। তাঁর ওমর খৈয়ামের রুবাইয়াৎ নজরুলেব ফৌজ হতে ফেরার আগেই ছাপা হয়েছিল।" এখানে অবশ্য বাঙলা ভাষায় "সাকী" শব্দের ব্যবহারিক তাৎপর্য নিয়ে "সাকী"কে যে কান্তিচন্দ্র সুন্দরী নারী অর্থে ব্যবহার করেছিলেন এবং ঐ ব্যবহারের দ্বারা নজরুল প্রভাবিত হয়েছিলেন সেই ইঙ্গিত করা হয়েছে—কান্তিচন্দ্রের "রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়ামে"র অনুবাদের দ্বারা নজরুল ওমব খৈয়ামের রুবাইয়াত অনুবাদ করতে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন,—সে ইঙ্গিত নয়।

নজরুল ফিট্‌জিরাল্ডের ইংরেজী অনুবাদ পড়েও প্রোৎসাহিত হয়েছিলেন বলে মনে হয় না। বরং নজরুলের "ওমবের কাব্য ও দর্শন" * পড়ে বোঝা যায় যে ফিট্‌জিরাল্ডের ওমরের অনুবাদকে নজরুল সমালোচকের দৃষ্টিতে দেখছেন। এইসব বাক্যগুলো অন্ততঃ সেই ধারণাকে প্রবল করে:

১. ওমরকে তাঁর কাব্য পড়ে যাঁরা Epicurean বলে অভিহিত করেন, তাঁরা পূর্ণ সত্য বলেন না।—ওমরকে Epicurean বলা যায় শুধু তাঁর 'কুফরিয়া' শ্রেণীর কবিতার জন্য।

২. ফিট্‌জিরাল্ডের মুখে ঝাল খেয়ে অনেকেই বলে থাকেন, ওমর যে শারাবের কথা বলেছেন তা দ্রাক্ষারস, তাঁর সাকীও রক্ত-মাংসের। ফিট্‌জিরাল্ড

---

* নজরুল-রচনা সম্ভার; ২য় সংস্করণ: সম্পাদনা: আবদুল কাদির।

তাঁর মতের পরিপোষকতার জন্য কোনো প্রমাণ দেননি। তাঁর মতে মত দিয়েছেন যাঁরা, তাঁরাও কোনো প্রমাণ দিতে পারেননি। ফিট্‌জিরাল্ডের সঙ্গে কিংবা ফিট্‌জিরাল্ড-অনুসারীদের সঙ্গে নিজের দৃষ্টি-ভঙ্গির পার্থক্য দেখাতে গিয়ে নজরুল ওমররের কাব্যকে ছয় ভাগে ভাগ করেছেন। ভাগগুলি এই :

১. 'শিকায়াত-ই-রোজগার', অর্থাৎ গ্রহের ফের বা অদৃষ্টের প্রতি অনুযোগ।
২. 'হজও', অর্থাৎ ভণ্ডদের, বকধার্মিকদের প্রতি শ্লেষ-বিদ্রূপ ও তথাকথিত আলেম বা জ্ঞানীদেব দাম্ভিকতা ও মূর্খদের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ।
৩. 'ফিরাফিয়া' ও 'ওসালিয়া', বা প্রিয়ার বিরহে ও মিলনে লিখিত কবিতা।
৪. 'বাহরিয়া',--বসন্ত, ফুল, বাগান, ফল, পাখী ইত্যাদির প্রশংসায় লিখিত কবিতা।
৫. 'কুফরিয়া',—ধর্মশাস্ত্র-বিরুদ্ধ কবিতাসমূহ। এইগুলি ওমরের শ্রেষ্ঠ কবিতারূপে কবি-সমাজে আদৃত। স্বর্গ-নরকের অলীক কল্পনা, বাহ্যিক উপাসনাব অসারতা, পাপ-পুণ্যের মিথ্যা ভয ও লাভ ইত্যাদি নিয়ে লিখিত কবিতাগুলি এর অন্তর্গত।
৬. 'মুনাজাত'—বা খোদার কাছে প্রার্থনা। এ-প্রার্থনা অবশ্য সাধারণের মত প্রার্থনা নয়, সুফীর প্রার্থনার মত এ হাস্যজড়িত। *

নজরুল অনূদিত "রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম" দেখলেই ওই সুস্পষ্ট-ভাগগুলি লক্ষ্য করা যাবে। বিশেষ করে 'মুনাজাত'-এর অংশটি নজরুল, শহীদুল্লাহ্ ও নরেন দেবের অনুবাদেই দেখা যায়। ফিট্‌জিরাল্ডের সঙ্গে নজরুলের পার্থক্য মাত্র একটি ব্যাপারে তা'হল ওমরকে তিনি নাস্তিক বলেত মেনে নিতে পারেনই নি উপরন্তু ওমরকে একজন মুসলমান সুফী হিসেবে ধরে নিয়েছেন। সে-জন্যেই সম্ভবত মুসলমানের নবী হজরত মুহম্মদের উপর লিখিত ওমরের চারটি 'রুবাই'ও নজরুলকে অনুবাদ করতে দেখি। এর তৃতীয় 'রুবাই'তে দেখা যায় হজরত মুহম্মদকে ওমর সালাম পৌঁছে দিতে বলছেন। খুব সহজেই অনুমেয় ধর্মের প্রতি বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা

* নরেন্দ্র দেব ওমরের কবিতাকে পাঁচ ভাগে ভাগ করেছেন: অভিযোগ, বিদ্রূপ, প্রেম, সৌন্দর্য ও নর্ম।

না থাকলে তার প্রবর্তকের প্রতিও শ্রদ্ধা থাকার কথা নয়। এখানে উক্ত 'রুবাই' চারটির অনুবাদ উদ্ধার করা যেতে পারে :

১. স্বর্গে পাব শরাব-সুধা এ যে কড়ার খোদ খোদার
ধরায় তাহা পান করলে পাপ হয় এ কোন বিচার ?
'হামজা' সাথে বেয়াদবি করল মাতাল এক আরব—
তুচ্ছ কারণ—শরাব হারাম তাই হুকুমে মোস্তফার। (৫৩ নং রুবাই)

২. "রজব শাবান পবিত্র মাস" বলে গোঁড়া মুসলমান,
"সাবধান, এই দু'মাস ভাই কেউ করো না শরাব পান।"
খোদা এবং তাঁর রসুলের 'রজব' 'শাবান' এই দু'মাস
পান-পিয়াসীর তরে তবে সৃষ্ট বুঝি এ 'রমজান'। (৫৪ নং রুবাই)

৩. পৌঁছে দিও হজরতেরে খৈয়ামের হাজার সালাম,
শ্রদ্ধাভরে জিজ্ঞাসিও তাঁরে লয়ে আমার নাম—
"বাদশানবী! কাঁজি খেতে নাই ত নিষেধ শরিয়তে,
কি দোষ করল আঙুর-পানি ? করলে কেন তায় হারাম ?"
(১৯৬ নং রুবাই [1])

রসুলের কাছ থেকে প্রত্যাশিত জবাবটি ওমরের ভাষায় এমনি :

৪. তত্ত্বগুরু খৈয়ামেরে পৌঁছে দিও মোর আশিস্—
ওর মত লোক বুঝল কি না উল্টো করে মোর হদিস।
কোথায় আমি বলেছি যে, সবার তরেই মদ হারাম ?
জ্ঞানীর তরে অমৃত এ, বোকার তরে উহাই বিষ। (১৯৭ নং রুসাই [2])

মূল রুবাইতে নবীকে হাশেম বংশের শ্রেষ্ঠ মানুষ বলা হয়েছে। নজরুল তাঁকে বাদশানবী করেছেন। এতে হজরতের প্রতি ওমরের গভীর শ্রদ্ধার ভাবটি বিনষ্ট হয়নি।

1 মূল রুবাইটি হল : আজ্ মন-ই-বব মুস্তফা রিসানেদ সালাম
ও আঁগাহ্-ই বগোয়েদ বা ইজাজ্ তামাম
কায় সইয়েদে হাশমী চেরা দওগ্-ই-তুরশ্
দর শরা' হালাল অস্ত ও ময়-নাব-ই হারাম

2 মূল রুবাইটি হল : আজ মন-ই বর খইয়াম-ই রেস্ নিদ সালাম
ও আঁগাহ্-ই বগোয়েদ কি খামি-ই খইয়াম
মন কয় গুফতম্ ময় হারাম অস্ত ওয়ালে'
বর পোখতা হালাল অস্ত ও বর খাম-ই হারাম

সুতরাং কান্তিচন্দ্র ত ননই এমনকি ফিট্‌জিরাল্ডও যে নজরুলকে আদৌ অনুপ্রাণিত করেছিলেন এমন মনে হয় না। ফিট্‌জিরাল্ড ওমরকে পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখেছেন, নজরুল ওমরকে দেখেছেন প্রাচ্যের দৃষ্টিভঙ্গিতে। তাঁর অনুবাদও ঠিক তেমনি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিকে অনুসরণ করেই পৃথক কাব্যরূপ লাভ করেছে।

কোনো ইংরেজী অনুবাদ থেকে নয় মূল ফারসী থেকেই তিনি ওমরের রুবাইয়াত অনুবাদ করেছিলেন যে সে-কথা তাঁর প্রবন্ধেই আছে:

> আমি ওমরের রুবাইয়াৎ বলে প্রচলিত প্রায় এক হাজার রুবাই থেকেই কিঞ্চিদধিক দু'শ রুবাই বেছে নিয়েছি; এবং তা ফার্সী ভাষার রুবাইয়াৎ থেকে।

বাঙলা ভাষায় আর যাঁরা "রুবাইয়াত-ই-ওমর খৈয়াম" অনুবাদ করেছেন তাঁদের প্রায় সবাই মূলতঃ ফিট্‌জিরাল্ড থেকেই অনুবাদ করেছেন—একমাত্র শহীদুল্লাহ্ ও নরেন দেব ছাড়া এবং লক্ষ্য করা যায় উপরে উদ্ধৃত ৩ ও ৪নং রুবাই দুটি শহীদুল্লাহ্ তাঁর অনূদিত "রুবাইয়াত-ই-উমর খৈয়াম"-এর ভূমিকায় উদ্ধৃত করেছেন। সুতরাং নজরুল ও শহীদুল্লাহ্ ছাড়া অন্য অনুবাদকদের দৃষ্টিভঙ্গিও প্রায় ফিট্‌জিরাল্ডেরই অনুসরণ করেছে। দেখা যায় এই দলের অনুবাদকদেরও নজরুল সামান্য শ্লেষের ভাষায় আক্রমণ করেছেন। তিনি বলেছেন:

> ওমর খৈয়ামের ভাবে অনুপ্রাণিত ফিট্‌জিরাল্ডের কবিতার যাঁরা অনুবাদ করেছেন, তাঁরা সকলেই আমার চেয়ে শক্তিশালী ও বড় কবি। কাজেই তাঁদের মতো মিষ্টি শোনাবে না হয়ত আমার এ অনুবাদ।

এই কথায় ঠিক বিনয় ফুটে ওঠেনি, প্রকাশ পেয়েছে কৌতুক। কান্তিচন্দ্র ঘোষ কিংবা নরেন্দ্র দেব—যাঁরা বাঙলা ভাষায় ওমর খৈয়ামের বিখ্যাত অনুবাদক তাঁরা কেউ নজরুল ইসলামের মত শক্তিমান কবি নন। ওদিকে "তাঁদের মতো মিষ্টি শোনাবে না হয়ত আমার এ অনুবাদ।" এই বাক্যের মধ্যে আছে প্রকৃত কাব্য-সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ এবং অশিক্ষিত পাঠকদের সাধারণ ভালো লাগার প্রতি পরিহাসময় শ্লেষ। ছন্দের মিষ্টতা দিয়ে প্রকৃত কাব্যের মহিমা সব সময় বিচার করা যায় না। মূল ফারসীতে লেখা ওমরের যে স্টাইল সেটাও একটা বিচার্য বিষয়—নজরুল খুব সতর্কতার সঙ্গে সে

দিকটায় চোখ রেখেছিলেন যে সে যেমন তাঁর "রুবাইয়াত-ই-ওমর খৈয়াম" পড়ে বোঝা যায়, তেমনি তাঁর নিজের ভাষণেও আমরা লক্ষ্য করি। নজরুল ১৯৭টি রুবাই অনুবাদ করেছেন। প্রায় হাজার খানেক রুবাইয়ের মধ্যে এই ১৯৭টি রুবাই বেছে নেওয়ার কারণ হিসেবে তিনি বলেছেন

> আমার বিবেচনায় এইগুলি ছাড়া বাকী রুবাই ওমরের প্রকাশ ভঙ্গি বা বা স্টাইলের সঙ্গে একেবারে মিল খায় না। বাকীগুলিতে ওমর খৈয়ামের ভাব নেই, ভাষা নেই, গতি ঋজুতা—এক কথায় স্টাইলের কোনো কিছু নেই। *

অনুবাদের সময় এই ওমরী স্টাইল বা ভঙ্গীর দিকে নজরুল বিশেষ খেয়াল রেখেছিলেন। তিনি বলেছেন:

> আমি আমার ওস্তাদী দেখাবার জন্য ওমর খৈয়ামের ভাব ভাষা বা স্টাইলকে বিকৃত করিনি—অবশ্য আমার সাধ্যমত। এর জন্য আমার অজস্র পরিশ্রম করতে হয়েছে। কাগজ পেন্সিলের, যাকে বলে আদ্য শ্রাদ্ধ, তাই করে ছেড়েছি। ওমরের রুবাইয়াতের সবচেয়ে বড় জিনিস ওর প্রকাশের ভঙ্গী বা ঢং। ওমর আগাগোড়া মাতালের "পোজ্" নিয়ে তাঁর রুবাইয়াত লিখে গেছেন—মাতালের মতোই ভাষা, ভাব, ভঙ্গী, শ্লেষ, রসিকতা, হাসি, কান্না—সব। আমি আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি—ওমরের সেই ঢঙ্টির মর্যাদা রাখতে, তাঁর প্রকাশভঙ্গীকে যতটা পারি কায়দায় আনতে।

বিশেষভাবে ফারসীতে দখল না থাকলে নজরুল এই ধরনের কথা বলতে পারেন না। ওমরীয় এই ভঙ্গীকে ফিট্জিরাল্ড অবশ্য অনুসরণ করার চেষ্টা করেছিলেন এবং এ. জে. আরবেরি দেখিয়েছেন:

---

* মুহম্মদ শহীদুল্লাহ তাঁর 'রুবাইয়াৎ-ই-উমর খয়্যাম'-এর মুখবন্ধে বলেছেন: এ-পর্যন্ত ২২৫০টি রুবাইয়ের মধ্যে স্বামী গোবিন্দতীর্থের মতে ৭৫৬টি, খ্রীস্টেনসেনের মতে ১২১টি এবং ডক্টর জি. এইচ. রোজপিনের মতে ৭০৪টি খাঁটি।

যা হোক ওমরের রুবাই মুহম্মদ শহীদুল্লাহ অনুবাদ করেছেন ১৫১টি, ফিটজিরাল্ড ১১০টি, কান্তিচন্দ্র ৭৫টি, সিকান্দার আবু জাফর ৭৫টি, রবার্ট গ্রেভস ও ওমর আলী শাহ ১১১টি, আরবেরি ২৫২টি, শক্তি চট্টোপাধ্যায় ১২৫টি এবং নরেন দেব ৩০৯টি।

Said one—'Folks of a surely Tapster tell
And daub his Visage with the smoke of Hell ;
They talk of some strict Testing of us—Pish !
Hes a Good fellow' and 'twill all be well.

The Romance of the Rubaiyat, P 22.

উদ্ধৃত ইংরেজী অনুবাদে আছে true drunkards language. বাঙলা ভাষায় যাঁরা ওমরের অনুবাদ করেছিলেন এই মাতাল ভাষাটির নাড়ীর সন্ধান তাঁরা পাননি—একমাত্র নজরুল ছাড়া। সুতরাং নজরুলের অনুবাদের স্বাদ যে সম্পূর্ণ ভিন্ন হবে তা বলাই বাহুল্য। যাহোক এটুকু আমরা জানতে পারলাম যে ওমরের সঙ্গে নজরুলের যখনই পরিচয় হোক না কেন, পরিচয়টা ফারসীর মাধ্যমেই হয়েছিল এবং খুব নিবিড়ভাবেই ওমরকে তিনি ভোগ করেছিলেন। রুবাইয়াতের কোনো একটি পংক্তি তাঁর দাঁতের গভীর চাপ থেকে উদ্ধার পায়নি।

(২)

নজরুলের উপর ওমরের প্রভাব হাফিজের মত কিনা, সেটা দেখানোর পূর্বে দেখা যাক নজরুল কিভাবে এবং কেমনভাবে ওমরকে অনুবাদের মাধ্যমে বাংলা ভাষায় রূপান্তরিত করেছেন। 'রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম' অনুবাদ করার, সম্ভবতঃ, আগে ওমরকে নজরুল তাঁর গানের মাধ্যমে অনুবাদ করেন। "নজরুল-গীতিকা'র "ওমর খৈয়াম-গীতি" অংশটি, "রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়ামের"র কয়েকটি রুবাইয়াতেরই অনুবাদ। কিন্তু এই অনুবাদগুলো নজরুল করেছেন অপূর্ব কৌশলে। ওমরের "রুবাই" গুলি চতুষ্পদী কবিতা—এদিকে নজরুলের "ওমর খৈয়াম-গীতি" গান। এগুলিতে "রুবাই"-এর ছন্দ-রীতিকে মানা হয়নি। রুবাইকে নতুন রূপে রূপায়িত করা হয়েছে, দেওয়া হয়েছে তাকে গানের আঙ্গিক। এখানে নজরুল ওমরের দুটি করে রুবাই এক সঙ্গে জুড়ে একটি করে গানে পরিণত করেছেন। যেমন "নজরুল-গীতিকা"র ১-ম গানটি হল নজরুল অনূদিত "রুবাইয়াত-ই-ওমর খৈয়াম"-এর ১২৫ নং ও ১২৭ নং, ২য় গানটি ২৩ নং ও ১০৬ নং, ৩ নং গানটি ১৭০ নং ও. ও ৩৮ নং, ৪ নং গানটি ৩৩নং ও ৩৪ নং , ৫ নং গানটি ৫৭ নং ও ৫৯ নং, ৭নং গানটি ৫৬ নং ও ৩৭ নং ও ৮ নং গানটি ১১৮ নং ও ৬২ নং রুবাই এর সম্মিলন। ৬নং গানটির শেষ অংশটি ২১ নং রুবাই-এর অনুকৃতি। এর প্রথম অংশটির

প্রথম দু'লাইন নজরুল-অনূদিত 'রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়ামে''র ১৫৩ নং রুবাই-এর ৩-য় লাইন ''মরব যেদিন লাল পানিতে ধুয়ো সেদিন লাশ আমার।'' প্রথম অংশের বাকী লাইনগুলির--''শারাবী জম্‌শেদী গজল 'জানাজা'য় গাহিও আমার/দিবে গোর খুঁড়িয়া মাটি খারাবী ঐ শারাব-খানার / ''রোজ-কিয়ামতে তাজা উঠবো জিয়ে''--এর সঙ্গে রবার্ট গ্রেভস ও ওমর আলী শাহ-অনূদিত ''রুবাইযাৎ-ই-ওমর খৈযামে--''র ৯৮ নং রুবাইয়ের মিল আছে। অনুরূপ স্তবক নজরুল-অনূদিত ''রুবাইযাৎ-ই-ওমর খৈয়ামে''র কোথাও দেখা যায় না। কান্তিচন্দ্র ঘোষের অনুবাদেও অনুরূপ স্তবকের কোনো সাদৃশ্য খুঁজে পাইনি। ''রুবাইযাৎ-ই-ওমর খৈযামে''র যে রুবাই থেকে ঐ পংক্তিটি আহবিত তার সম্পূর্ণ স্তবকটি নিম্নরূপ :

আমার রোগের এলাজ কর পিইযে দাওযাই লাল সুরা,
পাংশু মুখে ফুটবে আমার চুনীর লালী, বন্ধুরা।
মরব যেদিন---লাল পানিতে ধুযো সেদিন লাশ আমার,
আঙুর কাঠের 'তাবুত' ক'রো. কবর দ্রাক্ষাদল ঝুরা।(রুবাই নং১৫২)

এই স্তবকটি কান্তিচন্দ্র ঘোষের অনুবাদে এইরূপ লাভ করেছে :

চেতিযে তুলো মরণ কালে দ্রাক্ষা সুধায় প্রাণটা মোর,
মদির স্নানটা করিযে দিও, ঘুচবে যবে মায়ার ঘোর,
পরিযে দিও যত্নে, স্নেহে আঙুর পাতার বহির্বাস,
গোর দিও এক বাগান ধারে, সজীব যেথায় ফুলের চাষ ।।(রুবাই নং ৬৭)

ফিটজিরাল্ড এই স্তবকটির অনুবাদ করেছিলেন এইভাবে :

Ah' with the Grape my fading Life provide,
And wash my Body whence the Life has died,
And in a Windingsheet of Vine-leaf wrapt,
So bury me by some sweet Garden-side.
[67 in first ed. and 98 in 2nd ed. in R. O. K. of Fitz.]

এই পুস্তকটির রবার্ট গ্রেভ্‌স ও ওমর আলী শাহ্‌ কৃতঅনুবাদ :

Take heed to pamper me with bowls that change
A pasty-coloured cheek to ruby red.
When I fall dead' I say' wash me in wine.
And use the vine's own slats for coffin-wood.
[99 in R. O. K. of R. G. and O.S.A.]

রেখাঙ্কিত প্রতিটি লাইন নজরুল-গীতিকার ৬নং ওমর খৈয়াম-গীতির ১ম ও ২য় পংক্তি। 'যেদিন লব বিদায় ধরা ছাড়ি, প্রিয়ে ! /ধুয়ো 'লাশ'' আমার লাল পানি দিয়ে'-র অনুরূপ। আর একটি পংক্তির সঙ্গে এর কাছাকাছি সাদৃশ্য আসে। গানটিতে নজরুল বলেছেন—''দিবে গোর খুঁড়িয়া মাটি খারাবী ঐ শারাবখানার।'–এর সঙ্গে নজরুল অনূদিত 'রুবাই'টির 'কবর দ্রাক্ষাদল ঝরা' (অর্থাৎ যে বাগানে আঙুর ঝরে পড়ে সেখানে কবর দিও), কান্তিচন্দ্রের 'গোর দিও এক বাগান নারে, সজীব যেথায় ফুলের চাষ' ফিটজিরাল্ডের bury me by some sweet garden side * প্রভৃতি পংক্তির নিকট সাদৃশ্য লক্ষণীয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যে রুবাইটি থেকে নজরুল এই গানের ১ম স্তবকের ভাবসম্পদ আহরণ করেছেন, উপমা-চিত্রকল্প নিয়েছেন, সে রুবাইটি রবার্ট গ্রেভস ও ওমর আলী শাহ্ অনূদিত ''রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়ামে''র ৯৮ নং রুবাই। এখানে নজরুলের গানের সম্পূর্ণ স্তবক এবং উক্ত ইংরেজী অনুবাদটি তুলে দিলাম পাঠকের কৌতূহল নিরসনের জন্যে—সম্ভবতঃ নজরুল তাঁর অনূদিত ''রুবাই-য়াৎ-ই-ওমর খৈয়ামে''র উক্ত স্তবকটি কোনো কারণবশতঃ বাদ দিয়েছেন অথবা অনুবাদ করার সময় পাননি :

যে দিন লব বিদায় ধরা চাড়ি, প্রিয়ে!
ধুয়ো লাশ আমার লাল পানি দিয়ে।।
শেয়র : শারাবী জামশেদী গজল ''জানাজা''য় গাহিও আমার
দিবে গোর খুঁড়িয়া মাটি খারাবী ঐ শারাব-খানার।
''রোজ-কিয়ামতে'' তাজা উঠ্‌ব জিয়ে।।
[নজরুল-গীতিকা : ওমর খৈয়াম-গীতি : ৬ নং]

এখানে মদ দিয়ে শব ধোয়ার কথা বলা হয়েছে। কবরে সুরার গানের কথা বলা হয়েছে। Judgement Day অর্থাৎ রোজকিয়ামতের কথা বলা হয়েছে এবং শুঁড়িখানার দরোজায় মাটি খুঁড়ে কবর দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে নজরুলের উক্ত স্তবকটি উদ্ধৃত গ্রেভস-শাহ অনূদিত ওমরের রুবাই-এর ইংরেজী অনুবাদ :

---

* দ্বিতীয় সংস্করণে পরিবর্তিত হয়ে হয়েছে : And lay me, shrouded in the living leaf by some not unfrequented gar den-side.

টিরই অনুবাদ। তবু আগে যে পংক্তি দুটির সঙ্গে অন্য রুবাই-এর দুটি পংক্তির মিল পাওয়া গেল সেটাও চোখের দেখার সত্য। ওমরের নিজেরই রুবাইয়ের মধ্যে এমনি পংক্তিগত সাদৃশ্য অনেক স্থানে আছে।

গানের আঙ্গিকে অনুবাদের সময় নজরুল ইসলাম ওমরের ভাবটুকু নিয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে নিজের মত করে সংগীত রচনা করেছেন। এক্ষেত্রে রুবাইয়ের আঙ্গিক ত নয়ই বরং পৃথক একটি গানের জন্য সুরের কাঠামোয় ফেলে তার আকৃতি দান করেছেন। এমন দুটি রুবাই বেছে নিয়েছেন যাদের পরস্পরের মধ্যে ভাবের সাদৃশ্য আছে। যে-জন্যে সম্পূর্ণ গানটি শুনলে আমরা খণ্ডিত চিন্তার আঘাত পাই না। এখন স্তবকগুলো অনূদিত রুবাই এবং "নজরুল-গীতিকা"র 'খৈয়াম-গীতি' উদ্ধৃত করে কি কৌশলে এই অভিনব ব্যাপারটি সম্পন্ন করা হয়েছে দেখা যাক। প্রথম খৈয়াম-গীতিটি বলেছি নজরুল অনূদিত "রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়ামে"র ১২৫ ও ১২৭ নং রুবাইয়ের মিশ্রণ।
১২৫ নং রুবাই :

আমায় সৃজন করার দিনে জানত খোদা বেশ করেই,
ভাবীকালের কর্ম আমার বলতে পারত মুহূর্তেই।
আমি যে-সব পাপ করি—তার ললাট-লেখা তার নির্দেশ,
সেই সে পাপের শাস্তি নরক—কে বলবে ন্যায় বিচার এই।

১২৭ নং রুবাই ;

দয়ার তবেই দয়া যদি, করুণাময় স্রষ্টা হন,
আদমেরে স্বর্গ হতে দিলেন কেন নির্বাসন ?
পাপীর তরে করুণা যে—করুণা সে-ই সত্যিকার,
তারে আবার প্রসাদ কে কয় পুণ্য করে যা অর্জন।

এর সম্মিলিত রূপের গানটি এই রূপ ধারণ করেছে :

সৃজন-ভোরে প্রভু মোরে সৃজিলে গো প্রথম যবে
(তুমি) জানতে আমার ললাট-লেখা, জীবন আমার কেমন হবে ॥
তোমারি সে নির্দেশ, প্রভু,
যদিই গো পাপ করি কভু,
নরক-ভীতি দেখাও তবু এমন বিচার কেউ কি স'বে ॥

করুণাময় তুমি যদি দয়া কর দয়ার লাগি'
ভুলের তরে "আদমে"রে করলে কেন স্বর্গ ত্যাগি
ভক্তে বাঁচাও দয়া দানি
সে ত গো তার পাওনা জানি,
পাপীরে লও বক্ষে টানি' করুণাময় কইব তবে ॥

যে-কোনো পাঠকই বুঝতে পারবেন এই গানে রুবাই-এর কথা আছে কিন্তু কাঠামো নেই। এর বিষয় ভাবনা ওমরের, আঙ্গিক নজরুলের। ছোট্ট একটা বাংলা গীতি কবিতা যেমন হতে পারে এটা ঠিক তাই হয়েছে। গানের মত এর অন্ত্যানুপ্রাস। এর থেকে একটা শিক্ষাও লাভ করা যায় যে কবিতা অনেকখানি প্রকাশ-সৌকর্যের ব্যাপার, সম্পূর্ণ চিন্তার ব্যাপার নয়। কেননা আঙ্গিকগত দিক থেকে উদ্ধৃত গানটি একান্তভাবে নজরুলের সৃষ্টি। আর এর সঙ্গে ভারতীয় সংগীতের সুর মিশিয়ে নজরুল তাকে সত্যিই নজরুল-গীতিকা বানিয়েছেন। প্রসংগত ওমরের রুবাইয়ের নিদ্রিত বিষাদ নজরুলের গানে ফোটা ফুলের মত উন্মুক্ত। সুধীন্দ্রনাথ যে অনুবাদকে "প্রতিধ্বনি" বলেছিলেন একে কতকটা তেমনি ভাবের প্রতিধ্বনি বলা যেতে পারে—"ধ্বনির" কিংবা রূপের প্রতিধ্বনি নয়। দ্বিতীয় গানটি বিশ্লেষণ করলেই আমরা তা বুঝতে পারব। এটি নজরুল অনূদিত "রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়ামে"র ২৩ ও ১০৬ নং রুবাই-এর সম্পৃক্তি। ২৩ নং রুবাইটি এই :

নিদ্রা যেতে হবে গোরে অনন্তকাল, মদ পিও।
থাকবে নাকো সাথী সেথায় বন্ধু প্রিয় আত্মীয়।
আবার বলতে আসব না ভাই বলছি যা তা রাখ শুনে—
ঝরেছে যে ফুলের মুকুল ফুটতে পারে আর কি ও।

১০৬ নং রুবাইটি এই :

করছে ওরা প্রচার পাবি স্বর্গে গিয়ে হুর পরী
আমার স্বর্গ এই মদিরা হাতের কাছের সুন্দরী।
নগদা যা পাস তাই ধরে থাক ধারের পুণ্য করিসনে।
দূরের বাদ্য মধুর শোনায় শূন্য হাওয়ায় সঞ্চরি'।

এর গীতি-আঙ্গিক এই :

পিও শরাব পিও।
তোরে দীর্ঘ সে কাল গোরে হবে ঘুমাতে।
সে তিমির-পুরে
তোর বন্ধু-স্বজন প্রিয়া র'বে না সাথে॥ ৪

পিও নিমেষ মধু।
পুনঃ গাহিব না কা'ল আজি যে গীত গাহি।
শোনো শোনো মোর গান—
'রাতে শুকাল যে গুল্ হাসিবে না সে প্রাতে॥' ৮

ওরা কহিছে সদাই—
'পাবি মোহিনী হুরী', শোনো আমার বাণী—
'ওরে মধুবতর
এই আঙুর-পানি এই পান্‌শালাতে'॥ ১২

ধর্ নগদা যা পাস,
মিছে রমনে ব'সে বাকী পাওনা-আশায়,
দূরে মৃদং বাজে
শুধু ফাঁকা আওয়াজে তোর মন ভোলাতে॥ ১৬

গানে রুবাই-এর আঁট-ষাট বাঁধন নেই; কিন্তু এর ২য় পংক্তির শেষ শব্দ "ঘুমাতে"র সঙ্গে ৪,৮,১২ ও ১৬ পংক্তির শেষ শব্দ—'সাথে', 'প্রাতে', 'পান-শালাতে'ও 'ভোলাতে"র যে মিল হয়েছে অস্থায়ীতে বারসার ফিরে সেই মিল কিংবা আলঙ্কারিকের ভাষায় অন্ত্যানুপ্রাস গীতিধনুকটিকে ছিলার মত টেনে রেখেছে। এটাও সংযমের সংহতি। যে-কটা শব্দ অনুবাদের রেললাইন থেকে নেমে ঘাসের পথে আশ্রয় নিয়েছে—'তিমির-পুর', 'নিমেষ-মধু', 'গুল' 'মৃদং'—এগুলি এই গানটিকে ভিন্ন শ্রী দান করেছে। শুধু 'গোর' বলে যেন কবিতার পূর্ণ আস্বাদ পাওয়া যাচ্ছিল না তাই অনুপ্রাসিত শব্দ "তিমির-পুর' সৃষ্টি করা হ'ল আর হাইফেনের রাখীতে বাঁধা দুটি শব্দ 'নিমেষ-মধু' সৃষ্টি করল মুহূর্ত স্বর্গের অনন্ত পিপাসা। সমস্ত ওমরীয় চিন্তাধারা ঐ একটি শব্দের জালে মাছের মত বন্দী হল যেন।

এখানে বলা প্রয়োজন ভৈরবীর উদাস সুর এর সঙ্গে মিশ্রিত না 'হলে—মদ্য-পানের পরামর্শ দাতার চোখের ঝালরে অশ্রু-শিশির দোলানো যেত না। প্রথম গানটিতে যেমন অভিযোগ ও আক্ষেপের বেদনা শব্দহীন কান্নার মেদুরতা ছড়াচেছ—দ্বিতীয় গানটি তেমনি অসহায় মানুষের অনন্য বিলাপকে করুণাঘন করে তুলছে সত্য অদৃষ্টের বিষাদ-বঙ্কিম হাসিতে। ওমরের রুবাই-এর গভীর অর্থ বুঝি এমনি গানে প্রকাশিত না হলে আমাদের অনুভূতির স্বরগুলো চন্দ্র-কিরণপিপাসু পদ্মের পাঁপড়ির মত বিকশিত হয়ে উঠত না।

ঠিক এমনিভাবে আমরা যখন শুনি 'কাননগিরি সিন্ধু-পার ফিরনু পথিক দেশ বিদেশ।' তখন নজরুল-গীতিকার এই ৩য় খৈয়াম গীতির ১ম পংক্তি আমাদের পার্থিব চেতনাকে উৎকর্ণ করে তোলে অপার্থিব নীলিমায়। ১৭০ নং রুবাই-এর যে প্রথম পংক্তি এর উৎস মূল—'ফিরনু পথিক সাগর মরু ঘোর বনে পর্বত শিরে' তাতে সুরারোপ করলেও গানের ঐ পংক্তিটির আনন্দ কিছুতেই পাওয়া যাবে না। আমি জানি 'সিন্ধু কাওয়ালী'তে গাওয়া নজরুলের বিখ্যাত গজল 'করুণ কেন অরুণ আঁখি দাও গো সাকী দাও শারাব'-এর সুরে নজরুলের ''রুবাই-য়াৎ-ই-ওমর খৈয়ামে''র তাবৎ রুবাইগুলি গাওয়া যাবে। কারণ উভয়েরই ভাষা drunkard la guage অর্থাৎ মাতালভাষা। কিন্তু 'ভীমপলশ্রী—দাদ্‌রা'য় গাওয়া বর্তমান গজলটিতে 'কানন গিরি সিন্ধু পার' সুরের যে আমেজ আছে তার শব্দগুলো সুর থেকে ভাষায় রূপান্তরিত হয়েছে—হৃদয়ের যে কান্না তার তটে মাথা খুঁড়ে মরছে—তারই আঘাত থেকে উৎক্ষিপ্ত এর শব্দফেনপুঞ্জ। এখানে বলা হয়ত অপ্রাসঙ্গিক হবে না—কবিতায় সুরারোপ করে শুধু গান করা যায় না, গানের জন্যে পৃথক সুর হৃদয়ের অবদান। অর্থাৎ হৃদয়টি মূলত গানের স্রষ্টা। নজরুলের হৃদযের গভীর গোপনে ওমরের কান্নার ধ্বনি প্রতিধ্বনি জাগিয়ে তুলেছিল। সেই প্রতিধ্বনিত সুরের গানগুলি ''নজরুল-গীতিকা''র 'খৈয়াম-গীতি'। এখানে প্রতিটি গানের সঙ্গে রুবাইগুলি মিলিয়ে দেখানোর প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। কৌতূহলী পাঠক আমার দেওয়া রুবাই সমূহের নাম্বার দেখে নিজেই নজরুল-রচিত খৈয়াম-গীতির সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে পার-বেন। শুধু এইটুকু বলি যে নজরুল এক নতুন পরীক্ষার মাধ্যমে ওমরকে বাঙলা গানের আসরে চিরদিনের জন্য অমর করে তুলেছেন। 'যাঁরা নজরুলকে স্বভাব-কবি বলেন তাঁরা নিশ্চয়ই বুঝবেন এই বুদ্ধির সাধনা এবং এই রকম

বুদ্ধিসম্পন্ন কল্পনা কোনো স্বভাব-কবির হতে পারে না। অবশ্যই যে স্বভাব-কবি নাগরিক কবির অবজ্ঞাসূচক উক্তিতে স্বভাব-কবি।

যা হোক্ এবার 'রুবাই'-এর 'রুবাই'-আঙ্গিকে নজরুল-কৃত অনুবাদ প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক্। ওমরের রুবাই অনুবাদ প্রসঙ্গে নজরুল কি বলেছেন তা পূর্বে উল্লেখ করেছি। 'ওস্তাদী দেখাবার জন্য তিনি ওমরের ভাব ভাষা বা স্টাইলকে বিকৃত' করেননি বলেছেন। আর তিনি জানিয়েছেন যে "ওমর আগাগোড়া মাতালের 'পোজ' নিয়ে" তাঁর রুবাইয়াৎ লিখে গেছেন– "মাতালের মতোই ভাষা, ভাব, ভঙ্গি, শ্লেষ, রসিকতা, হাসি কান্না--সব।" এবং তিনি বলেছেন---'আমি আমার সাধ্যমত চেষ্টা করেছি–ওমরের সেই ঢংটির মর্যাদা রাখতে'। নজরুলের অনুবাদ বুঝবার আগে এই কথাগুলি স্মরণ রাখতে হবে এবং তখনই বোঝা যাবে কেন তিনি বলেছিলেন–"মিষ্টি শোনাবে না হয়ত আমার এ অনুবাদ।"

উপরের কথাগুলো সামনে রেখে এক এক করে দেখা যাক নজরুলের ঐ কথার সঙ্গে তাঁর কাজের মিল কতটা। মাত্র একটি অনুবাদ ছাড়া রুবাই-এর প্রচলিত আঙ্গিক নজরুল হুবহু মেনে চলেছিলেন। এই অনুবাদটি "রুবাই-য়াৎ-ই-ওমর খৈয়ামে" স্থান পায়নি। অনুবাদটি হল :

চোখ জুড়ানো গুল্ম-লতার চিকণ পাতা পক্ষ্মসম
ফেলছ ছায়া নদীরঠোঁটে, এলিয়ে তনু যথায় তুমি,—
আস্তে ক'রে হেলান দিয়ো লতার গায়ে, প্রিয়তম,
উঠ্‌ছে লতা মাটির তলের কোন্ তরুণীর অধর চুমি'।

১৩৩৬ সালের পৌষের 'সওগাতে' এটি প্রকাশিত হয়েছিল। পরে এটি আবদুল কাদির সম্পাদিত "নজরুল রচনা সম্ভারে" পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। সম্ভবত, এই অনুবাদটি রুবাই অনুবাদে নজরুলের প্রাথমিক প্রয়াস। ফার্সী আঙ্গিকে নজরুল পরে ক ক খ ক-র মিলে রুবাইএর যে অনুবাদ করেন ঐখানে তা ছিল না। প্রথমে তিনি বাংলা কবিতার মত ক খ ক খ-এর মিলে অনুবাদ করেছিলেন। হাফিজের রুবাই অনুবাদ করবার সময় প্রথমে ক ক খ ক-এর রীতিটা তিনি রপ্ত করেন এবং সেই পটুত্ব-অর্জিত হাতেই তিনি "রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম" অনুবাদে হাত দেন। এই ক ক খ ক-এর মিলের ব্যাপারে তিনি কতখানি পটুত্ব অর্জন করেছিলেন তা তাঁর অনূদিত একটি রুবাই উদ্ধৃত করে দেখা যেতে পারে :

স্যাঙাৎ ওগো, আজ যে হঠাৎ মোল্লা হ'য়ে সাজলে সং!
ছাড় কপট তপের এ ভান, সাধুর মুখোস্ এই ভড়ং।
দেবেন 'আলী মুর্তজা' যা সাকী হয়ে বেহেশ্‌তে
পান কর সে শরাব হেথাও হুরী নিয়ে রং-বেরং। (১৩০ নং রুবাই)

ক (অং) ক (অং) খ (তে) ক (অং)-এই মিল মৌলিক রচনার মত স্বতঃস্ফূর্ত। এই যে ৩য় পংক্তির ফাঁক—যার সম্বন্ধে মুজতবা আলী উল্লেখ করেছেন এই বলে: 'ইরানী আলঙ্কারিকেরা বলেন, তৃতীয় ছত্রে মিল না দিলে চতুর্থ ছত্রের শেষ মিলে বেশী ঝোঁক পড়ে এবং শ্লোক সমাপ্তি তার পরিপূর্ণ গাম্ভীর্য ও তীক্ষ্ণতা পায়।' এই কৌশলটি কান্তিচন্দ্র এড়িয়ে গেছেন। তিনি ক ক খ খ পদ্ধতিতে অনুবাদ করেছিলেন। ওমরের সামান্য কয়েকটি রুবাই-এর অনুবাদক সত্যেন্দ্র-নাথ দত্তও মূল রুবাই-এর মিলের অনুসরণ করেননি। তিনিও ক ক খ খ মিলের পদ্ধতিতে অনুবাদ করেছেন। অথচ ফিটজিরাল্ড তাঁর অনুবাদে ফারসী রুবাই-এর আঙ্গিক অনুসরণ করেছেন। সুতরাং আমরা মানতে বাধ্য যে মিল দেওয়ার রীতির দিকটা নজরুল বিকৃত করেননি। এবার শব্দ প্রয়োগের দিকটাও দেখানো যেতে পারে। উপরোদ্ধৃত রুবাইটির প্রথম শব্দ 'স্যাঙাৎ' মাতালের ভাষা অবশ্যই। এ-ছাড়া 'ভান্', 'সং', 'ভড়ং' এই সব শব্দ মাতালের মুখেই মানায় বেশ। সুতরাং এই শব্দ চয়নও চিন্তা প্রযুক্ত। এমনিভাবে যশোখ্যাতির ঠুন্‌কো এ কাঁচ করব ভেঙে চাখনাচুর' পংক্তির 'চাখনাচুর', 'পীর সাহেবে দেখতে পেলাম, হাতে বোতল ভরা মাল'-এব 'মাল' মদ্যপায়ীর জড়িত জিহ্বা উচচারিত 'স্ল্যাং' ভাষাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। এই 'স্ল্যাং' ভাষা ইচছাকৃতভাবে ব্যবহৃত— এর সম্পূর্ণ ভিন্ন মেজাজের জন্যে, মিষ্টি শোনাবার জন্যে নয়।

এখানে বিস্তৃত আলোচনার পূর্বে সুধীন দত্তের প্রতিধ্বনি সম্পর্কে বুদ্ধদেব বসুর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্যের সঙ্গে সংগতি রেখে নজরুলের অনুবাদের বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। বুদ্ধদেব বসু বলেছিলেন:

> অনুবাদের উচচতম লক্ষ্য হ'তে পারে: ১. মূলের ভাব বক্তব্য বা সংবাদের পরিবেশন, ২. চিত্রকল্প, ভাষার ভঙ্গি, ছন্দ, মিল ও স্তবকের বিন্যাস অর্থাৎ সমগ্র রূপকল্পের অনুসরণ, ৩. মূল কবির দেশ ও কালের স্বাদ সঞ্চার এবং ৪. অনুবাদের ভাষায় একটি সুন্দর-অন্তত সুখপাঠ্য—নতুন কবিতার রচনা।

আমার মনে হয় অনুবাদে ভাবের কিংবা বক্তব্যের ব্যাপারটা গৌণ। কেননা অক্ষম অনুবাদকও মোটামুটি বিদেশী কবির বক্তব্য তুলে ধরতে সক্ষম। সবচেয়ে জরুরী কবিতাটির রূপকল্প। এইখানে কে কতটা সার্থক হয়েছেন সেটাই প্রকৃত বিচার্য ব্যাপার। আমরা পূর্বে দেখেছি বাংলা ভাষায় একমাত্র নজরুলই রুবাই-এর স্তবক বিন্যাসকে ঠিক ঠিক মেনেছেন, তার আঙ্গিক, ছন্দ ও মিলকে অনুসরণ করেছেন। এতে মূল কবির দেশীয় কাব্যরীতির ধাঁচটা আমরা জানতে পেরেছি এবং তার বিশেষ স্বাদও লাভ করেছি। নজরুল ওমরের ভাষার ভঙ্গি-কেও যে অনেকটা আয়ত্ত করে অনুবাদকে বিশেষ ধরনের রূপদান করেছেন পূর্বাহ্নে সে কথাও বলেছি। বাকী থেকে গেছে চিত্রকল্প ও উপমা সম্বন্ধে আলোচনার কথা। এখানে বলা যেতে পারে নজরুল ইসলাম পারসী কাব্যের সংস্পর্শে এসে অত্যন্ত উন্নতমানের উপমা ও চিত্রকল্পের ব্যবহার শিখেছিলেন। যে উজ্জ্বল চিত্রকল্প ও উপমা তাঁর নিজের কাব্যকে আকর্ষণীযভাবে সমৃদ্ধ করেছে। প্রাচ্যের কাব্যেব এই অলঙ্কার সম্বন্ধে লরেন্স হাউসম্যানের উক্তি হল : richly coloured similes. এখানে পাঠকদের ঐ 'colour' শব্দটির দিকে মনোযোগ দিতে বলি। তাহ'লে নজরুলের অনুবাদের একটা বিশেষ দিক আরো স্পষ্টভাবে তুলে ধরা যাবে। প্রথমে নজরুল-অনূদিত 'রুবাইয়াত-ই-ওমর খৈয়াম' থেকে কয়েকটি রুবাই উদ্ধৃত করা যাক :

১. কইল গোলাপ, "মুখে আমার 'ইয়াকুত্' মণি, রং সোনাব,
গুল্‌বাগিচার মিসর দেশে য়ুসোফ আমি রূপকুমার।"
কইনু, "প্রমাণ আর কিছু কি দিতে পার ?" কইল সে,
"রক্ত-মাখা এই যে পিরাণ প'রে আছি, প্রমাণ তার।"(১৫৬ নং রুবাই)

২. আরাম ক'রে ছিলাম শুয়ে নদীর তীরে কাল রাতে,
পার্শ্বে ছিল কুমারী এক, শরাব ছিল পিয়ালাতে ;
স্বচ্ছ তাহার দীপ্তি হেরি সুক্তিবুকে মুক্তাপ্রায়
উঠ্‌ল হেঁকে প্রাসাদ-রক্ষী, 'ভোর হ'ল কি আধ-রাতে ?' (৭৮ নং রুবাই)

৩. দেখতে পাবে যেথায় তুমি গোলাপ লালা ফুলের ভিড়,
জেনো, সেথায় ঝরেছিল কোনো শাহানশা'র রুধির।
নার্গিস আর গুল-বনোসার দেখবে যেথায় সুনীল দল,
ঘুমিয়ে আছে সেথায়—গালে তিল ছিল যে সুন্দরীর। (২২নং রুবাই)

৪. পেতে যে চায় সুন্দরীদের ফুল্লকপোল গোলাপ ফুল
কাঁটার সাথে সইতে হবে তায় নিয়তির তীক্ষ্ণ হুল।
নিঠুর করাত চিরুনিরে কেটে কেটে তুলল দাঁত
তাই সে ছুঁয়ে ধন্য হ'ল আমার প্রিয়ার কেশ আকুল। (৯০ নং রুবাই)

প্রথম উদ্ধৃতিতে কবি গোলাপের রূপ বর্ণনা করছেন। গোলাপটির মুখ কেমন? 'ইয়াকুত মণি'র মত। গোলাপটির রং কেমন? সোনার মত। গোলাপটির সঙ্গে কার তুলনা চলে? ফুল বাগানের দেশ মিসর দেশের অসামান্য সুন্দর রূপবান কুমার য়ুসোফের সঙ্গে। কিন্তু কবিতাটি তখনো চরমোৎকর্ষ লাভ করেনি। পরের দু'লাইনে সেই রসকে সম্পন্ন করা হল এই বলে যে তুমি যে রূপকুমার য়ুসোফ তার প্রমাণ কি? গোলাপ উত্তর দিল যে রাজকুমারের রক্তমাখা জামা যে সে পরে আছে সেইত প্রমাণ। রক্তগোলাপ যে রক্তরাঙা পিরাণের মত সেই উপমাটি এই বিশেষ কায়দায় পরিবেশিত হল। এমনি দৃশ্যত সহজ কিন্তু কুটিল উপমা পরবর্তীকালে নজরুল তাঁর কাব্যে ব্যবহার করেছেন। এই সব উপমায় সাধারণত তুলনাবাচক শব্দ 'মত, সম, যেমতি, প্রায়, পারৎ, নিভ, তুল, তুলনা, উপমা, তুল্য, হেন, কল্প, সঙ্কাশ, জাতীয়, সদৃশ, যেন, প্রতীকাশ, বৎ' ইত্যাদি থাকে না। নজরুলের কাব্য থেকে দুটি উদ্ধৃতি এর পরিচয় প্রদান করবে:

১. ওরে গোলাব! নিরিবিলি—
(বুঝি) নবীর কদম ছুঁয়েছিলি,
(তাই) তাঁর কদমের খোশ্‌বু আজও তোব আতরে জাগে॥
মোর নবীরে লুকিয়ে দেখে
তাঁর পেশানীর জ্যোতি মেখে'
ওরে ও চাঁদ রাঙলি কি তুই গভীর অনুরাগে॥

গোলাবের আতরের গন্ধ কিসের মত বলে এত মাদকতাময়? নবীর চরণ-সৌরভের মত বলে। চাঁদের স্নিগ্ধ জ্যোতি কিসের মত বলে কেন এত চিত্তা-মোদী? নবীর ললাট-জ্যোতির মত ব'লে।

২, "ওরে রবী শশী ওরে ও গ্রহ তারা,
কোথা পেলি এ রৌশনি এ জ্যোতিধারা?"
কহে, "আমরা তাহারি রূপের ইশারা,
মুসা বেহুঁস হ'ল দেখি যে খুবরু।"

রবি শশী গ্রহ তারার জ্যোতি কার সদৃশ ? অনুভবগম্য আল্লার রূপের ইশারার সদৃশ। একটু খেয়াল করলে দেখা যাবে এখানে ওমরের উপমার colour অর্থাৎ রঙও উন্মোচিত হয়েছে। প্রসংগত উল্লেখযোগ্য ওমরের রুবাইয়াত থেকে যে রুবাইগুলোর উদ্ধৃতি উপরে দেওয়া হয়েছে সেখানে কোনো তাত্ত্বিক কিংবা দার্শনিক ওমরের উপস্থিতি লক্ষণীয় নয়, সেখানে কবিত্বের পোশাক পরে বসে আছেন কবি ওমর। নজরুলের উদ্ধৃত ঐ 'নাত' ও 'হামদে'ও আমরা কবি নজরুলকে দেখি। যিনি বলেছিলেন : 'আমার বহু লেখার মধ্য দিয়ে আমি ইসলামের এই মহিমার গান করেছি। তবে কাব্যকে ছাপিয়ে ওঠেনি সে গানের সুর।'* অমনি ওমর দর্শন যাই করুন না কেন কাব্য ছাপিয়ে ওঠেনি যে সে দর্শন নজরুল তাঁর অনুবাদে তার প্রমাণ দেখিয়েছেন।

যাহোক উদ্ধৃত ওমরের সব রুবাইগুলোর ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। রসিক পাঠক নিজের গুণেই ওমরের কবিত্বশক্তি দেখতে পাবেন এবং নজরুলের অনুবাদে ঐ রঙের রামধনু কতটা ফুটেছে তাও বুঝতে তাঁদের বেগ পেতে হবে না। এ ধরনের অনুবাদে অসামান্য কবি-দৃষ্টিরও প্রয়োজন হয়। যেমন ধরা যাক শেষোক্ত রুবাইটির কথা। প্রেমের পথ চিরকালই বন্ধুর। প্রিয়তমকে পেতে হলে কাঁটার পথ পেরুতে হয়—কাঁটার আঘাত সহ্য করে যেমন পাওয়া যায় গোলাপের স্পর্শ। করাত যদি কাঠের বুককে চিরে চিরে তার দাঁত তৈরী করে না দিতো ত প্রিয়ার সুরভিত কেশ স্পর্শ করার সৌভাগ্য হত কি তার ?

এবার দেখা যাক মূল কবির দেশ ও কালের স্বাদ সঞ্চার নজরুল তাঁর অনুবাদে করতে পেরেছেন কি না। আরবী ও ফারসী শব্দে কবিতা লেখার রেওয়াজ বাংলা কাব্যে নজরুলে পূর্ণতা লাভ করে। পারিবারিক ঐতিহ্য, ধর্মীয় ঐতিহ্য, তদুপরি আরসী-ফারসী শিক্ষার সুযোগ ও পরিবেশ পাওয়ার সৌভাগ্যের জন্য নজরুলের ঐ সব শব্দ ব্যবহারের একটি অতিরিক্ত সুবিধা ছিল। কিন্তু এই অতিরিক্ত সুবিধা লাভ করেও নজরুল পারতপক্ষে তেমন শব্দ ব্যবহার করতেন না যা বাংলাদেশের সমাজে অচালু। একটি উদাহরণ নেওয়া যাক :

* ইবরাহিম খাঁকে লেখা নজরুলের চিঠি : 'নজরুল' রচনা-সম্ভার' : সম্পাদনা : আবদুল কাদির।

ঢাল হৃদয়ের তোর তশ্‌তরিতে
শিরনী তৌহিদের
তোর দাওয়াত কবুল করবেন হজরত
হয় মনে উমীদ।

[জুলফিকার]

এখানে ব্যবহৃত তশতরী, শিরনী, তৌহিদ, দাওয়াত, কবুল, উমীদ প্রভৃতি শব্দগুলো প্রতিদিন ঘরে বাইরে ব্যবহার করি। বাংলার মুসলমানের এ-গুলো ঘরের শব্দ। সুতরাং কান এদের সঙ্গে পূর্ব-পরিচিত থাকায় বক্তব্য বিষয় বুঝতে আদৌ বেগ পেতে হয় না। বলা বাহুল্য ওমরের ধর্মীয় ঐতিহ্য এবং নজরুলের ধর্মীয় ঐতিহ্য এক হওয়াতে এবং স্বধর্মের পুরাণাশ্রিত ব্যক্তি ও বিষয় এবং দেশীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির আওতাভুক্ত ঐতিহাসিক স্থান, ঐতিহাসিক পুরুষদের নাম ব্যবহারে উভয়ের স্বভাবগত মিল থাকায় নজরুল ওমর অনুবাদে মূল কবির 'দেশ ও কালের স্বাদ সঞ্চার' করতে পেরেছেন তাঁর অনুবাদে। এবার উদাহরণ দেওয়া যাক:

'ইয়াসিন' আর 'বরাত' নিয়ে, সাকী রে, রাখ, তর্ক তোব।
আমায় সুরার হাত-চিঠি দাও, সেই সে সুরা 'বরাত' মোর।
যে রাতে মোর শ্রান্তি ব্যথা ডুবিয়ে দেবে মদের স্রোত,—
সেই সে 'শবে-বরাত' আমার, সেই ত আমার বরাত জোর।

(১৫৮নং রুবাই)

এখানে ব্যবহৃত 'ইয়াসিন', 'বরাত' ও 'শবে-বরাত' শব্দগুলি বাঙালী মুসলিম সমাজে সু-পরিচিত। এগুলি আবার ইরান সমেত সমস্ত বিশ্ব-মুসলিম সমাজেও পরিচিত। 'সুরা ইয়াসিন' কোরান শরীফের একটি বিখ্যাত সুরা। কোনো মুসলমান বিপদে পড়লে এই সুরা বিপদ-মুক্তির প্রতীক হিসাবে পাঠ করেন। "ইয়াসিন" শব্দের অর্থ কোরান-টিকাকারেরা ঠিকমত দিতে পারেননি। এই শব্দটিকে তাঁরা হযরত মুহম্মদের (দঃ) একটি রহস্যময় নাম বলে মনে করেন।* অনুবাদের সময় নজরুল এগুলোর অনুবাদ করার প্রয়োজন মনে করেননি। 'শবে-বরাত' যে 'ভাগ্য রজনী' তা কোনো বাঙালী মুসলমানের

* This Sura is regarded with special reference, and is recited in times of adversity, illness, fasting and on the approach of death—(Glorious Koran : Mohammed Marmaduke Pickthal P. 314).

বলে দেওয়ার প্রয়োজন হয় না। সুতরাং এই অনুবাদে নজরুল যথোপযুক্ত শব্দ ব্যবহারের শুধু কৃতিত্বই দেখাননি তাঁর প্রজ্ঞা-দৃষ্টির তাৎপর্যকেও উদ্‌ঘাটিত করেছেন। বলা বাহুল্য নজরুল তাঁর এই অনুবাদে পীর, সাহেব, শেখ, নামাজ রোজা, মসজিদ, খোদা, জুম্মাবার, জায়নামাজ, বেহেশত, জাহান্নাম, শরাব, তৌবা, নিকা, তসবি, লালা, গুল্ প্রভৃতি বহু আরবী-ফরসী শব্দ ব্যবহার করেছেন। আর সেজন্যেই কান্তিচন্দ্র ঘোষ কিংবা নরেন্দ্র দেবের অনুবাদের চাইতে তাঁর অনুবাদেই যথাযথভাবে মূল কবির দেশ ও কালের স্বাদ সঞ্চারিত হযেছে। ওমরের আবেগের স্পন্দন সঠিক সুরে তাঁর হৃদয়ের তারে স্পন্দন জাগিয়েছিল বলে তিনি এমনি ভাষায় অনুবাদ করতে পেরেছেন :

আকাশ পানে হতাশ আঁখি চেয়ে থাকি নির্নিমিখ্
'লওহ' 'কলম' বেহেশত-দোজখ কোথায় থাকে কোন্ সে দিক
অন্ধকারে পেলাম আলো, দরবেশ এক কইল শেষ—
'লওহ' 'কলম' বেহেশত-দোজখ তোরি মাঝে—নয় অলীক।

(১৪৭ নং রুবাই)

এই স্তবকটির মূল ফারসী হল এই :

bərtar zi sipihr. Khatir-əm ruz-i nukhust
lauh u qalam u bihisht u dhuzakh mi just
pas guft. mara mu'allim az ray-i durust
lauh u qalam u bihisht u duzakh ba tu-st *

মূলে 'লওহ' 'কলম' 'বেহেশত' দোজখ' প্রতিটি শব্দই আছে যে-গুলো অনুবাদ করার প্রয়োজন হয়নি। কেন না ঐ একই শব্দ বাংলাতে বাঙালী মুসলমান সমাজে নিত্য প্রচলিত। তাই অত্যন্ত সহজ-স্বাচ্ছন্দ্যে নজরুল এই অনুবাদ-কর্ম সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়েছেন এবং এতে তিনি মূল কবির দেশকালের স্বাদও খুব সহজে সঞ্চার করতে পেরেছেন। অথচ ফিট্‌জিরাল্ড এই স্তবকটির অনুবাদ করতে গিয়ে কেমন বিপন্ন হয়েছেন এবং অনুবাদে বিকৃতি ঘটিয়েছেন সেটা দেখিয়েছেন A. J. Arberry তাঁব বিখ্যাত গ্রন্থ The Romance of the Rubáiyat-এ। আরবেরি বলছেন :

* **Appendix : The Romance of the Rubaiyat A. J. Arberry : P. 112**

Fitzgerald here interpreted mu'allim in a wholly unjustifiable sense : whatever Omar may have meant by it---whether the Prophet, or some mystic preceptor or philosopher, possibly Aristotle whom the Arabs called 'the First teacher'---he certainly did not intend what Fitzgerald understood.*

এখানে ফিটজিবাল্ডের অনুবাদটি উদ্ধাব কবলেই বোঝা যাবে যে ফিটজিরাল্ড 'মুআল্লিম' শব্দের অর্থ সত্যই বোঝেননি। ফিটজিরাল্ডেব অনুবাদ :

I sent my Soul through the Invisible,
Some Letter of that After-life spell :
And by and by my Soul returned to me
And answered, 'I myself am Heav'n and Hell.'

[66 in 5th ED. of R. O. R. : Fitz.]

নজরুল 'মুআল্লিম'কে 'দরবেশ' করেছেন, এবং এটা mystic preceptor কিংবা philosopher-এর সঙ্গে অনেকখানি ভাবগত সাদৃশ্য বজায় রেখেছে। ফিটজিরাল্ড দরবেশের স্থানে কিংবা গুরুর স্থানে soul ব্যবহার করে মূল অর্থটিকেই উল্টে ফেলেছেন। এখন দেখা যাক—কান্তিচন্দ্র ও নরেন্দ্র দেবের তুলনায় নজরুল কতটা সার্থক। ফিটজিবাল্ড ওমরের একটি রুবাই অনুবাদ করেন এইভাবে :

Indeed, indeed, Repentance oft before
I swore--but was I sober when I swore ?
And then and then came Spring and Rose-in-hand
My thread-bare Penitence apieces tore.

[70 in 1st. 102 in 2nd of R. O. R : Fitz.]

এর থেকে কান্তিচন্দ্র অনুবাদ করলেন এইভাবে :

দিব্যি দিয়ে ত্যাগ করিনু—চক্ষুজলও পড়ল ঢের—
শপথ কালে সবটা তবে যায়নি কেটে নেশার জের।
তারপরে যেই ফাগুন এল বাড়িয়ে গোলাপ—রঙীন হাত—
কোথায় গেল ক্ষীণ অনুতাপ, গন্ধ আকুল মলয় সাথ ॥

(৭০ রো. ও. খৈ)

* Appendix : R. O. R : A. J. Arberry : P. 113.

এবং নরেন্দ্র দেব করলেন এমনি করে :

প্রতিশ্রুতি নিত্য প্রাতেই করছি তো সই, দান
আজকে থেকে এক চুমুকও করব না আর পান,
অনুতাপেই রাত কাটাবো তপ্ত আঁখির জলে
যাবোই না ও-পানশালাতে সুবাপায়ীর দলে।

কিন্তু যবে দীপ্ত-নব নাচত ফাগুন এসে,
কুঞ্জ-বনে ফুল্ল মনে উঠ্‌তো গোলাপ হেসে
টুট্‌ত আমার প্রতিশ্রুতি নিত্য বারংবার
বলত তারা—পান ক'রে নাও বাঁচবি কদিন আর?

(২১৮ রো. ও. খৈ.)

আব এব নজরুল কৃত-অনুবাদ :

নিত্য দিনে শপথ করি করব তৌবা আজ রাতে,
যাব না আর পানশালাতে, ছোঁব না আর মদ হাতে।
অমনি আঁখির আগে দাঁড়ায় গোলাপ-ব্যাকুল বসন্ত
সকল শপথ ভুল হ'য়ে যায়, কুলোয় না আর তৌবাতে।

(১২১ নং রুবাই)

শৈল্পিক ঔৎকর্ষের দিক থেকে নজরুলের অনুবাদ যে উত্তম এ-কথা বলার বোধ করি প্রয়োজন নেই। এক দিকে 'তৌবা' *প্রয়োগ ও 'গোলাপ-ব্যাকুল' শব্দটির সৃষ্টি, অন্যদিকে 'রাতে,' 'হাতে' ও 'তৌবাতে'র মিল। 'যাবনা'র সঙ্গে 'ছোঁবনা'র ভিতরের মিল এবং মধ্য মিল 'দাঁড়ায়' ও 'যায়' নজরুলকে সহজেই মনে করিয়ে দেয়। এমনি কাব্যকলার দিকে পূর্বতন দু'জন অনুবাদক কোনো দৃষ্টি দেননি। তাঁরা শুধু ভাবসংগতিব দিকে খেয়াল রেখেছেন কাব্যের রূপকল্পের অনুসরণের প্রয়োজনকে বাতিল করে দিয়েছেন। নরেন দেবও রুবাই-এর চার লাইনকে আট লাইন করেছেন আর কান্তি দেবের অনুবাদ আশ্রয় করেছে বিবর্জিত পুরাতনী ক্রিয়াপদের ভাষা। তাঁর অনুবাদে তৎসম শব্দ বেশী, তাঁর বক্তব্যে সেই মদ্য ত্যাগের প্রতিশ্রুতির জোরালো স্বর নেই।

* শরিয়তের নিয়মানুসারে কোনো মুসলমান পাপ করলে সে অনুতপ্ত হৃদযে 'তৌবা' ক'রে সে পাপ থেকে মুক্ত হতে পারে। 'তৌবা'র অর্থ এমন এক শপথ যা উচ্চারণ করলে যে অন্যায় একবার করা হয় তা পুনরায় করা যায় না।

যাতে করে ঘরোয়া কথার চলতি রূপটা তাঁর অনুবাদে প্রকাশ পায়নি। এটা দুর্বলতা। নজরুলের অনুবাদে যে সতর্কতা ও চিন্তার প্রতিফলন আছে সে সতর্কতা এঁদের অনুবাদে অনুপস্থিত। নজরুল যেই মাত্র বলেন, 'যাব না আর পান-শালাতে, ছোঁব না আর মদ হাতে' অমনি মাতালের জড়ানো স্বরটা দিব্যরূপ লাভ করে। সুতরাং নির্দ্বিধায় বলা যায় বাংলা ভাষায় "রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়ামে"র সার্থকতম অনুবাদক কাজী নজরুল ইসলাম। কান্তিচন্দ্র ঘোষ, নরেন দেবের অনুবাদ মিষ্টি কিন্তু নাট্যরসসমৃদ্ধ নয়। বুদ্ধদেব বসু "প্রতিধ্বনির" আলোচনায় বলেছেন—"ফরাসীতে একটা প্রবাদ আছে যে অনুবাদ জিনিসটা মেয়েদের মতো, রূপসী হ'লে সতী হয় না, সতী হলে কুরূপা হয়।" কথাটা হয়ত বা কিছুটা সত্য। তবে শক্তিমান অনুবাদক হযত প্রবাদটিকে মিথ্যাও প্রমাণ করতে পারেন। অর্থাৎ সতী নারীও কখনও কখনও বিস্ময়করভাবে সুন্দর হয়। যাহোক বলতে চাই সুন্দর করার জন্যে অনুবাদকে অসৎ করলে তা অনুবাদ হয় না, হয় অনুবাদকের সম্পূর্ণ নিজের কবিতা, মূল কবিতার সঙ্গে যার কোনো মিল থাকে না। কবিতার পংক্তি ঠিকমত আয়ত্ত না করতে পারাতে ফিটজিরাল্ড এই ভ্রান্তপথ অবলম্বন করেছিলেন। এখানে তারই একটি উদাহরণ দেব। "রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়ামে"র প্রথম যে রুবাইটি ফিটজিরাল্ড অনুবাদ করেন তার মূল লেখাটি এই :

Khurshid kamandi sobh bar bam afgand
Kai Khusro i roz badah dar jam afgand
Mai khur ki manadi sahri gi khizan
Awaza i ishrabu dar ayam afgand.

[Two Comparative Renderings : R.O.R. : R.A.S.: P. 82]

এর অনুবাদ করেন ফিটজিরাল্ড ১ম সংস্করণে এইভাবে :

Awake ! for Morning in the Bowl of Night
Has flung the Stone that puts the stars to Flight :
And lo ! the Hunter of the East has caught
The Sultan's Turret in a Noose of light.

দ্বিতীয় সংস্করণে এইভাবে :

Wake ! For the Sun behind yon Eastern height
Has chased the Session of the Stars from Night :
And, to the field of Heav'n ascending, strikes
The Sultan's Turret with a Shaft of Light.

আবেরি বলেছেন :

it is interesting to speculate how differently FitzGerald might have translated this quatrain if the copyist had transcribed it correctly, and if he himself read it correctly. The phrase Kai-Khusraw-i-ruz (the Emperor of Day) beginning the second line was misread as Kanjru- yi ruz : Fitz-Gerald then looked into the dictionary and found the word ganjar ('rouge') : so he conjecturd the meaning 'Rouge-faced Day', suggesting to him ultimately the lines :

Awake ! for Morning in the Bowl of Night
Has flung the Stone that puts the stars to Flight,

[Appendix R.O.R. A.J. Arbery, P. 136-7]

অর্থাৎ প্রথম যে দু'লাইনের অর্থ দাঁড়াত :

The sun has thrown the lassoo of dawn over the roof ;
the emperor of day has thrown the bead in the cup.

[Note · R.O.R. : A. J- Arberry : P. 192]

তার অনুবাদ ফিটজিরাল্ড এমনিভাবে করলেন। ৩য় পংক্তি বুঝতে ফিটজিরাল্ডের অসুবিধা হয়নি। কিন্তু ৪র্থ পংক্তি তিনি আদৌ অনুধাবন করতে পারেননি, তার কারণ মূল পারসী থেকে যিনি কপি করেছেন তিনি Awaza i ishrabu dar ayam afgand-এর পরিবর্তে Awaza-yi sh. r. bu w. z aiyam afgand লেখেন। বস্তুত শেষের দু'লাইনের অর্থ হল :

Drink wine, for the herald of dawn arising
has flung the cry 'Drink !, into the days.

[Appendix : R.O.R. A.J. Arberry, P. 137]

ফিট্‌জিরাল্ড এই শেষের দু'লাইন বাদ দিয়ে প্রথম দু'লাইনকেই চার পংক্তিতে অনুবাদ করেন। আরবেরি বলেছেন: In the end Fitz-Gerald abandoned the second half of this quatrain and made his stanza I out of the first half only."

গ্রেভস ও শাহ তাঁদের "রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম" গ্রন্থে ফিট্‌জিরাল্ডের এই ভুল অনুবাদ দেখিয়ে স্তবকটির অনুবাদ করেছেন এমনিভাবে:

While Dawn, Day's herald straddling the whole sky
Offers the drowsy world a toast 'To Wine ;
The Sun spills early gold on city roofs---
Day's regal Host, replemishing his jug.

[Two Comparative Renderings : R O.K. by R. G. and O.A.S P.82]

অর্থাৎ দিনের ঘোষক ঊষা আকাশ উদ্ভাসিত করে দাঁড়াল এবং তন্দ্রামগ্ন পৃথিবীকে উৎসর্গ করল মদ; প্রভাত সূর্য, দিনের রাজকীয় অতিথিসেবক, পুনর্বার পাত্র পূর্ণ করল তার আর ছড়িয়ে দিল তার সোনালী রশ্মি শহরের প্রাসাদ-শীর্ষে। শেষের দু'লাইনের অর্থ আরবেরি যা করেছেন—তা হ'ল:

'Drink wine, for the herald of dawn arising has flung the cry 'Drink'! into the days.

অর্থাৎ শরাব পান করো, কেননা ঊষার ঘোষক জাগছে--আর সে ছুঁড়ে দিয়েছে দিনের চত্বরে এক চীৎকার, 'পান কর'!

আমরা লক্ষ্য করছি আরবেরি ও গ্রেভস-শাহ্ উভয়েই ওমরের মূল পারসী রুবাই অনুযায়ী 'পান'-এর কথা উল্লেখ করেছেন। এই 'পান' করা কথাটি ফিট্‌জিরাল্ডের অনুবাদ থেকে সম্পূর্ণ বাদ গিয়েছে। ফলে যাঁরা ফিটজিরাল্ডের অনুবাদকে অনুবাদ করেছেন তাঁদের সবারই অনুবাদে ঐ ত্রুটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কান্তিচন্দ্র ঘোষ তাই অনুবাদ করেছেন এমনি ভাবে:

রাত পোহালো—শুনছ সখি, দীপ্ত ঊষার মাঙ্গলিক?
লাজুক তারা তাই শুনে কি পালিয়ে গেল দিগ্বিদিক!
পূব-গগনের দেব-শিকারীর স্বর্ণ-উজল কিরণ-তীর
প'ড়ল এসে রাজ-প্রাসাদের মিনার যেথা উচচশির॥ (১ রো.ও.খৈ)

ফিট্‌জিরাল্ডের প্রথম সংস্করণ 'রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম' এর প্রথম রুবাই-এর ৩য় ও ৪র্থ পংক্তি র চিত্রকল্পের এ একেবারে হুবহু অনুসরণ। ঈষৎ পরিবর্তিত

কেবল প্রথম দুটি লাইন—বিশেষ করে প্রথম লাইনটি। সখিকে সম্বোধন ফিট্-জিরাল্ডে নেই। আর উষার মাঙ্গলিক শুনে তারারা পালিয়েছে এ-কথা ফিট্-জিরাল্ড বলেননি। রাত্রির পাত্রে প্রভাত ছুঁড়ে মেরেছে পাথর, আর তারই ভয়ে তারারা পালিযেছে—এই ছিল ফিটজিরাল্ডের প্রথম সংস্করণের চিত্রকল্প। দ্বিতীয় সংস্করণে চিত্রকল্পটি রূপ বদলেছে এইভাবে—পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠে তারার দলকে রাত্রির প্রাঙ্গণ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। যা হোক ওমরের চিত্রকল্পই শুধু নয় ভাবগত বিষয় থেকেও এঁরা দূরে সরে গিয়েছেন অনেক। এখন দেখা যাক নজরুল কতটা কাছাকাছি আছেন। প্রসংগসূত্রে নজরুলের রুবাইটি এখানে উদ্ধৃত হল :

বাতের আঁচল দীর্ণ ক'রে আসল শুভ ঐ প্রভাত,
জাগো সাকী। সকাল বেলার খোঁয়ারি ভাঙো আমার সাথ।
ভোলো ভোলো বিষাদ-স্মৃতি। এমনি প্রভাত আসবে ঢের,
খুঁজতে মোদের এইখানে ফের করবে করুণ নয়নপাত।

(১ নং রুবাই)

ওমবের চিত্রকল্পের সঙ্গে পার্থক্য ঘটে গেছে নজরুলের চিত্রকল্পের ; কিন্তু দিনের আবির্ভাব হয়েছে ; অতএব, এসো, মদ্যপান করি—'খোঁয়ারি ভাঙো আমার সাথ' বাক্যে নজরুল সে বক্তব্য-টুকুকে অনড় রেখেছেন। এখানে 'খোঁয়ারি' শব্দটা চোখে লাগার মত। শব্দটা পরিবেশের বাস্তবতাকে জীবন্ত করে তুলেচে। মাতাল-সমাজে প্রচলিত এই শব্দ বাংলার মৌখিক ভাষায় প্রচলিত আছে। ঠিক স্থান মত নজরুল সেটাকে কাজে লাগিয়েছেন। 'খোঁয়ারি' মানে মদের নেশা কাটবার পর অবসাদ বা গ্লানি। আর 'খোঁয়ারি ভাঙা' মানে 'খোঁয়ারি' দূর করবার জন্য পুনরায় অল্পমাত্রায় মদ খাওয়া অর্থাৎ অবসাদ বা তন্দ্রাজনিত অবসাদ দূর করবার জন্য মদ খাওয়া। সুতরাং এই বাক্যটি offers the drowsy world a toast 'to wine' (অল্প মাত্রায় মদ অর্পণ করে তন্দ্রালু পৃথিবীকে) এরই ভাবানুবাদ বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু শেষের দুটি লাইন নজরুলের সম্পূর্ণ নিজস্ব। এখানে কেবল ওমরের ভাবনার সঙ্গে সংগতি রেখে দুটি নতুন পংক্তি তৈরী করা হয়েছে। প্রভাত বারবার ফিরে আসবে কিন্তু আমরা একবার এই পৃথিবী থেকে চলে গেল আর আসব না, করুণ দৃষ্টি ফেলে প্রভাত আমাদের খুঁজতে চেষ্টা করে ব্যর্থ

হবে। সুতরাং অতীতের ব্যর্থজীবনের বেদনাময় স্মৃতিকে ভুলতে,—'এসো আরো কিছুটা মদ্যপান করি'—ক্লান্তি অপনোদিত হোক। লক্ষ্য করবার বিষয় এই ধরনের অর্থময় অনুবাদ ফিটজিরাল্ডের স্তবকটি নয়। কান্তিচন্দ্র ঘোষের অনুবাদই পরিচয় দেয় যে চিত্রকল্পটি তাৎপর্যপূর্ণ কোন গভীর অর্থকে ইঙ্গিত করেনা যেমনটি নজরুলের অনুবাদ করেছে। বলতেই হয় অবশ্য রুবাইটির অনুবাদ নজরুলও স্বেচ্ছাচারীর মত করেছেন।* ফিট্‌জিরাল্ডের চিত্রকল্পটি চমৎকার এমনকি এই চিত্রকল্পটি বাঙালী কবিদের অনুপ্রাণিত করেছিল। এর প্রমাণ মোহিতলাল মজুমদারের নিম্নোক্ত স্তবক :

বাম হাতখানি তুলিয়াছে ঊষা 'পামীর' পাহাড়-চূড়ে
আগুনের বাণ অরুণের ওই উড়িল কুয়াশা ফুঁড়ে।
আগুনের বিষ-বল্লম হুঁড়ি রাত্রির কালো বুকে
পূবের শিকারী নীল-বালুচরে দাঁড়াইল রাঙামুখে।

[নাদির শাহের জাগরণ]

এখানে সূর্যের প্রতীক 'পূবের শিকারী' ফিটজিরাল্ডের Hunter of the East! কৌতুকের ব্যাপার ফিটজিরাল্ড-অনূদিত রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়ামের ২য় রুবাইটির "Dawn's Left Hand was in the Sky" মোহিতলালে হয়েছে "বাম হাতখানি তুলিয়াছে ঊষা"।

* বাংলা ১৩৪০ সালের মাসিক "মোহাম্মদী"র কার্তিক সংখ্যায় নজরুল এই রুবাইটির যে অনুবাদ করেন মূলের সংগে তার অনেক বেশী সাদৃশ্য ছিল। পরবর্তীকালে এটাকে পরিবর্তন করার কারণ জানি না। হয়ত অন্য কারও অনুবাদের সংগে মিল হওয়ার আশংকায় তাঁর সৃজনধর্মী প্রতিভা স্তবকটির সম্পূর্ণ রূপান্তর করে। এখানে মোহাম্মদীর সেই অনুবাদটি মূলের সংগে তুলে দিলাম :

মূল : খুরশিদ কামান্দি সোভ বার বাম আফগান্দ
কায়খসরু-ই-রোজ-বাদাহ্ দর জাম আফগান্দ
মায় খুর কি মানাদি সাহারি গি খিজান
আওয়াজ-ই ইশবাকু দর আইয়াম আফগান্দ।

অনুবাদ : পূর্বাশায় ঐ মিহির হানে তিমির-বিদার কিরণ তীর,
কায়খসরুর লাল পিয়ালায় ঝরছে যেন মদ জ্যোতির
ভোরের শুভ্র বেদী মূলে ডাক দিয়ে কয় মুয়াজ্জিন
জাগো জাগো, প্রসাদ পেতে ঊষার ঘটের লাল-পানির।

জসীমউদ্দীনকেও প্রায় অনুরূপ চিত্রকল্প সৃষ্টি করতে দেখি:

পূর্বগগনে রক্ত-বরণ দাঁড়াল পিশাচী এসে
ধরণী ভরিয়া লোহু উগারিয়া বিকট দশনে হেসে।
ডাক শুনি তার কবরে যাইয়া পালাল মৃতের দল,
শ্মশান ঘাটায় দৈত্য দানার থেমে গেল কোলাহল।

[পূর্বরাগ : সোজন বাদিয়ার ঘাট]

এখানে শিকারী হয়েছে 'পিশাচী' আর পলাতক 'তারার দল' হয়েছে 'মৃতের দল'। ঐ আকর্ষণীয় চিত্রকল্প সৃষ্টি করে ফিট্‌জিরাল্ড তাঁর কবিত্বশক্তির পরিচয় প্রদান করেছেন ঠিকই কিন্তু ওই স্তবকে অন্তত ওমরকে বাঁধতে পারেননি। কিন্তু নজরুল খুব স্বচ্ছন্দেই মূল কবির স্বভাব উদ্‌ঘাটন করেছেন -drunk-ards language-এ "খোঁয়ারি ভাঙো" বাক্য নির্মাণ করে। এখানেই নজরুলের বুদ্ধিজাত সূক্ষ্ম ভাব-কল্পনা প্রশংসা দাবি করে এবং আমরা নজরুলের অনুবাদে ওমরের ভাবনা ও বক্তব্য প্রকাশের ভঙ্গির উপস্থাপনা দেখে বিশ্বাস করতে বাধ্য হই নজরুলের এই কথা : "আমি আমার ওস্তাদী দেখাবার জন্য ওমর খৈয়ামের ভাব, ভাষা বা স্টাইলকে বিকৃত করিনি।"

পাঠকের অবগতির জন্য একটা কথা এইখানে বলে রাখি। অনেকের ধারণা আবেগবিহ্বল নজরুল ভেবে চিন্তে কেটে ছিঁড়ে সাজিয়ে গুছিয়ে লেখার পক্ষপাতী ছিলেন না। এ-সব কিন্তু দায়িত্বহীন কথা। শুধু কবি নয় অনুবাদক-কবি হিসেবেও নজরুলের একটা পরিচয় আছে। তিনি আরবী ছন্দে কবিতা লিখেছেন, ফারসী ছন্দে ফারসী অনুবাদ করেছেন। আর যখন কোনো কবি আঙ্গিক না বদলিয়ে অনুবাদ করার চেষ্টা করেন তখন মূল কবিতার ছন্দোবন্ধ ও রূপকল্পের কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হন। সেখানে স্বকীয়তা বজায় রাখার প্রচেষ্টা চালানো গেলেও স্বেচ্ছাচারিতা চলে না — কবিকে সংযমের শিকল পরতেই হয়। হাফেজ ও ওমর অনুবাদে নজরুল এই স্থৈর্যের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর উদ্বেলিত আবেগ এখানে প্রশান্তির শাসনে সুন্দর হয়ে উঠেছে। আর এ শাসনে ধরা দেওয়ার মত মনের প্রস্তুতি নিয়েছিলেন তিনি সংগীত শিক্ষা ও গান লেখার মাধ্যমে। ধ্যান ছাড়া এই জিনিস আয়ত্ত হয় না। অট্টহাস্যে ছাদ-ফাটানো নজরুল ভিতরে ছিলেন এই ধ্যানী সাধক। বলা বাহুল্য অনুবাদ তখনই সার্থক হয় যখন স্বভাবে চরিত্রে মেজাজে এবং

কল্পনা-শক্তিতে মূল কবির সঙ্গে সাদৃশ্য থাকে। ওমরের সঙ্গে নজরুলের কি তেমন সাদৃশ্য ছিল? ওমরের মত নজরুল একজন শ্রেষ্ঠ অঙ্কবিদ ছিলেন না। তিনি তাঁর মত বৈজ্ঞানিক, পণ্ডিত কিংবা জ্যোতির্বিদ ছিলেন না। শোনা যায় নজরুল কিছু কিছু জ্যোতির্বিদ্যার চর্চা করেছিলেন এবং যাকে intuition বলে সেই সজ্ঞা তাঁর ছিল এবং তা অপ্রখর ছিল বলে মনে হয় না। ক্লাসে তিনি ফার্স্ট বয় ছিলেন এবং দাবা খেলায় ছিলেন একজন আকর্ষণীয় দাবাড়ে। এই দাবা খেলায় অঙ্কের মাথা কিছুটা সাহায্য করে। যে বুদ্ধির ভারসাম্যে এই গণিতে পারদর্শিতা লাভ করা যায় তার সঙ্গে ওমরের বুদ্ধির চারিত্র্যগত সাদৃশ্য থাকা বিচিত্র নয়। আমরা ওমরের রুবাইয়াতে দাবার প্রতীক ব্যবহৃত কতকগুলো রুবাই দেখি যা নজরুল অনুবাদ করেছেন। আর এ অনুবাদগুলোও চমৎকার হওয়ার পিছনে কাজ করেছে দাবা খেলায় নজরুলের অভিজ্ঞতা। এখানে দাবা সংক্রান্ত রুবাইগুলোর নজরুল-কৃত অনুবাদ তুলে দিলাম :

১. আমরা দাবাখেলার ঘুঁটি, নাইরে এতে সন্দ নাই!
আসমানী সেই রাজ-দাবাড়ে চালায় যেমন চলছি তাই।
এই জীবনের দাবার ছকে সামনে পিছে ছুটছি সব,
খেলার শেষে তুলে মোদের রাখবে মৃত্যু-বাক্সে ভাই! (১৬১ নং)

২. আসমানি হাত হতে যেমন পড়বে ঘুঁটি ভাগ্যে তোর।
পণ্ডশ্রম করিসনে তুই হাতড়ে ফিরে সকল দোর।
এই জীবনের জুয়াখেলায় হবেই হবে খেলতে ভাই
সৌভাগ্যের সাথে বরণ করে নে দুর্ভাগ্য তোর। (১৬২ নং)

৩. চাল ভুলিয়ে দেয় রানী মোর খঞ্জন ঐ চোখ খর,
বোড়ে দিয়ে বন্দী ক'রে আমার ঘোড়া গজ হর!
তোমার সকল বল আগিয়ে কিস্তির পর কিস্তি দাও,
শেষে লালা-রুখ্ দেখিয়ে 'রুখ' নিয়ে মোর মাত্ কর। (১৬৩ নং)

৪, লাল গোলাপে কিস্তি দিয়ে তোমার ও গাল করে মাত,
খেলতে গিয়ে চীন কুমারী হারে প্রিয়া তোমার সাথ।
খেলতে বাবেল-রাজার সাথে হানলে চাউনি একটিবার
মন্ত্রী ঘোড়া গজ নিলে তার হেনে ঐ এক নয়ন-পাত। (১৬৭ নং).

দাবাকে প্রতীক করে এতগুলো রুবাই নজরুলের আগে অন্য কেউ অনুবাদ করেননি। আর এক আধটা করলেও তা অমন সার্থকও হয়নি। এখানে প্রথমোদ্ধৃত স্তবকটির কান্তিচন্দ্রকৃত অনুবাদের স্তবকের সঙ্গে তুলনা করলে ব্যাপারটা অনুবাধন করা যাবে। কান্তিচন্দ্রের অনুবাদ :

> ছকটি আঁকা সৃজন-ঘরের রাত্রি দিবা দুই রঙের,
> নিয়ৎ দেবী খেলছে পাশা, মানুষ ঘুঁটি সব ঢঙের :
> পড়ছে পাশা ধরছে পুনঃ কাটছে ঘুঁটি, উঠছে ফের—
> বাক্সবন্দী সব পুনরায়, সাঙ্গ হ'লে খেলার জের। (৪৯ রো. ও. খৈ :)

এখানে ছন্দের গাঁথুনী আছে কিন্তু বলবার অভিজাত নাটকীয় ভঙ্গি নেই। নজরুল 'রাজদাবাড়ে' বলে যে শব্দটি তৈরী করেছেন সেটি সেই অজানা শক্তি যার হাতে মানুষের জন্ম-মৃত্যু নির্ভরশীল। "নিয়ৎ দেবী" বহু ব্যবহৃত শব্দ তাই মলিন। 'রাজ-দাবাড়ে' নতুন শব্দ যেটা খাঁটি কবি-কল্পনায় প্রথমবারের মত সৃষ্টি হয়েছে। নজরুলের ভাষা স্বচ্ছ, সুস্পষ্ট, অর্থব্যঞ্জক—চিত্ররূপময় অর্থালঙ্কারের ভাষা। কান্তিচন্দ্রের ভাষা প্রচলিত ব্যবহৃত চমকহীন নিরুজ্জ্বল কাব্য ভাষা এ ভাষা পাঠকের মনোযোগ কাড়তে পারে না। আর এর অন্ত্যানুপ্রাস যথেষ্ট অর্থসংগতি বহন করে না। এইজন্যে বলছিলাম স্বভাবগত এবং কল্পনাগত মিল অনুবাদের জন্যে কতখানি উপযোগী।

এবার ওমরের সঙ্গে স্বভাবগত আর একটি মিলের কথা বলব আর সেটা হল সমাজ-জীবনে উভয়ের সমাজের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি। আমরা জানি ওমর যেমন স্বাধীনচেতা ছিলেন, বিদ্রোহী মনোভাবাপন্ন ছিলেন, সকল প্রকার কুসংস্কার ভণ্ডামি এবং গোঁড়ামির প্রতি ছিলেন খড়্গহস্ত নজরুলও ঠিক তেমনই ছিলেন। এখানে বলে রাখা দরকার নজরুলের এই স্বভাব ওমরের কাব্য পড়ে তৈরী নয়। এটা তাঁর জন্মপ্রাপ্য প্রকৃতিপ্রদত্ত স্বভাব। অনুকৃতির ফলে এ তৈরী হয় না। তা হ'লে ওমর পড়ে অনেকে ওমর হতেন, নজরুল পড়ে হতেন নজরুল। ওমরের সঙ্গে নজরুলের আর একটি মিল চারিত্রিক ঔদার্য। দু'জনেই ধর্মীয় গোঁড়ামির সম্পূর্ণ উর্ধ্বে ছিলেন। ওমরের কাছে যেমন হিন্দু, মুসলমান, পার্সী, খ্রীষ্টান বলে ভিন্ন ভিন্ন কোনো সম্প্রদায় ছিল না, নজরুলের কাছেও তেমনি কোনো জাতিভেদ ছিল না। ভারতবর্ষের হিন্দু-মুসলমানকে তিনি

দু'ভাগ করে কখনও দেখেননি। এই যে সবমানুষের প্রতি প্রেম, নজরুলের এই প্রেমিক হৃদয়ই ওমরকে দ্রুত এবং সম্পূর্ণভাবে বুঝতে সাহায্য করেছিল। তাই ঐ ধরনের অনুবাদেও নজরুল তুলনাহীন। কুসংস্কার, ভণ্ডামি গোঁড়ামি ইত্যাদির প্রতি ওমরের বিদ্রূপাত্মক রুবাই-এর নজরুল-কৃত অনুবাদ এখানে দেওয়া যেতে পারে।

১. ভণ্ড যত ভড়ং ক'রে দেখিয়ে বেড়ায় জায়নামাজ,
চায় না খোদায়—লোকের তারা প্রশংসা চায় ধাপ্পাবাজ।
দিব্যি আছে মুখোশ পরে সাধু ফকীর ধার্মিকের,
ভিতরে সব কাফের ওরা, বাইরে মুসলমানের সাজ। (১৩৫ নং)

২. তিরস্কার আর করবে কত জ্ঞান-দাম্ভিক অর্বাচীন?
লম্পট নই, পান যদিও করি শরাব রাত্রিদিন।
তোমার কাছে তস্‌বী দাড়ি, তাপস সাজার নানান মাল,
আমার পুঁজি দিল্-প্রিয়া আর লাল পেয়ালি মদ-রঙীন। (১১৯নং)

৩. দোষ দিও না মদ্যপায়ীর তোমরা, যারা খাওনা মদ,
ভালো করার থাকলে কিছু, মদ খাওয়া মোর হত রদ্।
মদ্ না-পিয়েও, হে নীতিবিদ, তোমরা যে-সব কর পাপ,
তাহার কাছে আমরা শিশু, হই না যতই মাতাল-বদ্। (৬৪ নং)

ধর্মবর্ণ জাতির উর্ধ্বে ওমরের যে মানসিকতা তার পরিচয় আছে নিম্নের রুবাই দুটিতে:

১. হৃদয় যাদের অমর প্রেমের জ্যোতির্ধারায় দীপ্তিমান,
মসজিদ, মন্দির, গীর্জা যথাই করুক অর্ঘ দান—
প্রেমের খাতায় থাকে লেখা অমর হ'য়ে তাদের নাম,
স্বর্গ-লোভ ও নরকভীতির উর্ধ্বে তারা মুক্ত-প্রাণ। (৫৯ নং)

২. মুগ্ধ করো নিখিল-হৃদয় প্রেম-নিবেদন কৌশলে
হৃদয়-জয়ী হে বীর, উড়াও নিশান প্রিয়ার অঞ্চলে
এক হৃদয়ের সমান নহে, লক্ষ মস্‌জিদ আর কাবা
কি হবে তোর তীর্থে 'কাবা'র শান্তি খোঁজ হৃদয় তলে। (৫৭ নং)

দরিদ্রের প্রতি ওমরের সমবেদনা প্রকাশ পেয়েছে নিম্নলিখিত রুবাই দুটিতে:

১. মার্কা-মারা রইস্ যত—ঈষৎ দুখের বোঝার ভার
বইতে যাঁরা পড়েন ভেঙে, বিস্ময়ের নাই অন্ত আর,
তাঁরাই যখন দীন দরিদ্রে দেখেন দ্বারে পাততে হাত
তাদের তখন চিন্‌তে নারেন মানুষ ব'লে এই ধরার। (১৩৯ নং)

২. দরিদ্রেরে যদি তুমি প্রাপ্য তাহার অংশ দাও।
প্রাণে কারুর না দাও ব্যথা, মন্দ কারুর নাহি চাও
তখন তুমি শাস্ত্র মেনে নাই চললে তায় বা কি।
আমি তোমায় স্বর্গ দেব, আপাতত শরাব নাও। (১৪০ নং)

শোষকের বিরুদ্ধে উৎপীড়কের বিরুদ্ধে ওমরের রোষানল ও ঘৃণা ছড়িয়ে পড়েছে নিম্নোদ্ধৃত রুবাই-এ :

১. হে শহরের মুফ্‌তি! তুমি বিপথ-গামী কম ত নও,
পানোন্মত্ত আমার চেয়ে তুমিই বেশী বেহুঁশ হও।
মানব-রক্ত শোষ তুমি, আমি শুষি আঙুর-খুন
রক্ত-পিপাসু কে বেশী এই দু-জনের তুমিই কও! (১৩৪ নং)

বঞ্চিতের প্রতি সমবেদনা ও উৎপীড়কের প্রতি ঘৃণা প্রকাশে ওমরেরও যে একটা সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল নজরুলের অনুবাদেই আমরা তা দেখতে পেলাম। ফিটজিরাল্ডের অনুবাদে এই ধরনের রুবাইয়ের আমরা সাক্ষাৎ পাই না। উপরোক্ত রুবাইগুলিতে নজরুল নিজের আদর্শের স্বরূপ লক্ষ্য করেছিলেন। এবং সেজন্যেই তাঁর মনোমত বিষয় হিসেবে এ-গুলোর অনুবাদ করেছেন। এর থেকে আমরা ওমরের একটা ভিন্ন চরিত্রের পরিচয় পাচ্ছি। আর তাহ'ল সুরা ও সাকীতে মশগুল হয়ে দুনিয়ার প্রতি তিনি সম্পূর্ণ বেখেয়াল ছিলেন না। এবং নজরুলের সে-কথাও আমরা মানতে বাধ্য হচ্ছি—"ওমরকে তাঁর কাব্য প'ড়ে যাঁরা তাঁকে Epicurean বলে অভিহিত করেন, তাঁরা পূর্ণ সত্য বলেন না।"

ফিট্‌জিরাল্ডের 'রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম' প'ড়ে নজরুলের চরিত্রের সঙ্গে ওমরের কোন মিল পাওয়া যাবে না। ফিট্‌জিরাল্ডের ওমর ভোগ-বিলাসী, স্বর্গ-নরকে অবিশ্বাসী, নাস্তিক এবং সংসারের প্রতি প্রায় দায়িত্বহীন। নজরুলের "রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়ামে"র একাংশে এমনি একটি চরিত্রের পরিচয় মেলে বটে কিন্তু তার পাশে আরও একজনকে দেখি যিনি উপরের ঐ রুবাইগুলো

লিখেছেন এবং তারই সঙ্গে মানুষকে দিয়েছেন সৎগুরুর মত উপদেশ। যেমন :

১. দাস হয়ো না মাৎসর্যের, হয়োনাক অর্থ-যখ,
ঘাড়ে যেন ভর করে না ঠুনকো যশোখ্যাতির সখ,
অগ্নিসম প্রদীপ্ত হও, বন্যা সম প্রাণোচ্ছল,
হয়ো নাক পথের ধূলি, হাওয়ার হাতের ক্রীড়নক। (১৪৩ নং)

২. কারুর প্রাণে দুখ দিও না, করো বরং হাজার পাপ,
পরের মনের শান্তি নাশি বাড়িও না তার মনস্তাপ।
অমর আশিস লাভের আশা রয় যদি, হে বন্ধু মোর,
আপনি সয়ে ব্যথা, মুছো পরের বুকের ব্যথার ছাপ। (৩৯ নং)

৩. থামকা ব্যথার বিষ-খাসনে, মুষড়ে যাসনে নিরাশায়,
ফেরেব-বাজির এই দুনিয়ায় তুই ধরে থাক সত্য ন্যায়
আখেরে ত দেখলি বিশ্ব শূন্য ফাঁকা ফক্কিকার,
তুইও মায়ার পুতুল যখন—ভয় ভাবনা যাক চুলায়। (১৮১ নং)

৪. ধীর চিত্তে সহ্য কর, দুঃখ শোকের এই দাওয়াই
দুঃখ পেয়ে রুক্ষ মেজাজ হসনে, দেখবি দুঃখ নাই।
অভাবে ক্ষয় হয় না যেন তোর স্বভাবের প্রশান্তি,
ষড়ৈশ্বর্য লাভের উপায়, আমার মতে, এই সে ভাই। (১৪৬ নং)

৫. আমার কাছে শোন উপদেশ—কাউকে কভু বলিসনে—
মিথ্যা ধবায় কাউকে প্রাণের বন্ধু মেনে চলিসনে
দুঃখ ব্যথায় টলিসনে তুই, খুঁজিসনে তার প্রতিষেধ,
চাসনে ব্যথার সমব্যথী, শির উঁচু রাখ টলিসনে। (৪৪ নং)

এই রকম উপদেশ-দাতা হিসাবে ওমরকে ভাবা এইজন্যে কঠিন যে ওমর নিজে উপদেশ শুনতে নারাজ। যে-জন্য তিনি বলেন :

খাজা! তোমার দরবারে মোর একটি শুধু আর্জী এই—
থামাও উপদেশের ঘটা, মুক্তি আমার এই পথেই।
দৃষ্টি দোষে দেখছ বাঁকা আমার সোজা সরল পথ
আমায় ছেড়ে ভালো করো ঝাপসা তোমার চক্ষুকেই। (৩২ নং)

কিন্তু উদ্ধৃত রুবাইটিতে ওমর মোল্লাদের উপদেশে বিরক্তি প্রকাশ করলেও তিনি সৎ ব্যক্তির উপদেশ শোনাকে খারাপ বলেননি। উপদেশ কেমন ব্যক্তির কাছে শোনা যায় সে-কথা তিনি বলেছেন :

যোগ্য হাতে জ্ঞানীর কাছে ন্যস্ত কর এই জীবন,
নির্বোধদের কাছ থেকে ভাই থাকবে তফাত দশ যোজন।
জ্ঞানী হাকিম বিষ যদি দেয় বরং তাহাই করবে পান,
সুধাও যদি দেয় আনাড়ি, করবে তাহা বিসর্জন। (১৪৪ নং)

এবং বলা বাহুল্য দুনিয়ায় শোকতাপ ভোলার জন্য দুঃখ-বেদনা বিস্মৃত হওয়ার জন্য, আনন্দের উত্তেজনা পেতে তিনি যে সুরাপানের জন্য আহ্বান করছেন সে সুরা পানে সবারই যে অধিকার আছে তাও তিনি মনে করেন না। তাই তাঁকে বলতে শুনি :

যদিও মদ নিষিদ্ধ ভাই, যত পার মদ চালাও,
তিনটি কথা স্মরণ রেখো কাহার সাথে মদ্য খাও
মদ পানের কি যোগ্য তুমি? কি মদই বা করছ পান?
জ্ঞান পেকে না ঝুনো হ'লে মদ খেয়োনা এক ফোঁটাও! (১০৪ নং)

শুধু তাই নয় মদ্য পান করা মানে যেখানে সেখানে মদ খাওয়া নয়। স্থান-মাহাত্ম্য বুঝে তিনি শরাব খাওয়ার উপদেশ দিয়েছেন। তাই তাঁর বক্তব্য হল :

সাবধান! তুই বসবি যখন শরাব-পানের জলসাতে,
মদ খাসনে বদ্-মেজাজী নীচ কুৎসিত লোক সাথে।
রাত্তির ভর্ করবে সে নীচ চীৎকার আর গণ্ডগোল,
ইতর সম চেঁচিয়ে কারণ দর্শাবে ফের সে প্রাতে। (১০৩ নং)

প্রকৃতপক্ষে ঢালাওভাবে সকলকে মদ খেতে পরামর্শ দেননি ওমর। তাই হজরতের জবানীতে তিনি বলেন :

কোথায় আমি বলেছি যে সবার তরে মদ হারাম
জ্ঞানীর তরে অমৃত এ, বোকার তরে উহাই বিষ। (১৯৭ নং)

উপরের উদ্ধৃতিই প্রমাণ করে যে ফিট্জিরাল্ড যে ওমরকে আমাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন আসল ওমর ঠিক তা নন। ওমরের রুবাইয়াৎ পড়ে ওমরের জীবন-দর্শন সম্বন্ধে নজরুল যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন সেটি প্রণিধানযোগ্য।

পূর্বাহ্নে, ওমরের উপর লিখিত নজরুলের প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে দেখিয়েছি যে ওমর সম্বন্ধে ফিট্‌জিরাল্ডের মতকে তিনি মেনে নিতে পারেননি। কেন পারেননি সে ব্যাখ্যা করতে তিনি ৬টি কারণ দর্শেছেন। এর মধ্যেই উভয়ের মধ্যে মত-পার্থক্যের ব্যাপারটি লক্ষণীয়। ফিট্‌জিরাল্ডের ধারণা ছিল যুক্তি-বাদী ওমর সুফী ছিলেন না বরং ছিলেন great opponent of sufism-নিযতিবাদী ওমরকে তিনি অকম্প্র ঋজু চিন্তার মধ্যে অবস্থিত দেখেছেন। কিন্তু এই মতবাদ সবাই মানেননি। ফিটজিরাল্ড নিজেই বলেছেন ওমর খৈয়ামের ৪৬৪টি রুবাইয়ের ফরাসী অনুবাদক মসিয়েঁ নিকোলাস does not consider Omar to be the material Epicurean that I have literally taken him for, but a Mystic, shadowing the Daity under the figure of Wine, Wine-bearer, & c. as Hafiz is supposed to do; in short, a Sufi poet like Hafiz and the rest. এই উদ্ধৃতি দিয়ে ফিট্‌জিরাল্ড বলেছেন: I cannot see reason to alter my opinion. * অর্থাৎ ওমর যে এপিকিউরিয়ান, ওমর সম্বন্ধে ফিটজিরাল্ড তাঁর এই মত পরিবর্তন করার কোন কারণ দেখেন না। ওদিকে ওমর আলী শাহ্‌ নিকোলাসকে সমর্থন ক'রে বলেন যে ওমরের সঙ্গে নিকোলাসের পরিচয় ফিটজিরাল্ডের চেয়ে গভীর বলে মনে হয়। কেননা ফিটজিরাল্ড ওমরকে চিনেছিলেন অধ্যাপক কাওয়েলের মাধ্যমে যিনি প্রথমত ফিটজিরাল্ড থেকে দূরে ভারতবর্ষে ছিলেন; এবং সুফী কাব্য সম্বন্ধে কাওয়েলের জ্ঞান জনসনের পারসী ইংরেজী অভিধানের মাধ্যমে গৃহীত। ওদিকে নিকোলাস as French Consul at Resht, was in touch with far better informed opinion than Fitzgerald.†

এই রকম ভিন্নমতের জন্য ফিটজিরাল্ড ওমরকে যে-ভাবে অনুবাদ করেছেন বলছিলাম নজরুল তা করেননি। এবং নজরুল যে দু'টি কারণ দেখিয়েছেন তার পূর্ণ ব্যাখ্যা হিসেবে ওমর সম্বন্ধে নজরুল তার সম্পূর্ণ ধারণাকে এই ভাবে ব্যক্ত করেছেন:

* Introduction to Third Edition: Rubaiyat of Omar Khaiyam: Edward Fitzgerald, Latest Reprint 1969: Collins—P. 45.

† Historical preface Omar Ali Shah. The R. O. K. by R. G. and O. A. S.: P. 32.

ওমর সুফী ছিলেন কি না জানিনে। কিন্তু ঐ পথের পথিক যাঁরা, তাঁরা ওমরকে সুফী এবং খুব উঁচুদরের তাপস ব'লে মনে করেন। তাঁরা বলেন, সুফী জনপ্রিয়তার বা লোকের শ্রদ্ধা জুলুম এড়াবার জন্যই ঘোরতর পাপ করছেন বলে দেখান। তাঁরা নিজেদের মদ্যপ লম্পট ব'লে স্বেচ্ছা-নির্বাসন বরণ ক'রে নিজেরা গুপ্ত সাধনায় মগ্ন থাকেন। তা ছাড়া, ইরানের কবির শারাবকে সকলে সত্যিকার মদ ব'লে ধ'রে নেন না। তাঁরা শারাব বলতে আনন্দ-ভূমানন্দকে বোঝেন—যে আনন্দ-রূপিনী সুরার নেশায় তাপস-ঋষি সংসারের সব ভুলে গিয়ে আপনাতে আপনি বিভোর হ'য়ে থাকেন। সাকী বলতে বোঝেন মুর্শিদকে, গুরুকে, যিনি সেই আনন্দ-শারাব পরিবেশন করেন।—আমাদের কাছে, বিংশ-শতাব্দীর জ্ঞান-বিজ্ঞান পুষ্ট কারণ-জিজ্ঞাসু মনের কাছে, ওমরের কবিতা যেন আমাদেরই প্রশ্ন, আমাদেরই প্রাণের কথা। আমরা জিজ্ঞাসা করি-করি করেও যেন সাহসও প্রকাশ-ক্ষমতার দৈন্যবশতঃ তা জিজ্ঞাসা করতে পারছিলাম না। বিগত মহাযুদ্ধের মতই আমাদের আজকের জীবন মহাযুদ্ধ-ক্লান্ত অবিশ্বাসী-মন জিজ্ঞাসা ক'রে ওঠে—কেন এই জীবন, মৃত্যুই বা কেন? স্বর্গ, নরক, ভগবান ব'লে সত্যই কি কিছু আছে? আমরা ম'রে কোথায় যাই? কেন এই হানাহানি? এই অভাব, দুঃখ, শোক?—এমনিতর অগুণতি প্রশ্ন, যার উত্তর কেউ দিতে পারেনি। যে উত্তর দিয়েছে, সে তার উত্তরের প্রমাণে কিছুই দেখাতে পারে নি; শুধু বলেছে: বিশ্বাস কর। তবু আমাদের মন বিশ্বাস করতে চায় না। সে তর্ক করতে চায়। এই চিরন্তন প্রশ্ন ওমরের জ্ঞান-প্রশান্ত মনে প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে ঝড়ের মতই দোল্ দিয়েছিল। ওমর তাই বললেন, এ-সব মিথ্যা, পৃথিবী মিথ্যা, স্বর্গ মিথ্যা, পাপ পুণ্য মিথ্যা, তুমি মিথ্যা, আমি মিথ্যা, সত্য মিথ্যা, মিথ্যা মিথ্যা। একমাত্র সত্য যে মুহূর্ত তোমার হাতের মুঠোয় এল তাকে চুটিয়ে ভোগ করে নাও। স্রষ্টা যদি কেউ থাকেনও, তিনি আমাদের দুঃখে-সুখে নির্বিকার—আমরা তাঁর হাতের খেলা -পুতুল।

নজরুলের এই বক্তব্যের সবটুকু নিশ্চয়ই ফিট্‌জিরাল্ডের বিরুদ্ধে যায়নি। যেটুকু গিয়েছে সেটুকু পার্থক্যই ফিটজিরাল্ডের সংগে নজরুলের। এবার, পাঠককে আরেকটি নতুন দিকের প্রতি চোখ ফেরাতে বলব। আর

তা হল নজরুলের অনুবাদের উপমা ও উৎপ্রেক্ষার দিক। এখানে বলে রাখা দরকার শুধুমাত্র তুলনাবাচক শব্দের উপস্থিতিই উপমাকে চিহ্নিত করে না। তুলনার ভিত্তিতে যত অলঙ্কারের সৃষ্টি তাদের সকলেরই সাধারণ নাম উপমা।' সাধারণত ভিন্ন জাতীয় দুটি বস্তুর গুণগত সাদৃশ্যই হল উপমা। সে উপমা, তুলনাবাচক শব্দের অনুপস্থিতে হয়। তবে সাধারণত পূর্ণোপমাকে, যেখানে উপমেয়, উপমান, তুলনাবাচক শব্দ ও সাধারণ ধর্ম উপস্থিত থাকে, আমরা উপমা বলি। এই উপমায় তুলনাবাচক শব্দ: মত, সম, তেমতি, প্রায়, নিভ, তুল, তুলনা, উপমা, তুল্য, হেন, কল্প, সঙ্কাশ, জাতীয়, সদৃশ, যেন. প্রতীকাশ, বৎ প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়। ওমরের রুবাইযাতের অনুবাদে নজরুল যে-সব উপমা সৃষ্টি করেছেন—কখনও সম্পূর্ণ ওমরকে অনুকরণ করে, কখনও কখনও ওমরের অনুসরণ করে অথবা নিজের মত করে—সেখানে 'মত', 'সম' প্রায়, 'তুল' ইত্যাদি তুলনাবাচক শব্দের ব্যবহার করেছেন। এখানে বলা দরকার, এই শ্রেণীর উপমা ওমরের সুবিখ্যাত বাঙালী অনুবাদক কান্তিচন্দ্রে, নরেনে তেমন বেশী নেই। একটি উপমা কান্তি অনূদিত "রোবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়ামে'র ২৮ নং 'রুবাই'-এর শেষ চরণ—"স্রোতের মতই ভাসতে আসা, হাওয়ার মতই উধাও ফের"; যেটি ফিটজিরাল্ডের I c me like w ter ard like wind I go"-এর আক্ষরিক অনুবাদ। এখানে ইংরেজী বাক্যটি অর্থহীন নয় কিন্তু কান্তিচন্দ্রের বাক্যটি অর্থহীন। অর্থহীন এইজন্য যে 'স্রোতের' ভাসাটা একটি হাস্যকর দৃষ্টান্ত।' 'স্রোত' নিজে ভাসে না। Came like w ter মানে "স্রোতের মত ভাসতে আসা" নয় "জলের মত আসা"। দ্বিতীয় উপমাটি কান্তি অনূদিত "রোবাইয়াৎ- ই-ওমর খৈয়ামে'র ২৯ নং রুবাইয়ের শেষ চরণ "উধাও সে কোন্ মরুর 'পরে-হাওয়ার মতই লক্ষ্যহীন।" এই উপমাটির উৎস ফিটজিরাল্ডের প্রথম সংস্করণের ২৯ নং রুবাই:

> Into this Universe, and why not knowing,
> Nor whence, like Water willy-nilly flowing :
>
> And out of it, as Wind along the Waste,
> I know not whither, willy-nilly blowing.

তৃতীয় উপমাটি কান্তিঘোষের অনূদিত ১৪ নং রুবাই-এর শেষ চরণ: "সব

ক্ষণিকের আসল ফাঁকি সত্য মিথ্যা কিছুই নয়—মরুর পরে তুষার মত চিক-মিকিয়ে পায় সে লয়।" এর উৎস ফিট্‌জিরাল্ডের প্রথম সংস্করণ 'রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়ামে'র ১৪ নং রুবাই :

> The worldly Hope men set their Hearts upon
> Turns Ashes---or it prospers : and anon'
> Like Snow upon the Desert's dusty Face
> Lightning a little Hour or two—is gone.

এখানে বলা দরকার ছন্দের মিল রক্ষার জন্যে কান্তিচন্দ্র অশুদ্ধ বাক্য রচনা করেছেন। তিনি 'তুষারের মত" না লিখে "তুষার মত" লিখেছেন। "Snow" -এর অর্থ তুষার। L.ke snowমানে "তুষারের মত"—"তুষার মত" নয়। "তুষা" কখনও "তুষার"-এর সমার্থক শব্দ হতে পারে না। যা হোক এই তিনটি উপমাতেই কান্তিচন্দ্র ঘোষ একমাত্র তুলনাবাচক শব্দ "মত" ব্যবহার করে-ছেন। এটা ইংরেজী simle-এর তুলনাবাচক শব্দ as ও l:ke-এর অর্থ। এখানে বলা অপ্রাসংগিক হবে না যে কান্তিচন্দ্র ঘোষ ফিটজিরাল্ড থেকে অনুবাদ ক.রছিলেন সেই ফিট্‌জিরাল্ডের প্রথম সংস্করণের ওমরের অনুবাদেও তাঁর অনুবাদের চেয়ে বেশী উপমার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। উপরের এ তিনটি উদাহরণ ছাড়াও ফিট্‌জিরাল্ড তাঁর প্রথম সংস্করণ 'রুবাইয়াত-ওমর-খৈয়ামে' এই একটি উপমা ব্যবহার করেছেন :

> And those who husbanded the Golden Grain'
> And those who flung it to the winds like rain
>
> [15 : Ist Edition]

ফিটজিরাল্ড তাঁর ২য় সংস্করণের চেয়ে আরও ৩৫টি বেশী রুবাই অনুবাদ করে-ছিলেন, ৫ম সংস্করণে তার থেকে আবার ৯টি রুবাই বাদ দেন। ঐ সংযোজিত রুবাইগুলির মধ্যে অনেকগুলিতে তিনি উপমা ব্যবহার করেছেন। যেমন:

1. Were it not Folly, Spiderlike to spin, The Thread of present life—(14 in 2nd) : 2. till Heavn/ To Earth invert you like an empty cup—(45 in 2nd' 40 in 5th) : 3. The Eternal Saki from that Bowl has pou'rd/Millions of Bubles like us—(46 in 5th' 47, in 2nd) : 4. Whose secret presence, through creations veins !

Running, Quicksilver- like eludes your pains : (5 in 5th, 47 in 2nd) ; 5. Prophets,' paradise were empty as the hollow of one's hand---(65 in 2nd) ; 6. Traveller might spring / As springs the trampled herbage of the field !--(105 in 2nd, 97 in 5th)

এখন নজরুলের কয়েক ধরনের উপমা দেখানো যাক :

১. লাজ-রাঙা তোর গালের মত দে গোলাপী রঙ শরাব। (রুবাই নং ৪) তুলনাবাচক শব্দ 'মত'।

২. মোদের শুভ দিন চলে যায়—পারদ সম ব্যস্ত পা'য়, (রুবাই নং ৯) তুলনাবাচক শব্দ 'সম'।

৩. চোখ জুড়ালো আমার যেমন আজ এ ফোটা ফুলগুলি। (রুবাই নং ২০) তুলনাবাচক শব্দ 'যেমন'।

৪. বদখশানি রক্ত-চূণীর মতন সুরা চুঁইয়ে আন (রুবাই নং ৪৮)। তুলনা বাচক শব্দ মতন।

৫. আমার ক্ষণিক জীবন হেথায় যায় চলে ঐ ত্রস্ত পায়—/খরস্রোতা স্রোতস্বতী কিংবা মরু ঝঞ্ঝা প্রায়। (রুবাই নং ৭১) তুলনা বাচক শব্দ 'প্রায়'।

৬. 'সরো'র' মতন সরল-তনু টাট্‌কা-তোলা গোলাপ-তুল
কুমারীদের সঙ্গে নিয়ে আনন্দে তুই হ মশগুল!
মৃত্যুর ঝড় উঠবে কখন, আয়ুর পিরাণ ছিঁড়বে তোর—
প'ড়ে আছে ধূলায় যেমন ঐ বিদীর্ণ দল মুকুল। (রুবাই নং ৭৫)

একটি 'রুবাই'তে তিনটি উপমা এবং তুলনাবাচক শব্দ 'মতন' 'তুল' ও 'যেমন'।

৭. গুল্-লালা-রুখ কুমারীদের প্রস্ফুটিত যৌবনে/উঠ্‌লো রেঙে কানন-ভূমি লালা-ফুলের কেয়ারী-তুল। (রুবাই নং ৭৯) তুলনাবাচক শব্দ 'তুল'।

৮. ভেসে যাবে রাশভারি তোর ঋষির মত দাড়ির রাশ (রুবাই নং ১৮৫, এটি যমকেরও উদাহরণ)।

কান্তিচন্দ্র ঘোষের অনুবাদে কোন উৎপ্রেক্ষা দেখা যায় না। নজরুলের অনুবাদে দৃষ্ট ছয়টি উৎপ্রেক্ষার নজির :

১. নৃত্য-পাগল ঝর্ণাতীরে সবুজ ঘাসের ঐ ঝালর
উন্মুখ কার চুমো যেন দেব-কুমারের ঠোঁটের পর। (রুবাই নং ৭০)

২. হেলায় পায়ে দলো না কেউ—এই যে সবুজ তৃণের ভীড়
হয়ত কোন গুল্‌-বদনীর কবর-ঢাকা নীল চাদর। (রুবাই নং ৭০)

৩. সুরা দ্রবীভূত চুনী, সোরাহী সে খনি তার
এই পিয়ালা কায়া যেন, প্রাণ তার এই দ্রাক্ষাসার
বেলোয়ারির এই পিয়ালা ভরা তরল হাসির রক্তিমা,
কিংবা ওরা ব্যথায় ক্ষত হিয়ার যেন রক্তাধার। —(রুবাই নং ৮৬)

উৎপ্রেক্ষার সঙ্গে প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষার উদাহরণও একই স্তবক থেকে দেওয়া যায়: 'সুরা দ্রবীভূত চুনী', 'প্রাণ তার এই দ্রাক্ষাসার' প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষার উদাহরণ।

৪. দেহ তাহার বাঁশরী আর তেজ যেন সেই বাঁশরীর স্বর।—(রুবাই নং ৮৭)
৫. দাড়ির বোঝা জড়িয়ে গিয়ে হ'ল যেন গাধার দুম্‌। —(রুবাই নং ১৩৬)
৬. কাজেই, এই যে মানবজাতি—জ্ঞানীর চক্ষে হয় মালুম—
ঐ সে ভীষণ ষাঁড় যুগলের মধ্যে যেন ঝাঁক গাধার।—(রুবাই নং ১৬৪)

নজরুল তাঁর উপমাতে সম, তুল, প্রায়, মত, মতন, যেমন, প্রভৃতি তুলনাবাচক শব্দ ব্যবহার করে বারবার 'মত' ব্যবহারের এক ঘেঁয়েমী থেকে কানকে রক্ষা করেছেন। এখানে প্রদর্শিত নজরুলের 'পূর্ণোপমা' ছাড়াও 'লুপ্তোপমার' অনেক উদাহরণ তাঁর অনুবাদে দেখা যায়।

নজরুল-সাহিত্য বিচার

নজরুল ইসলামের কাব্য ও তাঁর সংগীত ও সাহিত্য নিয়ে এ পর্যন্ত বেশ কিছু আলোচনা হয়েছে। যাঁরা তাঁর সম্পূর্ণ জীবনী অথবা আংশিক জীবনী লিখেছেন তাঁরা তাঁর চারিত্রিক গুণাগুণ সম্পর্কে যেমন তেমনি সাহিত্যিক গুণাগুণ সম্পর্কে কিছু কিছু আলোচনা করেছেন। কেবল তাঁর সাহিত্য নিয়েও কিছু একক আলোচনা গ্রন্থ এবং সংকলন গ্রন্থ প্রকাশিত হ'য়েছে—এই গ্রন্থের "নজরুল-চর্চা : দেশে-বিদেশে" প্রবন্ধে সেই সব জীবনী সম্পর্কিত আলোচনা গ্রন্থের তালিকা দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ-যোগ্য আলোচনা গ্রন্থের নামও করেছি সেখানে।

১৯৭৪ সালে দেশ বিভক্ত হওয়ার পর লক্ষ্য করা যায় তখনকার পূর্ব পাকিস্তানে "নজরুল-চর্চা" বেশী হয়েছে। ১৯৪৭ সালের পর পূর্ব বাঙলা থেকে প্রকাশিত সব সাহিত্য-পত্রিকা এবং দৈনিক পত্রিকার রবিবারের সংখ্যা ও নজরুল দিবস সংখ্যাতেও নজরুলের উপর অসংখ্য প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। এদের ভিতর থেকে বাছাই করে মীর নূরুল ইসলাম ও কবি আবদুল কাদিরের সম্পাদনায় দুটি মূল্যবান সংকলন প্রকাশিত হয়েছিল। অনেক পরে এসে আরও চারটি মূল্যবান সংকলন মোস্তফা নূরুল ইসলাম, ডক্টর মুহম্মদ মনিরুজ্জামান, জি. এস, হালিম এবং হায়াৎ মামুদ ও জ্যোতি প্রকাশ দত্তের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে। সেখানে নজরুলের কবিতা, উপন্যাস, গল্প, নাটক ও সংগীতের উপর আলোচনা হয়েছে। সে আলোচনা অধিকাংশস্থানে প্রশস্তিমূলক আবার কখনো কখনো সমালোচনামূলক। কেউ দ্বিধা সংকোচে নজরুলকে সমালোচনা করেছেন আবার কেউ নিঃসঙ্কোচে নির্ভয়ে তাঁর স্খলন-পতন দেখাতে কুণ্ঠিত হননি। যে-ভাবেই হোক ১৯৪৭ থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত বাংলা-দেশে তিনিই বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে বেশী আলোচিত ও সমালোচিত

সাহিত্যিক। মুসলমান প্রধান বাংলাদেশে তাঁর জনপ্রিয়তা বেশী হওয়া অস্বাভাবিক না এবং এ কথাও অকুণ্ঠভাবে বলা যায় বাংলাদেশের অনুন্নত মুসলিম সমাজের জন্যে তাঁর একক দান তুলনাহীন। কৃতজ্ঞ সমাজ সে-কথা যে ভোলেনি পাকিস্তান আমলে বাঙলা উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক তাঁর রচনাবলী প্রকাশই তার নিদর্শন। এই রচনাবলী তাঁর সাহিত্যকর্মের আলোচনাকে আরও সম্প্রসারিত করেছে।

কিন্তু পশ্চিম বঙ্গ যে নজরুল আলোচনা ও চর্চায় খুব পিছিয়ে ছিল তা নয়, কেননা হিন্দু-মুসলমান এই দুটি কথা বাদ দিলেও বাঙালী সমাজ তাঁর কাছে অশেষভাবে ঋণী। বাঙলাদেশে মানুষের কল্যাণ চিন্তায় যাঁরা নবজাগরণ এনেছিলেন তাঁদেরই একজন নজরুল। আর শুধু তাই নয় তিনি সাহিত্যিক হিসেবে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের অগ্রনায়ক। পশ্চিম বঙ্গের কোন কোন সাহিত্যিক সে সম্মান তাঁকে দিয়েছেন। গ্রন্থের প্রথম প্রবন্ধে তার উল্লেখ আছে।

নজরুল-সাহিত্যের বিচার এ-পর্যন্ত কম হয়নি। বিভাগ-পূর্ব বাঙলার শ্রেষ্ঠ রাজনীতিক নেতা ও কর্মী থেকে শুরু ক'রে ছোট-বড় সাহিত্য, চিত্র, নাট্য ও সংগীত শিল্পীদের অনেকেই তাঁর প্রতিভা সম্পর্কে মন্তব্য রেখে-ছেন। এ গ্রন্থের এই শেষ প্রবন্ধটি সেই মন্তব্যকারীদের মধ্যে যাঁদের আলোচনাকে যথার্থ সাহিত্যালোচনা ও সমালোচনা হিসাবে দেখা হয়েছে তাঁদের কয়েকজনের বিতর্কিত কিছু বক্তব্যের পুনর্বিচার মাত্র। এই আলোচনাটুকু গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে এরই সূত্র ধরে ভবিষ্যতে নজরুল-সাহিত্যের বিচার-বিশ্লেষণ হবে। আমি এখানে প্রথমে আংশিক-ভাবে ঐ বক্তব্যের উদ্ধৃতি দিয়ে শেষে সে-সব সম্পর্কে আমার বক্তব্য রাখব।

জীবনানন্দ দাশ :

> তাঁর কবিতা চমৎকার কিন্তু মনোত্তীর্ণ নয়। তিনি অনেক সফল কবিতা উৎ-সারিত করতে পেরেছিলেন। কোনো কোনো কবিতায় এত বেশী সফলতা যে কঠিন সমালোচকও বলতে পারেন যে নজরুলী সাধনা এইখানে-এইখানে সার্থক হয়েছে;---কিন্তু তবুও মহৎ মান এড়িয়ে গেছে।...

নিজেকে বিশোধিত ক'রে নেবার প্রতিভা নেই এ-সব কবিতার বিধানে, শেষ রক্ষার কোন বিধান নেই।

পরার্থপরতার চেয়ে স্বার্থসন্ধান ঢের হেয় জিনিস; স্বার্থসাধন কিছুই নয়, কিন্তু কোটি মানসের আত্মোপকার প্রতিভাই তাকে নির্মাতার উপরের ভূমিকায় ওঠাতে সাহায্য করে, কবিতাকে তার অন্তিম সঙ্গতির পথে নিয়ে যায়। এরই স্বভাবে সৃষ্ট কবিতা যতদূর ব্যাপ্ত ও গভীর হ'য়ে উঠতে পারে নজরুলের প্রথম ও শেষ কবিতা এরই অভাবে একই সূচনায় বিচ্ছিন্ন হয়ে ততদূর স্থান হারিয়ে ফেলছে। (রোগমুক্তির পর নজরুল এই বিষয়ে অবহিত হ'য়ে উঠবেন আশা করি।)

বুদ্ধদেব বসু :

'আমি চির শিশু, চির কিশোর'--এ-কথা বিদ্রূপের বাঁকা হাসির সঙ্গে নজরুলের সাহিত্যিক জীবনে সত্য হয়েছে। পঁচিশ বছর ধরে প্রতিভাবান বালকের মত লিখেছেন তিনি, কখনো বাড়েননি, বয়স্ক হননি, পরপর বইগুলিতে কোন পরিণতির ইতিহাস পাওয়া যায় না। কুড়ি বছরের লেখা আর চল্লিশ বছরের লেখা একই রকম। যে সম্পদ নিয়ে তিনি জন্মেছিলেন তার পূর্ণ ব্যবহার তাঁর সাহিত্যকর্মে কখনো হলো না; সেখানে দেখতে পাই তাঁর আত্ম-অচেতন মনের অনেক হেলা ফেলা, অনেক ফেলা ছড়া, অনেক অপচয়। (কালের পুতুল)---- তাঁর রচনায় সামাজিক, রাজনৈতিক বিদ্রোহ আছে, কিন্তু সাহিত্যিক বিদ্রোহ নেই।

কাজী আবদুল ওদুদ :

নজরুল যে পূর্ণাঙ্গ কবিতার রচয়িতা তেমন নন, তাঁর কবি-প্রতিভা বরং প্রকাশ পেয়েছে উৎকৃষ্ট চরণের রচনায়, এ উক্তি করা যেতে পারে। নজরুলের 'বিদ্রোহী' যুগের অনেক কবিতায় দেখা যাবে---বিদ্রোহীও সে সবের অন্তর্গত বিভিন্ন ভাবের একত্র সমাবেশের সংগতি-সুষমা অথবা যৌক্তিকতা বিষয়ে কবি বেশ উদাসীন হয়েছেন।

অরবিন্দ পোদ্দার :

কবি কীটস বলেছিলেন, poetry should please by a fine excess নজরুলের কাব্য সবটাই excess কদাচিত fiine, উপস্থিত গরজ তরঙ্গের মত তাঁর চিত্তে ঘা দিয়েছে, সে আঘাতে উদ্বেল হয়েছেন তিনি, সেই উদ্বেল মুহূর্তে অজস্র ধারায় ভাষা ফুটে উঠেছে কলমে; কিন্তু সে ভাষা ছন্দ-শিথিল, ব্যঞ্জনা শক্তিতে একান্ত দুর্বল। নজরুল ছিলেন অত্যন্ত প্রবলভাবে আত্মমুখর।

সৈয়দ আলী আহসান :

> যে কারণে নজরুল সকলের প্রীতিভাজন হয়েছিলেন, তা হলো সাময়িক আদর্শ-বিলাস। এ আদর্শ-বিলাস হ'ল প্রথমতঃ নিপীড়িতদের প্রতি মমত্ববোধ, দ্বিতীয়তঃ দেশের স্বাধীনতার জন্য একটি উদগ্র আবেগ।
>
> দুর্দশাগ্রস্তদের জন্য তিনি সর্বদাই করুণা প্রকাশ করেছেন। দুর্বলদের প্রতি তাঁর অনুরাগ ছিল অসীম। কিন্তু তা অশ্রুতে রূপায়িত হয়নি—হয়েছে সংঘাতে আবর্তিত। ----যে তথ্য অথবা দাবী অথবা যে আকাংখা মনে দোলা দিচ্ছে৷ দ্বিধাহীনভাবে তিনি তা জানিয়েছেন। কাব্যিক সৌন্দর্য অক্ষুণ্ন রইল কি না সে চিন্তাও তিনি করেননি। সুসঙ্গত শব্দ চয়নের দিকে তার মন ছিল না। —তার মমত্ববোধ অধিকাংশ সময়ই উচ্ছ্বাসে আচ্ছন্ন ছিলো বলে তাতে কোনো মৌলিকতা আপাতদৃষ্টিতে ধরা পড়ে না। ----
>
> অত্যন্ত চঞ্চল ছিলো তাঁর চিন্তা, তাই তিনি কোনো দীর্ঘ কবিতায় ভাবগত সম্পূর্ণতা অথবা পারম্পর্য বজায় রাখতে পারেননি। চরণের সৌকর্য অথবা স্তবকের মাধুর্যই ছিলো তাঁর একমাত্র লক্ষ্য।

নজরুলের কঠোর সমালোচনার নিদর্শন হিসাবে উপরের খ্যাতিমান কবি ও সাহিত্যিকদের কতকগুলি উদ্ধৃতি নেওয়া হ'ল। পরবর্তীকালে এই সমালোচনাসমূহ অনেক নবীন নজরুল-সমালোচককেও উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করেছে এবং তাঁরা অনেক সময় কঠোরতর ভাষায় নজরুলকে আক্রমণ করেছেন। সে-সব সমালোচনাগুলি উল্লিখিত উদ্ধৃত সমালোচনার নিছক অনুকরণ বলে সেগুলোর উদ্ধৃতি এখানে নিষ্প্রয়োজন মনে করে তা থেকে বিরত থাকলাম। আমরা কেবল উপর্যুক্ত উদ্ধৃতিসমূহ সমালোচকের চোখে বিচার করব।

যে উদ্ধৃতিগুলো এখানে আছে—যাঁরা নজরুলকে ভালবাসেন তাঁরা এগুলো দেখে খুশি হবেন না, হয়ত বা অনেকে বিরক্ত ও বিক্ষুব্ধ হবেন। কিন্তু সে রকম অন্ধভক্তের মত উত্তেজিত বা ক্রুদ্ধ না হ'য়ে শান্তচিত্তে উদ্ধৃত বক্তব্যসমূহ বিচার করে দেখা যেতে পারে প্রকৃতপক্ষে তা যুক্তিসংগত কিনা এবং কতটা যুক্তিসংগত। কেননা যাঁরা মন্তব্য করেছেন তাঁদের অনেকেই বৈদগ্ধ্য ও মনীষার অধিকারী। দু'একজনের কাব্যখ্যাতিও শ্রদ্ধার যোগ্য ; এবং যেহেতু কবিরাই দিতে পারেন কবিতার আত্মার সন্ধান,

অতএব কবি যাঁরা তাঁদের মন্তব্য উপেক্ষনীয় নয়। অবশ্য এ-কথাও এসংগে যোগ করা যেতে পারে যে কবি সম্বন্ধে কবিদের মন্তব্য সব সময় নির্ভুল প্রমাণিত হয়নি। তাই খুব সতর্কতার সঙ্গে উপরের উদ্ধৃতিগুলি পর্যালোচনা করা দরকার। বলা বাহুল্য আমরা পর্যালোচনার সময় এ-কথা মনে রাখব না যে উল্লিখিত সমালোচকেরা বিদ্বেষবশীভূত হ'য়ে অথবা অন্য কোনো উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্যে কিংবা কোন অবস্থা বা নীতির চাপে পড়ে ঐসব কথা বলেছেন। আমরা মনে রাখব নিরাসক্তভাবে, নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে, পক্ষপাতিত্বহীন বিচারকের মনোলীন হয়ে তাঁরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হ'য়েছিলেন এবং আমরাও তাঁদের কথাগুলোকে তেমনি নির্বিকারভাবে নির্বিবেক না হ'য়ে বিচার করব।

প্রথমে জীবনানন্দ দাশের মন্তব্যের কথা ধরা যাক। তিনি বলেছেন—'নজরুলের কবিতা চমৎকার কিন্তু মনোত্তীর্ণ নয়।' তিনি বলেছেন—"নজরুলী সাধনা" কোথাও কোথাও "সার্থক" কিন্তু তবু সেই 'চমৎকার' ও 'সার্থক' কবিতা মহৎ হ'তে পারেনি—তারা 'মহৎ মান এড়িয়ে গেছে।" তিনি এও বলেছেন—তাঁর ঐ সব সার্থক কবিতার তুলনায় "আজকের দিনের অনেক কবিতাই" 'ব্যাহত হ'য়ে যাচ্ছে।' তবু তিনি বলছেন—"নিজেকে বিশোধিত ক'রে নেবার প্রতিভা নেই এ-সব কবিতার বিধানে, শেষ রক্ষার কোন বিধান নেই।" "চমৎকার কিন্তু মনোত্তীর্ণ নয়", "সার্থক কিন্তু মহৎ নয়," "আজকের দিনের অনেক কবিতার চেয়ে সার্থক" কিন্তু "বিশোধিত ক'রে নেবার প্রতিভা নেই।" আপাতদৃষ্টিতে এই বক্তব্যের মধ্যে বিরোধিতা থাকলেও এর মধ্যে অর্থপূর্ণ ক'থার যে ইঙ্গিত আছে বুদ্ধিমান পাঠকের চোখে তা ধরা পড়বে। জীবনানন্দ দাশ নিজেও শেষ পর্যন্ত ধরা দিয়েছেন এই কথা বলে :

> পরার্থপরতার চেয়ে স্বার্থসন্ধান ঢের হেয় জিনিস, স্বার্থসাধন কিছুই নয়, কিন্তু কোটি মানসের আত্মোপকার প্রতিভাই তাকে নির্মাতার উপরের ভূমিকার উঠতে সাহায্য করে, কবিতাকে তার অন্তিম সঙ্গতির পথে নিয়ে যায়। এরই স্বভাবে সৃষ্ট কবিতা যতদূর ব্যাপ্ত হ'য়ে উঠতে পারে নজরুলের প্রথম ও শেষ কবিতা এরই অভাবে, একই সূচনায় বিচ্ছিন্ন হয়ে ততদূর স্থান হারিয়ে ফেলেছে।

জীবনানন্দ দাশ-এর বক্তব্যের সারাংসার অনুমান করা যায়। অনুমান করা যায় এইজন্যে যে তিনি শেষমেষ একটা উপদেশও নজরুলকে দিয়েছেন—"রোগমুক্তির পর নজরুল এই বিষয়ে অবহিত হ'য়ে উঠবেন আশা করি।" নজরুল সুস্থ থাকাকালীন এই সমালোচনা ও উপদেশ পেলে হয়ত ভাল হত। এই ধরনের উপদেশ এক সময় মোহিতলালও তাঁকে দিয়েছিলেন। যা হোক—জীবনানন্দের ঐ বক্তব্যের অর্থ থাকলেও তা এত অস্পষ্ট যে ঐ ভাষাকে বুদ্ধদেব বসু পর্যন্ত "সুদূরদুরূহ ভাষা" বলেছেন। "পরার্থপরতা" কি, "স্বার্থসন্ধান" কি, "আত্মোপকার প্রতিভা" কি, "অন্তিম সঙ্গতি" কি--এসব গবেষণার বিষয়। উৎকৃষ্ট গদ্যের ভাষা কখনও এমন হয় না গদ্যে লেখা হ'লেও কথাগুলো গদ্যের ভাষা নয়, গদ্যের ভাষা আলোক, অন্ধকার নয়। এর থেকে আমরা শুধু এই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি যে নজরুল প্রতিভার মহত্বকে জীবনানন্দ স্বীকার ক'রে নিতে পারেননি। তাঁর কবিতাকে চমৎকার ও সার্থক বললেও আসলে তা যে চমৎকারও নয়, সার্থকও নয় এই ছিল তাঁর বক্তব্য। কেননা যে মন চমৎকারিত্বলাভ করে সে মন আবিষ্ট না হ'লে চমৎকারিত্ব লাভ করে না: আর চমৎকার এই বিশেষণটি একটি চরম ভালোলাগার ব্যাপারকে প্রকাশ করে। সুতরাং ভালো না লাগা সত্ত্বেও "চমৎকার" শব্দ ব্যবহারে যে প্রচ্ছন্ন কপটতা থাকে সেই কুয়াশায় সংক্রমিত এই ভাষা। অতএব এই মন্তব্য কোনো সহৃদয় সমালোচকের মন্তব্য নয়। [অবশ্য fine অর্থে যে "চমৎকার" সে চমৎকার হলে জীবনানন্দ দাশের বক্তব্যে বিরোধিতা নেই। তবু বলা বাহুল্য জীবনানন্দ নজরুলের কবিতাকে মহৎ বলে মেনে নিতে পারেননি।]

/ আমরা জানি স্বয়ং জীবনানন্দ দাশও একদা নজরুল দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। যদি নজরুলের ভাষায় সেই চিত্ত-উদ্বোধক মহৎ প্রাণের অনুপস্থিতি থাকত তা হ'লে জীবনানন্দ অনুপ্রাণিত হতেন না। মহৎ কবিতাই মহৎ উদ্দীপনার জন্ম দেয়। মনে রাখা দরকার—সূর্যের আলোকে চাঁদ আলোকিত হয় চাঁদের আলোয় সূর্য আলোকিত হয় না। নজরুল অনেক চাঁদকে আলোকিত ক'রে তুলতে পেরেছিলেন। সুতরাং "মহৎ মান এড়িয়ে গেছে।" খুব খুঁটিয়ে বিচার করেও একথা বলা যায় কি?

প্রয়োজনীয় আর একটি কথা বলে নিই। এখানে যে উদ্ধৃতিগুলি আছে তার পুঙখানুপুঙখ বিচার ও বিশ্লেষণের জন্যে অনেক কথার, অনেক উদাহরণের, অনেক সাক্ষ্য-প্রমাণের দরকার। সে অবসর এখানে নেই। হয়ত এই গ্রন্থের কিংবা মৎরচিত "শব্দ-ধানুকী নজরুল ইসলামের" অনেক পরিচ্ছেদে ও প্রবন্ধে পরোক্ষে তার কিছু আলোচনা করেছি। যে আলোচনা বৈজ্ঞানিক নয়। বৈজ্ঞানিক আলোচনা ঠিক হয় যদি প্রতিটি বিতর্ক-মূলক কথাকে সামনে রেখে ধীরে ধীরে বিচার বিশ্লেষণ ক'রে নিজের সিদ্ধান্ত দেওয়া যায়। যদিও আমি জানি এই বিতর্কের কোন দিন অবসান হবে না। তার কারণ যে স্বভাব ও প্রকৃতির জন্যে একজন কবি একজন পাঠকের কাছে প্রিয় অথবা অপ্রিয় হন সেই স্বভাব ও প্রকৃতির সমধর্মিতা ও ভিন্নতার কারণে একজন কবি একজন পাঠকের কাছে প্রিয় কিংবা অপ্রিয় হবেন। সমালোচক সেখানে নিরাসক্ত থাকার চেষ্টা করলেও নিরাসক্ত থাকতে পারবেন না। পক্ষপাতিত্ব দেখানো কিংবা বিরুদ্ধতার জন্য বিক্ষোভ গোপন করার চেষ্টা করলেও সমালোচকের অলক্ষ্যে তাঁর ভাষার মধ্যে প্রিয়তা ও অপ্রিয়তার চিহ্ন ফুটে উঠবে। কবিতার মন্তব্য সম্বন্ধে এই প্রকৃতিগত ভিন্নতা ও অভিন্নতার কথা এ-জন্যেই উল্লেখ করলাম যে ভালো লাগা, কম ভালো লাগা, বেশী ভালো লাগা অথবা একেবারেই ভালো না লাগার মধ্যে বিষয়গত ব্যাপারে বিশ্বাস অবিশ্বাসের প্রশ্ন আছে।

কবিতার মধ্যে ধর্মের কথা থাকে, সমাজের কথা থাকে, আদর্শের কথা থাকে, কবির ব্যক্তিগত জীবন-দর্শনের কথা থাকে। কোনো পাঠক এবং সমালোচক এই ধর্মগত সমাজগত ও আদর্শগত বিশ্বাসকে উপেক্ষা ক'রে কবিতার বিচার করতে সমর্থ হবেন এমন আশা করা বৃথা। যদিও কবিতার সমালোচকের কাছে কবির কাব্যধর্মই মুখ্য বিচার্য বিষয় হওয়া উচিৎ তবু সমাজের অন্তর্গত মানুষ হিসাবে ধর্ম, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, নীতি এবং মতাদর্শ থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে বিচারকের ভূমিকা গ্রহণ খুবই কঠিন। "কবিতার জন্য কবিতা"—এই বিশুদ্ধ কাব্যধর্মের কথা আধুনিককালে সুপ্রচারিত হলেও দেখা গেছে একজনের কাব্যধর্মের আদর্শের সঙ্গে অন্যের কাব্যধর্মের অমিল অনেকখানি। এবং শেষ পর্যন্ত একটা বিশ্বাসের কথা এসে যেতে বাধ্য। এ প্রসংগে বলা ভাল সাহিত্যে বয়োধর্মের ব্যাপারটা গৌণ

হলেও তার ভূমিকা কখনও কখনও মুখ্য হয়। শিশুর চোখে যা সুন্দর কিশোরের চোখে তা সুন্দর নয়, কিশোরের চোখে যা সুন্দর যুবকের চোখে তা সুন্দর নয়, যুবকের চোখে যা সুন্দর বৃদ্ধের চোখে তা সুন্দর নয়। অবশ্য সার্বজনীন একটা সৌন্দর্য আছে যা শিশু-কিশোর-যুবক-বৃদ্ধ-নর-নারী নির্বিশেষে সবার ভাল লাগে। সংগীতকে এই জন্যে সার্বজনীন সৌন্দর্যের প্রতীক বলা হয় এবং সকল শিল্পের উপরে সংগীত-শিল্পের স্থান বলে অনেকে মনে করেন। তবু এই নিষ্কলঙ্ক সুরের প্রতিও বিকর্ষণের কোনো ঘটনা যে ঘটে না তা নয়।

শোনা যায় কোনো একজন সিভিল সার্ভিস চাকুরী প্রার্থী ইণ্টারভিউ দিতে গিয়ে 'তার জীবনে আজ পর্যন্ত কোন্ বাজনা সবচেয়ে ভাল লেগেছে' এই প্রশ্নের জবাবে বলেছিল, বাসর ঘরে আগত তার স্ত্রীর হাতের চুড়ীর বাজনা। কাম-পীড়িত যৌবনের কানে মধুরতর যে ধ্বনি যুবক তারই কথা বলে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেয়। শিল্প-বিচারে এটা তাই আদৌ উপেক্ষণীয় নয়। যারা বামাচারী রাজনীতির ভক্ত সুকান্তের কবিতা তাঁদের কাছে সুন্দরতম; অন্তত: সেই রাজনীতিতে বিশ্বাস যদি সত্যি প্রবল হয়। যারা ইসলাম-পন্থী তাঁদের কাছে তদ্রূপ ফররুখ আহ্মদ প্রিয়তম। ঠিক এইজন্যই একজন সন্ত্রাসবাদী বৃদ্ধ বিপ্লবীর কাছে শুনেছিলাম নজরুলের বিদ্রোহী প'ড়ে নিজের গায়ের চামড়া তাঁর কামড়ে ছিঁড়ে ফেলতে ইচ্ছা হয়েছিল। আমরা জানি নজরুল ইসলামকে একদিন যাঁরা কাফের বলেছিলেন নজরুলের ইসলামী গান শুনে তাঁদের অনেকে ফুঁপিয়ে কেঁদেছেন। শুনেছি মুসলমান ব'লে যে হিন্দু তাঁকে পছন্দ করতেন না তাঁর শ্যামা-সংগীত শুনে তাঁকে তাকিয়াশোভিত দুগ্ধফেননিভ শয্যায় বসিয়ে ষাষ্টাঙ্গে প্রণাম করেছেন, মাটিতে মাথা রেখে তার পদযুগল মস্তিষ্কে স্থাপন করেছেন। এই হিন্দুরা তিনি ইসলামী গান লিখেছেন বলে আক্ষেপ করেছেন আবার মুসলমানরা তিনি শ্যামা-সংগীত লিখেছেন বলে অভিযোগ করেছেন। বিপ্লববাদীরা গান্ধীর উপর কবিতা লেখার জন্যে ক্ষুব্ধ হ'য়েছেন, গান্ধী-বাদীরা বিপ্লবধর্মী কবিতা লেখার জন্যে তাঁর প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছেন, মুসল-মানেরা হিন্দু-পুরান ব্যবহারের জন্য বিরূপ হ'য়েছেন আর বামাচারীরা ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন তাঁর বস্তুতান্ত্রিক দর্শনের সীমানায় আবদ্ধ না থাকতে

দেখে। এই যে আদর্শগত, ধর্মগত ও নীতিগত সংস্কারে বন্দী মনোবৃত্তির ভালো লাগা এ ভালো লাগার বশবর্তী না হ'য়ে শুধু সাহিত্যনীতি, কাব্য-নীতি ও শিল্পের মান দিয়ে কাব্যের বিচার করেছেন যাঁরা উল্লিখিত উদ্ধৃ-তিগুলো তাঁদেরই যদিও তবু প্রকৃতিগত ভালোলাগা মন্দলাগা সেখানে যে অবলুপ্ত এমন ভাবা কঠিন বলেই এতগুলো কথা বলতে হ'ল।

নজরুলের যে প্রকৃতি সেই প্রকৃতির সঙ্গে জীবনানন্দ দাশ, বুদ্ধদেব বসু ও সৈয়দ আলী আহসানের প্রকৃতির ব্যবধান অসামান্য। জীবনানন্দ দাশ কোলাহল পছন্দ করতেন না. সঙ্গ পছন্দ করতেন না, বুদ্ধদেব বসুর একটি লেখায় দেখেছি খেলাধূলার প্রতি তাঁর বিরাগের কথা, অনুরূপভাবে সৈয়দ আলী আহসানের লেখায় খেলাধূলা অপেক্ষা পাঠের প্রতি তাঁর যে বেশী অনুরাগ সে কথাই দেখেছিলাম। এই নিরীহ প্রকৃতির মানুষদের কানে তাই "তোপ দ্রুম দ্রুম গান গায়" এই ধ্বনিময় উচ্চারণ অপ্রিয় মনে হওয়ারই কথা। বীর্যবান প্রকৃতিকে গাঢ় আলিঙ্গনে বাঁধতে পারে আর একটি বীর্যবান প্রকৃতি। নজরুল ইসলাম বীর্যবান স্বভাবের কাছেই শ্রেষ্ঠ কবি, নির্বীর্য প্রকৃতির কাছে নন, তিনি পুরুষ প্রকৃতির কাছে শ্রেষ্ঠ কবি, নারী প্রকৃতির কাছে শ্রেষ্ঠ প্রতিভা নন। জীবনানন্দ দাশ, বুদ্ধদেব বসু এবং তাঁর অন্য সমালোচক যাঁরা কোমল প্রকৃতির, নম্র প্রকৃতির স্নিগ্ধ প্রকৃতির সেবক তাঁদের কাছে তিনি এই জন্যে মহৎ প্রতিভা নন। এঁদের দৃষ্টিতে তাই তাঁর কবিতা "মহৎ মান এড়িয়ে" যায়।

বলা বাহুল্য সমালোচনা সাধারণভাবে দু'রকমের হ'তে পারে। একটি সৃজনাত্মক অন্যটি ধ্বংসাত্মক। সব সময় মনে রাখা দরকার ধ্বংসা-ত্মক কাজ যত সহজ সৃজনাত্মক কাজ তত সহজ নয়। তাজমহল গড়তে বিশ বছর সময় লেগেছিল, বোমা মেরে সেটাকে এক সেকেণ্ডে উড়িয়ে দেওয়া যায়। জীবনানন্দ দাশ, বুদ্ধদেব বসু, সৈয়দ আলী আহসান এবং অরবিন্দ পোদ্দার যা বলেছেন সে-কথা বলতে পারা যত সহজ সেই কথাগুলোকে মিথ্যা প্রমাণিত করা ততোধিক কঠিন এবং সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। তা যত সংক্ষেপে পারা যায় ঐ ক'জনের মন্তব্যের মোটামুটি একটা উত্তর আমি দেওয়ার চেষ্টা করব। এঁদের প্রত্যেকের কথার মধ্যে একটি ঐক্য সূত্র আছে সে ঐক্য সূত্রটি হ'ল যে নজরুল কবি হ'তে

পেরেছিলেন তাঁর স্বাভাবিক কবিত্ব শক্তি ছিল বলে কিন্তু তিনি বড় কবি হ'তে পারেননি।' যে-কথা জীবনানন্দ দাশ স্পষ্ট ক'রে বলেননি সেটাই বুদ্ধদেব বসু স্পষ্ট করে বলেছেন। আর তা হ'ল :

'বালকের মত লিখেছেন তিনি, কখনো বাড়েননি, বয়স্ক হননি, পরপর বইগুলিতে কোন পরিণতির ইতিহাস পাওয়া যায় না, কুড়ি বছরের লেখা আর চল্লিশ বছরের লেখা একই রকম।'

'কথাটা খুব ঠিক নয়। এ-কথা ঠিক ২২ বছর বয়সে নজরুল পাকা হাতে লিখেছেন। কিন্তু নজরুল লিখতে শুরু করেছিলেন ১২ বছর বয়স থেকে এটাই ঐতিহাসিক সত্য। এবং তাঁর ১২ বছর বয়সের, এমনকি তাঁর ১৮।১৯।২০ বছরের বয়সের, লেখার সঙ্গে তাঁর ঐ ২২ বছর বয়সের লেখার পার্থক্য আছে। যে-কোন লেখক একবার লেখার পরিণত ভঙ্গিতে পৌঁছলে তার চেয়ে পরিণত লেখা তাঁর পক্ষে আর সম্ভব হয় না। হয়ত লেখার ভঙ্গী বদলায়, বাকচাতুর্যের পরিবর্তন হয়, লেখার প্রকৃতি পাল্টে যায় কিন্তু পাকা লেখা অধিকতর পাকা হয় না—এমনকি রবীন্দ্রনাথেরও হয়নি। "বলাকা"তে রবীন্দ্রনাথ যে ভাষা আয়ত্ত করেছিলেন তার চেয়ে উৎকৃষ্ট ভাষায় তিনি পরবর্তীকালে কাব্যরচনা করতে পেরেছেন ব'লে আমি মনে করতে পারি না। "মেঘনাদবধ কাব্যে"র পরে তার চেয়ে উৎকৃষ্ট ভাষায় মধুসূদনও কোনো কাব্যগ্রন্থ রচনা করতে পারেননি। এই ভাষাগত দিকের কথা বাদ দিলেও চিন্তার দিক থেকে মানুষের একটি বিশেষ পর্যায়ে পরিণতি শেষ সীমায় পৌঁছে যায়। যে বয়সে র‍্যাবো যে পরিণতিতে পৌঁছেছিলেন, যে বয়সে কীটস যে পরিণতিতে পৌঁছেছিলেন সেই বয়সে সেটাই ছিল তাঁদের শেষ পরিণতি। "গীতাঞ্জলি"র পরে রবীন্দ্রনাথের পরিণতি ব্যাখ্যা করলে স্ব-বিরোধিতা ধরা পড়বে, পরিণতি ধরা পড়বে না। "গীতাঞ্জলি" তে গিয়ে যে চিন্তা চূড়ান্ত রূপ লাভ করেছে সেটাই তার শেষ পরিণতি। "গীতিমাল্য", "গীতালী", "গীতিমালা" "গীতাঞ্জলির" পরিণতি নয়। "বলাকার" পরিণতি নয় "পলাতকা", "পূরবী" "মহুয়া" কিংবা" "পুনশ্চ"। এসব কল্পনার বৈচিত্র্য, চিন্তার স্থান পরিবর্তন, চিন্তার পরিণতি নয়। বোদলেয়ার বলেছিলেন, আমি ত্রিশ

বছবের চিন্তা তিন বছরে করেছি। ১৯২০ সাল থেকে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত ভারতীয় উপমহাদেশের এবং পৃথিবীর নিগৃহীত মানুষের সমস্যা নিয়ে নজরুল যা ভেবেছেন তা তিন হাজার বছর বয়সের সভ্যতার চিন্তা। তাঁব বক্তব্যের মধ্যে যদি আমরা কোরান গীতা উপনিষদ তন্ত্রতত্ত্ব এবং রুশো, ভলেটয়ার ও মার্কসের চিন্তাধারার উপস্থিতি লক্ষ্য করি তাহ'লে সেটাকেই কয়েক হাজার বছরের চিন্তার ফলশ্রুতি বলে মনে করব। ঐ বয়সে তিনি যা ভেবেছেন সেটাই যথেষ্ট পাকা মাথার, বয়স্ক মাথার ভাবনা। কেননা অনেক বয়স্ক মানুষেরাও আজ পর্যন্ত মানুষের কল্যাণচিন্তায় অতটা পরিপক্ক হ'তে পারেননি।

বুদ্ধদেব বসুর আব একটি কথার উত্তর দেওয়া যায় কি না? তিনি বলেছেন :

> যে সম্পদ নিযে তিনি জন্মেছিলেন তাব পূর্ণ ব্যবহাব তাঁব সাহিত্যে কখনো হলো না; সেখানে দেখতে পাই তাঁর আত্ম-অচেতন মনেব অনেক হেলাফেলা, অনেক ফেলা-ছড়া, অনেক অপচয়।

জীবনানন্দ দাশ "নিজেকে বিশোধিত করার প্রতিভা নেই এ-সব কবিতার বিধানে" ব'লে "সুদূরদুরূহভাষায়" যে উক্তি করেছিলেন তারই ব্যাখ্যা কিনা বুদ্ধদেব বসুব মন্তব্য, জানি না—কিন্তু এটুকু জানি নজরুল ইসলাম আত্ম-অচেতন ছিলেন না। তাঁর চিঠিপত্র, অভিভাষণ, প্রবন্ধ এবং পত্রিকায় প্রকাশিত সম্পাদকীয় প্রবন্ধ মালায় তিনি তাঁর আত্ম-সচেতন মনের স্বাক্ষব রেখে গেছেন। সশস্ত্র বিপ্লব, গান্ধীর অহিংসাবাদ এবং সৃষ্টি-ধ্বংসের দার্শনিক সংজ্ঞার ভিতর সুস্পষ্ট ভেদ যিনি জানতেন, যাঁর চিন্তায় জড়বাদ ও ভাববাদের পার্থক্য চিহ্নিতভাবে ধরা পড়েছিল তিনি আত্ম-অচেতন ছিলেন এ-কথা বিশ্বাস করা যায় না।

আর "হেলাফেলা" "ফেলাছড়া" ও "অপচয়" সম্বন্ধে এটুকু বলি যে, সত্যিকার বড় কবির সমগ্র রচনা খুঁটলে এমন "অপচয়" ও "হেলা-ফেলার" কিছু স্বাক্ষর পাওয়া যাবে। তবে একটা কথা, নজরুল তাঁর কবিতা একেবারে মাজা-ঘষা করতেন না—এই সংবাদ মিথ্যা। প্রমাণ স্বরূপ দু'-একটি উদাহরণ এখানে দেখাব : "বিদ্রোহী" কবিতার ৯১-৯৪ চরণ প্রথমে এইভাবে লিখিত হয়;

ছুটি ঝড়ের মতন করতালি দিয়া
হাসি হা-হা হা-হা -হি-হি হি-হি
তাজি বোররাক আর উচ্চৈঃশ্রবা বাহন আমার
হাঁকে চিঁ-হিঁ হিঁ-হিঁ চিঁ-হিঁ হি-হিঁ।

পরে এটাকে বদলে তিনি লেখেন :

ছুটি ঝড়ের মতন করতালি দিয়া
স্বর্গ মর্ত্ত্য করতলে,
তাজি বোররাক আর উচ্চৈঃশ্রবা বাহন আমার
হিম্মত হ্রেষা হেঁকে চলে!

"নজরুল-রচনা-সম্ভার"-এ "প্রথম অশ্রু" নামে একটি কবিতা আছে। এই কবিতাটির পাশে কবির লেখার একটি খসড়াও ছাপা হয়েছে। সেখানে আমরা বেশ কাটাকুটির চিহ্ন দেখেছি। এবং দেখা যাচ্ছে কবি যে-ভাবে লেখাটি শুরু করেছিলেন পরে তা বদলে গিয়েছে। মুদ্রিত কবিতা হ'ল :

এরি লাগি তুই পথ চেয়ে' কি রে ব'সে ছিলি মুসাফের,
প্রথম অশ্রু দেখে যাবি চোখে নিরশ্রু আকাশের?
রৌদ্র-ধূসর উষর গগন
হেরিল কখন মেঘের স্বপন,
দুলিয়া উঠিল অসীম রোদন কূলে কূলে নয়নের,
তত ঝরে জল-চোখে অঞ্চল যত চাপে জলদের।

এটাকে তিনি প্রথমে এইভাবে লিখেছিলেন :

এরি লাগি তুই পথ চেয়ে কিরে বসেছিলি মুসাফির,
নিরশ্রু তোর চোখে দেখে যাবি প্রথম অশ্রু-নীর?
রৌদ্র-ধূসর উষর গগন
মেঘে মেঘে আজ হ'ল নিমগণ
ও চাপে চোখে মেঘের আঁচল

দ্বিতীয় চিন্তায় "তিনি মেঘে মেঘে আজ হ'ল নিমগন" কেটে লেখেন "কূলে কূলে জলে হল নিমগন"—তারপর সম্পূর্ণ স্তবক বর্জন ক'রে "মুসাফির" এর স্থানে "মুসাফের" লেখেন এবং 'নিরশ্রু তোর চোখে দেখে যাবি প্রথম অশ্রু-নীর' এর স্থানে "প্রথম অশ্রু দেখে যাবি চোখে নিরশ্রু আকাশের?' এবং "কূলে কূলে জলে হল নিমগন" এর স্থানে "হেরিল কখন মেঘের স্বপন" লেখেন। দু'টি মাত্র উদাহরণ দিলাম। এ-রকম

অজস্র উদাহরণ সাক্ষ্য প্রমাণ দিয়ে দেখানো যাবে যে তিনি "আত্ম-অচেতন" ছিলেন না। পরবর্তী কালে যখন তিনি সংগীত অজস্র ধারায় লেখেন তখন সূক্ষ্ম ছন্দ নির্মাণে, সুরের পাঞ্চ করার ব্যাপারে তাঁর অসামান্য সচেতন মনের স্বাক্ষর রেখেছেন। অবশ্য আমি বলব না যে নজরুলের কবিতায় কোথাও অবহেলা কিংবা অপচয়ের চিহ্ন নেই তবে সে ক্ষেত্রে আমি লংগিনাসের একটি বিখ্যাত উক্তি এখানে উদ্ধৃত করব :

> Now I am well aware that the highest genius is very far from being flawless, for entire accuracy runs the risk of descending to triviality, whereas in the grand manner, as in the possession of great wealth, something is bound to be neglected. Again. it may be inevitable that men of humble or mediocre endowment who never run any risks and never aim at the heights, should in the normal course of events enjoy a greater freedom from error, while great abilities remain subject to danger by reason of their very greatness. And in the second place, I know that it is always the less admirable aspects of all human endeavours that are most widely noticed, The remembrance of mistakes remains ineradicable, while that of virtues quickly melts away.
>
> I have myself observed a good many faults in Homer and our other authors of the highest distinction, and I cannot say that I enjoy finding these slips : however I would not call them wilful errors, but rather careless oversights let in casually and at random by the heedlessness of genius.

মহত্তম প্রতিভার রচনার স্বতস্ফূর্ততাই যে সবচেয়ে বড় কথা লংগিনাস সে-কথা বলেছেন—তুচ্ছ ভুল ত্রুটি কিংবা স্খলন-পতন সেখানে অনুল্লেখ-যোগ্য ; এবং তিনি এ-কথাও বলেছেন যে যাঁর ঐশ্বর্য থাকে তাঁরই কিছু অপচয় হয়— as in the possesion of great wealth, something is bound to be neglected.

লক্ষ্যণীয় লংগিনাস বলছেন যে মধ্যম শ্রেণীর প্রতিভাই অধিকতর সংশোধনের পক্ষপাতি। তাঁরা মহত্তম প্রতিভাবানদের মত কোনো 'রিস্ক' নিতে সাহস করেন না। তাঁরা বেশী শুদ্ধতার পক্ষপাতী বলে মহত্তম প্রতিভার উচ্চতম পর্যায়ে পৌঁছতে অসমর্থ হন। মহত্তম প্রতিভার স্খলন পতন থাকে—লংগিনাস হোমারে এবং তাঁর দেশের অন্যান্য বড় প্রতিভার মধ্যেও সে ত্রুটি লক্ষ্য করেছেন। সে ত্রুটি দেখে তিনি খুশি হ'তে পারেননি। তবে সেই ত্রুটিকে তিনি ইচ্ছাকৃতও মনে করেননি। সে ত্রুটি দৃষ্টি এড়াবার ফল। সেটা রচয়িতার অচেতনতা নয়। এবং বলা বাহুল্য রচনার মহত্ত্ব তার স্বতস্ফূর্ততা, গতিশীলতা এবং তীব্রতার উপর নির্ভর করে—সামান্য-শব্দ প্রয়োগের হেলা-ফেলার উপর নির্ভর করে না।

এখানে বুদ্ধদেব বসুর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগ আলোচিত হ'তে পারে। তিনি বলেছেন, নজরুলের রচনায় সামাজিক, রাজনৈতিক বিদ্রোহ আছে কিন্তু সাহিত্যিক বিদ্রোহ নেই। 'সাহিত্যিক বিদ্রোহ নেই কথাটা কি খুব সত্য? এ-অভিযোগের উত্তর বুদ্ধদেব বসু নিজে কি দেননি? "রবীন্দ্রনাথ ও উত্তর সাধক" প্রবন্ধে তিনি নজরুল সম্বন্ধে বলেছেন—"তিনি (নজরুল) দেখিয়ে দিলেন যে রবীন্দ্রনাথের পথ ছাড়াও অন্য পথ বাংলা কবিতায় সম্ভব।" কি দিয়ে নজরুল ইসলাম দেখিয়ে দিলেন যে 'রবীন্দ্রনাথের পথ ছাড়াও অন্য পথ বাংলা কবিতায় সম্ভব।' সাহিত্যিক বিদ্রোহ না থাকলে রবীন্দ্র কারাগার তিনি ভাঙলেন কি ক'রে? অবশ্যই সাহিত্যিক বিদ্রোহও তাঁর ছিল—'আমি চির দুরন্ত দুর্মদ, আমি দুর্দম মম প্রাণের পেয়ালা হর্দম হ্যায় হর্দম ভরপুর মদ"—এই ভাষায় লেখার সাহসই সাহিত্যিক বিদ্রোহ।' এবং এ কাজটি নজরুল সচেতনভাবেই করেছিলেন—হিন্দু পুরাণ-প্রতীক ও মুসলিম পুরাণ-প্রতীক পাশাপাশি ব্যবহার করা, আরবী ফারসী শব্দের সঙ্গে তদ্ভব তৎসম ও দেশী শব্দের মিশ্রণ ঘটানো তাঁর সচেতন সাহিত্যিক বিদ্রোহের ফল। এক চেটিয়া সংস্কৃত শব্দের আধিপত্যে চিড় খাইয়ে বাংলা শব্দভাণ্ডারকে সম্পদশালী ক'রে তোলার এ বিদ্রোহ কি সাহিত্যিক বিদ্রোহ নয়? এবং ছন্দ? নজরুল কি-দু' দশটি নতুন ছন্দও আবিষ্কার করেননি? ছান্দসিকরা ত বলেন করেছেন। তা হ'লে?

এখন আবদুল ওদুদের কথায় আসা যাক। তিনি বলেছেন: "নজরুল পূর্ণাঙ্গ কবিতার রচয়িতা নন" "উৎকৃষ্ট চরণের রচয়িতা"—মানেটা কি দাঁড়াল? এই কথার অর্থ আমরা এইভাবে করতে পারি যে নজরুলের কবিতা হয় না তবে কোনো কোনো পংক্তি কিংবা চরণে কাব্য লক্ষণ আছে। এই কাব্যলক্ষণযুক্ত চরণগুলো কি—যার সঙ্গে কবির মৌলভাবের কোনো সম্বন্ধ নেই। সাধারণভাবে ধরা যাক অসামান্য চিত্র-কল্পে, অনুপ্রাসে বা উপমায় সমৃদ্ধ পংক্তিগুলোকে আবদুল ওদুদ উৎকৃষ্ট চরণ বলেছেন—অথবা যে পংক্তিতে উজ্জ্বল চিন্তার উপস্থিতি দেখেছেন তার ইঙ্গিত করেছেন। যেমন: "আমি জাহান্নামের আগুনে বসিয়া হাসি পুষ্পের হাসি" চরণটি।

আমি জানি না এমন অদ্ভুত উক্তি আবদুল ওদুদ কি মনে করে করে-ছিলেন। প্রত্যেক কাব্যে এবং মহাকাব্যে অলঙ্কারহীন নিরাভরণ অসংখ্য কাব্যপংক্তি থাকে। যে কবিতা অথবা কাব্যপংক্তি আভরণহীন সে কাব্য নয় অথবা আভরণে দ্যুতিময় পংক্তিই একমাত্র কাব্য এই মনে ক'রে কাব্যবিচার চলে না। পৃথিবীর মহাকাব্যগুলি ত বটেই এবং যেগুলোকে প্রবন্ধ কাব্য বলা হয় এমন কবিতার বর্ণনাধর্মী ভাষায় অনেক অকাব্যিক পংক্তি থাকে—সেটা কোনো কবির দোষ নয়। টোটাল এফেক্ট—সার্বিক অনুভূতিই আসল কথা। "বিদ্রোহী"র মধ্যে পরস্পরবিরোধী উক্তি আছে–কিন্তু বিরোধের মধ্যে যে আত্মীয়তা আছে সেটাকে দেখার জন্যে আরও গভীর দৃষ্টির প্রয়োজন, আবদুল ওদুদ সেই গভীর দৃষ্টি দিয়ে নজরুলের কাব্যকে ভোগ করতে পারেননি।' 'কিছুতেই মানব না" এই ধরনের জেদই ঐ ধরনের উক্তি করতে বাধ্য হয়। অনুভূতির দ্বারা কাব্যের উপলব্ধি না ক'রে বুদ্ধির দ্বারা কাব্য-বিচারে অগ্রসর হ'লে প্রতারিত হতে হয়। আবদুল ওদুদ সেই ভুল করেছিলেন। এবার অরবিন্দ পোদ্দারের কথা ধরা যাক। তিনিও বলেছেন নজরুলের কবিতা সবটা excess কদাচিৎ fine. সম্ভবতঃ নজরুলের সব কবিতা তিনি পড়েননি তাঁর অকবিতাগুলোকে কবিতা হিসেবে পড়েছেন। তা না হলে এমন একদেশদর্শী মন্তব্য করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হত না।

প্রসংগত নজরুল ইসলামের অসংখ্য গানগুলিকেও তাঁর কবিতা হিসেবে ধরে নিতে হবে। নিশ্চয়ই নজরুলের সমস্ত গান এবং সমস্ত কবিতা সমপর্যায়ের নয়। 'ওঠরে চাষী জগদ্বাসী ধর কসে লাঙল' কিংবা 'কারার ঐ লৌহ কপাট ভেঙে ফেল কররে লোপাট' ইত্যাদি গান কিংবা কবিতা "বিদ্রোহী" "প্রলয়োল্লাস", "কোরবানী" অথবা "ঝড়" কিংবা "দারিদ্র্য" প্রভৃতি কবিতার সমগোত্রীয় নয়। "কে নিবি ফুল, কে নিবিফুল," "আমি দ্বার খুলে আর রাখব না" ইত্যাদি গান "মোর ঘুমঘোরে এলে মনোহর", "করুণ কেন অরুণ আঁখি", "মুসাফির মোছ এ আঁখি জল", "ভরিয়া পরান শুনিতেছি গান" প্রভৃতি গানের সমপর্যায়ের নয়। কবির হাইয়েষ্ট কনসেনট্রেশন, সাব্লাইম ইমাজিনেশন এবং হাই সিরিয়াসনেস সব কবিতা ও গানে রূপলাভ করেনি। তাঁর মহত্ত্ব বিচারে সেগুলোকে উপেক্ষা করতে হবে এই মনে করে যে তাঁর অবস্থা, পরিবেশ, পারিবারিক জীবন, দারিদ্র্য এবং তাঁর যে সমাজে জন্ম সেই অসংস্কৃত অপরিণত এবং অশিক্ষিত সমাজই তাঁকে অনেক বাজে কবিতা লিখতে বাধ্য করেছিল। সবটাই তাঁর ভিতরের উচ্চারণ নয়। অবশ্য রাজনৈতিক প্রয়োজনে তিনি যে সহজ কবিতা লিখেছিলেন সেটাও একটা মহৎ উদ্দেশ্যকে মনে রেখেই সচেতনভাবে করেছিলেন। মহৎ চিন্তায় গুণান্বিত সেই সচেতনতার ভিন্ন মূল্য আছে। সহজ ক'রে লিখতে পারার ক্ষমতাকে আয়ত্ত করাও সহজ নয়। মহৎ উদ্দেশ্যকে রূপায়িত করার জন্য এই সহজতার স্বীকৃতি যে মহৎ মন দিতে পারে সেই মহৎ মনও মহৎ প্রতিভার লক্ষণ। লংগিনাসও বলেছেন কবিতায় Greatest mind অনুস্যূত হয়েছে কিনা সেটাও প্রনিধানযোগ্য। আর বলা বাহুল্য নজরুলের যেসব কবিতা তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতা অথবা গান তার সবটাই excess নয়—কেবল fine ও নয় great-ও। যদি বেছে ১০০টা কবিতা আর ৫০০ গানকে সুনির্বাচিত কবিতা ব'লে গ্রহণ করা যায় তা'হলেও সে-গুলোর সবগুলোকে fine বলে ধরতে হবে। মনে রাখতে হবে কোনো কবিই তাঁর প্রতিটি রচনাকে নিখুঁত বিশুদ্ধ করতে পারেন না। কেউ নন—শেলী, কীটস, রবীন্দ্রনাথ, হাফিজ, ওমর খৈয়াম কেউ নন। সবারই মধ্যে কিছু excess আছে এবং কিছু finenessও আছে। বলা বাহুল্য অরবিন্দ পোদ্দার নজরুলের

কাব্যভাষা সম্বন্ধে যে দুর্বলতার কথা বলেছেন. ছন্দ সম্বন্ধে "শিথিল, ব্যঞ্জনা শক্তিতে একান্ত দুর্বল" বলে যে উক্তি করেছেন তা তাঁর নজরুল পাঠের সীমানা নির্দেশ করে, শুধু তাই নয় কাব্যবোধেরও সীমানা নির্দেশ করে। "নবযুগে" সম্পাদকীয়গুলি কবিতায় লেখার সময় যখন তিনি ক্রমেই অসুস্থ হ'য়ে উঠছিলেন তখনকার কিছু কিছু কবিতায় ছন্দ-দৌর্বল্যের লক্ষণ পাওয়া যায়; কিন্তু নজরুলের সমগ্র কাব্যের আলোচনায় এই ধরনের ঢালাও মন্তব্য কোনো সহৃদয় কাব্যরসিকের নয়। নজরুলের কাব্যভাষার ছন্দ যে বাংলাছন্দে অসামান্য বলিষ্ঠতা ফিরিয়ে এনেছিল এ-কথা অনেক ছান্দসিকরাই স্বীকার করেছেন। অরবিন্দ পোদ্দারের কথা মানলে প্রথমে সেই ছান্দসিকদের মুণ্ডপাত করতে হয়। দ্বিতীয়তঃ যিনি ছিলেন সংগীত সম্রাট যাঁর সংগীতের সূক্ষ্ম ধ্বনি তাললয় সম্বন্ধে জ্ঞান ছিল অবিতর্কিত তাঁর ছন্দভাষা সম্বন্ধে ঐ ধরনের উক্তি খুব স্বচ্ছ মনের পরিচয় বহন করে না।

এবারে আমরা সৈয়দ আলী আহসানের মন্তব্যটি নিরীক্ষণ করে দেখব। আমাদের প্রথম আপত্তি "অত্যন্ত প্রবলভাবে আত্মমুখর" নজরুল সম্বন্ধে বিশেষণ হিসেবে তাঁর এই বাক্যের গঠন। "আত্মমুখর" অর্থে অন্ততঃ আমরা বুঝি আত্মপ্রেমে মুগ্ধতা—এটাকে খানিকটা আত্মস্বার্থপরতা বলেও মনে হয়। কিন্তু আত্মরতির উপাসক নজরুল ছিলেন না। "বিদ্রোহী" ও "ধূমকেতু" কবিতায় অসংখ্য "আমি"র উচ্চারণ আছে। তাকে কি সেইজন্যে আত্মমুখর বলব। নজরুলের 'আমি"র ব্যাখ্যা নজরুল করেছেন। নিজেকে না জানলে অন্যকে জানা হয়না, আত্মজ্ঞান ভিন্ন আল্লাকে জানা যায় না এবং পৌরুষ শক্তিকেও পাওয়া যায় না—যে পৌরুষ-শক্তি অন্যায়কে প্রতিরোধ করে।' নজরুল "আমি"কেও সেই অর্থে ব্যবহার করেছিলেন—এ ত আত্মমুখরতা নয়। দ্বিতীয়তঃ দুর্দশাগ্রস্তের প্রতি নজরুলের মমত্বকে তিনি "আদর্শ-বিলাস" বলেছেন। অত্যন্ত আপত্তিজনক এই শব্দের ব্যবহার। নিজের বাব্যখ্যাতিকে বিসর্জন দিয়ে, অমরতার লোভ ত্যাগ ক'রে যিনি নিপীড়িত জনগণের কথা বলেছেন তাঁর সম্পর্কে "আদর্শ-বিলাসে"র বিশেষণ ন্যায়সঙ্গত কি? নজরুল ইসলাম একটি গানে লিখেছিলেন, "এ নহে বিলাস বন্ধু, ফুটেছি জলে কমল—এযে ব্যথা রাঙা

হৃদয় আঁখিজলে টলমল।" তাঁর সাহিত্যে সেটা সত্যি হ'য়ে উঠেছে। তাঁর কাব্যের স্খলন পতন নিয়ে যাঁরা কথা বলেছেন তাঁরাও তাঁর সাহিত্যকে অন্ততঃ বিলাস বলতে পারেন নি। আলী আহসান কেন এই নির্মম উচ্চারণ করলেন। এ ত কাব্যের প্রতি সুবিচার নয়। তিনি একটা কৈফিয়ৎ এই বলে দিয়েছেন বটে— "দুর্বলদের প্রতি তার অনুরাগ ছিল অসীম। কিন্তু তা অশ্রুতে রূপায়িত হয়নি হয়েছে সংঘাতে আবর্তিত।" আমি এখানে কয়েকটি লাইন তুলে দেখাব যে বেদনার কুসুম নির্যাসে তাঁর কাব্যপংক্তি অভিসিক্ত ছিল ;

ও কে ? চণ্ডাল ? চমকাও কেন? নহে ও ঘৃণ্য-জীব।
ওই হতে পারে হরিশ্চন্দ্র ওই শ্মশানের শিব।
আজ চণ্ডাল কাল হ'তে পারে মহাযোগী সম্রাট
তুমি তাব কাল অর্ঘ্য দানিবে করিবে নান্দী পাঠ।
রাখাল বলিয়া কারে কর হেলা ও হেলা কাহার বাজে
হয়ত গোপনে ব্রজের গোপাল এসেছে রাখাল সাজে।
চাষা বলে কর ঘৃণা।
দেখো চাষা রূপে লুকায়ে জনক বলরাম এলো কিনা ?

কিংবা

তোমার সৃষ্টি কত সুন্দর কত সে মহৎ, পিতা।
সৃষ্টি-শিয়রে ব'সে কাঁদ তবু জননীর মত ভীতা।
নাহি সোয়াস্তি নাহি যেন সুখ,
ভেঙে গড়, গড়ে ভাঙ উৎসুক।
আকাশ মুড়েছ মরকতে--পাছে আঁখি হয় রোদে ম্লান
তোমার পবন করিছে ব্যজন জুড়াতে দগ্ধ প্রাণ।
ভগবান, ভগবান।।

রবি-শশী তারা প্রভাত-সন্ধ্যা তোমার আদেশ কহে
'এই দিবারাতি আকাশ বাতাস নহে একা কারো নহে।
এই ধরণীর যাহা সম্বল,--
বাসে ভরা ফুল রসে ভরা ফল,
সু-স্নিগ্ধ মাটি সুধাসম জল, পাখীর কণ্ঠে গান,---
সকলের এতে সম অধিকার এই তাঁর ফরমান'।

কবির গোপন অশ্রু তাঁর আঁখির ঝালরে দুলে না উঠলে এই লেখা কলমে আসে না। কোনো বিলাসী, সাহিত্য অথবা শিল্প-বিলাসী, কবি-সমালোচকের পক্ষে এর সম্পূর্ণ অনুভূতি টের পাওয়াও সম্ভব নয়। কবির মত সমপর্যায়ের বিশাল হৃদয় ভিন্ন এর গুরুত্ব অনুধাবন অসম্ভব।

তাঁর শেষের বক্তব্যের সঙ্গে আবদুল ওদুদের প্রাগুক্ত বক্তব্যের মিল আছে। বলা বাহুল্য এই মন্তব্য অসার। "অগ্নি-বীণা"য় অনেকগুলি দীর্ঘ কবিতা আছে। তাদের ভাবগত সম্পূর্ণতা বিঘ্নিত হয়েছে বলে আমাদের মনে হয় না। তা ছাড়া বড় কথা কবিতা প্রবন্ধের মত যুক্তির ক্রীতদাস নয়—সে কখনো বুদ্ধির দাসত্ব স্বীকার করে না—তার সম্বন্ধে আবেগের সঙ্গে অবশ্য একটা কিছু শৃংখলা থাকতে হবে। তার কবিতার সে শৃংখলা যদি না থাকত সমালোচকদের প্রয়োজন হ'ত না—পাঠকই নজরুলকে উচ্ছিষ্টের মত বর্জন করত। কিন্তু একটা শৃংখলা আছে; আর তারই শৃংখলে এখনও পর্যন্ত তিনি কোটি কোটি পাঠককে সুদৃঢ়ভাবে বেঁধে রেখেছেন।

নির্ঘণ্ট

ই

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ২৪

২৪—

ভ

ল